

বাণিজ্যিক



পৌরবিজ্ঞান

ও



ধনবিজ্ঞান

শ্রীশিবনাথ চক্রবর্তী

[পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্যসূচী অনুসারে উচ্চ মাধ্যমিক ও সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়সমূহের বাণিজ্য-ধারার নবম হইতে একাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লিখিত]

বাণিজ্যিক পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

(আলোচনা, সংক্ষিপ্তসার ও ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত প্রশ্নোত্তর-সম্বলিত)

[উচ্চ মাধ্যমিক বাণিজ্য-ধারার নবম হইতে একাদশ শ্রেণীর জন্য]

শ্রীশিবনাথ চক্রবর্তী, এম. এ.

অধ্যক্ষ, শ্যামাপ্রসাদ কলেজ, কলিকাতা।

An Introduction to Politics, রাষ্ট্রতত্ত্ব (ত্রৈ-বার্ষিক স্নাতক সংস্করণ) ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড, অর্থতত্ত্ব, উচ্চ মাধ্যমিক ধনবিজ্ঞান ও পৌরবিজ্ঞান, প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় ধনবিজ্ঞান ও পৌরবিজ্ঞান, বাণিজ্যিক ধনবিজ্ঞান ও পৌরবিজ্ঞান প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা।

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

প্রকাশক :
শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট্, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—১৯৬২
দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯৬৪
তৃতীয় সংস্করণ—১৯৬৬
মূল্য : ৭ টাকা ৫০ পয়সা মাত্র

আসাম এজেণ্টস্ :
বি. বি. ব্রাদার্স এণ্ড কোং
কলেজ হোস্টেল রোড
গৌহাটী-১

মুদ্রাকর :

শ্রীঅজিতকুমার বসু
শক্তি প্রেস
২৭।৩বি, হরি ঘোষ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

দেবেশ দত্ত
অরুণিমা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৮১, সিমলা স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

নিবেদন

বহুদিন হইতে প্রকাশক ও কয়েকজন শিক্ষক বন্ধু উচ্চ মাধ্যমিক বাণিজ্য-ধারার জন্য পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞানের উপর একখানি পুস্তক লিখিতে অনুরোধ জানাইতেছেন। কিন্তু এতদিন তাহা সম্ভব হয় নাই। এবার প্রকাশকের সনির্বন্ধ অনুরোধে মৎ-প্রণীত উচ্চ মাধ্যমিক ধনবিজ্ঞান ও পৌর-বিজ্ঞান পুস্তকখানিকে ভিত্তি করিয়া বাণিজ্য-ধারার জন্য এই পুস্তকখানি লিখিত হইল। যতদূর সম্ভব নির্ধারিত পাঠ্যসূচীর সরল ও বিস্তারিত আলোচনা এই পুস্তকে করা হইল। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়টির সংক্ষিপ্তসার এবং তৎসঙ্গে মধ্যশিক্ষা পর্ষতের বাণিজ্য-ধারার ১৯৬২ সাল পর্যন্ত সমুদয় প্রশ্নের ও অন্য সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল। প্রশ্নোত্তরের জন্য পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি পাইলেও ছাত্র-ছাত্রীগণ উত্তরগুলি পাঠ করিলে প্রশ্নের তাৎপর্য ও উত্তর লিখিবার প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবেন এবং এজন্য তাঁহাদের আর কোন স্বতন্ত্র পুস্তকের প্রয়োজন হইবে না। আশাকরি, যাঁহাদের জন্য এই পুস্তক লিখিত হইল, পুস্তক পাঠে তাঁহারা উপকৃত হইবেন।

প্রকাশক ও তাঁহাদের সুদক্ষ কর্মচারিবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ যেরূপ দ্রুতগতিতে মুদ্রণকার্য সমাপ্ত করিয়াছেন, তাহা বিস্ময়ের বিষয়।

শ্যামাপ্রসাদ কলেজ
কলিকাতা-২৬
কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমা
২৬শে আশ্বিন, ১৩৬৯
ইং ১৩।১০।৬২

শ্রীশিবনাথ চক্রবর্তী

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই সংস্করণে পুস্তকখানির যথাযথ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হইল। ১৯৬৫ সালের প্রশ্নগুলিও যথাস্থানে আলোচিত হইল। আশা করি, ছাত্র-ছাত্রীগণ এই সংস্করণ পাঠে লাভবান হইবেন।

প্রকাশক ও প্রেসকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

শ্যামাপ্রসাদ কলেজ
কলিকাতা-২৬
শ্রীপঞ্চমী, ১৩৭২, ২৬।১।৬৬

শ্রীশিবনাথ চক্রবর্তী

Syllabus For Economics & Civics

CIVICS including INDIAN ADMINISTRATION

CLASS—X

1. Meaning and Scope of the study of Civics.
2. Nature and stages of Society.
3. The individual, Society, the State and the other Associations.
4. Ends and Functions of the Modern State.
5. Citizenship—Citizens and Aliens—Acquisition and termination of Citizenship. Rights and duties of a Citizen—The fundamental Rights and the Directive Principles of State Policy as included in the Constitution of India.
6. Law—Meaning of Law. Law and Liberty.
7. Forms of Government—Democracy and Dictatorship. Merits and Demerits of Democracy—Conditions for Democracy. Unitary and Federal Government—their advantages and disadvantages. Nature of Indian Federation.
8. Constitution—Nature of a Constitution—Written and Unwritten. Rigid and Flexible Constitutions.
9. The Executive, the Legislature and the Judiciary. Theory of Separation of Powers.
10. The Electorate—Adult Suffrage—Extent of Electorate —Minority representation—Voters and Constituencies in India.
11. Public Opinion and Political Parties. Nature of Public Opinion—Methods of influencing Public Opinion. Nature of Political Parties—Functions of Political Parties—Merits and Demerits of Party system.
12. Relations between States—Nationalism and Internationalism. The United Nations.
13. Government of India—Union Executive and Union Legislature. State Executive and State Legislature. Judicial System—Local Self-Governing Bodies with reference to West Bengal.

ECONOMICS including INDIAN ECONOMIC PROBLEMS

CLASS—XI

1. The Economic activities of man—The Subject-matter of Economics.

[An outline description of the main features of present-day economic structure and activity in India in conjunction with the elements only of the theory of demand and supply, may be the starting point.]

2. Some Fundamental concepts : Wealth, Goods, Utility, Production and Consumption. Supply and Demand. Value and Price.
3. Wants and their characteristics—Law of Diminishing Utility—Total and Marginal Utility.
4. Law of Demand—Elasticity of Demand.
5. Factors of Production—Land, Labour, Capital and Organisation. Land and other factors of production—Laws of Returns. Supply and efficiency of Labour—Division of Labour. Capital—Wealth and Capital, Capital formation in India. The function of the Organiser.
6. Large scale Production—Internal and External Economies of large-scale production. Small-scale production. Localisation of industries. Organisation of large and small Industries in India.
7. Exchange : What is a market ? Conditions determining size of market— Value and Price. Value and competition—Theory of Value. Market Value and Normal Value—Equilibrium of demand and supply in the case of market value and in the case of Normal Value. Value and the laws of Returns.
8. International Trade : Territorial Division of Labour. Protection and Free Trade—Fiscal Policy in India.
9. Money : Barter. What is money ? Functions of money. Different kinds of money in India. Paper money—Value of money. Index Numbers. Quantity Theory of Money—Inflation—Prices in India.
10. Credit and Banking : Nature and characteristics of Credit. Credit instruments. Banking : Central and Commercial Banks and their functions—Clearing House System—Different kinds of Banks in India.
11. Distribution, Rent, Wages, Interest and Profit. National Dividend and National Income, India's National Income and its principal sources.

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু

(Definition and Scope of Civics)

পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞা—Definition of Civics

পৌরবিজ্ঞানের ইংরাজী প্রতিশব্দ হইল সিভিক্স (Civics)। সিভিক্স শব্দটি আবার যথাক্রমে লাতিন 'সিভিটাস' (Civitas) ও 'সিভিস' (Civics) হইতে গৃহীত। 'সিভিটাস' শব্দের অর্থ হইল নগর-রাষ্ট্র আর 'সিভিস' শব্দের অর্থ হইল নাগরিক।

প্রাচীন গ্রীস ও রোমে নগরকে কেন্দ্র করিয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়। এথেন্স, স্পার্টা, সাইরাকিউস প্রভৃতি ছিল এই জাতীয় রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের আয়তন নগরেই সীমাবদ্ধ থাকিত বলিয়া এই জাতীয় রাষ্ট্রকে নগর-রাষ্ট্র (City-State) বলা হইত। গ্রীক ও রোম দেশের সভ্যতা এই নগর-রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে। এই নগর-রাষ্ট্রের যে-সমস্ত অধিবাসীর প্রচুর অবসর ছিল, এবং যাহারা রাষ্ট্রপরিচালনা-কার্যে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিবার যোগ্যতার অধিকারী ছিল, তাহাদিগকেই নাগরিক বলা হইত। রাষ্ট্রপরিচালনা-কার্যে অংশ গ্রহণ করিবার অযোগ্যতাহেতু ক্রীতদাস, দিন-মজুর ও স্ত্রীলোকগণ নাগরিক বলিয়া গণ্য হইত না।

শব্দগত অর্থের দিক দিয়া দেখিলে বলা যায় যে, পৌরবিজ্ঞান হইল সেই শাস্ত্র, যে শাস্ত্র পুর অর্থাৎ নগর এবং পৌরজন অর্থাৎ নাগরিক লইয়া আলোচনা করে। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে রাষ্ট্র ও সমাজ ছিল অভিন্ন, রাষ্ট্রই ছিল সমাজের একমাত্র প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিকগণের সর্ববিধ কার্যকলাপই একমাত্র রাষ্ট্রের ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং অতীত যুগে পৌরবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু নাগরিক অধিকার-ভোগ ও নাগরিক কর্তব্য-পালনেই সীমাবদ্ধ ছিল। নগর-রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকগণের সম্পর্ক এবং এই পারস্পরিক সম্পর্ক-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা পৌরবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইত।

পৌরবিজ্ঞানের আধুনিক সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু—Modern Definition of Civics and its Scope

বর্তমান যুগে নগর-রাষ্ট্রের পরিবর্তে দেশজোড়া বৃহৎ রাষ্ট্রের আবির্ভাব

হইয়াছে। আধুনিক রাষ্ট্রগুলি একদিকে যেরূপ আয়তনে ও জনসংখ্যায় বিশাল, অপরদিকে তদ্রূপ নানাবিধ জটিল সমস্যা-সংকুল। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে আধুনিক অতিকায় রাষ্ট্রের সহিত অতীত যুগের ক্ষুদ্রকায় নগর-রাষ্ট্রের তুলনাই হয় না, কিন্তু তা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী এখনও পর্যন্ত নাগরিক বলিয়া অভিহিত হয়। নাগরিক বলিয়া অভিহিত হইলেও অতীত যুগের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং বর্তমান যুগের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে মানুষের ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পৌরবিজ্ঞান-সম্পর্কেও এই ধারণার রূপান্তর ঘটিয়াছে। বর্তমান যুগে মানুষ মুখ্যতঃ রাষ্ট্রের নাগরিক হইলেও নাগরিকতা তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নহে। মানুষের সামাজিক জীবনের পূর্ণপ্রকাশ একমাত্র রাষ্ট্রেই নয়; তাই সামাজিক মানুষের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য সমাজ-জীবনে নানাবিধ সঙ্ঘের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সঙ্ঘগুলি মানুষের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সহায়ক বলিয়া এই সঙ্ঘগুলির সদস্য হিসাবে প্রত্যেক মানুষেরই কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্য আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মানুষ যেস্থানে বাস করে তাহার সহিত তাহার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সুতরাং বাসস্থানের সমস্যাগুলির সহিত তাহার জীবনের সুখ-শান্তি নিবিড়ভাবে জড়িত থাকে। এই জন্যই গ্রাম পঞ্চায়েৎ, য়ুনিয়ন বোর্ড, পৌরসভা প্রভৃতি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবেও মানুষের কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্য আছে এবং এই অধিকারভোগ ও কর্তব্য-পালন তাহার নাগরিক জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। বর্তমান ব্যাপকতর নাগরিক জীবনের এই অংশকে **স্থানীয় নাগরিকতা (Local or Municipal Citizenship)** বলা হয়।

মানুষ যে গ্রাম বা শহরে বাস করে তাহা তাহার প্রধান কর্মকেন্দ্র হইলেও মানুষের আনুগত্য একমাত্র সেই গ্রাম বা শহরে সীমাবদ্ধ থাকে না। কোন গ্রাম বা শহর দেশের একটি অঞ্চলমাত্র এবং এই অঞ্চলের সুখ-শান্তি অনেক পরিমাণে সমগ্র দেশের শাসনব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। সুতরাং মানুষের প্রথম ও প্রধান আনুগত্য হইল দেশের প্রতি—রাষ্ট্রের প্রতি। মানুষের সমস্ত অধিকারের উৎস হইল রাষ্ট্র এবং একমাত্র রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবেই তাহার অধিকারগুলি সমাজে স্বীকৃতিলাভ করে। কোন একটি রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবে মানুষ যে অধিকার ভোগ করে এবং রাষ্ট্রসম্পর্কিত কর্তব্য পালন করে, তাহাকে **জাতীয় নাগরিকতা (National Citizenship)** বলা হয়।

বর্তমানে জাতীয় নাগরিকতাই মানব-জীবনের শেষ অধ্যায় বলিয়া পরিগণিত হয় না। মানুষ যে গ্রামে বা নগরে বাস করে, সে সেখানকার স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য। দ্বিতীয়তঃ, সে যে রাষ্ট্রে বাস করে সে রাষ্ট্রেরও সে সদস্য, কিন্তু বর্তমানে মানুষের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যবোধ তাহার গ্রাম, শহর এমন কি দেশের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। মানুষ আজ তাহার সংকীর্ণ ব্যক্তিগত ও দেশগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠিয়া বিশ্ববাসীকে 'ভ্রাতৃ'-সম্বোধন করিতেছে। মানুষ বুঝিতে পারিয়াছে যে, সে যে-দেশে বসবাস করে সে-দেশের রাষ্ট্রের সভ্য হইলেও সে সমগ্র মানব-গোষ্ঠীরও একজন সভ্য এবং তাই সমগ্র মানব-গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা তাহার পবিত্র কর্তব্য বলিয়া সে মনে করে। প্রধানতঃ অর্থনৈতিক কারণে হইলেও কৃষ্টিগত ও ধর্মীয় কারণেও মানুষ নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সমগ্র পৃথিবীকে নিজের কর্মক্ষেত্র করিয়া লইতেছে। মানুষের জীবন আজ বহু সমস্যা-সংকুল, তাই তাহার চিন্তা ও কর্মের পরিধিও সুদূর বিস্তৃত। এই জন্যই আজ শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক নানা আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে এবং এই সমস্ত আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মানুষ আজ এক বৃহত্তর মানব-সমাজ গঠনের পথে অগ্রসর হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) আজ মহামানবের মহামিলনক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তাই পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু আর স্থানীয় নাগরিকতা বা জাতীয় নাগরিকতায় সীমাবদ্ধ নহে। মানব-গোষ্ঠীর একজন হিসাবে—আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সদস্য হিসাবে ব্যক্তির সম্পর্ক, দায়িত্ব, অধিকার ও কর্তব্য আজ পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তি-মানুষের এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সভ্য হিসাবে যে অধিকার ও দায়িত্ব আছে, তাহাকে **আন্তর্জাতিক নাগরিকতা (International Citizenship)** বলা হয়।

পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হইতে আরম্ভ করিয়া আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত মানুষে মানুষে সম্পর্ক রহিয়াছে। এই পারস্পরিক সম্পর্ক যতই বন্ধুত্বপূর্ণ ও দৃঢ়তর হইবে, মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে ততই ঐক্য, সাম্য ও মৈত্রীভাব স্থাপিত হইয়া সমগ্র মানবজাতির বৃহত্তর কল্যাণ সাধিত হইবে। সুতরাং কি উপায়ে আদর্শ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া মানুষের মধ্যে সৌভ্রাত্র স্থাপন করা যায়, তাহাই হইল পৌরবিজ্ঞান-আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য।

পৌরবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য সমাজ-বিজ্ঞানের সম্বন্ধ—Relation of Civics with other Social Science

পৌরবিজ্ঞান সমাজবদ্ধ মানুষেরই আচার ও রীতিনীতি সম্পর্কে আলোচনা করে। সুতরাং ইহা একটি সমাজ-বিজ্ঞান। সমাজ-বিজ্ঞান হিসাবে অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত পৌরবিজ্ঞান ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। এখন দেখা যাউক, অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত ইহার কি সম্বন্ধ।

পৌরবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান—Civics and Politics

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রসম্পর্কিত সকল তথ্যেরই আলোচনা হয়। আর পৌরবিজ্ঞানে আলোচনা হয় নাগরিকগণের সহিত সরকারের সম্পর্কের বিষয়। সুতরাং পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু রাষ্ট্রসম্পর্কে নাগরিক অধিকার ও নাগরিক কর্তব্যে সীমাবদ্ধ। নাগরিক জীবনের সমস্যা ব্যতীত পৌরবিজ্ঞানে রাষ্ট্রসম্পর্কিত অন্য কোন সমস্যার আলোচনা হয় না। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র আরও ব্যাপক ও বহুদূর বিস্তৃত। রাষ্ট্রকে নাগরিক জীবনের দৈনন্দিন সমস্যা ব্যতীত আরও বহু জটিল সমস্যার সমাধান করিতে হয়। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের প্রধান সমস্যা হইল আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির সমাধান করিয়া পররাষ্ট্রের সহিত সহিত সহ-অস্তিত্ব (Co-existence) নীতির ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন করা। নতুবা কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া দেশের উন্নতির জন্য গঠনমূলক কার্য পরিচালনা করা সম্ভব নহে। নাগরিক জীবনের অভাব-অভিযোগ দূর করিয়া তাহাদের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে হইলে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থা ও বৈদেশিক নীতি সুপরিচালিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং রাষ্ট্রসম্পর্কে নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শাসননীতি ও বৈদেশিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। কাজেই পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। নাগরিক জীবনের বহুমুখী সমস্যা লইয়া আলোচনা করা হইল উভয় বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য।

পৌরবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান—Civics and Economics

দারিদ্র্য হইল মানুষের সামাজিক জীবনের প্রধান অভিশাপ। দারিদ্র্য দূর করিয়া মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে না পারিলে নাগরিক জীবনের পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না। দারিদ্র্যই হইল সু-নাগরিকতার প্রধান অন্তরায়।

ধনবিজ্ঞানের আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যার সমাধান করিয়া মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা। মানুষের অর্থনৈতিক দুর্গতি দূর হইলে সুনাগরিকতার প্রধান বাধা অপসারিত হয়। সুতরাং ধনবিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত পৌরবিজ্ঞান আলোচনার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না। ধনবিজ্ঞান হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান প্রয়োগ করিয়া পৌরবিজ্ঞান আলোচনার উদ্দেশ্য অর্থাৎ নাগরিক জীবনের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি দ্বারা আদর্শ নাগরিক সৃষ্টি করা সম্ভব। অপর পক্ষে পৌরনীতির দ্বারা সমর্থিত না হইলে ধনবিজ্ঞানের কোন সুপরিকল্পনা কার্যকরী করা যায় না। সুতরাং পৌরনীতি ও ধনবিজ্ঞান পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত।

পৌরবিজ্ঞান ও ইতিহাস—Civics and History

পৌরবিজ্ঞান নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করে, আর ইতিহাস অতীতের আলোচনা করে। বর্তমান যুগের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা করিতে হইলে ইতিহাসের সাহায্য ব্যতীত সে ধারণা নির্ভুল হইতে পারে না; কারণ বর্তমান নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং আধুনিক চিন্তাধারা ও পৌর-প্রতিষ্ঠানগুলি অতীতযুগের ভিত্তির উপর গঠিত হইয়াছে। পৌর-প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রমপরিণতির মূলকথা ও ভবিষ্যৎ অগ্রগতির ধারা বুঝিতে হইলে ইতিহাসের সাহায্য অপরিহার্য। অতীতের পরিণতি হইল বর্তমান এবং বর্তমানের ভিত্তিতেই ভবিষ্যৎ গঠিত হয়। ইতিহাসে নাগরিক জীবনের বহুমুখী অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ আছে। তাই ইতিহাস পাঠ করিয়া অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বর্তমান সম্পর্কে সঠিক ধারণা করিতে হইবে এবং বর্তমান সম্পর্কে ঠিক পথে পরিচালিত হইলে ভবিষ্যৎ কল্যাণের পথ সুগম হয়। সুতরাং ইতিহাসের সহিত সম্পর্কহীন পৌরবিজ্ঞান কোনরূপ সুফল দিতে পারে না।

পৌরবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র—Civics and Ethics

পৌরবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। নীতিশাস্ত্র মানুষের সমগ্র জীবনের—তাহার চিন্তাধারা, কাজের উদ্দেশ্য ও বাহ্যিক আচরণ সব লইয়া আলোচনা করে এবং কোন্‌টি ভাল ও কোন্‌টি মন্দ, তাহার নির্দেশ দেয়। পৌর-বিজ্ঞানে নাগরিক জীবনের শুধুমাত্র বাহ্যিক আচরণগুলি আলোচনা করা হয়। এদিক দিয়ে দেখিতে গেলে পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু অপেক্ষা সঙ্কীর্ণতর, কিন্তু উদ্দেশ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বুঝা যায় যে, উভয়শাস্ত্রের মধ্যে

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। নীতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইল আদর্শ মানুষ সৃষ্টি করা, আর পৌরবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হইল আদর্শ নাগরিক সৃষ্টি করা। কিন্তু মানুষ হিসাবে আদর্শস্থানীয় না হইলে আদর্শ নাগরিক হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং আদর্শ নাগরিক হইতে হইলে নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারেই নাগরিক জীবনের অধিকার রক্ষা ও কর্তব্য পালন করা প্রয়োজন। যে কাজ নীতিশাস্ত্র সমর্থন করে না, সেরূপ কাজ করিয়া কেহ আদর্শ নাগরিক হইতে পারে না। নাগরিক হিসাবে মানুষের আচরণের আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, একমাত্র নীতিশাস্ত্রের সাহায্যে তাহা জানা যায়। সুতরাং নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে মানুষের কার্যকলাপ পরিচালিত না হইলে নাগরিক জীবনের মঙ্গলময় পরিণতি হইতে পারে না।

পৌরবিজ্ঞান আলোচনার সার্থকতা—Utility of the study of Civics

ইংরেজীতে একটি উক্তি আছে যাহার সারমর্ম হইল যে, গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য দেশে শিক্ষিত ও সচেতন জনমত একান্ত অপরিহার্য। ("An alert and intelligent public opinion is the first essential of democracy.") উক্তিটি সম্পূর্ণরূপে সত্য। নাগরিকগণ যদি শিক্ষিত ও সচেতন না হয়, তাহা হইলে তাহারা যথাযথভাবে তাহাদের নাগরিক অধিকার-ভোগ ও কর্তব্যপালন করিতে পারে না। শাসক-গোষ্ঠী ক্রমশঃ তাহাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবে ও কালক্রমে তাহারা ক্রীতদাসে পরিণত হইবে। কর্তব্যপালনে অবহেলার ফলে শাসনব্যবস্থাও দুর্বল হইয়া তাহাদের অধিকার রক্ষা করিতে অসমর্থ হইবে। এই জন্যই নাগরিকগণের তাহাদের অধিকার ও কর্তব্য-সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকা প্রয়োজন। আর পৌরবিজ্ঞানের আলোচনা হইতেই নাগরিকগণ তাহাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আহরণ করিতে পারে। রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করিয়া কিভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা দ্বারা নাগরিকগণকে তাহাদের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সুবিধা দান করে, পৌরবিজ্ঞানের আলোচনা হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। ইহা ছাড়া, পৌরবিজ্ঞান আলোচনা দ্বারা মানুষ আত্ম-সচেতন হইয়া তাহার নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হইতে পারে। পৌরবিজ্ঞান পাঠ করিয়া মানুষ নিজের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া ছাড়া তাহার মধ্যে সমাজ-চেতনা জন্মে না। ইহার ফলে সে অপরের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান হয়। পারস্পরিক সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করিয়া মানুষ যদি তাহার কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে তাহা হইলে সমাজ-জীবনের বহু

সমস্যারই সহজে সমাধান হয়। মানুষের মনে সমাজ-চেতনা জাগরিত হইলে, মানুষ তাহার পারিপার্শ্বিক সামাজিক নানা সমস্যার সমাধান করিয়া কিভাবে উন্নততর জীবন যাপন করিতে পারে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মত গঠন করিতে শিক্ষা-লাভ করে।

স্বাধীনতা লাভ করিবার পর এই শাস্ত্রের আলোচনা ভারতের নাগরিকগণের পক্ষে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনের ফলে নাগরিকগণের দায়িত্ব বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে তাহাদের পক্ষে সংবিধান-প্রদত্ত অধিকার ও কর্তব্যগুলি সম্পর্কে সঠিক ধারণা করিতে হইলে পৌরবিজ্ঞানের মূলনীতিগুলির সহিত পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। নতুবা স্বাধীনতালাভ বিফল হইবে।

সংক্ষিপ্তসার

পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

প্রাচীন গ্রীক ও রোমকগণ নগর-রাষ্ট্রে বাস করিত। নগর-রাষ্ট্রের যে সমস্ত অধিবাসীর রাষ্ট্রের কাজে যোগদান করিবার অবসর ও যোগ্যতা ছিল, তাহাদিগকে নাগরিক বলা হইত এবং এই নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা হইল পৌরবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু।

আধুনিক সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু

নগর-রাষ্ট্রের পরিবর্তে বর্তমানে দেশজোড়া বৃহৎ রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। এই বৃহৎ রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসীমাত্রই নাগরিক বলিয়া পরিচিত। বর্তমান যুগের নাগরিকগণ এখন আর শুধুমাত্র রাষ্ট্রের সদস্য নহে। নাগরিকগণের ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের জন্য সমাজে বহু সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক নাগরিক এইরূপ একাধিক সঙ্ঘের সদস্য। মানুষ যে গ্রামে বা শহরে বাস করে, সেই গ্রাম বা শহরের সহিত তাহার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। এই সম্পর্ক পঞ্চায়েৎ সভা, পৌরসভা প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এই স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পর্কে মানুষ যে অধিকার ভোগ করে ও কর্তব্যপালন করে, তাহাকে স্থানীয় নাগরিকতা বলা হয়।

কোন গ্রাম বা সহরের স্বার্থ সমগ্র দেশের স্বার্থের সহিত জড়িত। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবেই মানুষ স্থানীয় অধিকারগুলি ভোগ করিতে পারে, সুতরাং রাষ্ট্র-সম্পর্কিত প্রত্যেক মানুষের কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্য আছে। মানুষের জীবনের এই রাষ্ট্র-সম্পর্কিত অধিকার-ভোগ ও কর্তব্যপালন জাতীয় নাগরিকতা বলিয়া কথিত হয়।

বর্তমানে জাতীয় নাগরিকতা মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হয় না। মানুষ ক্রমশঃই দেশ ও রাষ্ট্রের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া নিজেকে সমগ্র মানবজাতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া ভাবিতে শিখিতেছে। তাই সে মনে করে যে, বিশ্বমানবের প্রতি তাহার একটি কর্তব্য আছে এবং এই বিশ্বমানবের একজন হিসাবে সেও মানব-অধিকার দাবী করিতে পারে। সুতরাং মানুষের অধিকার ও কর্তব্যবোধ আজ তাহার ক্ষুদ্র গ্রাম বা শহর ও রাষ্ট্রের সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বমানবতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। বিশ্বমানব-সম্পর্কে মানুষের এই অধিকার ও কর্তব্যবোধ হইল আন্তর্জাতিক নাগরিকতা।

পৌরবিজ্ঞান ও অন্যান্য সমাজ-বিজ্ঞান

পৌরবিজ্ঞান একটি সমাজ-বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানে রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের অধিকার ও কর্তব্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সমাজ বিজ্ঞান হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, ধনবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সহিত এই শাস্ত্র ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। ইতিহাস হইতেই মানুষের অধিকার ও কর্তব্যের উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। মানুষের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে অর্থনৈতিক জীবনের মান উন্নত হওয়া একান্ত আবশ্যক। আবার, অর্থ-নৈতিক দুর্গতি হইল সু-নাগরিকতার প্রধান অন্তরায়। আদর্শ নাগরিক হইতে হইলে নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারেই নাগরিক অধিকাররক্ষা ও কর্তব্যপালন করা প্রয়োজন।

পৌরবিজ্ঞান আলোচনার সার্থকতা

সু-নাগরিক হইতে গেলে অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। পৌরবিজ্ঞান পাঠ করিয়া এই জ্ঞান লাভ করা যায়। পৌরবিজ্ঞান-আলোচনার ফলে মানুষের সমাজচেতনা বৃদ্ধি পায় এবং সে সহযোগিতার ভিত্তিতে

সামাজিক নানা সমস্যার সমাধান করিবার শিক্ষা পায়। স্বাধীন ভারতের নাগরিকগণের পক্ষে তাহাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা করিবার জন্য পৌরবিজ্ঞান আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. **Describe the scope and value of studying Civics.**

[H. S. (Com.) 1961 (Comp.)]

পৌরবিজ্ঞান আলোচনার পরিধি এবং ইহার চর্চার সার্থকতা বর্ণনা কর।

উঃ—শব্দগত অর্থের দিক দিয়া দেখিলে বলা যায় যে, পৌরবিজ্ঞান হইল সেই শাস্ত্র, যে শাস্ত্র পুর অর্থাৎ নগর এবং পৌরজন অর্থাৎ নাগরিক লইয়া আলোচনা করে। বর্তমানে নগর রাষ্ট্রের পরিবর্তে দেশজোড়া বৃহদায়তন রাষ্ট্রের আবির্ভাব হওয়ার ফলে পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তুর পরিধি ব্যাপকতর হইয়াছে। বর্তমানে রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী মাত্রই নাগরিক বলিয়া অভিহিত হয়। আর এই নাগরিক জীবনও নানা দিক দিয়া বহু সমস্যা-সংকুল হইয়াছে। তাই বর্তমান যুগের নাগরিক অধিকার ও নাগরিক কর্তব্য সম্পর্কে মানুষের ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে এই ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বর্তমানে মানুষ মুখ্যতঃ রাষ্ট্রের নাগরিক হইলেও নাগরিকতা তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নহে। মানুষের সামাজিক জীবনের পূর্ণ প্রকাশ একমাত্র রাষ্ট্রই নহে। তাই সামাজিক মানুষ তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানাবিধ সংঘ বা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিয়াছে এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্য হিসাবে প্রত্যেক মানুষের কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্য আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মানুষ যে গ্রামে বা শহরে বাস করে, সেই গ্রাম বা শহরের সমস্যাগুলির সহিত তাহার জীবনের সুখ-শান্তি একান্তভাবে জড়িত থাকে। এই স্থানীয় সমস্যাগুলির সমাধান করিবার উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন বোর্ড, জেলা বোর্ড, পৌর সভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবে মানুষের কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্য আছে এবং এই অধিকার ভোগ ও কর্তব্যপালন তাহার নাগরিক জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। বর্তমান ব্যাপকতর নাগরিক জীবনের এই অংশকে স্থানীয় নাগরিকতা (Local or Municipal citizenship) বলা হয়।

মানুষ যে গ্রাম বা সহরে বাস করে তাহা তাহার প্রধান কর্মকেন্দ্র হইলেও মানুষের কর্মক্ষেত্র ও আনুগত্য একমাত্র সেই গ্রাম বা শহরে সীমাবদ্ধ থাকে না। গ্রাম বা সহর হইল দেশের একটি অংশমাত্র এবং প্রত্যেক মানুষের জীবনের সুখ-শান্তি দেশের শাসন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। সুতরাং প্রত্যেক মানুষের প্রথম ও প্রধান আনুগত্য হইল দেশের প্রতি—জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতি। কারণ মানুষের সব অধিকারের উৎস হইল রাষ্ট্র। সুতরাং স্থানীয় নাগরিকতা ছাড়াও রাষ্ট্রের নাগরিকরূপে প্রত্যেক মানুষের কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্য আছে এবং এই অধিকার ভোগ ও কর্তব্য-পালনকে জাতীয় নাগরিকতা (National citizenship) বলা হয়। পৌরবিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে এই জাতীয় নাগরিকতার উপর সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

মানুষ যে দেশে বাস করে, সে দেশের রাষ্ট্রের সদস্য হইলেও সে সমগ্র মানবগোষ্ঠীরও একজন। বর্তমানে শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক নানা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে এবং এই সমস্ত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মানুষ আজ এক বৃহত্তর মানব-সমাজ গঠনের পথে অগ্রসর হইয়াছে। মানুষের চিন্তাধারা ও কর্মের পরিধি বিস্তৃত হওয়ার ফলে আজ সমগ্র পৃথিবীকে সে তাহার কর্মক্ষেত্র করিয়া লইতেছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) আজ মহামানবের মহা-মিলনক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তাই পৌরবিজ্ঞানের পরিধি আর স্থানীয় নাগরিকতা বা জাতীয় নাগরিকতায় সীমাবদ্ধ নহে। মানবগোষ্ঠীর একজন হিসাবে—আন্তর্জাতিক সংঘের সদস্য হিসাবে ব্যক্তির সম্পর্ক, দায়িত্ব, অধিকার ও কর্তব্য আজ পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং পৌরবিজ্ঞান আলোচনার পরিধি স্থানীয় ও জাতীয় নাগরিকতার ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আন্তর্জাতিক নাগরিকতার অধিকার ও কর্তব্য পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে।

সু-নাগরিক ব্যতীত কল্যাণ-রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না। আর সু-নাগরিকতার প্রধান ভিত্তি হইল অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান। পৌরবিজ্ঞান পাঠ করিয়াই এই জ্ঞান লাভ করা যায়। পৌরবিজ্ঞান আলোচনার ফলে মানুষের সমাজচেতনা বৃদ্ধি পায় এবং সে সহযোগিতার ভিত্তিতে সামাজিক নানা সমস্যার সমাধান করিবার শিক্ষা পায়। স্বাধীন ভারতের নাগরিকগণের পক্ষে তাহাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা করিবার জন্য পৌরবিজ্ঞান আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। নতুন স্বাধীনতালাভ বিফল হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানব সমাজের প্রকৃতি ও বিবর্তন

(The Nature and Evolution of Human Society)

সমাজ কাহাকে বলে—What is a Society

সাধারণতঃ বলা হয় যে, মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক জীব অর্থে কি বুঝা যায় তাহার আলোচনা প্রয়োজন। বহু জনসমষ্টি সভ্যজীবন যাপনের উদ্দেশ্যে একসঙ্গে বাস করে। তাহারা সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে মনুষ্য সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। জনসমষ্টি যখন তাহাদের সভ্যজীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য নানাসূত্রে একতাবদ্ধ হয়, তখনই সমাজ-জীবনের সূত্রপাত হয়। এই সমাজ মানব-জীবনকে আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করে। এই নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন লিখিত

আইন-কাহ্নের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজনের তাগিদে নানাবিধ প্রথা, আচার ও রীতিনীতি আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে। মাহুষের জীবন বহুমুখী। বহুমুখী জীবনের বহুবিধ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য মাহ্য সমাজদেহের মধ্যে ক্ষুদ্র-বৃহৎ সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিয়াছে। তাই সমাজের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই ধর্মসংগঠন, শিক্ষাকেন্দ্র, শ্রমিক-সঙ্ঘ প্রভৃতি। এইরূপ বিভিন্ন সংগঠনের সমাবেশে সমাজদেহ গঠিত। রাষ্ট্রও সমাজদেহের মধ্যে এইরূপ একটি সঙ্ঘ।

স্থতরাং জনসমষ্টি লইয়াই সমাজ গঠিত হয় এবং এই জনসমষ্টি সাধারণ স্বার্থে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়। নিঃসঙ্গভাবে বাস করিয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না। তাহার সহজাত প্রকৃতির তাড়নায় সে অপর মাহুষের সঙ্গ কামনা করে। একদিকে এই সহজাত প্রবৃত্তি ও অন্যদিকে সমাজবদ্ধ জীবনের সুখ-সুবিধাগুলি, এই উভয়ে মিলিয়া মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে সমাজ সৃষ্টি করিয়া বাস করিতে শিক্ষা দিয়াছে।

সমাজের ক্রমবিবর্তন—Evolution of Society

সমাজ একদিনে বা একজন লোকের প্রচেষ্টায় গঠিত হয় নাই। আমরা বর্তমানে যে সমাজে বাস করি, তাহা গঠিত হইতে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইয়াছে। বর্তমান সমাজ মাহুষের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফল। যত দূর কল্পনা করা যায় তাহাতে অনুমান করা হয় যে, **পরিবার (Family)** হইতেই মানবসমাজের সুরু হয়। শিশু জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকে লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ না করিলে কোন সমাজই স্থায়ী হইতে পারে না। সুতরাং শিশুপালনের জন্যই মাতাপিতার বিশেষ করিয়া মাতার স্নেহ ও যত্ন প্রয়োজন। এই স্নেহ ও যত্ন মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষ ছাড়া অন্যান্য ইতর প্রাণীর মধ্যেও সন্তান পালনের এই সহজাত প্রবৃত্তি দেখা যায়; সুতরাং মাতৃস্নেহের আবেষ্টনীর মধ্য দিয়াই মাহুষের সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের সূত্রপাত হয়। সন্তান-সন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও মাতার সঙ্গে বাস করিতে থাকে এবং এইরূপে এক মাতা ও পিতার সন্তানগণ এক একটি পরিবার সৃষ্টি করে। এইরূপে পরিবারের প্রত্যেকটি লোক রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। পারিবারিক-জীবনের নানাবিধ সমস্যা-সমাধানের ভার থাকে পরিবারের প্রাচীনতম নারী বা পুরুষের উপরে।

পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া যখন মানুষের সমাজ গঠিত হইতে থাকে, তখন পরিবার-পরিচালনা করিবার ভার পরিবারের প্রাচীনতম পুরুষ বা প্রাচীনতমা নারীর হাতে ছিল—এবিষয়ে মনীষিগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ

বলেন যে, প্রাচীনকালে মাতাই ছিলেন পরিবারের সর্বময়ী কর্ত্রী, আবার কেহ কেহ বলেন পিতাই ছিলেই পরিবারের সর্বময় কর্তা। প্রাচীনকালে যখন মানব সমাজে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হয় নাই, তখন সন্তান পালনের দায়িত্ব যে মাতার উপর ছিল, এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। সুতরাং মাতাকে কেন্দ্র করিয়া যে পরিবার গঠিত হইত, তাহাকে **মাতৃতান্ত্রিক পরিবার (Matriarchal family)** বলা হয়। এই পরিবার-প্রথায় প্রাচীনতমা নারী মাতৃ-শ্রেষ্ঠা (Matriarch) বলিয়া পরিচিত ছিলেন। প্রাচীনকালের জার্মাণ জাতির মধ্যে ও ভারতে মালাবারের নাইর জাতির মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের নিদর্শন পাওয়া যায়। যে-সমস্ত সমাজে পরিবারের সর্বময় কর্তা প্রাচীনতম পুরুষ ছিলেন, সেই পরিবারগুলি **পিতৃতান্ত্রিক পরিবার (Patriarchal family)** বলিয়া অভিহিত হয়। পিতৃ-শ্রেষ্ঠই (Patriarch) ছিলেন এই সমস্ত পরিবারের শ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার উপরই ন্যস্ত থাকিত।

পরিবার পিতৃ-প্রধান হউক আর মাতৃ-প্রধান হউক, পরিবার হইতেই যে মানবসমাজের সূত্রপাত হয়, এ সম্পর্কে প্রায় সকলেই একমত। কালক্রমে যখন বিবাহ-প্রথার প্রবর্তন হইল, তখন এই বিবাহ-বন্ধনের মধ্য দিয়া বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তা-সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ কতকগুলি পরিবার মিলিত হইয়া কালক্রমে একটি **গোষ্ঠী (Clan)** সৃষ্টি করিল। প্রত্যেক গোষ্ঠীর একজন গোষ্ঠীপতি থাকিত এবং আপদে-বিপদে এই গোষ্ঠীপতির নির্দেশেই এই সঙ্ঘবদ্ধ পরিবারগুলি পরিচালিত হইত। কতকগুলি প্রতিবেশী গোষ্ঠী তাহাদের সাধারণ স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে যখন একজন বিশিষ্ট দলপতির অধীনে মিলিত হইত, তখন এই সঙ্ঘবদ্ধ গোষ্ঠীগুলি **কুল (Tribe)** নামে অভিহিত হইত। বিভিন্ন কুলগুলি আবার নানাকারণে মিলিত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে একই ভৌগোলিক পরিবেশে বাস করিবার ফলে তাহাদের মধ্যে একই ধরণের আচার-ব্যবহার, ভাব-ভাষা, ধর্ম-বিশ্বাস প্রভৃতি জন্মিতে লাগিল। কালক্রমে বিভিন্ন কুলগুলির মধ্যে পার্থক্য দূরীভূত হইয়া একাত্মবোধ সৃষ্টি করিল এবং এই একাত্মবোধ হইতেই বর্তমান-যুগের **জাতীয়তাবোধের** জন্ম হইল। সুতরাং গঠনের প্রথম স্তরে হয়ত পরিবারের মতন সহজ ও সংকীর্ণ সংগঠনের মধ্য দিয়া মানবসমাজের সুরু হয়, তারপর মানুষের সমাজচেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন উপাদানের প্রভাবে বিভিন্ন বিকাশের মধ্য দিয়া মানব সমাজ আজ বৃহত্তর ও জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। যে প্রীতি-বন্ধন এক সময়ে শুধু পরিবারে সভ্যগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সেই প্রীতি-

বন্ধন আজ পরিব্যাপ্ত হইয়া সমগ্র মানব-গোষ্ঠীকে এক সমাজভুক্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, কুল, জাতি আজ মহামানবের এক মহামিলনক্ষেত্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

সমাজের উদ্দেশ্য—Aims of Society

মানুষ একাকী বাঁচিতে পারে না। এইজন্য পরস্পরের সাহায্য প্রয়োজন। সঙ্ঘবদ্ধ জীবন যে মানুষকে শুধু তাহার জীবন, ধন ও মানের নিরাপত্তা দেয় তাহা নহে, মানুষ সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাহার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়। সহযোগিতার সাহায্যেই মানুষের সমস্ত অভাব দূর হয় এবং এই সহযোগিতাই হইল মানবসমাজের মূলভিত্তি।

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলিয়াছেন যে, বাঁচিয়া থাকাই মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, ভালভাবে বাঁচিয়া থাকাই হইল জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য (Life is not merely living, but it is living well)। উন্নততর জীবন-যাপনের জন্যই মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে। সমাজে বিভিন্ন মানুষের চিন্তাধারা ও ভাবের আদান-প্রদানের ফলে জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয় এবং মানুষের এই চিত্তবিকাশের ফলে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, চারু ও কারুশিল্প এবং গীত-বাদ্য প্রভৃতি জন্মলাভ করে। এইগুলি হইল সভ্য জীবনযাপনের অপরিহার্য উপাদান। মানুষ সমাজে বাস করে, কারণ সমাজে বাস করিয়াই সমাজের সাহায্যে সে তাহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে পারে।

বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করিয়াছে। প্রধানতঃ অর্থনৈতিক কারণে হইলেও কৃষ্টিগত ও ধর্মীয় কারণেও বর্তমানে মানুষ আর নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সমগ্র পৃথিবীকে নিজের কর্মক্ষেত্র করিয়া লইতেছে। মানুষের চিন্তা ও কর্মের পরিধিও সুদূর-বিস্তৃত। এই জন্যই আজ শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক নানা আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে এবং এই সমস্ত আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মানুষ আজ এক বৃহত্তর মানব-সমাজ গঠনের পথে অগ্রসর হইতেছে।

ভারতের যৌথ পরিবার—The Indian Joint Family

যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবার ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্য দেশসমূহে সাধারণতঃ স্বামী-স্ত্রী ও নাবালক পুত্র-কন্যা লইয়া পরিবার

গঠিত হয়, কিন্তু ভারতে পিতামহ-পিতামহী, মাতা-পিতা, পুত্র-কন্যা, জ্যেষ্ঠতাত, খুল্লতাত ও অন্যান্য নিকট-আত্মীয় লইয়া পরিবার গঠিত হয়। ভারতে এমন বহু যৌথ পরিবার দেখা যায়, যেখানে একসঙ্গে শতাধিক লোক একই অন্নে প্রতিপালিত হয়। সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের কর্তৃত্বেই এই পরিবার পরিচালিত হয়। ইনিই হইলেন পরিবারের শ্রেষ্ঠ-পুরুষ বা কর্তা এবং ইঁহার নির্দেশ অনুসারেই পারিবারিক সমস্ত ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়। পরিবারের অন্দরমহলের কর্তৃত্বের জন্য সাধারণতঃ একজন কর্তা-মা বা গিন্নী-মা থাকেন। পরিবারের খাওয়া-পরা, পূজা-পার্বণ, সম্পত্তি-ভোগ প্রভৃতি যৌথভাবে পরিচালিত হয়। পরিবারের যে যাহা সামর্থ্যানুসারে আয় করে, তাহা কর্তার নিকট পারিবারিক একটি সাধারণ তহবিলে জমা হয় ও পরিবারের সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কর্তা ঐ তহবিল হইতে ব্যয় করেন। পরিবারের সকলে সমান আয় না করিলেও ভোগের ক্ষেত্রে সকলেই সমান সুবিধার অধিকারী। আধুনিক সাম্যবাদের মূলনীতি হইল প্রত্যেকে তাহার সাধ্যমত কাজ করিবে এবং প্রয়োজন-মত পাইবে। (Each will work according to his ability but will get back according to his need)। সুতরাং দেখা যায় যে, সাম্যবাদী আদর্শ প্রচারিত হইবার বহুপূর্বে আমাদের এই ভারতে যৌথ পরিবার-ব্যবস্থার মধ্য দিয়া আদর্শটি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

যৌথ পরিবারের সুবিধা

১। যৌথ পরিবার-ব্যবস্থার প্রধান সুবিধা হইল যে, এই ব্যবস্থায় সকলেই নিঃস্বার্থভাবে সাধারণ হিতের জন্য কাজ করিতে শিখে এবং কেহই একেবারে নিঃসহায় অবস্থায় পতিত হয় না। যৌথ পরিবারের সাহায্যে সকলের বাঁচিয়া থাকিবার মতন গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা সম্ভব হয়।

২। নিঃসহায় বিধবা, পিতৃ-মাতৃহীন নাবালক শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন, ও অক্ষম সকলেই যৌথ পরিবারে আশ্রয় পায়। এইরূপে যৌথ পরিবার নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান করিয়া একদিকে যেরূপ দেশের জনবলের অপচয় নিরোধ করে, অন্যদিকে সেইরূপ রাষ্ট্রকে বৃদ্ধ, অক্ষম ও দরিদ্রগণকে সাহায্য দান করিবার দায় হইতে মুক্ত করে।

৩। যৌথ পরিবার-ব্যবস্থার দ্বারা শ্রম-বিভাগ নীতির সকল সুবিধা পাওয়া যায়। একটি বৃহৎ পরিবার-পরিচালনার ক্ষেত্রে নানারূপ জটিল ও সহজ কাজ দেখা যায়। পরিবারের এই বিভিন্ন কাজ পরিবারের বিভিন্ন লোকের

মধ্যে বয়স, গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে ভাগ হইয়া শৃঙ্খলার সহিত নিষ্পন্ন হইতে পারে।

৪। ব্যয়সংকোচের দিক দিয়াও যৌথ পরিবার-প্রথার বহু সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায়। একসঙ্গে বহুলোক বাস করিলে খাওয়া-পরা, তৈজস ও আসবাবপত্র প্রভৃতি সবদিক দিয়া ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হয়। যৌথ পরিবার-ব্যবস্থা জমির অনাবশ্যক ও অবাঞ্ছিত খণ্ডীকরণ ও বিচ্ছিন্নতা রোধ করিতে পারে।

৫। ইহা ছাড়া, যৌথ পরিবারভুক্ত হওয়ার ফলে মানুষের আত্মসংযম ত্যাগ-স্বীকার, বশ্যতা, বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি বৃদ্ধি পায়।

অসুবিধা

১। কিন্তু বর্তমানে অবস্থা-পরিবর্তনের ফলে যৌথ পরিবার-প্রথার কতকগুলি ত্রুটি দেখা যায়। যৌথ পরিবারে সকলে সমান কাজ না করিয়াও সমান সুবিধা ভোগ করিতে পারে। কাজ করিয়া কাজের ফল সম্পূর্ণভাবে ভোগ করিতে না পারিলে লোকের কাজের ইচ্ছা হ্রাস পায়। কাজ না করিলেও খাওয়া-পরা চলে—এজন্যও যৌথ পরিবার-প্রথা আলস্য ও কর্মবিমুখতার প্রশ্রয় দেয়।

২। যৌথ-পরিবার-প্রথায় গৃহকর্তার ক্ষমতা সব বিষয়ে এত বেশী হয় যে, পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অনুপ্রেরণা নষ্ট হয়। পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তির কর্তার হুকুম পালন করা ছাড়া করণীয় আর কিছু থাকে না। কর্তার উপর সমগ্র পরিবার পরিচালনা করিবার গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত থাকার ফলে কর্তাও সাংসারিক উন্নতির জন্য কোনপ্রকার ঝুঁকি লইতে দ্বিধাবোধ করেন।

৩। পরিবারের সকলের অসমান আয় সমানভাবে সকলের জন্য ব্যয় হয় বলিয়া কোন ব্যক্তিগত সঞ্চয় সম্ভব হয় না। যে কম আয় করে তাহার পক্ষে সঞ্চয় করা সম্ভব নহে, আর যে বেশী আয় করে তাহার উদ্বৃত্ত থাকিলেও এই আয় পারিবারিক আয়ভুক্ত হইয়া সকলের জন্য ব্যয় করা হয় বলিয়া কোনই উদ্বৃত্ত থাকে না। সুতরাং যৌথ পরিবার-প্রথায় সঞ্চয় সম্ভব হয় না। সঞ্চয়ের অভাবে মূলধন বৃদ্ধি পাইয়া দেশে বড় বড় শিল্প বা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গঠিত হইতে পারে না।

৪। এই ব্যবস্থায় স্বজন-প্রীতি ও আত্মীয় বাৎসল্য বৃদ্ধি পাইলেও লোকে অতিমাত্রায় অলস ও গৃহকাতর প্রকৃতির হয়। ফলে, তাহারা পরিবার-পরিবেশ ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইতে চায় না। এইজন্যই ভারতে শ্রমিকগণের মধ্যে গতিশীলতার বিশেষ অভাব দেখা যায়।

বর্তমানে নানাকারণে ভারতের এই সুপ্রাচীন পরিবার-ব্যবস্থা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। মানুষের জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা যতই বাড়িতেছে, যৌথ পরিবার-প্রথার ত্রুটিগুলি লোকে ততই বুঝিতে পারিতেছে। শুধু পারিবারিক বৃত্তির সাহায্যে লোকের আর এখন সম্পূর্ণ জীবিকানির্বাহ সম্ভব নয়, তাই এই বৃত্তিগুলি পরিত্যাগ করিয়া লোকের অন্য নানা উপায়ে জীবিকা সংস্থান করিতে হয়। সুতরাং পরিবারের অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল হওয়ার ফলে লোকের বাধ্য হইয়াই আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মনির্ভরশীল হইতে হইয়াছে। যৌথ পরিবারের পক্ষে এখন আর নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়া সম্ভব নহে। ইহা ছাড়াও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-প্রসারের ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-মনোভাব সৃষ্টি হইয়া স্বাধীন-ভাবে জীবনযাপন করিবার ইচ্ছা শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে স্থানান্তর-গমনের সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় লোকে জীবিকা অর্জনের জন্য আজ গৃহ ছাড়িয়া বহু দূরদেশে যাইতে বাধ্য হইয়াছে। জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা এবং স্বাধীন ও স্বাবলম্বী মনোভাব এই উভয়ে মিলিয়া আজ গৃহকাতর ও পারি-বারিক বন্ধনে আবদ্ধ ভারতবাসীকে ঘরছাড়া করিতেছে।

ব্যক্তি ও সমাজ (Individual and Society)

ব্যক্তিকে লইয়াই সমষ্টি এবং সমষ্টি লইয়াই সমাজ গঠিত হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মানুষ নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে চায় না। পিতা-মাতার স্নেহ, আত্মীয়-বন্ধুর ভালবাসা পাইবার এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে আমোদ-প্রমোদ উপভোগ ও আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই মানুষ সমাজ গঠন করিয়া বাস করে। সমাজ একদিনে বা একজন লোকের দ্বারা গঠিত হয় নাই। মানুষের প্রয়োজনের তাগিদেই সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং মানুষ যতই বুদ্ধিমান ও সভ্য হইয়া উঠিতেছে, সামাজিক জীবনের প্রয়োজনীয়তা সে ততই বুঝিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানব-জীবনের উপর সমাজের প্রভাব প্রসার লাভ করিতেছে। মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমাজ নানাভাবে তাহার দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। এখন প্রশ্ন হইল, মানুষ কেন স্বেচ্ছায় সমাজের এই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লইল ?

এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হইল যে, মানুষ সমাজ ছাড়া বাস করিতে পারে না। সমাজের বাহিরে তাহার জীবন শুধু নিঃসঙ্গ ও দুঃসহ হয় না, সমাজের বাহিরে মানুষ ভাবের ও চিন্তাধারার আদান-প্রদান করিবার সুযোগ পায় না। মানুষের

মধ্যে যে স্বভাব-জাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতাগুলি থাকে, সমাজের বাহিরে সেগুলির বিকাশ আদৌ সম্ভই নহে। সমাজে মানুষের কতকগুলি রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার মানিয়া চলিতে হয়। এই রীতি-নীতিগুলি মানুষের বহু অভিজ্ঞতার ফল এবং এইগুলির সাহায্যে মানুষের চিন্তাধারা ও জীবনযাত্রা সুনিয়ন্ত্রিত হয়। চিন্তাধারা ও জীবনযাত্রা-প্রণালী সুনিয়ন্ত্রিত না হইলে চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে না। সামাজিক পরিবেশে, সামাজিক প্রভাবে মানুষের মন শুদ্ধ ও সৎ-পথগামী হয়—সমাজের বাহিরে সামাজিক প্রভাবের অবর্তমানে তাহার ভালমন্দ-জ্ঞান জন্মিতে পারে না। তাই গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টট্‌ল বলিয়াছেন, যে মানুষ সমাজে বাস করে না সে পূর্ণ মানুষ নহে। সে হয় অতি-মানব না হয় নিম্নস্তরের জীব।

তাহা হইলে কি সমাজ-ছাড়া ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নাই? মানুষকে কি একেবারেই সমাজের দাসরূপে ভাবিতে হইবে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, মানুষকে লইয়াই সমাজ গঠিত হয় এবং প্রত্যেকটি মানুষ হইল সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মানুষ যেমন সমাজ ছাড়িয়া বাস করিতে পারে না, সেইরূপ মানুষ ছাড়া সমাজের কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। মানুষের মঙ্গলের জন্যই সমাজের উৎপত্তি এবং মানুষের উন্নতিতেই সমাজের উন্নতি। উন্নত সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের উন্নতি হয় এবং মানুষের উন্নতি হইলেই সমাজ-ব্যবস্থাও উন্নত হয়। মানুষকে বাদ দিয়া সমাজ গঠিত হইতে পারে না এবং সমাজকে বাদ দিয়া মানুষ তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশ করিতে পারে না। সুতরাং মানুষ ও সমাজের মধ্যে কোন বিরোধ নাই।

মানুষ বড় না সমাজ বড়, এ প্রশ্নের আজ আর বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। প্রাচীনকালে মানুষের মধ্যে যখন সমাজ-চেতনা দুর্বল ছিল, তখন ব্যক্তি অপেক্ষা সমাজের শ্রেষ্ঠত্বের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়া ব্যক্তি ও সমষ্টির মঙ্গলের পথ সুগম করা হইয়াছিল। তাই প্রাচীনকালে সামাজিক নির্দেশ ও সামাজিক বিধানগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়া অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করা হয়। এইরূপে ব্যক্তির মঙ্গলের জন্যই ব্যক্তির উপর সমাজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে মানুষের সমাজ-চেতনা যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, মানুষ যতই বুঝিতে পারিতেছে যে, সমষ্টির কল্যাণ না হইলে তাহার নিজের কল্যাণ স্থায়ী হইতে পারে না, মানুষ ততই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সমাজের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করিতেছে। সমাজের প্রতি মানুষের এই স্বেচ্ছাকৃত আনুগত্য একদিকে যেমন সামাজিক বন্ধন

দৃঢ়তর করিতেছে, অপরদিকে সেইরূপ সামাজিক বিধি-নিষেধগুলির কঠোরতা প্রশমিত করিয়াছে। কারণ, সমাজও বুঝিতে পারিয়াছে যে, ব্যক্তিকে খর্ব করিয়া, ব্যক্তির স্বাধীন সত্তা লোপ করিয়া সমাজের মঙ্গল হইতে পারে না। যে সমাজ অহেতুক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে বাধা স্থষ্টি করে, সে সমাজ টিকিতে পারে না। কারণ, সমাজের উদ্দেশ্যই হইল ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করা।

সংক্ষিপ্তসার

সমাজের প্রকৃতি

বহু জনসমষ্টি সভ্য জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে একসঙ্গে বাস করে। তাহারা নানা বিষয়ে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। জনসমষ্টি যখন তাহাদের জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তখনই সমাজ-জীবনের স্থত্রপাত হয়। সমাজ ছাড়া মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নহে।

সমাজের ক্রমবিকাশ

সমাজ একদিনে বা একটি উপাদানে গঠিত হয় নাই। নানা উপাদানের সাহায্যে দীর্ঘদিন ধরিয়া সমাজ ধীরে ধীরে গঠিত হইয়াছে। পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি প্রভৃতি হইল সমাজ-গঠনের বিভিন্ন উপাদান।

ভারতের যৌথ পরিবার

ভারতে সমাজ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল যে, একই সঙ্গে, আত্মীয়তা-বন্ধনে আবদ্ধ বহুলোক একই অন্নে প্রতিপালিত হয়। পরিবারের একজন কর্তা থাকেন এবং তাঁহার নির্দেশেই পারিবারিক সমস্ত কার্য পরিচালিত হয়। খাওয়া-পরা, আয়-ব্যয়, পূজা-পার্বণ প্রভৃতি যৌথভাবে সম্পাদিত হয়।

স্থবিধা—যৌথ পরিবার-প্রথার স্থবিধা হইল যে, ১। পরিবারের সকলেরই জীবিকার সংস্থান হয়; ২। শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন, বিধবা সকলেই আশ্রয় পায়। ৩। প্রত্যেকে তাহার সামর্থ্যমত কাজ করে কিন্তু সমান স্থবিধা পায়। ৪। একসঙ্গে বহুলোক বাস করে বলিয়া নানাবিষয়ে ব্যয় সঙ্কোচ সম্ভব হয়।

অস্থবিধা—যৌথ পরিবারের অস্থবিধা হইল যে, ১। এই ব্যবস্থায় পরিবারের

যে বেশী কাজ করে সে কাজের সম্পূর্ণ ফল পায় না বলিয়া নিরুৎসাহ হয়। ২। সঞ্চয় হ্রাস পায়। ৩। লোকের গৃহকাতর প্রকৃতি ও আলস্য বৃদ্ধি পায়। ৪। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়।

বর্তমানে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা, জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা-বৃদ্ধি, স্থানান্তর-গমনের সুবিধা প্রভৃতি কারণে যৌথ পরিবার-প্রথা ক্রমশঃই বিলুপ্ত হইতেছে।

ব্যক্তি ও সমাজ

ব্যক্তি ও সমাজ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। সমাজ ছাড়া মানুষ বাস করিতে পারে না, তাই সমাজের সৃষ্টি। একমাত্র সামাজিক পরিবেশেই মানুষের ব্যক্তিত্ব চরম পরিণতি লাভ করিতে পারে। সুতরাং ব্যক্তির মঙ্গলের জন্যই সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লওয়া আবশ্যক। কিন্তু তাই বলিয়া ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়া কোন সমাজই স্থায়ী হইতে পারে না। কারণ, ব্যক্তি লইয়াই সমাজ গঠিত হয় এবং ব্যক্তিগত মঙ্গল হইলেই সামাজিক মঙ্গল হয়। যে সমাজ ব্যক্তিগত কল্যাণ সাধনে অসমর্থ, সে সমাজের অস্তিত্বের কোন মূল্য থাকিতে পারে না; সুতরাং ব্যক্তি ও সমাজ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একের অবর্তমানে অপরের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. What do you mean by the term 'Society'? Discuss the purpose of Society.

সমাজ বলিতে কি বুঝ? সমাজের উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

উঃ—মানুষ নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করিতে পারে না। তাই বহু জনসমষ্টি একসঙ্গে বাস করে। তাহারা সুখে-দুঃখে, আপদ-বিপদে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতেই মনুষ্য সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। জনসমষ্টি যখন তাহাদের সভ্যজীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য নানাসূত্রে একতাবদ্ধ হয় তখনই মানব-সমাজের সূত্রপাত হয়। সুতরাং জনসমষ্টি লইয়া সমাজ গঠিত হয় এবং জনসমষ্টি সাধারণ স্বার্থে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়। একদিকে সংঘবদ্ধ জীবনের সহজাত প্রবৃত্তি ও অন্যদিকে সমাজবদ্ধ জীবনের সুখ-সুবিধাগুলি, এই উভয়ে মিলিয়া সমাজ গঠন করিয়াছে।

সমাজ একদিনে বা একজন লোকের প্রচেষ্টায় গঠিত হয় নাই। আমরা বর্তমানে যে সমাজে বাস করি, তাহা গঠিত হইতে দীর্ঘদিন অতীত হইয়াছে। পরিবার, গোষ্ঠী, কুল, জাতি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকাশের মধ্য দিয়া মানব সমাজের ক্রম-বিবর্তন ঘটিয়াছে।

উন্নততর জীবন যাপনের জন্যই মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে। সহযোগিতার সাহায্যেই মানুষের সমস্ত অভাব দূর হয় এবং সহযোগিতার সাহায্যেই সে তাহার জীবন, ধন ও মানের

নিরাপত্তা ভোগ করে। সমাজে বিভিন্ন মানুষের চিন্তাধারা ও ভাবের আদান-প্রদানের ফলে জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়। মানুষ সমাজে বাস করে, কারণ সমাজে বাস করিয়াই সমাজের সাহায্যে সে তাহার অর্থনৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারে। সুতরাং সমাজের উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তির মঙ্গলসাধন করিয়া সামগ্রিক মঙ্গলসাধন করা।

2. Discuss the relation between individual and society.

ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্বন্ধ আলোচনা কর।

উঃ—ব্যক্তি ও সমাজ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। সমাজ ছাড়া মানুষ বাস করিতে পারে না, তাই সমাজের সৃষ্টি। একমাত্র সামাজিক পরিবেশেই মানুষের ব্যক্তিত্ব চরম পরিণতি লাভ করিতে পারে। এই কারণে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলিয়াছেন যে, যে মানুষ সমাজে বাস করে না, সে হয় অতি-মানব কিংবা অতি নিকৃষ্ট স্তরের জীব। সুতরাং ব্যক্তির কল্যাণের জন্যই সমাজের অগ্রাধিকার ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা উচিত। কিন্তু তাই বলিয়া ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে খর্ব করিয়া কোন সমাজই স্থায়ী হইতে পারে না। কারণ, ব্যক্তি সমষ্টি লইয়াই সমাজ গঠিত হয় এবং ব্যক্তিগত মঙ্গল হইলেই সামাজিক মঙ্গল হয়। যে সমাজ ব্যক্তিগত কল্যাণ সাধনে অসমর্থ বা যে সমাজ অহেতুক ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে, সে সমাজের কোন মূল্য নাই। সুতরাং ব্যক্তি ও সমাজ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একের অবর্তমানে অপরের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

তৃতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্র

(The State)

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা—Definition of the State

সমাজবদ্ধ মানুষ তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের উদ্দেশ্যে সমাজমধ্যে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিয়াছে, তন্মধ্যে রাষ্ট্রই হইল সর্বপ্রধান। রাষ্ট্র ছাড়া সভ্য মানুষ বাস করিতে পারে না এবং রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবেই মানুষের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ সম্ভব। এই জন্যই প্রসিদ্ধ গ্রীক্ দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলিয়াছেন যে, যে মানুষ রাষ্ট্রের বাহিরে বাস করে, সে হয় অতি-মানব না হয় পশু। এখন দেখা যাউক, রাষ্ট্র বলিতে আমরা কি বুঝি।

রাষ্ট্র অতি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান হইলেও বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্র সম্পর্কে মানুষের ধারণা ছিল বিভিন্ন। গ্রীক ও রোমকগণ রাষ্ট্র বলিতে ক্ষুদ্রকায় 'নগর-রাষ্ট্র' বুঝিত।

বর্তমান বৃহদায়তন রাষ্ট্র সম্পর্কে তাহাদের বিশেষ কোন ধারণা ছিল না। জনসমষ্টি লইয়াই রাষ্ট্র গঠিত হয়। যখন একদল লোক সংঘবদ্ধ হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজস্ব শাসন-ব্যবস্থার অধীনে একটি নির্দিষ্ট ভূ-ভাগে বাস করে তখন সেই সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে রাষ্ট্র বলা হয়। অধ্যাপক গার্ণার নিম্নলিখিতভাবে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসনতান্ত্রিক আইনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে রাষ্ট্র অল্প-বিস্তর বহুসংখ্যক জনসমষ্টি যাহারা স্থায়িভাবে একটা ভূ-খণ্ডে বাস করে ও যাহারা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন অর্থাৎ বৈদেশিক শাসন-পাশ হইতে মুক্ত এবং যাহাদের একটি সুনিয়ন্ত্রিত শাসন-প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ সরকার আছে, যে শাসন-প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ ঐ স্থানের অধিবাসিগণ প্রতিনিয়ত পালন করিতে অভ্যস্ত।

"The state as a concept of political science and constitutional law, is a community of persons more or less numerous, permanently occupying a definite portion of territory, independent or nearly so, of external control and possessing an organised government to which the great body of inhabitants render habitual obedience.")

উড্‌রো উইলসন্‌ বলেন, একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আইন ও শৃংখলার সহিত বসবাস করিবার উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে রাষ্ট্র বলা হয়।

"A state is a people organised for law within a definite territory."

রাষ্ট্রের উপাদান—Characteristics of the State

অধ্যাপক গার্ণারের এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রই চারিটি উপাদান লইয়া গঠিত, যথা,

(ক) জনসমষ্টি—Population

বহু জনসমষ্টি না হইলে রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না। কিন্তু কত লোক লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইবে প্রাচীনকালের গ্রীক-রোমক রাষ্ট্রগুলির মত তাহার কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই, তবে প্রত্যেক রাষ্ট্র এমন সংখ্যক জনসমষ্টি লইয়া গঠিত হইবে যাহার দ্বারা সরকারের সব কাজই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে। বর্তমানে সুইজারল্যাণ্ডের ন্যায় অল্পসংখ্যক লোক লইয়া গঠিত রাষ্ট্র ও মহাচীনের ন্যায় জনবহুল রাষ্ট্র পাশাপাশি দেখা যায়।

(খ) নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ—Definite territory

নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ ব্যতীত রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না, কারণ প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই কার্যকলাপ এক নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকে। ভ্রাম্যমাণ যাযাবর জাতি রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে না। যখন একদল লোক স্থায়িভাবে এক নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বসবাস আরম্ভ করে, তখনই তাহাদের লইয়া রাষ্ট্র গঠনের সূত্রপাত হয়। কত লোক লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইবে ইহার যেমন কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই, সেইরূপ রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডের আয়তনের কোন নির্দিষ্ট সীমা স্থির করা যায় না। তবে ছোট ও বড় উভয় ধরণের রাষ্ট্রেরই নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ থাকা চাই। বর্তমান যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে বৃহদায়তন রাষ্ট্রের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে।

(গ) শাসনযন্ত্র বা সরকার—Government

একদল লোক কোন নির্দিষ্ট জায়গায় বসবাস করিলেই তাহাকে রাষ্ট্র বলা যায় না। নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসকারী জনসমষ্টিকে সুসংবদ্ধ করিয়া একটা সুদৃঢ় ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারিলে রাষ্ট্রের সূচনা হয়। সুসংবদ্ধ জনসমষ্টির এই ঐক্যবদ্ধতা শাসনযন্ত্রের সাহায্যে সম্ভব হয় এবং এই শাসনযন্ত্রই হইল রাষ্ট্রের কার্যকরী শক্তি। এই শাসনযন্ত্রের সাহায্যেই রাষ্ট্র তাহার ইচ্ছাকে কার্যে বলবৎ করিতে পারে। মানুষ যেমন তাহার বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, রাষ্ট্রও সেইরূপ শাসনযন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হয়। তাই শাসনযন্ত্রকে লোকে রাষ্ট্র বলিয়া ভুল করে। শাসনযন্ত্রের সাধারণতঃ তিনটি বিভাগ থাকে, যথা, আইনসভা, শাসনবিভাগ ও বিচার-বিভাগ। এই তিন বিভাগে নিযুক্ত কর্মচারী-সমষ্টিকে লইয়া শাসনযন্ত্র বা সরকার গঠিত হয়।

(ঘ) সার্বভৌম শক্তি—Sovereignty

রাষ্ট্রগঠনের সর্বপ্রধান উপাদান হইল সার্বভৌম শক্তি। এই শক্তি রাষ্ট্রের প্রাণ-স্বরূপ। এ শক্তি ব্যতীত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। সার্বভৌম শক্তির অর্থ হইল যে, দেশের মধ্যে সকল লোক ও সকল প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকিবে এবং বিদেশের সম্পর্কেও সেই রাষ্ট্র সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবে। যদি একটি দেশ কোন কারণে পররাষ্ট্রের অধীনতা স্বীকার করে, তাহা হইলে সে দেশকে আর স্বাধীন রাষ্ট্র বলা চলে না। ভারত যতদিন পর্যন্ত ইংরাজ শাসনের অধীন ছিল অথবা বর্তমান রুশ এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকা-অধিকৃত জার্মান দেশকে রাষ্ট্র

বলা যায় না। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে পূর্ণ স্বাধীনতাই রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিয়া ধরা হয়।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ, সরকার ও সার্বভৌম শক্তি ব্যতীতও একটি রাষ্ট্রের পক্ষে অপরাপর রাষ্ট্র কর্তৃক 'রাষ্ট্র' বলিয়া স্বীকৃতিলাভ করা প্রয়োজন। এই স্বীকৃতি লাভ করিলে একটি রাষ্ট্র অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক, বাণিজ্যিক ও অন্য নানাবিধ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া পারস্পরিক আদান-প্রদানের সুবিধা পায়। আধুনিককালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (United Nations) সদস্য হইতে পারিলেই আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে রাষ্ট্রমর্যাদা পাওয়া যায়। মহাচীন এখনও পর্যন্ত সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য হইতে পারে নাই বলিয়া পূর্ণ রাষ্ট্রমর্যাদার অধিকারী নহে।

সার্বভৌমের বৈশিষ্ট্য—Characteristics of Sovereignty

প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা আদি বা মৌলিক। দ্বিতীয়তঃ, এই ক্ষমতা কোন উচ্চতর ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণাধীন হইতে পারে না। ইহা রাষ্ট্রের স্বৈর-ক্ষমতা। তৃতীয়তঃ, এই ক্ষমতা অসীম। রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ন্ত্রণে ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে অবাধভাবে প্রয়োগ করা হয়। চতুর্থতঃ, এই ক্ষমতা অবিভাজ্য। একটিমাত্র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হইল এই ক্ষমতার অধিকারী। একাধিক প্রতিষ্ঠান একযোগে আংশিকভাবে এই ক্ষমতার পরিচালনা করিতে পারে না। পঞ্চমতঃ, এই ক্ষমতা স্থায়ী। রাষ্ট্র ব্যতীত এই ক্ষমতার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, আবার এই ক্ষমতা ব্যতীত রাষ্ট্র থাকিতে পারে না। ষষ্ঠতঃ, এই ক্ষমতা হস্তান্তরযোগ্য নহে। কোন মানুষ যেমন নিজের জীবন অপরকে দান করিয়া নিজে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, তদ্রূপ সার্বভৌমত্ব ব্যতীত রাষ্ট্রও বাঁচিতে পারে না। সার্বভৌমত্বের অবসানের সঙ্গে রাষ্ট্রেরও বিলুপ্তি ঘটে।

রাষ্ট্র ও সমাজের অন্যান্য সঙ্ঘ—The State and other Associations

সমাজের মধ্যে যে নানাবিধ সঙ্ঘ আছে, রাষ্ট্র তাহাদের মধ্যে অন্যতম। সামাজিক সঙ্ঘ হিসাবে রাষ্ট্রের সহিত শ্রমিক সঙ্ঘ, বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মসংগঠন প্রভৃতি অন্যান্য সঙ্ঘগুলির নিম্নলিখিত পার্থক্য দেখা যায়—

(ক) প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা আছে এবং এই সীমার মধ্যেই রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব পরিচালিত হয় কিন্তু অন্যান্য সঙ্ঘগুলির কার্যকলাপ কোন

নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে সীমাবদ্ধ না থাকিতে পারে। ভারতের রামকৃষ্ণ মিশন এইরূপ একটি সামাজিক সঙ্ঘ। ভারতের বাহিরের অন্য দেশের নাগরিকগণ এই সঙ্ঘের সদস্য হইতে পারেন এবং এই সঙ্ঘের কাজ ভারতের বাহিরের অন্যান্য দেশেও পরিচালিত হয়।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, মানুষমাত্রকেই কোন-না-কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে হইবে। কিন্তু সামাজিক অন্যান্য সঙ্ঘের সদস্য হওয়া বা না-হওয়া সম্পূর্ণ তাহার ইচ্ছাধীন। যে-কোন ছাত্র ইচ্ছা করিলে তাহার বিদ্যালয় বা ক্রীড়াসঙ্ঘ পরিত্যাগ করিতে পারে, নাগরিকগণও এক রাষ্ট্রের সদস্যপদ ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু তাহাকে অন্য রাষ্ট্রের সদস্য হইতেই হইবে। রাষ্ট্রের সদস্য হওয়া মানুষের পক্ষে বাধ্যতামূলক, অন্যান্য সঙ্ঘের সদস্য হওয়া সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন।

(গ) একজন লোক একই সময়ে একাধিক রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারে না, কিন্তু একই সময় বহু সঙ্ঘের সদস্য হইতে পারে।

(ঘ) অন্যান্য সঙ্ঘগুলি দীর্ঘস্থায়ী না হইতেও পারে। সঙ্ঘগুলির উদ্দেশ্য সফল হইলে বা অন্য কোন কারণে লোপ পাইতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র হইল চিরন্তন প্রতিষ্ঠান —ইহার বিনাশ নাই।

(ঙ) রাষ্ট্র স্বাধীন ও সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। অন্যান্য সঙ্ঘগুলির সার্বভৌম শক্তি নাই। সকল সঙ্ঘই রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন। রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে তাহাদের কার্যকলাপ বন্ধ করিতে পারে।

(চ) উদ্দেশ্যের দিক দিয়াও রাষ্ট্রের সহিত সমাজের অন্যান্য সঙ্ঘগুলির বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। অন্যান্য সঙ্ঘগুলি মানুষের কোন বিশেষ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য গঠিত হয়, যথা, বিশ্ববিদ্যালয় বা শ্রমিক সঙ্ঘ। কিন্তু রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এইরূপ এক বা একাধিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ নহে। মানব জীবনের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন করাই হইল রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র সকল বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিতে পারে।

সুতরাং দেখা যায় যে, সমাজের মধ্যে যে বহুবিধ সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে তাহার মধ্যে রাষ্ট্রই হইল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সঙ্ঘ। ব্যাপকতা, ক্ষমতা, স্থায়িত্ব ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে রাষ্ট্র হইল অসীম—অন্যান্য সঙ্ঘগুলি সসীম।

রাষ্ট্র ও সরকার—State and Government

সাধারণতঃ রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু

রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে এই দুইটি শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক। যে চারিটি উপাদান লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়, তাহার মধ্যে সরকার একটি মাত্র। রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি দেখা যায়—

১। দেশের সমস্ত অধিবাসীকে লইয়াই রাষ্ট্র গঠিত হয়, কিন্তু সরকার অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক লোক লইয়া গঠিত হয়। রাষ্ট্রের শাসন-পরিচালনাকার্যে যাহারা নিযুক্ত থাকে অর্থাৎ আইনসভাগুলির সদস্য, শাসন-বিভাগীয় কর্মচারী ও বিচার-বিভাগীয় কর্মচারিবৃন্দকে লইয়া সরকার গঠিত হয়। সুতরাং রাষ্ট্র সরকার অপেক্ষা ব্যাপকতর।

২। প্রত্যেক রাষ্ট্রই একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্রের কথা ভাবিতে গেলে একটা ভৌগোলিক সীমার কথা মনে পড়ে। কিন্তু সরকার বলিতে কোন নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের কল্পনার প্রয়োজন হয় না। সরকার শাসনকার্যেরত অল্পসংখ্যক লোককে বুঝায়।

৩। রাষ্ট্র একটি চিরন্তন প্রতিষ্ঠান—ইহার বিনাশ নাই। কিন্তু রাষ্ট্রের কর্ণধার হইলেও সরকার পরিবর্তনশীল। সরকার পরিবর্তনে রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের কোন হানি হয় না।

৪। রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, সরকার রাষ্ট্র হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতা পরিচালনা করে। রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলেই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া নূতন সরকার গঠন করিতে পারে।

৫। সকল রাষ্ট্রই একই উপাদান লইয়া গঠিত, যথা জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ, সরকার ও সার্বভৌম ক্ষমতা। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে সকল রাষ্ট্রই সমান। কিন্তু দেশভেদে সরকারের বিভিন্ন রূপ হইতে পারে। রাষ্ট্র হিসাবে গ্রেটবৃটেন ও ভারত একই প্রকার। কিন্তু দুইটি দেশের শাসন-ব্যবস্থা পৃথক।

৬। পরিশেষে বলা যায় যে, রাষ্ট্র একটি মনঃকল্পিত ধারণামাত্র। ইহার কোন বাস্তব রূপ নাই। কিন্তু সরকারের একটি বাস্তব অস্তিত্ব আছে। তাই সরকারের বিরুদ্ধে নাগরিকগণের অভিযোগ থাকিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাহাদের অভিযোগ থাকিতে পারে না। রাষ্ট্রই হইল সকল অধিকারের উৎস।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি—Origin of the State

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মতবাদ প্রচলিত আছে। এই মতবাদগুলির বিশেষ কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়াই এই

মতগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। এখন এই মতগুলির আলোচনা করিয়া ইহাদের সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা যাউক।

ঐশ্বরিক উৎপত্তি বা রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি-মতবাদ—Divine Origin of the State

এই মতবাদটি অতি প্রাচীন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বহুদেশে এই মতবাদ প্রচলিত ছিল। এই মতবাদে বলা হয় যে, রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি এবং রাজা হইলেন স্বয়ং ভগবানের প্রতিনিধি। অনেক ক্ষেত্রে এই মতবাদকে শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে রাজাকে কোন দেবতার বংশোদ্ভব বলিয়া কল্পনা করা হইত। আইন বলিতে রাজার ইচ্ছাকে বুঝাইত। লোকের ধারণা ছিল ভগবানের ইচ্ছাই রাজার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইত।

এই মতবাদ অনুসারে একমাত্র রাজতন্ত্র শাসন-ব্যবস্থাই হইল ঈশ্বরানুমোদিত শাসন-ব্যবস্থা। রাজার অবর্তমানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনের অধিকারী হইবে। রাজা শাসনকার্যের জন্য একমাত্র ভগবানের নিকট দায়ী ও প্রজা-সাধারণের পবিত্র কর্তব্য হইল রাজ-আজ্ঞা নির্বিচারে পালন করা।

এই মতবাদটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, যুক্তি অপেক্ষা লোকের ধর্ম-বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়াই এই মতবাদটি গঠিত হয়। এই মতবাদ শাসক-সম্প্রদায়কে যথেচ্ছাচারী করিয়া তুলে এবং জনসাধারণের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে। বর্তমান যুগে এই মতবাদ অবিশ্বাস্য হইলেও যে যুগে এই মতবাদটি প্রচলিত ছিল, সে যুগে ইহার উপযোগিতা ছিল। রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি ও রাজা ভগবানের নির্বাচিত প্রতিনিধি—এই মতবাদ প্রচার করিয়া রাজনৈতিক চেতনাবিহীন প্রাচীন সমাজ অন্ধবিশ্বাসের মধ্য দিয়া জনসাধারণকে আইন-শৃঙ্খলা মান্য করিতে শিক্ষা দেয়। আইন-শৃঙ্খলা না মানিলে কোন রাষ্ট্র বা কোন সংগঠনই কাজ করিতে পারে না। ইহা ছাড়া, এই মতবাদের সাহায্যে রাজশক্তি মধ্যযুগের শক্তিশালী ধর্মীয় সংগঠনের প্রভাব-মুক্ত হইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হয়। ইহার ফলে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (Secular State) গঠনের সূত্রপাত হয়। পরিশেষে বলা যায় যে, এই মতবাদটি রাষ্ট্রের নৈতিক উদ্দেশ্যের প্রতি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে। শাসকগণ যদি শাসন-ব্যাপারে নৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হন, তাহা হইলে শাসন-ব্যবস্থা উন্নততর হয়। আইনের কাছে দায়িত্ব ছাড়াও শাসকগণের একটা

অতিরিক্ত নৈতিক দায়িত্ব আছে—এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে শাসক-শাসিত সম্পর্ক শান্তিপূর্ণ হয়।

পরিবারের ক্রম-সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি মতবাদ—The Patriarchal and Matriarchal Theories

এই মতবাদে বলা হয় যে, পরিবার বড় হইয়াই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে। কতকগুলি পরিবার লইয়া গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়, কয়েকটি গোষ্ঠী লইয়া জাতি এবং অবশেষে কয়েকটি জাতি লইয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। পারিবারিক সংগঠনের ক্রমিক পরিণতির ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি—এই মতবাদের মূলকথা হইলেও পরিবারের কর্তৃত্ব লইয়া লেখকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, প্রাচীন পরিবারগুলি ছিল পিতৃ-তান্ত্রিক অর্থাৎ পরিবারের কর্তা ছিলেন সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ, আবার কেহ বলেন যে, প্রাচীন পরিবারগুলি ছিল মাতৃ-তান্ত্রিক অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠা নারী ছিলেন পরিবারের সর্বময়ী কর্ত্রী।

এই মতের প্রধান সমর্থক হইলেন ইংরাজ লেখক স্যর হেন্‌রি মেন্‌। কিন্তু তাঁহার বহু পূর্বে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টট্‌ল পরিবার হইতে যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে এই মতবাদ প্রচার করেন।

রাষ্ট্রগঠনের প্রথমদিকে পরিবারের মধ্যে বর্তমান রাষ্ট্রের অঙ্কুর নিহিত ছিল একথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও একমাত্র পরিবার সম্প্রসারিত হইয়া যে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে, একথা মানিয়া লওয়া যায় না। রক্তসম্পর্ক হইল পারিবারিক ঐক্যের ভিত্তি। কিন্তু রাষ্ট্রের ঐক্য শুধুমাত্র সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত, একথা বলিলে সত্যের অপলাপ হয়।

বলপ্রয়োগ মতবাদ—The Theory of Force

অনেকে বলেন রাষ্ট্র পশুবলের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শক্তিশালী লোক বা শক্তিশালী জাতি দুর্বল লোক বা দুর্বল জাতিকে শারীরিক শক্তি দ্বারা জয় করিয়া নিজ কর্তৃত্বের অধীনে আনিয়া রাষ্ট্রগঠনের গোড়া পত্তন করে। প্রাচীন মানব সমাজ নানা গোষ্ঠী, দল ও উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। গোষ্ঠীপতি বা দলপতি নিজের অনুচরদের সাহায্যে অন্যদলকে পরাস্ত করিয়া বিজিত দলের উপর আপন আধিপত্য স্থাপন করিত। এইরূপে যখন কোন দলপতি তাহার অনুচরদের সাহায্যে যথেষ্ট আয়তনের কোন নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে স্থায়ী আধিপত্য বিস্তার

করিয়া শাসনকার্য আরম্ভ করে, তখন রাষ্ট্রের সূত্রপাত হয়। সুতরাং যুদ্ধ রাষ্ট্র-গঠনের একটি প্রধান উপায়।

'জোর যার মল্লুক তার' ('Might is right.'), 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' ('None but the brave deserves the fair.') প্রভৃতি প্রবাদ-বচনগুলি হইতে প্রমাণিত হয় যে, উৎপত্তির প্রথম পর্যায়ে রাষ্ট্র নিশ্চিতরূপে বলপ্রয়োগনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এই মতবাদে আরও বলা হয় যে, বলপ্রয়োগ দ্বারা রাষ্ট্র শুধু গঠিত হয় না। গঠিত রাষ্ট্র স্থায়ী করিতে হইলেও বলপ্রয়োগ আবশ্যক। আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বহিরাক্রমণ হইতে রাষ্ট্রকে রক্ষা করিতে হইলেও সব বিজেতাকেই পশুবলের উপর নির্ভর করিতে হয়।

এই মতবাদের প্রধান ত্রুটি হইল যে, ইহা বলপ্রয়োগ নীতিকে রাষ্ট্র গঠনের একমাত্র উপাদান বলিয়া মনে করে। কিন্তু রাষ্ট্র কেবল শারীরিক শক্তির ভিত্তিতে গঠিত হইতে পারে না। শাসকের অধিকার শুধু পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কারণ যে অধিকার শুধু পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। বলের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অধিকারের অবসান ঘটে। ইতিহাসেও এই সাক্ষ্য প্রদান করে। মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন করাই যদি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন রাষ্ট্রই এই মহান উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে না। ইহা ছাড়া, এই মতবাদ গণতন্ত্র-বিরোধী। এই মতবাদ কার্যকরী হইলে স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী প্রভৃতি গণতান্ত্রিক নীতিগুলি বিনষ্ট হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা লোপ পাইবে। একমাত্র যুদ্ধ দ্বারাই আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা হইবে।

এই মতবাদের অন্তর্নিহিত সত্য হইল যে, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিদেশী শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য পশুবলের প্রয়োজন। কিন্তু সকলের রক্ষক ও পালক হিসাবে রাষ্ট্র শুধু শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমনের জন্য এই পশুবল প্রয়োগ করিবে এবং এই বলপ্রয়োগ জনগণ দ্বারা সমর্থিত হইবে। বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে এই সত্য মানিয়া লইতে হইবে যে, জনসাধারণের সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া কোন রাষ্ট্রই স্থায়ী হইতে পারে না। সুতরাং পশুবল রাষ্ট্রের ভিত্তি নহে। জনগণের ইচ্ছাই হইল রাষ্ট্রের প্রধান ভিত্তি। ('Will, not force, is the basis of the State.")

সামাজিক চুক্তি মতবাদ—The Social Contract Theory

এই মতবাদে বলা হয় যে, মানুষ ইচ্ছা করিয়া রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছে। মানুষ পূর্বে রাষ্ট্রের বাহিরে ছিল। রাষ্ট্রের অবর্তমানে মানুষের জীবনযাত্রার যে অসুবিধা হইত, তাহা দূর করিবার জন্য সকলে মিলিয়া একটা চুক্তি করে এবং এই চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

এই মতবাদটি অতি প্রাচীন। ভারতীয় দার্শনিক কৌটিল্য ও গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর লেখার মধ্যে চুক্তির উল্লেখ দেখা যায়। পরবর্তী কালে আরও কয়েকজন লেখক চুক্তিবিষয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু রাষ্ট্রগঠনে চুক্তির কার্যকারিতা সম্পর্কে ইংরাজ লেখক হব্‌স্‌ ও লক্‌ এবং ফরাসী লেখক রুশো সবিস্তারে আলোচনা করেন। সুতরাং সামাজিক চুক্তি মতবাদ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিতে হইলে, এই তিনজন লেখকের মত সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার।

হব্‌স্‌ঃ হব্‌স্‌ বলেন যে, রাষ্ট্রসৃষ্টির পূর্বে মানুষ এক বন্য পরিবেশে বাস করিত। এই অবস্থায় মানুষের তৈয়ারী কোন আইন ছিল না। যে যার খুসীমত বাস করিত। গায়ের জোরেই প্রত্যেকে তাহার অধিকার রক্ষা করিত। কাজেই এই অবস্থায় দুর্বলের কোন অধিকার ছিল না। নিজস্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য পরস্পরের সহিত কলহ-বিবাদ করিয়াই মানুষ বাঁচিয়া থাকিত। এই অবস্থাকে হবস্‌ প্রকৃতির রাজত্ব (State of Nature) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃতির রাজত্বের এই অরাজকতা এবং জীবন, ধন ও মানের অনিশ্চয়তা হইতে পরিত্রাণ পাইবার উদ্দেশ্যে মানুষ অবশেষে নিজেদের মধ্যে একটি পারস্পরিক চুক্তি করিল। চুক্তি দ্বারা মানুষ প্রকৃতির রাজত্বে যে অবাধ ক্ষমতার অধিকারী ছিল তাহা নিঃশেষে, বিনা শর্তে ও পুনঃপ্রাপ্তির দাবী না রাখিয়া এক ব্যক্তি বা একটি সংসদের হস্তে ন্যস্ত করিল। এই ব্যক্তি হইলেন রাজা। সুতরাং হব্‌সের মতে জনগণ নিজেদের মধ্যে একটা চুক্তি করিয়া একজনকে রাজা করিল এবং তাহার হস্তে বিনা শর্তে সমুদয় ক্ষমতা অর্পণ করিল। কাজেই যিনি রাজা হইলেন তিনি এই চুক্তির কোন পক্ষ নহেন এবং চুক্তির শর্তদ্বারা বাধ্য নহেন। তিনি তাঁহার খুসীমত শাসন করিবেন এবং এজন্য কাহারও নিকট তাঁহার কোন দায়িত্ব থাকিবে না। এইরূপে হব্‌স্‌ তাঁহার মতবাদ সাহায্যে রাজাকে অবাধ ক্ষমতার অধিকারী করিলেন। ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইল।

লক্‌ঃ

হব্‌সের মত লক্‌ও বলেন যে, রাষ্ট্রের জন্মের পূর্বে মানুষ এক প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করিত। এই প্রাকৃতিক পরিবেশ হব্‌স্ বর্ণিত প্রাকৃতিক পরিবেশের মত অসহনীয় ছিল না। এখানে মানুষ মোটামুটি শান্তিতে ও স্বাধীনভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে জীবন পরিচালিত করিত। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাকৃতিক নিয়মগুলি নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ ও বলবৎ করিবার মত কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছিল না। এই অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে মানুষ নিজেদের মধ্যে প্রথমে একটা পারস্পরিক চুক্তি করিয়া রাষ্ট্র গঠন করিল। রাষ্ট্র গঠিত হইলে তাহারা দ্বিতীয় আর একটি চুক্তি করিয়া একজনকে রাজা করিল। এই দ্বিতীয় চুক্তি রাজার সহিত হইল। চুক্তির শর্ত হইল যে, রাজা যতদিন পর্যন্ত তাহাদের জীবন, ধন ও মান রক্ষা করিতে পারিবেন ততদিন প্রজাগণ তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিবে ও তাঁহার আদেশ পালন করিবে। রাজা যদি চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করেন, তাহা হইলে প্রজাগণও তাঁহাকে মান্য করিবার দায় হইতে অব্যাহতি পাইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, হব্‌স্ শুধু একটি একপক্ষীয় চুক্তি দ্বারা অবাধ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন, লক্‌ দ্বিপক্ষীয় চুক্তি দ্বারা সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করেন।

রুশোঃ

ফরাসী লেখক রুশোও প্রকৃতির রাজত্ব হইতেই রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করেন। রাষ্ট্রের জন্মের পূর্বে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করিত। কিন্তু রুশোর মতে এই প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল মর্ত্যের স্বর্গ। এখানে সব মানুষই ছিল স্বাধীন ও সমান। কিন্তু কালক্রমে জনসংখ্যা ও সভ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মানুষের জীবন কৃত্রিম ও জটিল হইয়া উঠিল। এই জটিল জীবনযাত্রা পরিচালনা করিবার জন্য তাহাদের নানাবিধ সঙ্ঘ গঠন করিতে হইল। অবশেষে ব্যক্তিগত সম্পত্তি আবিষ্কারের ফলে কেহ প্রভু ও কেহ দাস হইল। এইরূপে মানুষ প্রকৃতির রাজত্বের সরল ও সহজ জীবনযাত্রাপথ হইতে ক্রমে ক্রমে যখন তথা-কথিত সভ্যতার উচ্চস্তরে পৌঁছিল, তখন তাহাদের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদ-জ্ঞান জন্মিল। ইহার ফলে তাহাদের আদিম স্বাধীনতা ও সাম্যভাব দূর হইয়া তাহারা হব্‌স্-বর্ণিত এক অসহনীয় পরিবেশে উপনীত হইল। এই অসহনীয় পরিবেশ হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে তাহারা নিজেদের মধ্যে একটা চুক্তি করিয়া কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কোন

সংসদের হাতে তাহাদের ক্ষমতা হস্তান্তর না করিয়া সমগ্র সমাজের হাতে অর্থাৎ তাহাদের সাধারণ ইচ্ছার (General will) হাতে ক্ষমতা সমর্পণ করিল। রুশোর মতে চুক্তি দ্বারা গঠিত এই সাধারণ ইচ্ছাই হইল সমাজের সর্বশক্তির অধিকারী। রুশোর এই সাধারণ ইচ্ছা হইল সমষ্টিগত ইচ্ছা। একমাত্র সমষ্টিই এই ইচ্ছা প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করিতে পারে। রাষ্ট্রের মধ্যে সমষ্টির এই ইচ্ছা হইল চূড়ান্ত ও নির্ভুল। এই চূড়ান্ত ও অভ্রান্ত ইচ্ছার উদ্দেশ্য হইল সমষ্টির মঙ্গল সাধন করা। যদি ব্যক্তিগত ইচ্ছার সহিত সাধারণের বা সমষ্টিগত ইচ্ছার বিরোধ হয়, তাহা হইলে সাধারণের ইচ্ছাই বলবৎ হইবে। রুশোর মতে প্রাকৃতিক পরিবেশে ব্যক্তি যে ক্ষমতার অধিকারী ছিল, তাহা চুক্তি দ্বারা সাধারণ ইচ্ছায় সমর্পণ করিলেও ব্যক্তি-স্বাধীনতা বা সাম্য নষ্ট হইল না। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তিই ব্যক্তিগতভাবে যাহা সমষ্টিতে সমর্পণ করিয়াছিল, চুক্তি দ্বারা গঠিত রাষ্ট্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তিই আবার তাহা ফিরিয়া পাইল। রুশোর মতে সরকারের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নাই। সরকার সাধারণ ইচ্ছার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং সাধারণ ইচ্ছার অধীন শাসনযন্ত্র মাত্র।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই তিনজন লেখকই চুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করিলেও তাঁহাদের মতবাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল। প্রকৃতির রাজত্বের বিশেষত্ব, চুক্তির প্রকৃতি, পক্ষ ও বিষয়বস্তু এবং রাজা ও প্রজার সম্পর্ক এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে তিনজন লেখকই ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনজন লেখক একই মতবাদের সাহায্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিলেও তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন।

হব্‌স্ তাঁহার মতবাদ দ্বারা গণশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া রাজশক্তির উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। ফলে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা নষ্ট হয়। লক্ রাজশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া গণশক্তির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। ফলে, শাসনব্যবস্থা দুর্বল ও অস্থায়ী হয় এবং জনসাধারণের খামখেয়ালের দ্বারা পরিচালিত হয়। রুশো তাঁহার মতবাদ দ্বারা স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়া লোকায়ত্ত সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।

সমালোচনা—Criticism

এই মতবাদের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত বহু সমালোচনা হইয়াছে। প্রধানতঃ বলা যায় যে, এই মতবাদের পিছনে কোন ঐতিহাসিক সত্য নাই। ইতিহাস

আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোন রাষ্ট্রই চুক্তি দ্বারা গঠিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ এই মতবাদে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের যে অধিকারের কথা বলা হয় তাহা যুক্তিসম্মত নহে। কারণ, প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা করিবার মত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছিল না। যেখানে অধিকারগুলি বলবৎ করিবার কোন কর্তৃপক্ষ নাই, সেখানে অধিকার থাকিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, যে সমস্ত রাজনৈতিক চেতনা-বিহীন মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বাস করিত, তাহারা যে রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হইয়া রাষ্ট্র গঠন করিল ইহা সম্পূর্ণ ভুল। চতুর্থতঃ, সভ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মানুষ চুক্তির মর্যাদা বুঝিতে পারিয়া তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক চুক্তি দ্বারা স্থির করে। প্রাকৃতিক পরিবেশের মানুষের মধ্যে এই চুক্তির ধারণা থাকা অসম্ভব। চুক্তি সামাজিক অগ্রগতির নিদর্শন, ইহার প্রারম্ভের নিদর্শন হইতে পারে না। পঞ্চমতঃ, এই মতবাদে জনমতকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। জনমত যে সব-সময়ে নির্ভুল সিদ্ধান্ত করে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অনেক সময় দেখা যায় যে, যুক্তিহীন উত্তেজনার দ্বারা পরিচালিত হইয়া জনমত অত্যাচারী শাসক অপেক্ষাও দেশের ও দশের অনেক অনিষ্ট সাধন করে। সুতরাং এদিক দিয়া এই মতটি বিপজ্জনক।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে এই মতবাদটি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা সম্ভব না হইলেও এই মতবাদটির উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। রাষ্ট্র মানবীয় প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের সম্মতি ও সহযোগিতার ভিত্তির উপর স্থাপিত—এই সত্যটি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া এই মতবাদটি আধুনিক গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন করে। কোন রাজশক্তি যে ঐশ্বরিক বিধান বা পশুবলের উপর স্থায়ী হইতে পারে না, এই মতবাদ তাহাই প্রচার করিল। মানুষের ব্যক্তিত্বের উপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করিয়া এই মতবাদ ব্যক্তিকে তাহার অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে শিক্ষা দিয়াছে।

ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ—**Historical or Evolutionary Theory**

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে বা কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনানুযায়ী রাষ্ট্র গঠিত হয় নাই। কোন একটি বিশেষ উপাদান দ্বারাও রাষ্ট্র গঠিত হয় নাই। রাষ্ট্র মানব সমাজের ক্রম-অগ্রগতির ফল। আদিম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগ পর্যন্ত এক বিরাম-

হীন পরিবর্তনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র ধীরে ধীরে ইহার বর্তমান রূপ পাইয়াছে। উৎপত্তির প্রথম যুগে রাষ্ট্র অতি সরল ও সাধারণ সংগঠন ছিল, কিন্তু তারপর সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে ক্রমশঃই জটিলতর হইতে লাগিল।

প্রথমতঃ, মানুষ সামাজিক জীব, তাই দলবদ্ধভাবে বাস করিতে চায়। মানুষের এই সমষ্টিগতভাবে বাস করিবার স্বভাবের মধ্যে রাষ্ট্রগঠনের বীজ উপ্ত আছে। রাষ্ট্রগঠনের প্রাথমিক উপাদান হিসাবে পরিবারের যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে এবং রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত ক্ষুদ্র পরিবার হইতে গোষ্ঠী ও গোষ্ঠী হইতে বৃহত্তর ও জটিলতর জাতির উদ্ভব হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীনকালে ধর্মের বন্ধনও রাষ্ট্রগঠনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। প্রাচীনকালের রাজারা ধর্মগুরু বলিয়াও পরিচিত ছিলেন। মানুষের রাজনৈতিক চেতনা জন্মিবার পূর্বে ধর্মই মানুষের মনে ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব জাগরিত করিয়া মানুষকে রাষ্ট্রের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করিতে শিক্ষা দিয়াছিল।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রগঠনের কোন এক সময়ে পশুবলের কার্যকারিতার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা-রক্ষা ও বহিরাক্রমণের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সমাজেই একজন দলপতির অধীনে যুদ্ধের ব্যবস্থা করিতে হইত। এইরূপে সামরিক প্রয়োজনে মানুষ নির্দিষ্ট নেতৃত্বের অধীনে ক্রমশঃ ঐক্যবদ্ধ হইয়া সুশৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল।

চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রের উৎপত্তির ইতিহাসে 'শাসিতের ইচ্ছা ও সহযোগিতা' বোধ-হয় সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। রাষ্ট্র যে জনগণের সম্মতি ও সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছে, সমাজের চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ এই মত প্রচার করিয়া জনসাধারণকে তাহাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইতে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই রাজনৈতিক চেতনা জনসমাজে ক্রমশঃ সঞ্চারিত হওয়ার ফলে শক্তির ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র জনমতের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রে পরিণত হইল।

ইহা ছাড়াও আরও অনেকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে রাষ্ট্রের পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। জনসমাজে জাতীয়তাবোধ যতই শক্তিশালী হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতার দাবী স্বীকৃত হইয়া বিশাল সাম্রাজ্যের স্থলে ছোট ছোট জাতীয় রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইল। বর্তমান যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থার আশাতীত উন্নতি হওয়ার ফলে বিভিন্ন দেশের জনসমাজের মধ্যে নানাজাতীয় সহযোগিতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, জগতের সকল জাতিই আজ রাষ্ট্রের সীমানা

অতিক্রম করিয়া এক বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আর এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক রাষ্ট্রই আজ তার সার্বভৌম শক্তি অন্ততঃ আংশিকভাবে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। আধুনিককালে অর্থনৈতিক কারণেও রাষ্ট্রগুলির পরিবর্তন ঘটিতেছে। সকলকে সমান সুবিধা দান করিবার জন্য পূর্বের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী রাষ্ট্র আজ সমাজতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, রাষ্ট্র একদিনে বা একটি উপাদানে গঠিত হয় নাই। মানুষের মনে রাষ্ট্রের ধারণা জন্মিতে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইয়াছে। পরিবারের মতন সরল প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া গঠিত হইলেও পরবর্তী কালে মানুষের রাজনৈতিক চেতনা-বিকাশের ফলে রাষ্ট্র বিভিন্ন উপাদানের প্রভাবে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। মানব-জীবনে বর্তমানে রাষ্ট্রের প্রভাব যে শুধু সুদূরপ্রসারী তাহা নয়, মানুষ আজ রাষ্ট্রকে সমাজ-জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া মনে করে।

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্র ও ইহার উপাদান

যখন একদল লোক কোন নির্দিষ্ট ভূ-ভাগে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শাসনযন্ত্র গঠন করে এবং স্বাধীনভাবে তাহাদের সামাজিক জীবন-যাপন করে, তখন তাহাকে রাষ্ট্র বলা হয়।

প্রত্যেক রাষ্ট্রই চারিটি উপাদান লইয়া গঠিত, যথা, ১। জনসমষ্টি, ২। নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ, ৩। সরকার, ও ৪। সার্বভৌম শক্তি। উপাদানগুলির মধ্যে সার্বভৌম শক্তি রাষ্ট্র গঠনের প্রধান উপাদান।

অন্য রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-মর্যাদা লাভ করা যায়।

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সঙ্ঘ

(ক) রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড থাকা চাই, অন্যান্য সঙ্ঘের নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড না হইলেও চলে।

(খ) রাষ্ট্র একটি স্থায়ী সঙ্ঘ, অন্যান্য সঙ্ঘগুলি সাধারণতঃ অস্থায়ী।

(গ) রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল মানুষের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করা, অন্যান্য সঙ্ঘগুলি দুই-একটি বিষয়ে মানুষের উন্নতির সাহায্য করে।

(ঘ) রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, অন্যান্য সঙ্ঘগুলির এরূপ অবাধ ক্ষমতা নাই।

(ঙ) মানুষের কোন-না-কোন রাষ্ট্রের সভ্য হইতেই হইবে, কিন্তু সে কোন সঙ্ঘের সদস্য নাও হইতে পারে।

রাষ্ট্র ও সরকার

১। রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই রাষ্ট্রের সদস্য, কিন্তু সকলেই সরকারের সদস্য নহে।

২। রাষ্ট্র স্থায়ী, সরকার পরিবর্তনশীল।

৩। রাষ্ট্র বলিতে একটা নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ বুঝায়, কিন্তু শাসনযন্ত্র বলিতে সরকারী কার্যে রত অল্পসংখ্যক লোক বুঝায়—কোন নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড বুঝায় না।

৪। রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, সরকার রাষ্ট্রপ্রদত্ত ক্ষমতা পরিচালনা করে।

৫। সকল রাষ্ট্রের একই বৈশিষ্ট্য, কিন্তু দেশভেদে সরকারের পার্থক্য দেখা যায়।

৬। রাষ্ট্রের কোন বাস্তব রূপ নাই। সরকার হইল, রাষ্ট্রের কার্যকরী শক্তি। তাই সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের অভিযোগ থাকিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়। রাষ্ট্র হইল সকল অধিকারের উৎস।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন সঠিক ইতিহাস নাই। অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া এ সম্পর্কে পাঁচটি বিভিন্ন মতবাদ গঠিত হইয়াছে, যথা, ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ, পরিবারের ক্রম-সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি মতবাদ, বলপ্রয়োগ মতবাদ, সামাজিক চুক্তি মতবাদ ও ঐতিহাসিক মতবাদ। প্রথম মতবাদে বলা হয় যে, রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি। দ্বিতীয় মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র হইল পরিবার-সম্প্রসারণের ফলে সৃষ্ট। তৃতীয় মতবাদ রাষ্ট্রকে বলপ্রয়োগে বিজয় দ্বারা গঠিত বলিয়া মনে করে। চতুর্থ মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রকে একটি মনুষ্য-সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করা হয় এবং রাষ্ট্রগঠনে জনমতের উপরই প্রাধান্য আরোপ করা হয়।

উপরি-উক্ত কোনও একটি মতবাদের সাহায্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। প্রত্যেকটি মতবাদ আংশিকভাবে সত্য হইলেও রাষ্ট্রের উৎপত্তির সম্পূর্ণ বিবরণ কোন একটিমাত্র মতবাদ হইতে পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক মতবাদ এই সমস্ত মতবাদের সারমর্ম গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তির একটি যুক্তিসম্মত বিবরণ দিবার চেষ্টা করে। ঐতিহাসিক মতবাদে বলা হয় যে, রাষ্ট্র একদিনে বা একটি উপাদানের সাহায্যে গঠিত হয় নাই। রাষ্ট্র নানা উপাদানের সাহায্যে বিভিন্ন বিকাশের মধ্য দিয়া ইহার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। রাষ্ট্রগঠনের বিভিন্ন উপাদান হইল : রক্ত-সম্পর্ক, ধর্মীয় বন্ধন, পশুবল, রাজনৈতিক চেতনা প্রভৃতি।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. Define state. Point out its characteristics. Is the "state" of West Bengal a state? H. S. (Hu) 1960

উঃ—সমাজবদ্ধ মানুষ তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের উদ্দেশ্যে সমাজ মধ্যে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিয়াছে তন্মধ্যে রাষ্ট্রই হইল সর্বপ্রধান। যখন একদল লোক সংঘবদ্ধ হইয়া স্বাধীনভাবে নিজস্ব শাসন-ব্যবস্থার অধীনে একটি নির্দিষ্ট ভূ-ভাগে বসবাস করে, তখন সেই সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে রাষ্ট্র বলা হয়। অধ্যাপক উড্রো উইলসন্ রাষ্ট্রের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন : নির্দিষ্ট ভূ-ভাগের মধ্যে আইন ও শৃঙ্খলার সহিত সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে রাষ্ট্র বলা হয়—(A state is a people organised for law within a definite territory).

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, চারিটি উপাদান লইয়া রাষ্ট্র গঠিত—যথা, জনসংখ্যা, নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ, শাসনযন্ত্র বা সরকার ও সার্বভৌমিকতা। জনসমষ্টি ব্যতীত রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না। কিন্তু কতলোক লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইবে, তাহার কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। প্রত্যেক রাষ্ট্রই এমন সংখ্যক লোক লইয়া গঠিত হইবে যাহার দ্বারা সরকারের বিভিন্ন কাজ ভালভাবে করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের কার্যকলাপ ও আধিপত্য একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে পরিচালিত হয়। তাই নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড ব্যতীত রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না। জনসমষ্টি স্থায়িভাবে কোথাও বসবাস না করা পর্যন্ত রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইতে পারে না। জনসমষ্টির ন্যায় রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডেরও কোন নির্দিষ্ট সীমা স্থির করা সম্ভব নয়। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্র গঠনে শাসনযন্ত্র বা সরকার হইল একটি প্রধান উপাদান। শুধু একদল লোক একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বাস করিলেই রাষ্ট্র গঠিত হয় না। জনসমষ্টিকে সুসংবদ্ধ করিয়া সুদৃঢ় ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করা প্রয়োজন। জনসমষ্টির এই ঐক্যবদ্ধতা শাসনযন্ত্রের সাহায্যে সম্ভব হয় এবং এই শাসনযন্ত্রই হইল রাষ্ট্রের কার্যকরী শক্তি। শাসনযন্ত্রের সাহায্যেই রাষ্ট্র তাহার ইচ্ছাকে বলবৎ করিতে পারে।

রাষ্ট্র গঠনের সর্বপ্রধান উপাদান হইল সার্বভৌমিকতা। এই সার্বভৌম শক্তি হইল রাষ্ট্রের

প্রাণস্বরূপ। সার্বভৌম শক্তির অর্থ হইল যে, রাষ্ট্রের মধ্যে সকল লোক ও প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকিবে এবং বৈদেশিক ব্যাপারেও রাষ্ট্র সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবে। এই শক্তি ব্যতীত রাষ্ট্রের কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র নহে, কারণ ইহা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি প্রদেশ মাত্র। যে সমস্ত উপাদান লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হয় তন্মধ্যে একমাত্র শাসনযন্ত্র ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্র গঠনের অন্য কোন উপাদান নাই। পশ্চিমবঙ্গের জনসমষ্টি হইল ভারতীয় নাগরিক—পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব খাস্ কোন নাগরিক নাই। পশ্চিমবঙ্গের ভূ-ভাগও ভারতরাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন। পশ্চিমবঙ্গের একটি নিজস্ব শাসনব্যবস্থা থাকিলেও সে শাসনব্যবস্থা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। পরিশেষে পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্র গঠনের সর্বপ্রধান উপাদান সার্বভৌম শক্তি নাই। অন্যান্য বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলি পশ্চিমবঙ্গকে রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করে না। পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্র নহে—যে সমুদয় রাজ্য লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গ তন্মধ্যে অন্যতম। পশ্চিমবঙ্গ একটি রাজ্য মাত্র—রাষ্ট্র নহে।

2. Write a note on the theory of evolution as an explanation of the origin of the state.

উঃ—রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে যতগুলি মতবাদ প্রচলিত আছে তন্মধ্যে এই মতবাদটি সবচেয়ে বেশী যুক্তিসম্মত ও বিজ্ঞানসম্মত। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত অন্যান্য মতবাদগুলির সারমর্মের ভিত্তিতে এই মতবাদটি গঠিত হইয়াছে। এই মতবাদে বলা হয় যে, রাষ্ট্র একদিনে বা সামাজিক বিশেষ কোন একটি শক্তির প্রভাবে গঠিত হয় নাই। রাষ্ট্র মানব-সমাজের ক্রমবিবর্তনের ফল। আদিমযুগ হইতে আরম্ভ হইয়া বর্তমান যুগ পর্যন্ত এক বিরামহীন বিবর্তনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র ধীরে ধীরে নব নব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। গঠনের প্রথম পর্যায়ে রাষ্ট্রের সূত্রপাত হইয়াছিল অতি সাধারণভাবে, কিন্তু তারপর সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে ক্রমশঃ জটিলতর রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

রাষ্ট্র গঠনে রক্ত সম্পর্কের বন্ধন, ধর্মের বন্ধন, পশুবল ও শাসিতের ইচ্ছা—প্রত্যেকটির প্রভাব একক বা সম্মিলিতভাবে এক এক সময়ে কার্যকরী হইয়াছিল। কিন্তু উপরি-উক্ত কোন একটি প্রভাব একক রাষ্ট্র গঠন করে নাই। ইহা ছাড়াও, আরও অনেকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতে রাষ্ট্রের রূপ পরিবর্তিত হইয়াছে। জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিকতা ও বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক কারণগুলিও রাষ্ট্রের বিবর্তনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সুতরাং দেখা যায় যে, রাষ্ট্র একদিনে বা একটি উপাদানে গঠিত হয় নাই। রাষ্ট্র মানবজীবনের দীর্ঘদিনব্যাপী বিবর্তনের ফল।

3. Explain and criticise the social contract theory about the origin of the state.
H. S. Comp. 1960

উঃ—রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি নির্ধারণ সম্পর্কে সামাজিক চুক্তি মতবাদটি একটি প্রধান মতবাদ বলিয়া গণ্য হয়। এই মতবাদে বলা হয় যে, রাষ্ট্র গঠনের পূর্বে মানুষ আইন-শৃঙ্খলাবিহীন এক প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করিত। প্রাকৃতিক পরিবেশের অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র-বহির্ভূত মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত করিয়া রাষ্ট্র গঠন করিল। সুতরাং রাষ্ট্র হইল চুক্তির ফল।

প্রাচীন যুগের ভারতীয় দার্শনিক কৌটিল্য ও গ্রীক দার্শনিক প্লেটো প্রভৃতির চুক্তির সম্পর্কে ধারণা

থাকিলেও রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে চুক্তির গুরুত্ব ইংরাজ দার্শনিক হব্‌স্‌ ও লক এবং ফরাসী দার্শনিক রুশো বিশদভাবে আলোচনা করেন।

হব্‌সের মতে রাষ্ট্র জন্মের পূর্বে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করিত। প্রাকৃতিক পরিবেশ 'জোর যার মুল্লুক তার' এই নীতিতে পরিচালিত হইত। সুতরাং জীবন, ধন ও মানের কোন নিরাপত্তা ছিল না। মানুষের জীবন ছিল কদর্য, পাশবিক ও স্বল্পায়ু। প্রাকৃতিক পরিবেশের এই অনিশ্চয়তা ও দুর্বহ জীবন যখন অসহনীয় হইয়া উঠিল, মানুষ তখন নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি করিয়া প্রাকৃতিক পরিবেশে তাহারা যে সমস্ত অনিয়ন্ত্রিত ও অবাধ ক্ষমতার অধিকারী ছিল, সে সমুদয়ই একটি রাজতন্ত্রে নিঃশেষে ও পুনঃপ্রাপ্তির দাবী না রাখিয়া সমর্পণ করিল। চুক্তির ফলে যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহাই হইল সর্বক্ষমতার অধিকারী। রাজার বিরুদ্ধে প্রজার কোন অভিযোগ থাকিতে পারে না।

লক্‌ বলেন যে, প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের স্বাধীনতা ও সাম্যভাব কিছু পরিমাণে থাকিলেও অন্য কতকগুলি অসুবিধা দূর করিবার জন্য মানুষ প্রথম একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া সমাজ সৃষ্টি করে। পরে দ্বিতীয় একটি চুক্তিদ্বারা তাহারা সরকার (রাজতন্ত্র) গঠন করে এবং এই রাজতন্ত্রে তাহারা সর্তসাপেক্ষে তাহাদের কতিপয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে। রাজার সঙ্গে এই চুক্তি হয় যে, রাজা যতদিন চুক্তির শর্ত পালন করিবেন ততদিন পর্যন্ত প্রজাগণ তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিবে।

ফরাসী লেখক রুশোর মতে প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল মর্ত্যের স্বর্গ। এখানে সব মানুষই ছিল স্বাধীন ও সমান। কিন্তু কালক্রমে জনসংখ্যা ও সভ্যতা বৃদ্ধির ফলে মানুষের জীবন কৃত্রিম ও জটিল হইল ও শেষ পর্যন্ত মানুষের আদিম স্বাধীনতা ও সাম্যভাব দূর হইয়া তাহারা হব্‌স্‌ বর্ণিত এক অসহনীয় পরিবেশে উপনীত হইল। প্রাকৃতিক পরিবেশের শেষ পর্যায়ের এই অসহনীয় পরিবেশ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাহারা নিজেদের মধ্যে একটা চুক্তি করিয়া কোন ব্যক্তি-বিশেষ বা সংসদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত না করিয়া সমগ্র সমাজের হাতে অর্থাৎ তাহাদের সাধারণ ইচ্ছার (General will) হাতে ক্ষমতা সমর্পণ করিল। সুতরাং দেখা যায় যে, হব্‌স্‌ তাঁহার মতবাদ দ্বারা গণশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া রাজশক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। লক্‌ রাজশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া গণশক্তির উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। ফলে শাসনব্যবস্থা অস্থায়ী ও দুর্বল হয়। রুশো, হব্‌স্‌ ও লক্‌—উভয়ের মতবাদের সমন্বয়সাধন দ্বারা স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়া লোকায়ত্ত সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান।

সমালোচনা—এই মতবাদ ইতিহাস দ্বারা সমর্থিত হয় না। ইতিহাসে এমন কোন একটি রাষ্ট্রের খোঁজ পাওয়া যায় না যে রাষ্ট্রটি চুক্তি দ্বারা গঠিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, প্রাকৃতিক পরিবেশে যেখানে অধিকারগুলি রক্ষা করিবার কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছিল না, সেখানে অধিকার থাকিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, যে সমস্ত মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করিত তাহাদের কোন রাজনৈতিক চেতনা ছিল না। সুতরাং রাজনৈতিক চেতনাবিহীন মানুষ যে রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন হইয়া হঠাৎ রাষ্ট্র গঠন করিল, ইহা সম্ভব নয়। চতুর্থতঃ, এই মতবাদটি বিপজ্জনক, কারণ এই মতবাদে জনমতকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, যুক্তিবিহীন উত্তেজনা দ্বারা পরিচালিত হইয়া জনমত অনেক সময় অত্যাচারী শাসক অপেক্ষাও দেশের অনিষ্ট সাধন করিতে পারে।

মতবাদের মূল্যনির্ণয়—রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে মতবাদটি গ্রহণযোগ্য না হইলেও অন্যদিক দিয়া ইহার যথেষ্ট মূল্য আছে। রাষ্ট্র মানবীয় প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের সম্মতি ও সহযোগিতার উপর স্থাপিত এই সত্যটি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া এই মতবাদটি বর্তমান গণতন্ত্রের গোড়া পত্তন করে।

4. 'The state is the result of brute force'. Discuss the statement.

উঃ—অনেকে বলেন রাষ্ট্র পশুবলের সাহায্যে গঠিত হইয়াছে। সবল লোক বা সবল জাতি, দুর্বল লোক বা দুর্বল জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করে। ইতিহাসেও দেখা যায় যে, অতীতের বহু সাম্রাজ্যই বলপ্রয়োগ সাহায্যে বিজয় দ্বারা গঠিত হইয়াছিল। এই মতবাদে আরও বলা হয় যে, বলপ্রয়োগ দ্বারা রাষ্ট্র শুধু গঠিত হয় না, গঠিত রাষ্ট্র স্থায়ী করিতে হইলেও বলপ্রয়োগ আবশ্যক ও এইজন্য স্থায়ী পুলিশবাহিনী ও সেনাবাহিনী আবশ্যক।

এই মতবাদের ত্রুটি হইল যে, ইহা বলপ্রয়োগ নীতিকে রাষ্ট্র গঠনের একমাত্র উপাদান বলিয়া মনে করে। কিন্তু শাসকের অধিকার শুধু পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কারণ যে অধিকার শুধু পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে অধিকার চিরস্থায়ী হইতে পারে না। বলের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অধিকারেরও অবসান ঘটে। ইতিহাসও এই সাক্ষ্য প্রদান করে।

এই মতবাদের অন্তর্নিহিত সত্য হইল যে, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য পশুবলের প্রয়োজন। কিন্তু সকলের পালক ও রক্ষক হিসাবে রাষ্ট্র শুধু শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমনের জন্য এই পশুবল প্রয়োগ করিবে এবং এই বলপ্রয়োগ জনমত দ্বারা সমর্থিত হওয়া চাই। সুতরাং পশুবল রাষ্ট্রের ভিত্তি হইতে পারে না—জনগণের ইচ্ছাই হইল রাষ্ট্রের প্রধান ভিত্তি—'Will, not force, is the basis of the state'.

5. Explain the term 'state' and distinguish it from other associations.

H. S. (Com.) 1962

রাষ্ট্র শব্দটি ব্যাখ্যা কর এবং রাষ্ট্রের সহিত অন্যান্য সংঘের পার্থক্য বর্ণনা কর।

উঃ—রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও গঠনের উপাদান—প্রথম প্রশ্নের প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১। রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড চাই, সংঘের ভূখণ্ড না হইলেও চলে।

২। রাষ্ট্র একটি স্থায়ী সংঘ; অন্যান্য সংঘগুলি স্থায়ী না হইতেও পারে।

৩। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বহুমুখী। রাষ্ট্র মানুষের বহির্জীবন নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহার সর্ববিধ উন্নতিসাধনে সহায়তা করে, অন্যান্য সংঘগুলি দুই একটি বিষয়ে মানুষের উন্নতির সাহায্য করে।

৪। রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া রাষ্ট্রান্তর্গত সকলের উপর অবাধ কর্তৃত্ব করিতে পারে, অন্যান্য সংঘগুলির অবাধ ক্ষমতা নাই।

৫। মানুষ ইচ্ছামত এক বা একাধিক সংঘের সভ্য হইতে পারে বা সভ্যপদ ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু কোন-না-কোন একটি রাষ্ট্রের সভ্য তাহাকে হইতেই হইবে—নাগরিক হওয়া বাধ্যতা-মূলক।

চতুর্থ অধ্যায়

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী

(Ends and Functions of the State)

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য—Ends of the State

রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি—এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টটলের মতে রাষ্ট্র হইল সামাজিক সংগঠনের চরম বিকাশ। একমাত্র রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবে মানুষ তাহার চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ করিতে সমর্থ হয়। রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করিয়া নিয়মিত ব্যবস্থা করা, অথবা প্রগতিমূলক কার্য করা, অথবা ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠা করাকেই অনেকে রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হিতবাদী (utilitarian) দার্শনিকগণের মতে সর্বাধিক সংখ্যক লোকের সর্বাধিক কল্যাণসাধন করাই হইল রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য। অধুনা অনেক লেখক রাষ্ট্রকে শুধুমাত্র একটি সমাজ-কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করেন।

কিন্তু বিভিন্ন লেখক কর্তৃক নির্ধারিত উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলির কোনটিই রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ডাঃ গার্ণার ও অধ্যাপক বার্জেস রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন, যথা,—প্রাথমিক উদ্দেশ্য (Primary end), মাধ্যমিক উদ্দেশ্য (Secondary end) ও শেষ বা চরম উদ্দেশ্য (Ultimate end)। ব্যক্তিগত উন্নতি, জাতীয় উন্নতি ও সমগ্র মানব সমাজের উন্নতি সাধন করাই হইল রাষ্ট্রের চরম উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রের কার্যকলাপ এরূপভাবে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন যাহাতে ব্যক্তিগত স্বার্থ, জাতীয় স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক স্বার্থের মধ্যে কোনরূপ সংঘাত না ঘটে।

রাষ্ট্রের কার্যাবলী—Functions of the State

রাষ্ট্র কি কাজ করিবে বা রাষ্ট্রের কি কাজ করা উচিত—এ সম্পর্কে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, রাষ্ট্রের কাজ যতই কম হইবে ব্যক্তির পক্ষে ততই মঙ্গল। আবার, কাহারও কাহারও মতে রাষ্ট্রের কাজ যতই প্রসারিত হইবে ব্যক্তির মঙ্গল ততই বেশী হইবে। সুতরাং একদলের মত হইল রাষ্ট্রের কার্যকলাপ ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখা, অপরদলের মত হইল রাষ্ট্রের কার্যকলাপ

বহুদূর প্রসারিত করা। সুতরাং রাষ্ট্র-কর্তব্য সম্পর্কে এই দুইটি মতবাদকে পরস্পর বিরোধী বলা যাইতে পারে। যাঁহারা রাষ্ট্রের কাজ কমাইবার পক্ষপাতী, তাঁহাদিগের মতবাদকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ বলা হয় এবং যাঁহারা রাষ্ট্রের কাজ প্রসারিত করিবার পক্ষপাতী তাঁহাদের মতবাদকে সমাজতন্ত্রবাদ বলা হয়। এখন এই দুইটি মতবাদ আলোচনা করিলে রাষ্ট্রের কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা যাইতে পারে।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ—Individualism

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে বলা হয় যে, রাষ্ট্র মানবজীবনের প্রধান অভিশাপ। ইহা ভাল প্রতিষ্ঠান নহে, নিতান্ত মন্দ। তথাপি রাষ্ট্র না হইলে মানুষের চলে না। মানব-সমাজে যতদিন পর্যন্ত অপরাধমূলক কার্য অনুষ্ঠিত হইবে, ততদিন পর্যন্ত রাষ্ট্র না হইলে চলিবে না। যেদিন সমাজ হইতে সমস্ত প্রকার দুষ্কার্য দূর হইবে, সেদিন আর রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজন হইবে না। সুতরাং বর্তমানে রাষ্ট্র না হইলে নেহাৎ চলে না বলিয়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদিগণ রাষ্ট্রকে একটি অপরিহার্য পাপ বলিয়া মনে করেন। এইজন্য ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদিগণ বলেন, রাষ্ট্রের কার্যের পরিধি যতই কম হইবে, ব্যক্তির পক্ষে ততই মঙ্গল। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের প্রধান কার্য হইল আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য শাসনকার্য-পরিচালনা ও বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করা। ইহার অতিরিক্ত কোন কাজ রাষ্ট্র করিতে পারিবে না। অন্য সমস্ত বিষয়ে ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা থাকিবে এবং তাঁহারা বলেন এইরূপ স্বাধীন অবস্থায়ই ব্যক্তি তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের সুযোগ পাইতে পারে।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে যুক্তি—Arguments for Individualism

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদিগণ তাঁহাদের মত সমর্থনের পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি দেখাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, মানুষ নিজের ভাল নিজেই বুঝে। সুতরাং নিজের যাহাতে ভাল হয় প্রত্যেকে তাহাই করিবে। ইহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গল হইবে এবং সকলের মঙ্গল হইলে সমষ্টিগত মঙ্গলও সাধিত হইবে। সুতরাং ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্রের কিছু করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা আরও বলেন যে, রাষ্ট্র যদি ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে, তাহা হইলে ব্যক্তি তাহার নিজের চেষ্টার দ্বারা কোনদিনই স্বাবলম্বী হইতে পারিবে না। সে চিরদিনই শিশু থাকিয়া যাইবে। ব্যক্তিগত ব্যাপারে অত্যধিক রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে কোন কাজেই

ব্যক্তির আর অনুপ্রেরণা থাকিবে না এবং ইহার ফলে তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ সম্ভব হইবে না। ইহা ছাড়া, রাষ্ট্র যদি সব কাজ করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে কোন কাজই ভাল করিয়া করিতে পারিবে না। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদিগণ তাঁহাদের মতবাদের সমর্থনে অর্থনৈতিক যুক্তির অবতারণা করেন। তাঁহারা বলেন, রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ না করিলে অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে ও উৎপন্ন দ্রব্য উন্নতশ্রেণীর হইবে এবং প্রতিযোগিতার ফলে মূল্য কমিবে। প্রতিযোগিতার ফলে একমাত্র যোগ্য ব্যক্তিগণ টিকিয়া থাকিবে আর যাহারা অযোগ্য তাহারা অপসারিত হইবে। ইহাতে সমাজের মঙ্গল হইবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইয়ুরোপে রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই অত্যধিক রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের প্রতিবাদস্বরূপ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম হয়। এই মতবাদের প্রধান সমর্থক ছিলেন জার্মান দার্শনিক ক্যান্ট, ফরাসী দার্শনিক হ্মতকভেল্ ও ইংরেজ ধনবিজ্ঞানী রিকার্ডো, স্টুয়ার্ট মিল্, হার্বার্ট স্পেনসার্ প্রভৃতি।

বিপক্ষে যুক্তি—Arguments against Individualism

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদিগণের যুক্তিগুলি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না। যুক্তিগুলির মধ্যে বহু ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়। মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে অতীতে ও বর্তমানে রাষ্ট্র যেরূপ সাহায্য করিয়াছে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান তাহা করিতে পারে নাই। সুতরাং রাষ্ট্রের একেবারেই কোন প্রয়োজন নাই একথা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ, মানুষ নিজের ভাল নিজে বুঝিলেও সব সময়ে তাহা বুঝিতে পারে না বা বুঝিতে চায় না। বসন্ত বা কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় সকলে স্বেচ্ছায় টীকা না লইয়া নিজের ও অপরের নিরাপত্তা নষ্ট করে। এইরূপ ক্ষেত্রে সমষ্টির মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন। ইহা ছাড়া, ব্যক্তিগত স্বার্থ সমষ্টিগত স্বার্থের সহিত এরূপ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে, একমাত্র রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কেহ ব্যক্তি তথা সমষ্টির শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি কল্যাণকর কার্য সম্পাদন করিতে পারে না। ইহা ছাড়াও বলা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে সব সময়ে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় না। ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলিতে ব্যক্তির যাহা খুসী তাহা করিবার ক্ষমতা বুঝায় না। এইজন্য রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্ষেত্র স্থির করিয়া দেয়। রাষ্ট্র না থাকিলে দুর্বলের কোন স্বাধীনতা থাকিত না। সুতরাং সকলের সমান স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন। ব্যক্তির যাহাতে সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হয়, সেই উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্র বিবিধ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা

প্রবর্তন করে। সুতরাং সুনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ উচ্ছৃঙ্খলতার অবসান ঘটাইয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার ন্যায্য অধিকার ভোগ করিতে সাহায্য করে।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে এই নীতি অনুসারে পরিচালিত হইতে পারে না। বর্তমান রাষ্ট্রগুলি জনসাধারণের হিতসাধনের উদ্দেশ্যে রাস্তাঘাট, পার্ক, সেতুনির্মাণ, শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্যের উন্নতি ও অন্য নানাবিধ কল্যাণকর কার্য স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে এবং ইহার ফলে জনসাধারণের অভাবনীয় কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী মত অনুসারে রাষ্ট্রের কার্য পরিচালিত হইলে রাষ্ট্রের এই জনকল্যাণকর কার্যগুলি করিবার আর কোন অধিকার থাকে না। আধুনিক কালে এই জনহিতকর কার্যগুলিকে বাদ দিয়া রাষ্ট্রের কল্পনা করা যায় না।

সমাজতন্ত্রবাদ—Socialism

রাষ্ট্রের কাজ কি হইবে এ সম্পর্কে সমাজতন্ত্রবাদিগণ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী মত হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁহারা রাষ্ট্রকে মানব-জীবনের চরম উৎকর্ষলাভের পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন এবং এই কারণে তাঁহারা রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্র বহুদূর বিস্তৃত করিবার পক্ষপাতী। তাঁহারা বলেন, রাষ্ট্র শুধু পুলিশের কার্যই করিবে না, জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহার সব কিছু রাষ্ট্র করিবে।

ব্যক্তির সর্বাধিক কল্যাণসাধন করাই হইল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী ও সমাজ-তন্ত্রবাদী—উভয় দলের উদ্দেশ্য। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদিগণ ব্যক্তির ক্ষমতায় আস্থাবান, তাই তাঁহারা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে মত পোষণ করেন। অপরপক্ষে সমাজতন্ত্রবাদিগণ ব্যক্তিগত ক্ষমতায় বিশ্বাসী নহেন, তাই তাঁহারা রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের মধ্য দিয়া ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পক্ষপাতী। সুতরাং উদ্দেশ্য একই হইলেও কার্যক্রমের দিক দিয়া উভয় মতবাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে।

সমাজতন্ত্রবাদ শুধু একটি রাজনৈতিক মতবাদ নহে, ইহা প্রধানতঃ নির্দিষ্ট কার্যক্রম-সমন্বিত একটি অর্থনৈতিক মতবাদ। অত্যধিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ফলে সমাজ-ব্যবস্থায় যে ধনতান্ত্রিকতার উদ্ভব হয়, তাহার প্রতিবাদ হিসাবে সমাজ-তন্ত্রবাদের জন্ম হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় লোক জমি, মূলধন ও উৎপাদনের

অন্যান্য উপাদানগুলির মালিক হয় এবং উৎপন্নদ্রব্য বিক্রয় করিয়া লাভের বেশীর ভাগ তাহারা গ্রহণ করে। এইরূপে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য সৃষ্টি হয় ও উত্তরাধিকার-আইনের বলে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য স্থায়ী হয়। সমাজতন্ত্রবাদিগণ বলেন যে, সরকার জমি, মূলধন ও উৎপাদনের সমগ্র ব্যবস্থার মালিক হইবে। এই মত অনুযায়ী রাষ্ট্র শুধু উৎপাদন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিয়া ক্ষান্ত হইবে না, উৎপাদিত সম্পদ সকলের মধ্যে এরূপভাবে ভাগ করিয়া দিবে, যাহাতে প্রত্যেকে তাহার গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে জাতীয় আয়ের একটা ন্যায্য অংশ পাইতে পারে। তাঁহারা বলেন, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যতীত বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার এই চরম আয়-বৈষম্য দূর করা সম্ভব নহে।

সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন প্রকার-ভেদ—Different forms of Socialism

সমাজতন্ত্রবাদ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত সমাজতন্ত্রবাদী মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কসের মতবাদের ভিত্তির উপর গঠিত। সুতরাং কার্ল মার্কসের মতবাদের সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

মার্কসের সমাজতন্ত্রবাদ—Marxian Socialism

ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যার উপরই মার্কস্ তাঁহার সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, ইতিহাস আলোচনা করিলেই দেখা যায় যে, প্রত্যেক যুগেই সমাজ-ব্যবস্থায় শ্রেণীবৈষম্য ছিল। প্রাচীনকালে দাস, সাধারণ ও অভিজাত শ্রেণী ছিল। মধ্যযুগেও ভূমির অধিকারী অভিজাত শ্রেণী ও ভূমিদাস ছিল। এই শ্রেণীবৈষম্যের ফলে যে শ্রেণী-সংগ্রাম ঘটে, তাহার ভিত্তিতেই রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস রচিত হয়। বর্তমান যুগের সমাজ-ব্যবস্থার রূপ হইল ধনতান্ত্রিক। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা হইল পূর্ববর্তী ব্যবস্থার শেষ পরিণতি। এই ব্যবস্থায় অল্পসংখ্যক পুঁজিপতি মালিক শ্রমিকগণকে বঞ্চিত করিয়া উৎপাদিত সম্পদের বেশীর ভাগ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে। ফলে, সমাজে শ্রমিক ও মালিক এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীর আবির্ভাব হইয়াছে এবং এই দুই শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। মার্কস্ বলেন, কালক্রমে এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে শ্রমিক-শ্রেণীর সংখ্যা ও তাহাদের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইয়া এরূপ অবস্থায় আসিবে যে, শ্রমিক-শ্রেণী সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিদ্রোহ করিবে। বিদ্রোহের ফলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান

ঘটিবে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা শেষ হইলে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে দেশের সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত হইবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

মার্কসের মতবাদের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, তিনি মানব-ইতিহাসের শুধু দ্বন্দ্ব ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের দিকটাই দেখিয়াছিলেন, কিন্তু মানুষ এই দ্বন্দ্ব ও ধ্বংসের মধ্য দিয়া কিরূপভাবে গঠনমূলক কার্যের দ্বারা ধীরে ধীরে প্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে, সে সম্বন্ধে তিনি উদাসীন ছিলেন। মার্কসের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ না করিতে পারা গেলেও একথা সত্য যে, মার্কস্ তাঁহার মতবাদ প্রচার দ্বারা শ্রমিকগণকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার সাহায্যে তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করেন। শ্রমিকের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলেই মালিক কর্তৃক শ্রমিক-নির্যাতন ও শোষণ অন্ততঃ আংশিক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।

সমষ্টি-প্রধান সমাজতন্ত্রবাদ—Collectivism

এই মতের সমর্থকগণ উৎপাদনের উপাদানগুলির রাষ্ট্র-মালিকানা দাবী করেন। ইহাদের মতে উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে, কিন্তু বিনিময় ও ভোগব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুরূপ হইবে। তাঁহাদের মতে সমাজে বিশেষ সুবিধা-ভোগী কোন সম্প্রদায় থাকিতে পারিবে না। জার্মানিতে সমষ্টিপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ **রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ**—State Socialism নামে অভিহিত হয়।

অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদ—Syndicalism

অ-রাষ্ট্রতন্ত্রিগণ ধ্বংসাত্মক কার্যপদ্ধতির দ্বারা বর্তমান ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অবসান ঘটাইয়া শ্রমিক সঙ্ঘের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষপাতী। রাষ্ট্রের ধ্বংস-সাধন করিয়া মানুষের সমগ্র জীবনকে ইঁহারা শ্রমিক সঙ্ঘের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার চেষ্টা করেন।

সমিতি-প্রধান সমাজতন্ত্রবাদ—Guild Socialism

সমষ্টি-প্রধান সমাজতন্ত্রবাদ ও অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদের সমন্বয় সাধন করিয়া সমিতি-প্রধান সমাজতন্ত্রবাদিগণ সমাজতন্ত্রবাদের এক নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

ইঁহারা রাষ্ট্রের কর্মক্ষমতায় বিশ্বাসী নহেন, কিন্তু অ-রাষ্ট্রতন্ত্রিগণের মত রাষ্ট্রকে একেবারে ধ্বংস করিবার পক্ষপাতী নহেন। ইঁহারা বলেন, বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির মালিক হইবে রাষ্ট্র, কিন্তু পরিচালনার ভার থাকিবে বিভিন্ন শ্রমিকসঙ্ঘের উপর। জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার জন্য রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল, এই শ্রমিকসঙ্ঘ ও সমাজের অন্যান্য সঙ্ঘগুলির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

সাম্যবাদ—Communism

সাম্যবাদ হইল মার্কস্-প্রবর্তিত সমাজতন্ত্রবাদের শেষ অধ্যায়। শ্রমিক-মালিক বিরোধের পরে যে সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তাহা পূর্ণ সাম্যবাদ নহে। এই ব্যবস্থায় মালিকশ্রেণী নির্মূল হইয়া শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ও শ্রমিকের স্বার্থে রাষ্ট্রশক্তির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুসারে কাজ করে এবং যোগ্যতা অনুসারে পারিশ্রমিক পায়। বিনিময়-কার্যও অর্থের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। কালক্রমে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হইয়া এমন নূতন এক শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা গঠিত হইবে যেখানে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র প্রভৃতির কোন পার্থক্য থাকিবে না। শ্রেণীহীন যে নূতন ব্যবস্থা গঠিত হইবে তাহাতে কি উৎপাদনে, কি ভোগে কোনরূপ ব্যক্তিগত মালিকানা থাকিবে না। অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রায়ত্ত হইলে আর মুনাফার লোভে উৎপাদন করিবে না। এইরূপ অবস্থায় অর্থের মাধ্যমে কোন বিনিময়ের প্রয়োজন থাকিবে না, কারণ প্রত্যেকে তাহার সাধ্যমত কাজ করিবে ও প্রয়োজন অনুসারে অভাব মিটাইবার সামগ্রী পাইবে। এইরূপে পূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলে রাষ্ট্রের আর কোন প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না। সাম্যবাদী ব্যবস্থার সাহায্যে মানুষ স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হইলে রাষ্ট্র-সংগঠন আপনা হইতেই বিলীন হইবে।

রুশ বিপ্লবের পর সাম্যবাদী নেতাগণ এই নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। উৎপাদনের সব রকম উপাদানই রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে সাম্যবাদী নেতাগণ বুঝিতে পারিলেন যে, ব্যক্তিগত লাভের কিছু আশা না থাকিলে ব্যক্তির কাজে অনুপ্রেরণা হয় না। তাই তাঁহারা মার্কসীয় নীতির কিছু পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রুশ দেশে বর্তমানে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভোগ ও দখল স্বীকৃত হইয়াছে। যোগ্যতা অনুসারে শ্রমিকের মজুরি নির্ধারিত হয় এবং আয়-বৈষম্য কমিলেও একেবারে দূর হয় নাই। বিনিময়-কার্যও টাকা-পয়সার সাহায্যে পরিচালিত হয়। সাম্যবাদী ব্যবস্থার সাহায্যে

জনসাধারণের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইলেও সে দেশে এখনও পর্যন্ত পূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে যুক্তি—Arguments for Socialism

সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে প্রথম যুক্তি হইল যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শুধুমাত্র মালিক শ্রেণীর স্বার্থের জন্য রাষ্ট্র পরিচালিত হয়, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকল শ্রেণীর বিশেষ করিয়া বিত্তহীন শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য রাষ্ট্র পরিচালিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার ভিত্তিতে উৎপাদন-কার্য পরিচালিত হইবে। সুতরাং অপচয় বন্ধ হইয়া প্রয়োজন অনুসারে উৎপাদন হইবে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদন পরিচালিত হয়, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোগ-ব্যবহারের উদ্দেশ্যে উৎপাদন পরিচালিত হইবে। সুতরাং উৎপাদিত দ্রব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইবে। তৃতীয়তঃ, মানুষ সমাজে বাস করে, সুতরাং সমষ্টিগত স্বার্থের সহিত তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা সমষ্টিগত স্বার্থের উৎকর্ষ-সাধনের মধ্য দিয়াই ব্যক্তিগত স্বার্থের উন্নয়ন সম্ভব। চতুর্থতঃ, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ যদি ভয় ও অভাব-মুক্ত না হইতে পারে, তাহা হইলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আয়ের বৈষম্য দূর করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে তাহার জীবিকা অর্জনে সাহায্য করে। অভাবমুক্ত হইলে মানুষ অভিরুচি অনুযায়ী তাহার ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথ বাছিয়া লইতে পারে।

বিপক্ষে যুক্তি—Arguments against Socialism

এই মতবাদের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হইল সে, এই মতবাদে রাষ্ট্রকে সর্বশক্তিমান বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান নহে। রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলেই সব কাজ করিতে পারে না। রাষ্ট্রের কর্মক্ষমতারও একটা সীমা আছে এবং এই সীমার অতিরিক্ত হইলে রাষ্ট্রের অক্ষমতা প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়তঃ, অত্যধিক রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে ব্যক্তিগত উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা নষ্ট নয়। ইহার ফলে ব্যক্তি স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হইতে পারে না; ব্যক্তিগত জীবন ব্যক্তিগত অভিরুচি অনুযায়ী পরিচালিত না হইয়া সকল ক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয়, তাহা হইলে সমগ্র সমাজ-জীবন বৈচিত্র্যবিহীন হইয়া নিয়মানুবর্তী দৈনিক

জীবনে পরিণত হইবে। চতুর্থতঃ, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য মানুষের মধ্যে যে পরিমাণ সমাজচেতনা ও পরার্থপরতা থাকা আবশ্যক, কার্যতঃ মানুষ ততটা পরার্থপর নহে। পরিশেষে বলা যায় যে, এই ব্যবস্থায় অযোগ্যতা, কর্ম-বিমুখতা ও পরনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। অপর পক্ষে বুদ্ধিমত্তা, কর্মক্ষমতা ও আত্ম-নির্ভরশীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ নষ্ট হয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদক হওয়া অপেক্ষা কপর্দকশূন্য হওয়া ভাল (Better to be a pauper than to be a producer), কারণ দরিদ্র হইলেই রাষ্ট্রের সাহায্য পাওয়া যায়, আর ধনী হইলে কর দিতে হয়।

আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যকলাপের পরিধি—Proper Sphere of the Modern State

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের গুণাগুণ আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, রাষ্ট্রের কাজ শুধু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী বা শুধু সমাজতন্ত্রবাদী মতের দ্বারা পরিচালিত হয় না। রাষ্ট্র শুধু পুলিশের ও সৈনিকের কাজ করিবে, আর কিছুই করিবে না ইহা যেমন সত্য নহে, আবার রাষ্ট্র সব কিছুই করিবে তাহাও সত্য নহে। তবে আধুনিক কালে পুলিশি রাষ্ট্রের ধারণা পরিবর্তিত হইয়া মানুষের মনে কল্যাণ-রাষ্ট্রের ধারণা জন্মিয়াছে। তাই আধুনিক কালের অধিকাংশ রাষ্ট্রই সম্পূর্ণ-রূপে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে পরিচালিত না হইলেও জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে নানাবিধ গঠনমূলক কার্য স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে। আধুনিক রাষ্ট্রগুলি খনি রেলপথ ও অন্যান্য যোগাযোগ-ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-পরিচালনা প্রভৃতি জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপার-গুলির ভার গ্রহণ করিয়াছে। যুদ্ধাস্ত্র-নির্মাণ, অহিফেন ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য-উৎপাদনের একচেটিয়া অধিকার রাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছে। বর্তমান রাষ্ট্রগুলি শ্রমিক ও অন্যান্য দরিদ্র শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বৃদ্ধবয়সের ভাতা, কল-কারখানা ও প্রজাতন্ত্র-সংক্রান্ত নানাবিধ আইন প্রণয়ন করিতেছে। ইহা ছাড়া, সমাজ-ব্যবস্থার সংস্কারের উদ্দেশ্যে আধুনিক অনেক রাষ্ট্রই নানাবিধ আইন প্রবর্তন করিতেছে। ভারত সরকার অস্পৃশ্যতা-বর্জন, বাল্যবিবাহ নিরোধ প্রভৃতি নানাবিধ সমাজ-উন্নয়নমূলক বিধিনিষেধ প্রবর্তন করিয়াছেন। সুনাগরিক সৃষ্টি করিতে হইলে নাগরিক জীবনের নৈতিক মান উন্নয়ন করা একান্ত আবশ্যক। এইজন্যই আধুনিক রাষ্ট্রগুলি সমাজব্যবস্থায় বাল্যবিবাহ, মদ্যপান, অশিক্ষা, প্রভৃতি প্রগতি-বিরুদ্ধ যে সমস্ত কুপ্রথাগুলি প্রচলিত আছে, সেগুলি আইনের দ্বারা দূর করিয়া প্রগতিমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে।

মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর রাষ্ট্রের এই হস্তক্ষেপ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ফ্যাসীবাদী বা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও ধনতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রগুলিতেও এই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাত্রা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশগুলিতে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা ধীরে ধীরে রাষ্ট্রায়ত্তের অধীন হইতেছে। সুতরাং পূর্বের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী মতবাদ যে পরিত্যক্ত হইতে চলিয়াছে, এ বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নাই।

সরকারের কার্যাবলী—Functions of Government

সরকার সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর কার্য করে। প্রথম শ্রেণীর কার্যকে একান্ত প্রয়োজনীয় বা অপরিহার্য কার্য বলা হয়, কারণ এই কার্যগুলি না করিলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে এই কার্যগুলি করিতে হয়। অন্য কার্যগুলি না করিলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বা নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হয় না বটে, তবে প্রায় সব রাষ্ট্র এই ধরণের কাজ করিয়া থাকে, কারণ এই কাজগুলি কোন ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা সম্ভব হয় না। এইজন্য এই ধরণের কাজগুলিকে ইচ্ছাধীন কার্য বলা হয়। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদিগণ রাষ্ট্রের এই স্বেচ্ছামূলক কার্যগুলিকে রাষ্ট্র-কর্তব্য বলিয়া মনে করেন না।

অবশ্যকরণীয় বা অপরিহার্য কার্য—Essential functions

১। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করা প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রাথমিক বা অবশ্য কর্তব্য। নতুবা কোন রাষ্ট্রই বাঁচিতে পারে না।

২। পররাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া নিজ অস্তিত্ব নিরাপদ রাখা।

৩। পারিবারিক সম্পর্ক অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে আইনগত সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া পারিবারিক জীবন স্থিতিশীল রাখাও বর্তমান রাষ্ট্রগুলির অবশ্যকরণীয় বলিয়া বিবেচিত হয়।

৪। মুদ্রাব্যবস্থা-নিয়ন্ত্রণ ও নির্দিষ্ট পরিমাপের (ওজন) ব্যবস্থা করা। নতুবা বিনিময় ও ব্যবসায় চলিতে পারে না।

৫। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা, উত্তরাধিকার, নাগরিকত্ব গ্রহণ ও বর্জন নিয়ন্ত্রণ করা।

ইচ্ছামূলক কার্য—Non-essential or Optional functions

রাষ্ট্র যে কাজগুলি প্রয়োজন অনুসারে করে, সেগুলিকে ইচ্ছামূলক কার্য বলা হয়। এই ইচ্ছামূলক কার্যগুলির মধ্যে (১) কতকগুলি শিল্প ও ব্যবসায়ের পরিচালনা অনেক রাষ্ট্র স্বহস্তে গ্রহণ করে। অহিফেন প্রভৃতি মাদক দ্রব্য, তামাক, রেলপথ, প্রভৃতি অনেক শিল্পব্যবসায় রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করে।

(২) আবার অনেক সময় রাষ্ট্র শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য স্বহস্তে গ্রহণ না করিয়া সেগুলিকে নানা বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

(৩) শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্র শ্রমিক-কল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন করে। স্ত্রীলোক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র অনেক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে।

(৪) জনসাধারণের সুবিধার জন্য ডাক, তার, টেলিফোন ও বেতার-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে।

(৫) পূর্ত-কার্য, রাস্তাঘাট-নির্মাণ, স্বাস্থ্য-রক্ষা, কৃষির উন্নতি, ট্রাম, বাস প্রভৃতি পরিবহন-ব্যবস্থা, গ্যাস ও বিদ্যুৎ-সরবরাহ এবং সর্বোপরি শিক্ষাবিস্তারকার্যে আধুনিক রাষ্ট্রগুলি বিশেষ তৎপর হইয়াছে।

(৬) দরিদ্র, অসহায়, বৃদ্ধ, পঙ্গু ও বেকার লোকদের সাহায্যদান প্রভৃতি কার্যগুলিও বর্তমান রাষ্ট্র স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে।

সুতরাং আধুনিক রাষ্ট্রের অপরিহার্য কার্য ও ইচ্ছামূলক কার্যের মধ্যে সীমারেখা ক্রমশঃই বিলীন হইয়া যাইতেছে।

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্রের কার্যাবলী

রাষ্ট্রের কর্তব্য সম্পর্কে দুইটি মতবাদ প্রচলিত আছে। একটি হইল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ, অপরটি হইল সমাজতন্ত্রবাদ।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদিগণ রাষ্ট্রের ক্ষমতা একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়া ব্যক্তিগত অবাধ স্বাধীনতা প্রবর্তন করিবার পক্ষপাতী। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্র শুধু অপরাধ নিবারণ করিবে, মানুষের অন্যবিধ উন্নতির জন্য কোনরূপ প্রচেষ্টা করিবে না।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে যুক্তি

১। মানুষ নিজের ভাল নিজে বুঝে, সুতরাং রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশে বাধা দেয়। ২। অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে যোগ্যতম টিকিয়া থাকে, দুর্বল অপসারিত হয়। ৩। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইয়া ক্রেতার সুবিধা হয়। ৪। রাষ্ট্র মানুষের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধনে অসমর্থ।

বিপক্ষে যুক্তি

১। মানুষ সব সময়ে তাহার স্বার্থ-সম্পর্কে সজাগ নহে, এজন্য রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। ২। রাষ্ট্র না থাকিলে আইন-শৃঙ্খলা থাকে না এবং আইন-শৃঙ্খলার অবর্তমানে প্রকৃত ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। ৩। রাষ্ট্র-প্রচেষ্টার দ্বারা সমান সুযোগ-সুবিধা পাইলে প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার অভিরুচি অনুযায়ী ব্যক্তিত্ব বিকাশ করিতে পারে। ৪। রাষ্ট্র ছাড়া সমষ্টিগত স্বার্থের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে না।

সমাজতন্ত্রবাদ

এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রকে মানুষের একটি পরম হিতকর প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করা হয়। সমাজতন্ত্রবাদিগণ বলেন, একমাত্র রাষ্ট্রপ্রচেষ্টা দ্বারাই মানব-জীবনের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সম্ভবপর। তাই তাহারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী।

সমাজতন্ত্রবাদের প্রকারভেদ

সমাজতন্ত্রবাদ বর্তমানে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহার মধ্যে **মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ** পৃথিবীতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। শ্রেণী-সংগ্রামের সাহায্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করিয়া সাম্যের ভিত্তিতে এক শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করাই হইল মার্কসের মতবাদের উদ্দেশ্য। ইহা ছাড়া, রাষ্ট্রপ্রধান সমাজতন্ত্রবাদ, অ-রাষ্ট্রতন্ত্রী সমাজতন্ত্রবাদ, সমিতি-প্রধান সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ প্রভৃতি সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। রুশিয়ায় সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে যুক্তি

১। সমাজতন্ত্রবাদ মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর সুবিধার পরিবর্তে সকল শ্রেণীর

সুবিধা প্রতিষ্ঠা করে। ২। প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার সাহায্যে অর্থনৈতিক জীবনের গণতান্ত্রিক আদর্শ কার্যকরী করে। ৩। সমষ্টিগত উন্নতির দ্বারা ব্যক্তিগত উন্নতির ব্যবস্থা করে। ৪। আয়-বৈষম্য হ্রাস করিয়া সাম্য প্রতিষ্ঠা করে।

বিপক্ষে যুক্তি

১। রাষ্ট্রও ভুল করিতে পারে, সুতরাং রাষ্ট্রদ্বারা সব কাজ সম্ভব নয়। ২। ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকিলে ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টার অনুপ্রেরণা নষ্ট হয়। ৩। এই ব্যবস্থায় মানুষ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সুযোগ পায় না। ৪। রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণের ফলে মানুষ কর্মবিমুখ হয়।

আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যকলাপের পরিধি

বর্তমানে জনকল্যাণ-সাধনই রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। তাই আজ অতীতের পুলিশি-রাষ্ট্র কল্যাণ-রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং জনকল্যাণের জন্য যাহা অপরিহার্য, তাহা রাষ্ট্রের অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। মানুষের সামাজিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করিবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার সব কিছুই রাষ্ট্র করিতে পারে। এদিক দিয়া রাষ্ট্রের কার্যকলাপের কোন সীমারেখা স্থির করা সম্ভব নহে।

সরকারের কার্যাবলী

সরকারের কার্যাবলী দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা অপরিহার্য কার্য ও ইচ্ছামূলক কার্য। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য অপরিহার্য কার্যগুলি করিতে হয়। অন্য কার্যগুলি রাষ্ট্র প্রয়োজন অনুসারে করে।

অপরিহার্য কার্য

১। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধ করা। ২। পর-রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করা। ৩। পারিবারিক সম্পর্ক স্থির করা ও ৪। মুদ্রা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা—অপরিহার্য কার্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

ইচ্ছামূলক কার্য

১। শিল্প-ব্যবসায় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা। ২। শ্রমিক স্বার্থ রক্ষা করা। ৩। জনসাধারণের সুবিধা সৃষ্টি করা। ৪। দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিগণের সাহায্য করা—ইচ্ছামূলক কার্যের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. State and explain the Socialist theory about the functions of Government.
H. S. (Hu.) Comp. 1960

সরকারের কার্যকলাপ সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা কর।

উঃ—সরকারের কার্যকলাপ সম্পর্কে যে সমস্ত মতবাদ প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদ একটি শক্তিশালী মতবাদ বলিয়া বর্তমান যুগে পরিগণিত হয়। অত্যধিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের ফলে যে পুঁজিবাদের (Capitalism) আবির্ভাব হয় তাহারই প্রতিবাদস্বরূপ সমাজ-তন্ত্রবাদের আবির্ভাব হয়। সমাজতন্ত্রবাদের মূল কথা হইল রাষ্ট্রের কর্মপরিধি সীমাহীন। রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র শুধু পুলিশি কার্যে সীমাবদ্ধ নয়, পরন্তু সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অবাধ কর্তৃত্ব বাঞ্ছনীয়। সাধারণের কল্যাণ সাধনের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহার সব কিছুই রাষ্ট্র করিবে।

সমাজতন্ত্রবাদিগণ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। তাঁহারা বলেন দেশের যাবতীয় ধনোৎপাদনের উৎস, যথা, জমি, খনি, শিল্প, কল-কারখানা, রেল, ডক, জাহাজ, পোষ্ট, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতি এবং ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, সর্বপ্রকার বাণিজ্য প্রভৃতির মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হইবে। প্রত্যেক মানুষ রাষ্ট্রের কর্মী হিসাবে তাহার গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে কাজ করিবে এবং আপন প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগ্যবস্তু পাইবে। সমগ্র সামাজিক জীবন অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত রাখিবার জন্য রাষ্ট্র দেশের নিরাপত্তা, শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা জনসেবা পরিচালনা করিবে।

এই ব্যবস্থার ফলে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য দূর হইয়া সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ফলে যে ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতা হয়, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা তাহা দূর করিয়া তৎ পরিবর্তে মানুষের মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টি করিয়া সমষ্টির তথা সমষ্টির অংশ ব্যক্তির উন্নতি সাধনে সাহায্য করিবে।

2. State the functions of a modern government. Would you regard India as a modern State according to this concept ? H. S. (Com.) 1960.

আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যকলাপ বর্ণনা কর। কার্যকলাপের ধারণা অনুসারে কি ভারতকে আধুনিক রাষ্ট্র বলা যাইতে পারে ?

উঃ—আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যকলাপগুলিকে অপরিহার্য ও ইচ্ছামূলক—এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যে সমস্ত কাজ না করিলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকে না, সেগুলিকে অপরিহার্য বা অবশ্যকরণীয় কার্য বলা হয়, আর যে কাজগুলি জনহিতকর হইলেও রাষ্ট্র করিতেও পারে, আবার নাও করিতে পারে, সেগুলিকে ইচ্ছামূলক কার্য বলা হয়।

দেশরক্ষা ও সেই উদ্দেশ্যে সশস্ত্রবাহিনী রাখা, পুলিশবাহিনীর সাহায্যে আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং বিচারালয় সাহায্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা হইল প্রধান প্রধান অপরিহার্য কার্য।

নানাবিধ জনহিতকর কার্য, যথা, শিল্প-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ, পূর্ত-কার্য, স্বাস্থ্যোন্নতি, শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি হইল ইচ্ছামূলক কার্য।

বর্তমান যুগের কল্যাণ রাষ্ট্রের পক্ষে সামাজিক হিতসাধনের সহায়ক সব কাজই অপরিহার্য কাজ বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং অপরিহার্য ও ইচ্ছামূলক কাজের আর কোন পার্থক্য করা চলে না।

ভারতকে সব দিক দিয়াই আধুনিক রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। দেশের নিরাপত্তা ও আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর উত্তম ব্যবস্থা এদেশে রহিয়াছে। ন্যায় বিচার-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে সুপ্রিম কোর্ট হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামের ন্যায় পঞ্চায়েৎ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ কাজও অনেক রাজ্যে আরম্ভ হইয়াছে। বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, জমিদারী প্রথা, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি সমাজ-বিরোধী বহু পুরাতন প্রথা ভারত সরকার নিরোধ করিয়াছেন। পর পর তিনটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে ভারত সরকার কৃষি, ক্ষুদ্র-বৃহৎ শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, যোগাযোগ, পরিবহন প্রভৃতি ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া দেশের দুর্গত অর্থনৈতিক অবস্থা দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ভারত সরকারের কার্যাবলীর উদ্দেশ্য হইল সমাজ-ব্যবস্থা হইতে অসাম্য দূর করিয়া সকলের জন্য হিতকর কর্ম সংস্থানের সাহায্যে সমাজ-ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে পুনর্গঠন করা। দেশের চরম দুর্গত অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিচার করিলে বলিতে হয় যে, ভারত সরকার এখনও পর্যন্ত ভারতকে সম্পূর্ণরূপে কল্যাণ-রাষ্ট্রে রূপায়িত করিতে সমর্থ হন নাই। তথাপি ভারত সরকার আজ পর্যন্ত যাহা করিয়াছেন, একটি নবগঠিত সরকারের পক্ষে তাহা কৃতিত্বের পরিচায়ক বলিতে হইবে। সুতরাং ভারতকে আধুনিক অন্যান্য রাষ্ট্রের সমপর্যায়ভুক্ত বলা যাইতে পারে।

8. Describe briefly the functions of a modern state. H. S. (Com.) 1964

বর্তমান রাষ্ট্রের কার্যাবলী সংক্ষেপে বিবৃত কর।

উঃ—সরকার সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর কার্য করে। প্রথম শ্রেণীর কার্যকে একান্ত প্রয়োজনীয় বা অপরিহার্য কার্য বলা হয়, কারণ এই কার্যগুলি না করিলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে এই কার্যগুলি করিতে হয়। অন্য কার্যগুলি না করিলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বা নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হয় না বটে, তবে প্রায় সব রাষ্ট্র এই ধরণের কাজ করিয়া থাকে, কারণ এই কাজগুলি কোন ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা সম্ভব হয় না। এইজন্য এই ধরণের কাজগুলিকে ইচ্ছাধীন কার্য বলা হয়। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদিগণ রাষ্ট্রের এই স্বেচ্ছামূলক কার্যগুলিকে রাষ্ট্র-কর্তব্য বলিয়া মনে করেন না।

অবশ্যকরণীয় বা অপরিহার্য কার্য—Essential Functions

১। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করা প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রাথমিক বা অবশ্য কর্তব্য। নতুবা কোন রাষ্ট্রই বাঁচিতে পারে না।

২। পররাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া নিজ অস্তিত্ব নিরাপদ রাখা।

৩। পারিবারিক সম্পর্ক অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে আইনগত সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া পারিবারিক জীবন স্থিতিশীল রাখাও বর্তমান রাষ্ট্রগুলির অবশ্যকরণীয় বলিয়া বিবেচিত হয়।

৪। মুদ্রাব্যবস্থা-নিয়ন্ত্রণ ও নির্দিষ্ট পরিমাপের (ওজন) ব্যবস্থা করা। নতুবা বিনিময় ও ব্যবসায় চলিতে পারে না।

৫। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা, উত্তরাধিকার, নাগরিকত্ব গ্রহণ ও বর্জন নিয়ন্ত্রণ করা।

ইচ্ছামূলক কার্য—Non-essential or Optional Functions

রাষ্ট্র যে কাজগুলি প্রয়োজন অনুসারে করে, সেগুলিকে ইচ্ছামূলক কার্য বলা হয়। এই ইচ্ছা-মূলক কার্যগুলির মধ্যে (১) কতকগুলি শিল্প ও ব্যবসায়ের পরিচালনা অনেক রাষ্ট্র স্বহস্তে গ্রহণ করে। অহিফেন প্রভৃতি মাদক দ্রব্য, তামাক, রেলপথ প্রভৃতি অনেক শিল্পব্যবসায় রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করে।

(২) আবার অনেক সময় রাষ্ট্র শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য স্বহস্তে গ্রহণ না করিয়া সেগুলিকে নানা বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

(৩) শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্র শ্রমিক-কল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন করে। স্ত্রীলোক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র অনেক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে।

(৪) জনসাধারণের সুবিধার জন্য ডাক, তার, টেলিফোন ও বেতার-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে।

(৫) পূর্ত-কার্য, রাস্তাঘাট-নির্মাণ, স্বাস্থ্য-রক্ষা, কৃষির উন্নতি, ট্রাম, বাস প্রভৃতি পরিবহন-ব্যবস্থা গ্যাস, ও বিদ্যুৎসরবরাহ এবং সর্বোপরি শিক্ষাবিস্তার-কার্যে আধুনিক রাষ্ট্রগুলি বিশেষ তৎপর হইয়াছে।

(৬) দরিদ্র, অসহায়, বৃদ্ধ, পঙ্গু ও বেকার লোকদের সাহার্য্যদান প্রভৃতি কার্যগুলিও বর্তমান রাষ্ট্র স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে।

সুতরাং আধুনিক রাষ্ট্রের অপরিহার্য কার্য ও ইচ্ছামূলক কার্যের মধ্যে সীমারেখা ক্রমশঃই বিলীন হইয়া যাইতেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

নাগরিকতা

(Citizenship)

নাগরিক সংজ্ঞা—Definition of a Citizen

সাধারণ অর্থে নগরের অধিবাসীকে নাগরিক বলা হয়। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি শহরে যাহারা বাস করে তাহাদের ঐ শহরের নাগরিক বলা হয় ও নাগরিক হিসাবে তাহারা কতকগুলি সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয়। কিন্তু বর্তমান যুগে 'নাগরিক' শব্দটি এক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। নাগরিক শব্দটির প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন গ্রীক ও রোমকগণ নাগরিক শব্দটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রে বাস করিতেন। এই নগর-রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীই নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইত না। যে সমস্ত অধিবাসীর প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে যোগদান করিবার যোগ্যতা ও অপর্যাপ্ত সময় ছিল, তাহাদিগকেই নাগরিক আখ্যা দেওয়া হইত। সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্র-পরিচালনাকার্যে অংশ গ্রহণ করিবার যোগ্যতাই ছিল নাগরিকত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বর্তমানকালে নাগরিক শব্দের ব্যবহার আর ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নাই। বর্তমান রাষ্ট্রগুলি প্রাচীন নগর-রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা আয়তনে ও জনসংখ্যায় বহুগুণ বৃহত্তর। নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইতে গেলে আর পূর্বের মতন কোন ব্যক্তির বিশেষ কোন যোগ্যতারও প্রয়োজন হয় না। কোন রাষ্ট্রের সদস্য হইলেই তাহাকে বর্তমানে নাগরিক বলা হয়। যে লোক একটি রাষ্ট্রে স্থায়িভাবে বাস করিয়া সেই রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইয়াছে তাহাকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলা হয়। নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিই রাষ্ট্রের সদস্যরূপে কতকগুলি সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয় এবং অন্যদিকে তাহাকে কতকগুলি কর্তব্য সম্পাদন করিতে হয়। সুতরাং বর্তমান রাষ্ট্র তাহার নাগরিকদের নিকট হইতে সক্রিয়ভাবে কোন কর্তব্যপালনের দাবী করে না। কিন্তু তাই বলিয়া যদি এ কথা মনে করা যায় যে, বর্তমান নাগরিকগণ শুধু কতকগুলি সুযোগ-সুবিধার অধিকারী, রাষ্ট্রসম্পর্কে

তাহাদের কোনরূপ কর্তব্য-সম্পাদনের বাধ্যবাধকতা নাই তাহা হইলে মারাত্মক ভুল হইবে। জনসমষ্টি লইয়াই রাষ্ট্র গঠিত হয়। প্রত্যেকটি লোক রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং রাষ্ট্রের উন্নতিসাধন করিয়া উন্নততর সমাজ-জীবন প্রবর্তনের জন্য প্রত্যেক নাগরিকেরই তৎপর হওয়া প্রয়োজন। সমষ্টিগত জীবন যাহাতে রাষ্ট্রের মাধ্যমে একটা আদর্শস্তরে উন্নীত হইতে পারে, সেইজন্য প্রত্যেক নাগরিকই এরূপভাবে তাহার ব্যক্তিগত কার্যকলাপ পরিচালিত করিবে যাহাতে ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়েরই মঙ্গল সাধিত হয়। সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপে যোগদান না করিলেও প্রত্যেক নাগরিকেরই কিছু পরিমাণে ক্রিয়াশীল থাকা চাই। প্রত্যেক নাগরিকই তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিয়া সমষ্টিগত জীবনকে উন্নততর করিবার জন্য যত্নবান হইবে। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নাগরিকতা হইল ব্যক্তির মধ্যে কতকগুলি গুণের সমাবেশ—যে সমাবেশে সমাজ-জীবন সহজ ও সুগম হয়। এইজন্য অধ্যাপক ল্যাস্কি নাগরিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, নাগরিকতার সারমর্ম হইল—সাধারণের হিতার্থে ব্যক্তির শিক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত মার্জিত বুদ্ধির প্রয়োগ। (Citizenship "is the contribution of one's instructed judgment to public good.") সমাজের প্রত্যেক নাগরিক এইরূপভাবে তাহার চিন্তাধারা ও কার্যাবলী পরিচালিত করিবে যাহাতে জনকল্যাণ সাধিত হয়। এইজন্য অবশ্য প্রত্যেক নাগরিকেরই উপযুক্ত শিক্ষা পাওয়া চাই।

নাগরিক ও বিদেশী—Citizen and Alien

নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। বিদেশী ভিন্ন দেশবাসী ও ভিন্ন রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে। যে দেশে বিদেশী কার্যব্যপদেশে সাময়িকভাবে বাস করে, সে দেশের সাধারণ বিধি-নিষেধ তাহাকে মানিতে হয় ও সেই দেশের প্রবর্তিত করও তাহাকে দিতে হয়। বিদেশী কতকগুলি পৌর অধিকার ভোগ করিলেও তাহার কোন রাজনৈতিক অধিকার জন্মে না, বা সে দাবী করিতে পারে না। বিদেশীকে অসদাচরণের জন্য দেশ হইতে বহিষ্কার করা যায়। কিন্তু বিদেশীকে বলপূর্বক যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য করা যায় না। বিদেশী সাময়িকভাবে যে দেশে বাস করে সে দেশ পরিত্যাগ করিলে তাহার জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা সম্বন্ধে সে রাষ্ট্রের আর কোন দায়িত্ব থাকে না। কিন্তু নাগরিক জীবন সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয়। নাগরিক স্বদেশেই থাকুক আর বিদেশেই থাকুক,

সর্বত্রই তাহার নিজ রাষ্ট্র তাহার নিরাপত্তা রক্ষা করে। নাগরিক পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পূর্ণভাবে ভোগ করে ও নাগরিক জীবনের সমস্ত দায়িত্ব—এমন কি প্রয়োজন হইলে যুদ্ধে যোগদান—তাহাকে পালন করিতেই হইবে।

নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি—How citizenship is acquired

নাগরিক অধিকার দুই উপায়ে পাওয়া যায় :—প্রথম, জন্মাধিকারে এবং দ্বিতীয়, অর্জনের দ্বারা। জন্মাধিকার দুই প্রকার—একটি হইল রক্তগত অধিকার (*Jus Sanguinis*), অপরটি হইল জন্মভূমিগত অধিকার (*Jus Soli*)। প্রথমোক্ত নীতি অনুযায়ী কোন ব্যক্তির জন্মকালে তাহার পিতা যে দেশের নাগরিক ছিলেন সে সেই দেশের নাগরিক হইবে, তাহার জন্মস্থান যে-কোন দেশেই হউক না কেন। ভারতীয় পিতামাতার সন্তান পৃথিবীর যে-কোন দেশে জন্মগ্রহণ করুক না কেন ভারতীয় বলিয়া পরিগণিত হইবে। দ্বিতীয় নিয়মানুসারে যদি কোন ভারতীয় পিতামাতার সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করে তাহা হইলে সে সন্তান তাহার পিতামাতা ভারতীয় হওয়া সত্ত্বেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই নিয়মে জন্মভূমি বিচার করিয়া নাগরিকত্ব স্থির হয়।

যদি কোন রাষ্ট্র একই সঙ্গে এই উভয় নীতি প্রয়োগ করিয়া নাগরিকত্ব স্থির করে, তাহা হইলে একই ব্যক্তি একই সময়ে দুইটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া কথা উঠিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পিতামাতার সন্তান পৃথিবীর যে-কোন দেশে জাত হউক না কেন রক্তগত অধিকারের ভিত্তিতে তাহাকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হয়। অপরপক্ষে ভিন্ন দেশের পিতামাতার সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাত হইলে ভূমিগত অধিকারের বলে তাহাকেও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া দাবী করা হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে নাগরিক সাবালক হইয়া এক দেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করিয়া নিজ ইচ্ছানুসারে অন্য দেশের নাগরিক হইতে পারে।

স্ত্রীলোকগণ বিবাহের দ্বারা তাহাদের স্বামীর নাগরিকত্ব পায়। বৈবাহিক সম্বন্ধ ছাড়াও ভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারের অধীনে চাকুরী লইয়া, বহুদিন অপর রাষ্ট্রে বসবাস করিয়া বা ভিন্ন রাষ্ট্রে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া ও সামরিক বাহিনীতে যোগদান করিয়া নূতন নাগরিকের অধিকার পাওয়া যায়।

সকল রাষ্ট্রই বিদেশীর উপর নাগরিকত্ব অর্পণ করে। এইরূপে কোন দেশের জন্মগত নাগরিক যদি ভিন্ন রাষ্ট্রে অর্পিত নাগরিকত্ব অর্জন করে, তাহা হইলে

তাহাকে অর্জিত নাগরিকত্ব (Naturalized citizenship) বলা হয়। বিবাহ, সম্পত্তি-ক্রয় বা সেনাবিভাগে যোগদান—সবগুলি উপায়ই হইল নাগরিক অধিকার অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি, কিন্তু এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে অর্পিত নাগরিকত্ব একটি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিতে হইলে বিদেশীকে কতকগুলি শর্ত পালন করিতে হয়। বিদেশী যে রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে ইচ্ছুক সে রাষ্ট্রের নিয়মানুযায়ী বিদেশীর সে দেশে একটি নির্দিষ্ট সময় বসবাস করিতে হয় ও তাহাকে সৎস্বভাবাপন্ন বলিয়া প্রমাণিত করিতে হয়। সে দেশের ভাষাভাষী হওয়ারও অনেক সময় প্রয়োজন হয়। এই শর্তগুলি পূরণ হইলে রাষ্ট্র ইহার ইচ্ছামত বিদেশীর উপর নাগরিকত্ব প্রদান করিতে পারে। এইরূপে নাগরিকত্ব অর্জন করিতে হইলে বিদেশীকে আবেদন করিতে হইবে এবং কোন বিচারালয় বা শাসনবিভাগীয় উচ্চতর কর্তৃপক্ষ ঐ আবেদন বিবেচনা করিয়া নাগরিকত্ব প্রদান সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করে।

এইরূপে নাগরিকত্ব অর্জিত হইলে বিদেশীও সেই দেশের জাত নাগরিকদের সমপর্যায়ভুক্ত হইয়া নাগরিক অধিকার ও বাধ্যবাধকতার দ্বারা আবদ্ধ হয়। সাধারণতঃ এই দুই শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি কয়েকটি দেশ কোন বিদেশী যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিলেও তাহাকে সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করে না। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির পদ জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব-প্রাপ্ত নাগরিক ব্যতীত অন্য কোন নাগরিক পাইতে পারে না।

নাগরিক অধিকারের বিলুপ্তি—Loss or Termination of Citizenship

নূতন নাগরিকত্ব অর্জন করিলে পূর্ব-নাগরিকত্বের অবসান ঘটে। বিবাহের দ্বারা স্ত্রীলোকের পূর্ব-নাগরিকত্ব নষ্ট হয়। অপর দেশে জমি খরিদ বা বিদেশী সরকারের চাকুরীগ্রহণ, দীর্ঘকাল স্বদেশে অনুপস্থিতি, বা গুরুতর অপরাধে স্বদেশ হইতে বহিষ্কার, প্রভৃতি কারণে নাগরিক অধিকারের বিলুপ্তি ঘটিতে পারে।

সু-নাগরিকের গুণ—Qualities of a good Citizen

নাগরিক জীবনের চরম সার্থকতা নির্ভর করে ব্যক্তিগত জীবনে কতকগুলি গুণের সমাবেশে। যে গুণগুলি থাকিলে সু-নাগরিক হওয়া যায়, সেগুলি হইল বুদ্ধিমত্তা, আত্মসংযম, বিচারবুদ্ধি ও সমাজচেতনা। নাগরিককে সকল সময়ে

নিজের অধিকার ও কর্তব্যসম্বন্ধে সমানভাবে সজাগ থাকিতে হইবে। অধিকার সম্বন্ধে অত্যধিক উৎসাহী আর কর্তব্যসম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হইলে নাগরিক জীবন কখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। সু-নাগরিক নিজের অধিকার-সম্বন্ধে যেরূপ সচেতন, অন্যের অধিকারসম্বন্ধেও তাহার অনুরূপ শ্রদ্ধাবান্ হওয়া উচিত। এইরূপ পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সম-সুখদুঃখবোধের দ্বারাই নাগরিক জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ইহার অভাবে নাগরিক জীবন আদর্শচ্যুত হইয়া ক্ষুদ্র দলাদলি ও কলহে লিপ্ত হইয়া উঠে।

পূর্ণ নাগরিক জীবনের অন্তরায়—Hidrances to good Citizenship

পূর্ণ নাগরিক জীবনের যে সকল অন্তরায় আছে, তন্মধ্যে উদাসীনতা (Indolence) হইল প্রধান। উদাসীনতার কারণ হইল কর্তব্যবোধের অভাব। নাগরিক জীবন যে শুধু কতকগুলি অধিকারের সমষ্টি নয়, একথা প্রত্যেক নাগরিকেরই স্মরণে রাখিতে হইবে। কি সাধারণ নাগরিক, কি সরকারী কর্মচারী প্রত্যেকেরই স্বীয় কর্তব্যসম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকিতে হইবে। সাধারণ নাগরিকের হয়ত অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বৃহৎ ও জটিল সমস্যাগুলির সমাধানে অংশ গ্রহণ করিবার যোগ্যতা না থাকিতে পারে; কিন্তু নিরপেক্ষভাবে ভোটদান করা, রাষ্ট্রের সাধারণ সমস্যাগুলির সমাধানে স্বাধীন মত ব্যক্ত করিয়া অংশ গ্রহণ করা, বা যুদ্ধের সময়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করিতে সাহায্য করা বিষয়ে কোন নাগরিকেরই উদাসীন থাকা উচিত নয়। নাগরিকেরা যদি তাহাদের মতামত ব্যক্ত করিয়া রাষ্ট্রপরিচালনা-কার্যে সাহায্য না করে, তাহা হইলে গণতন্ত্র একনায়কত্বে পরিণত হইয়া নাগরিক অধিকার পর্যন্ত ক্ষুণ্ণ করিতে পারে। আধুনিক গণতন্ত্র জনমত ও জনসহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জনগণ যদি এই সহযোগিতাপ্রদানে কার্পণ্য করে, তাহা হইলে রাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল হওয়া স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়তঃ, নাগরিকগণ যদি অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক হইয়া স্বার্থান্বেষণে ব্যস্ত থাকে তাহা হইলে এই স্বার্থপরতা (Private Self-interest) তাহাদের আদর্শ নাগরিক জীবনের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে। সমাজ-জীবনের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থকে বলি দিতে হইবে। নাগরিকগণ অনেক সময় যোগ্যতা বিচার না করিয়া আত্মীয়তা-বন্ধনের জন্য অথবা অর্থলোভে অযোগ্য লোক প্রতিনিধি নির্বাচন করে। সরকারী চাকুরীতেও অনেক সময়ে যোগ্যব্যক্তির

নিয়োগ না হইয়া ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য অযোগ্য লোক নিয়োগ করা হয়। এরূপ স্বার্থপ্রণোদিত কার্যের দ্বারা দেশের ও দশের অনিষ্ট করা হয়। এতদ্ব্যতীত দলগত রাজনীতি প্রবর্তিত হওয়ার ফলে দলীয় স্বার্থও (Party Spirit) নাগরিক জীবনের এক অভিশাপরূপে দেখা দিয়াছে। দলীয় স্বার্থ যখন প্রবল হইয়া দেখা দেয়, তখন জাতীয় স্বার্থ নষ্ট হয়। দলীয় স্বার্থের হানাহানিতে অনেক দেশে বৃহত্তর জনকল্যাণের পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়াছে। এই দলীয় স্বার্থের প্রাবল্যে আয়ারল্যাণ্ড, ভারত প্রভৃতি দেশ দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে।

ইহা ছাড়াও একটি দেশে সু-নাগরিকতার আরও অন্তরায় থাকিতে পারে। দেশে যদি জনকল্যাণমূলক সুচিন্তিত অভিমত প্রাধান্য লাভ করিতে না পারে, তাহা হইলে নাগরিকগণের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে না। এজন্য উচ্ছৃঙ্খল, দায়িত্বজ্ঞানহীন মতকে প্রতিরোধ করা আবশ্যক। এবিষয়ে দেশের সংবাদপত্র, প্রচার-পুস্তিকা প্রভৃতির গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে। চিন্তাশীল, বিচক্ষণ জননেতাগণ সভাসমিতি ও প্রচার-পুস্তিকার সাহায্যে সু-নাগরিক সৃষ্টিতে সাহায্য করিতে পারেন। দেশের নির্বাচন-পদ্ধতি যদি পক্ষপাতশূন্য না হয় তাহা হইলেও নাগরিকগণ রাজনৈতিক ব্যাপারে ক্রমশঃই উদাসীন হইয়া পড়েন।

অন্তরায়গুলির প্রতিকার—Remedies

পূর্ণ নাগরিক জীবনের অন্তরায়গুলিকে দূর করিতে পারিলে আদর্শ নাগরিক হওয়া যায়। লর্ড ব্রাইস্ এই সম্পর্কে দুইটি উপায়ের কথা বলিয়াছেন। প্রথম হইল, শাসন-ব্যবস্থার উৎকর্ষসাধন এবং দ্বিতীয় হইল জনসাধারণের জীবনযাত্রার নৈতিক মানের উন্নয়ন। শাসন-ব্যবস্থার উৎকর্ষসাধন বলিতে আমরা বুঝি প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভোটদানে বাধ্য করা, নাগরিকগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে আইন-প্রণয়ন, অল্প সময়ের ব্যবধানে প্রতিনিধি নির্বাচন, অবিশ্বস্ত বা অযোগ্য সরকারী কর্মচারীদের শাস্তিবিধান, ইত্যাদি। শাসন-ব্যবস্থায় এইগুলি বলবৎ করা হইলে লোকের উদাসীনতা, দলীয় মনোভাব ও স্বার্থপরতা অনেক পরিমাণে দূর হইয়া তাহাদিগকে রাষ্ট্রের কার্যপরিচালনায় সক্রিয় করিয়া তুলিবে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও অধিকতর প্রয়োজন হইল লোক-চরিত্রের উৎকর্ষসাধন করা। মানুষের মনে কর্তব্যবোধ জাগরিত করিতে হইবে। কর্তব্যবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া মানুষ যখন কাজ করে তখন তাহার দ্বারা মহৎ অনেক কিছু সম্ভব হয়। মানুষের মধ্যে কর্তব্যবোধ সঞ্চারিত করিবার জন্য চাই শিক্ষার প্রসার। এই শিক্ষার ফলে নাগরিকগণ সমস্ত

ক্ষুদ্রতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে উঠিয়া সমাজ-জীবনকে উন্নততর করিতে পারে। প্রকৃত শিক্ষা ফলপ্রসূ হইতে হয়ত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইতে পারে, কিন্তু শিক্ষার বীজ সমাজদেহে একবার প্রোথিত হইলে আজই হউক আর কালই হউক রাজনৈতিক জীবনে সোনার ফসল ফলাইবে। ভারতীয় জনগণের নৈতিক মান যে আজ এত নীচু হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ হইল প্রকৃত শিক্ষার অভাব।

অধিকার—Rights

সাধারণ অর্থে নাগরিক অধিকার বলিতে আমরা বুঝি নাগরিকের স্ব-ইচ্ছায় কিছু করিবার বা না-করিবার অবাধ ক্ষমতা। সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত এই নাগরিক অধিকার আর রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। তস্কর মনে করে চৌর্যবৃত্তিতে তাহার অধিকার আছে। কিন্তু সমাজ যদি তস্করের এই অধিকার স্বীকার করিয়া লয়, তাহা হইলে সমাজ-জীবন অচল হইয়া উঠিবে। তাই রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় তস্করের এই অধিকারকে অনধিকার বলা হয়। রাষ্ট্র তস্করের এই অধিকার স্বীকার করা দূরে থাকুক তাহা খর্ব করিয়া দেয়। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল আইনের দ্বারা সমাজে এরূপ পরিবেশের সৃষ্টি করা, যে পরিবেশে ব্যক্তির পূর্ণবিকাশ সম্ভব করিয়া সমষ্টিগত জীবনের উন্নতিসাধন করিতে পারা যায়। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে সকল অধিকার প্রয়োজন, সেগুলিকে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বলা হয়। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, অধিকার হইল মানুষের সামাজিক জীবনের সেই সকল ক্ষমতা, যেগুলির অভাবে মানুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। সুতরাং যে ক্ষমতাগুলি ব্যক্তির পূর্ণতা-প্রাপ্তির সহায়ক সেইগুলি প্রকৃত অধিকার, আর যেগুলি পূর্ণতাপ্রাপ্তির পথে অন্তরায় সেগুলিকে অধিকার বলিয়া স্বীকার করা যায় না। মানুষ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে এই অধিকারের দাবীতে। রাষ্ট্র এই অধিকারগুলি অক্ষুণ্ণ রাখে ও পরিবর্তে নাগরিকগণ রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে।

নাগরিক অধিকারের প্রকারভেদ—Classification of Rights

যে অধিকারগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় ও যেগুলি রাষ্ট্র আইন দ্বারা রক্ষা করে, সেইগুলিকে আইনগত অধিকার (Legal Rights) বলা হয়। এই আইনগত অধিকার ছাড়াও মানুষের কতকগুলি নৈতিক অধিকারের কথাও বলা হইয়া থাকে, যেমন বৃদ্ধ ও অক্ষম মাতাপিতা পুত্রের দ্বারা পালিত হইবেন—এই অধিকার তাঁহারা দাবী করিতে পারেন। কিন্তু এই অধিকার নীতিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা

ভঙ্গ করিলে আইনতঃ কেহ শাস্তি পায় না। সেইজন্য এগুলিকে নৈতিক অধিকার (Moral Rights) বলা হয়।

পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার

আইনগত অধিকারগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় ; যথা—পৌর অধিকার (Civil Rights) ও রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights)।

পৌর অধিকারগুলি মানুষের সভ্য জীবন যাপন করিবার পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এগুলির অভাবে মানুষ তাহার চরিত্রের পূর্ণবিকাশ করিতে সমর্থ হয় না। রাজনৈতিক অধিকারের দ্বারা মানুষ দেশের শাসন-পরিচালনা-কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

পৌর অধিকার—Civil Rights

নাগরিকগণের যে সমস্ত পৌর অধিকারের দাবী স্বীকৃত হইয়াছে, সেগুলির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

১। জীবন ধারণের অধিকার—Right to Life

এই অধিকারের অর্থ হইল যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে এবং রাষ্ট্র ব্যক্তির এই অধিকার পুলিশ, সামরিক ও বিচার-ব্যবস্থার সাহায্যে রক্ষা করিবে। তবে কেহ যদি অপরের প্রাণনাশ করে তাহা হইলে রাষ্ট্র ন্যায়-সঙ্গত বিচার করিয়া খুনীর ফাঁসির হুকুম দিতে পারে।

২। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার—Right to personal safety and freedom of movement

ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার ও গোপনীয়তা রক্ষা করিবার অধিকার আছে। একমাত্র আইনভঙ্গ করিলে আইনসম্মতভাবে ন্যায় বিচারের পর বন্দী করা ছাড়া রাষ্ট্র অন্য কোন প্রকারে ব্যক্তির এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবে না।

৩। কাজ করিবার ও সম্পত্তির অধিকার—Right to work and Property

প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মে নিযুক্ত হইতে পারিবে। রাষ্ট্র সকলের জন্যই কর্ম সংস্থান করিবে নতুবা বেকারগণকে ভাতা দিবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজস্ব স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ভোগ-দখল, বিনিময়,

দান বা হস্তান্তর করিতে পারিবে। তবে সাধারণ স্বার্থে রাষ্ট্র সম্পত্তির ভোগ-দখল ও বিনিময় নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

৪। চুক্তি করিবার অধিকার—Right to Contract

প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ ইচ্ছানুযায়ী সম্পত্তি বিনিময়ে ও ব্যবসায়-বাণিজ্য ব্যাপারে অপরের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে পারে। তবে বে-আইনী, শ্লীলতা হানিকর বা ধ্বংসাত্মক চুক্তি অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না।

৫। ধর্মাচরণের অধিকার—Right to Religion

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বিবেক ও বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মাচরণ করিতে পারিবে। তবে দেখিতে হইবে যে, একজনের ধর্মাচরণ অপরের ধর্মাচরণে যেন বাধা না দেয়।

৬। বাক্ স্বাধীনতা, সভা-সমিতি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা—Freedom of Speech and Press and Right to Public Meeting

স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও চিন্তার বিষয় ভাষায় ব্যক্ত করা ইহাই হইল মনুষ্যত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মানুষের চিন্তাধারার ক্রমাগত উৎকর্ষের ভাষায় যে অভিব্যক্তি হইয়াছে তাহারই ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে জগৎ সভ্যতা আজ সমৃদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং এই অধিকার ব্যক্তিত্ব বিকাশের একান্ত সহায়ক। মানুষের এই অধিকার না থাকিলে তাহার পক্ষে আত্মরক্ষা ও আত্মসমর্থন সম্ভব নয়। তাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সভা-সমিতি করিবার অধিকার গণতন্ত্রে অপরিহার্য বলিয়া গণ্য হয়। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাক্ স্বাধীনতা এরূপভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে যে, যাহাতে অন্যের সুনাম বা সামাজিক শালীনতা বোধ নষ্ট না হয় বা আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা না থাকে।

৭। শিক্ষার অধিকার—Right to Education

প্রত্যেক ব্যক্তিরই তাহার স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষা পাইবার অধিকার আছে। সভ্যদেশগুলিতে রাষ্ট্রকর্তৃক সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

৮। সংঘ গঠন করিবার অধিকার—Right to form association

মানুষের বহুমুখী জীবনের বৈচিত্র্যময় চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ রাষ্ট্রের মধ্যে নানাবিধ সংঘ গঠন করে। পরিবার, ক্রীড়াসংঘ, বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রমিকসংঘ প্রভৃতি হইল এই জাতীয় সংঘ। এই সংঘগুলি মানুষের চরিত্র বিকাশে সাহায্য করে। তাই এই অধিকারটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হয়।

উপরি-উক্ত অধিকারগুলি প্রত্যেক ব্যক্তিই আইনতঃ ও ন্যায়সঙ্গতভাবে দাবী করিতে পারে, কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই অধিকারগুলির

কোনটিই অবাধভাবে প্রয়োগ করা চলে না। প্রত্যেক অধিকারই কর্তব্যের গণ্ডির দ্বারা সীমায়িত। আমার বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে সত্য, কিন্তু আমি যদি অন্যের জীবননাশ করি তাহা হইলে আমার বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার হইতে আমি বঞ্চিত হইব। আমি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া যাহা সত্য বলিয়া মনে করি তাহা ব্যক্ত করিবার অধিকার আমার আছে ; কিন্তু আমার স্বাধীন মতামত এরূপ-ভাবে ব্যক্ত করিতে হইবে যাহাতে অন্যের মতামত প্রকাশের পথে অন্তরায় না হয়, বা অন্যের সুনাম নষ্ট না হয়, বা সমাজে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা না থাকে। সেরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র আমার এই স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার অধিকার হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতে পারে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থরক্ষাকল্পে সরকার অনেক সময় এই অধিকারগুলিকে সঙ্কুচিত করিতে পারে। যে অধিকারগুলি প্রয়োগের ফলে সমাজ-বিরোধী হিংসাত্মক কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হইতে পারে বা শান্তি-শৃঙ্খলাভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে, জনকল্যাণের জন্য সরকার সে অধিকারগুলিও খর্ব করিতে পারে।

বর্তমান যুগে নাগরিক অধিকার-সম্পর্কিত ধারণায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। অধিকার-সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল যে, কোন অধিকারই অবাধ বা সমাজ-নিরপেক্ষ নহে। এতদ্ব্যতীত আরও একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সর্বকালের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে এই অধিকারগুলির সংজ্ঞা নির্ণয় করা বা এইগুলির প্রয়োগের ক্ষেত্র স্থির করা যায় না। যেহেতু এই অধিকারগুলি একটা নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থায় স্বীকৃত ও সমর্থিত হয়, সেইহেতু সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সহিত অধিকারগুলিরও পরিবর্তন ঘটে। মানুষের শিক্ষার অধিকার বা জীবিকা অর্জনের অধিকার পূর্বে স্বীকৃতিলাভ করে নাই বা বর্তমান জগতে বহু দেশে এই অধিকারগুলি স্বীকৃত হয় নাই, কিন্তু কালের পরিবর্তনে বহুদেশে এই অধিকারগুলি স্বীকৃতি লাভ করিয়া মৌলিক অধিকারের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। সুতরাং অধিকারগুলি গতিশীল—স্থিতিশীল নহে।

মৌলিক অধিকার—Fundamental Rights

সকল অধিকার অবাধ, অসীম বা চিরন্তন না হইলেও মানুষের এমন কতকগুলি প্রাথমিক অধিকার আছে, যেগুলি ব্যক্তিত্ব বিকাশের অপরিহার্য অবস্থা বলিয়া সর্বদেশে স্বীকৃত হয় এবং এইজন্য এই অধিকারগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, স্বাধীন ধর্মমত পোষণ করিবার অধিকার প্রভৃতি এই পর্যায়ভুক্ত। বর্তমান যুগে এই

অধিকারগুলি সকল সভ্য দেশের রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে এবং এই অধিকারগুলি রক্ষার জন্য রাষ্ট্রগুলি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। এই অধিকারগুলি যাহাতে অন্য ব্যক্তি বা শাসনকর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতায় ব্যাহত না হয়, তজ্জন্য অনেক দেশে শাসনতন্ত্রে একটি অধিকারের সনদ (Bill of Rights) যোগ করা হয়। অধিকারের সনদে মানুষের এই প্রাথমিক অধিকারগুলি স্থান পায়। এই অধিকার-গুলিকে বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে অন্যান্য অধিকার হইতে পৃথক্ করিয়া শাসনতন্ত্রে সন্নিবদ্ধ করা হয়। এইজন্য এই অধিকারগুলিকে মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) বলা হয়। যদি কোন কারণে এই অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্য শাসন-তান্ত্রিক উপায়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি যে সমস্ত দেশে লিখিত শাসনতন্ত্রে অধিকারের সনদ দ্বারা অধিকারগুলি সুরক্ষিত হইয়াছে, সে সমস্ত দেশে প্রধান বিচারালয়ের বিচার-বিভাগীয় ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তের উপর এই অধিকারগুলির নিরাপত্তা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

রাজনৈতিক অধিকার—Political Rights

১। ভোটদানের অধিকার—Right to vote

আধুনিক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হইল জনমত। এই জনমত রাষ্ট্রের প্রত্যেক সাবালক ও সুস্থ মস্তিষ্কের লোকের প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। ভোটাধিকার যত ব্যাপক ও সার্বজনীন হয়, রাষ্ট্রের প্রকৃতিও তদনুরূপ গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং ভোটদান ক্ষমতা ব্যক্তির একটা প্রধান অধিকার বলিয়া স্বীকৃত হয়। এই অধিকারের সাহায্যে ব্যক্তি রাষ্ট্র পরিচালনা কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

২। ভোট পাইবার অর্থাৎ নির্বাচনের অধিকার—Right to be elected

ভোট দিবার মত ভোট পাইবার অর্থাৎ রাষ্ট্রপরিচালনা কার্যে অংশগ্রহণ করিবার অধিকারও প্রত্যেক নাগরিক দাবী করিতে পারে।

৩। সরকারী কার্যে নিযুক্ত হইবার অধিকার—Right to hold public offices

স্ত্রী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই সরকারী চাকুরী পাইতে পারিবে। সরকার এবিষয়ে নাগরিকগণের মধ্যে কোনরূপ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা করিবে না।

৪। আবেদন করিবার অধিকার—Right to petition

ব্যক্তি বা সমষ্টি সরকারের নিকট তাহাদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে শান্তিপূর্ণভাবে আবেদন জানাইতে পারিবে।

অর্থনৈতিক অধিকার—Economic Rights

আধুনিককালে মানুষের অর্থনৈতিক অধিকারগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়, কারণ এই অধিকারগুলি না থাকিলে রাজনৈতিক অধিকার ও সামাজিক অধিকারগুলি নিরর্থক। অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির ভোটাধিকার বিড়ম্বনা মাত্র। সুতরাং গণতান্ত্রিক আদর্শ সফল করিতে হইলে অর্থনৈতিক অধিকারগুলিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অর্থনৈতিক অধিকারের তাৎপর্য হইল যে, প্রত্যেক ব্যক্তির যোগ্যতা অনুসারে কাজ করিবার অধিকার অর্থাৎ বেকার না থাকা, নির্দিষ্ট সময় কাজ করিয়া উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অধিকার, অসুস্থ বা বেকার অবস্থায় ভাতা পাইবার অধিকার প্রভৃতিকে সাধারণতঃ অর্থনৈতিক অধিকার বলা হয়। প্রায় প্রত্যেক সভ্য দেশের শাসনতন্ত্রে এই অধিকারগুলি স্থান পাইয়াছে। ভারতের শাসনতন্ত্রে নির্দেশাত্মক নীতিগুলির মধ্যে এই অধিকারগুলির উল্লেখ দেখা যায়।

ভোটদান করিবার ক্ষমতা ঃ ইহার গুরুত্ব ও তাৎপর্য—The Right to vote : its importance and implications

ভোটদান করিবার ক্ষমতা বর্তমান যুগে নাগরিকগণের একটি সর্বপ্রধান অধিকার বলিয়া বিবেচিত হয়। এই ক্ষমতার বলে নাগরিকগণ পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রব্যবস্থা-পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু ভোটদান ক্ষমতার অধিকারী হইতে হইলে কয়েকটি যোগ্যতা থাকা চাই। কারণ, ভোটদান শুধু অধিকার নহে, ইহা নাগরিকের কর্তব্যও বটে। অপ্রাপ্তবয়স্ক, উন্মাদ, অপরাধী, দেউলিয়া প্রভৃতি অযোগ্য বিবেচিত হয় বলিয়া তাহাদের ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয় না। ভোটদান-ক্ষমতা যথাযথভাবে পরিচালিত না হইলে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচিত হইতে পারে না। ইহাতে শাসনকার্যের অবনতি ঘটে। অপর পক্ষে ভোটদান-ক্ষমতার গুরুত্ব হইল যে, এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া নাগরিকগণ তাহাদের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখিতে পারে ও সরকারের যথেচ্ছাচারিতায় বাধা দিতে পারে। উপযুক্ত যোগ্যতা-সম্পন্ন হইলে জাতি-ধর্ম ও স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে যে-কোন ব্যক্তি

যে-কোন সরকারী কার্যে নিযুক্ত হইতে পারে। নাগরিকগণ অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য শাসন-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আইন-সঙ্গতভাবে সরকারের কার্যের সমালোচনা করিতে পারে।

সার্বজনীন ভোটাধিকার—Universal Franchise

গণতান্ত্রিক আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে বর্তমানে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ভোটদানের অধিকারী বলিয়া গণ্য হয়। যত অধিক সংখ্যক লোক ভোটদানের অধিকারী হইবে গণতন্ত্র হইবে সেইরূপ ব্যাপক। ভোটদান-ক্ষমতা একদিকে যেমন একটি অধিকার অন্যদিকে ইহা আবার সেইরূপ একটি গুরুদায়িত্ব। যে-ক্ষেত্রে এই অধিকার অর্জনের ও কর্তব্যপালনের ক্ষমতার অভাব দেখা যায় সেখানে ভোটদান-ক্ষমতা অর্পণ করা ঠিক নহে। এই কারণে প্রত্যেক সভ্য দেশে অপ্রাপ্তবয়স্ক, বিকৃত মস্তিষ্ক, দেউলিয়া, দুর্বৃত্ত প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদিগকে ভোটাধিকার দেওয়া হয় না।

সার্বজনীন ভোটাধিকারের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল যে, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। জনগণের সম্মতি তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সুতরাং জনগণের ভোটদান-ক্ষমতা না থাকিলে সে শাসন-ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, ভোটদান ক্ষমতার অধিকারী হইলে জনগণ এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া দায়িত্ববোধ-হীন ও স্বৈরাচারী সরকারকে অপসারণ করিতে পারে। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সকল নাগরিকই সমান অধিকার দাবী করিতে পারে এবং সকলের স্বার্থ সমানভাবে রক্ষিত হয়। যেখানে সকেলর স্বার্থ সমানভাবে রক্ষিত হয় একমাত্র তাহাকেই কল্যাণ-রাষ্ট্র বলা যায়।

প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দান করিবার বিরুদ্ধে জন ষ্টুয়ার্ট মিল্, মেইন প্রভৃতি মনীষিগণ অনেক যুক্তি দেখাইয়াছেন। মিল্ ভোটদান ব্যাপারে ভোটদাতার শিক্ষার উপর বেশী জোর দিয়াছেন। তাঁহার মতে যাহারা লিখিতে পড়িতে জানে না ও গণিতশাস্ত্রের প্রাথমিক সূত্রগুলির সহিত পরিচিত নয়, তাহাদের ভোটদান অধিকার দেওয়া মিল যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। তাঁহার মতে পূর্বে জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া পরে তাহাদের ভোটদান অধিকার দেওয়া উচিত ("Universal teaching must precede universal enfranchisement"). কিন্তু একথা সব সময়ে সত্য নয়। শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভোটদাতা হিসাবে যে নিরক্ষর ব্যক্তি

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর তাহা স্বীকার করা যায় না। অধিকন্তু ভোটদানের অধিকার থাকিলে লোকে তাহাদের অন্য অধিকার সম্বন্ধে সজাগ হইয়া সেগুলি দাবী করিতে পারে। পূর্বে কিছু সম্পত্তির মালিক হওয়া ও কিছু করপ্রদানের ক্ষমতা থাকা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু বর্তমানে এগুলিকে ভোটদান অধিকারের বিশেষ যোগ্যতা বলিয়া গণ্য করা হয় না। ১৯৫২ সাল হইতে ভারতে প্রাপ্তবয়স্কের (২১ বৎসর) ভোটাধিকার নীতি প্রবর্তিত হইয়াছে।

কর্তব্য—Duties

নাগরিক কর্তব্য বলিতে বুঝায়, যে কর্তব্যগুলি নাগরিকের পক্ষে অবশ্যকরণীয়—যেগুলি পালন না করিলে আইনসঙ্গতভাবে শাস্তি পাইতে হয়। নাগরিক যেরূপ রাষ্ট্রের নিকট হইতে অধিকার দাবী করে, রাষ্ট্রও তদ্রূপ নাগরিকের নিকট কতকগুলি কর্তব্যপালনের দাবী করিতে পারে। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য আলোচনার পূর্বে নাগরিকের অন্য কর্তব্যগুলির আলোচনা হওয়া দরকার।

পরিবারের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য—Citizen's Duties to the Family

নাগরিক শুধু রাষ্ট্রের সদস্য নহে। সে যে পরিবারে বাস করে সেই পরিবারেরও সে একজন সদস্য। জন্মগ্রহণ করিবার পর হইতেই শিশু মাতা-পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ-যত্নে লালিত-পালিত হয়। মাতা-পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনই তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত পরিবারের উপরই নির্ভরশীল থাকে। পরিবারের মধ্যে না থাকিলে শিশু যে শুধু বড় হইতে পারে না তাহা নহে, তাহার ব্যক্তিত্বেরও পূর্ণবিকাশ পারিবারিক পরিবেশ ছাড়া সম্ভব নহে! সুতরাং যে পরিবার সাবালক না হওয়া পর্যন্ত শিশুর সমস্ত ভার গ্রহণ করে, সেই পরিবারের প্রতি শিশুর আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করা পবিত্র কর্তব্য। বৃদ্ধবয়সে অথবা অক্ষম হইলে মাতা-পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের দুঃখে-কষ্টে সাহায্য করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। মনে রাখিতে হইবে যে, মানুষের এই কর্তব্য আইনানুমোদিত কর্তব্য না-ও হইতে পারে। পরিবারের প্রতি কর্তব্য ব্যক্তিগত ও সামাজিক নীতিবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে ব্যক্তি পরিবারের প্রতি কর্তব্যপালনে অবহেলা করে, তাহাকে কু-সন্তান বলা যাইতে পারে।

সমাজের প্রতি কর্তব্য—Duties to the Community

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক পরিবেশেই তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ সম্ভব। শুধু পরিবারের সদস্য হইয়াই মানুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না, তাই পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করিয়া মানুষ বৃহত্তর ক্ষেত্রে সমাজ গঠন করিয়াছে। সুতরাং সামাজিক মানুষ হিসাবে সমাজের প্রতিও মানুষের একটা কর্তব্য রহিয়াছে। মানুষ যে সমাজে বাস করে, সে সমাজের বিধি-নিষেধগুলি তাহার মানিয়া চলা উচিত। যাহাতে সমষ্টির কল্যাণ, তাহাতে ব্যক্তিরও কল্যাণ হয়। সুতরাং সমাজ-বিরোধী কোন কাজ কোন নাগরিকেরই করা উচিত নহে। মানুষ শুধু যে সমাজ-বিরোধী কোন কাজ করিবে না তাহা যথেষ্ট নহে, সে তাহার চিন্তাধারা ও কার্যকলাপ এরূপভাবে পরিচালিত করিবে যাহাতে ব্যক্তি ও সমষ্টির মঙ্গল হয়।

রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য—Allegiance

প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য হইল স্বরাষ্ট্রের প্রতি একনিষ্ঠভাবে আনুগত্য প্রদর্শন করা। আনুগত্যের অর্থ হইল, রাষ্ট্রের কার্যে বাধা না দিয়া সর্বতোভাবে রাষ্ট্রকে সাহায্য করা। অপরাধ নিবারণ ও অপরাধীদের গ্রেপ্তারের কার্যে সাহায্য করা প্রত্যেক নাগরিকেরই গুরু দায়িত্ব বলিয়া সর্বদেশে বিবেচিত হয়।

রাষ্ট্রের আইন মান্য করিয়া চলা—Obedience to laws

রাষ্ট্র আইনের দ্বারা স্বাধীনতা রক্ষা করে। সুতরাং ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থের জন্যই প্রত্যেক নাগরিকের আইন মানিয়া চলা উচিত। কোন ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের মতে যদি কোন আইন অন্যায় বা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে জনমত সৃষ্টি করিয়া নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সে আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে হইবে।

করপ্রদান—Payment of Taxes

আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা ও জনহিতকর কার্যসম্পাদনের জন্য রাষ্ট্রের প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। জনগণের প্রদত্ত কর হইতে এই অর্থ সংগৃহীত হয়। সুতরাং রাষ্ট্রপরিচালনা-কার্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, সেজন্য প্রত্যেকের দেয় কর সময়মত রাষ্ট্রকে প্রদান করিতে হইবে।

ভোটদান—Voting

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক নাগরিকের ভোটদান-ব্যাপারে অবহিত হইতে হইবে। ভোটদান করা শুধু একটি নাগরিক অধিকার নয়, ইহা নাগরিকের পক্ষে একটা গুরু দায়িত্ব বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। সুতরাং সততা ও সুবিবেচনা সহকারে এই দায়িত্ব পালন করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। সমাজ-জীবন যাহাতে উন্নততর হয়, সেজন্য নাগরিকগণের সর্বদা সচেতন থাকা উচিত।

প্রয়োজনমত সরকারী কার্যে সাহায্য করা নাগরিকদের অবশ্য কর্তব্য। এইজন্য সর্বদেশে জুরীর বিচার প্রবর্তিত আছে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা কোন কারণে বিপন্ন হইলে নাগরিকগণের কর্তব্য হইল নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া রাষ্ট্রকে রক্ষা করা। রাষ্ট্র সকল অধিকারের উৎস। রাষ্ট্রের অবর্তমানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। তাই রাষ্ট্রকে রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য।

অধিকার ও কর্তব্যের পারস্পরিক সম্পর্ক—Correlation of Rights and Duties

কোন নাগরিক অধিকারই অবাধ বা অসীম নয়। সমাজ-জীবনে প্রত্যেকটি অধিকার একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে প্রয়োগ করিতে হয়, আর অপর ব্যক্তির অধিকারের দ্বারা এই গণ্ডির সীমারেখা স্থির হয়। নাগরিকের যেরূপ কতকগুলি অধিকার আছে, সেইরূপ কতকগুলি কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে। অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। আমার যেমন বাঁচিয়া থাকিবার, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার ও ধন-সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষা করিবার অধিকার আছে, অন্যেরও সেইরূপ অধিকার আছে। আমি বাঁচিয়া থাকিতে চাই বলিয়া অন্যের বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে পারি না। আমার যেমন অধিকার আছে, সমাজের অন্য সকলেরও সেইরূপ অধিকার আছে এবং অন্যের সেই সকল অধিকারে আমার হস্তক্ষেপ না করিবার দায়িত্ব রহিয়াছে। আমার অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা অন্যের যেরূপ কর্তব্য, অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করাও আমার সেইরূপ কর্তব্য। তাই অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়া অপরটি থাকিতে পারে না। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, অধিকার ও কর্তব্য একই আদর্শের দুইটি বিভিন্ন রূপ।

প্রথমতঃ, বলা যায়, আমার যাহা অধিকার, অন্যের তাহা কর্তব্য। আমার

বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে, এ কথার অর্থ হইল যে, অপর সকলের কর্তব্য হইল আমার জীবন নাশ না-করা। দ্বিতীয়তঃ, অন্যের যাহা অধিকার, আমার তাহা কর্তব্য। অন্য লোকের জীবনের অধিকার ক্ষুণ্ণ না-করা আমার কর্তব্য। তৃতীয়তঃ, আমার ও অন্য লোকের অধিকারগুলিকে রক্ষা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। সুতরাং ব্যক্তিগত অধিকারগুলি রক্ষা করা রাষ্ট্রের পক্ষে কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। চতুর্থতঃ, যেহেতু রাষ্ট্রই আমাদের অধিকারগুলির স্রষ্টা ও রক্ষক, সেইহেতু আমাদের সকলেরই কর্তব্য হইল রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা, সময়মত কর দেওয়া এবং সবরকমে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সুনাম রক্ষা করা। ব্যক্তির পক্ষে যাহা কর্তব্য রাষ্ট্রের পক্ষে তাহা অধিকার এবং ব্যক্তির পক্ষে যাহা অধিকার রাষ্ট্রের পক্ষে তাহা কর্তব্য। এইরূপে ব্যক্তি ও রাষ্ট্র ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং প্রত্যেক নাগরিকই এইরূপভাবে তাহার অধিকার প্রয়োগ করিবে, যাহাতে অন্যের অধিকার কোনমতে ক্ষুণ্ণ না হয়। অধিকারের এইরূপ প্রয়োগই ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশে সাহায্য করিয়া সামাজিক-জীবনে অগ্রগতির পথ সুগম করে।

ভারতে শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকারসমূহ—Fundamental Rights in the Indian Constitution

ভারতের শাসনতন্ত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার সাহায্যে ভারতীয় নাগরিকগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই অধিকারগুলি যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেজন্য সংবিধান দ্বারা আদালতে বিচারের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। সংবিধান অনুযায়ী নাগরিকগণকে নিম্নলিখিত অধিকারগুলি দেওয়া হইয়াছে।

১। সাম্যের অধিকার—Right to Equality

জাতি-বর্ণ-ধর্ম-স্ত্রী-পুরুষ ও জন্মস্থান-নির্বিশেষে সকল নাগরিকেরই সমান অধিকার থাকিবে, এবং এই সব কারণে কোন অযোগ্যতা—সাধারণ আমোদ-প্রমোদের স্থান, জনসাধারণের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নির্মিত জলাশয়, হোটেল, রাস্তা প্রভৃতি ব্যবহারে কাহারও কোন বাধা থাকিবে না। সরকারী চাকুরিতে সকলকে সমানাধিকার দিতে হইবে। যে কোনও আকারে অস্পৃশ্যতা আইনতঃ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। সামরিক ও শিক্ষাসূচক উপাধি ব্যতীত অন্য কোন উপাধি দান করা হইবে না এবং বৈদেশিক সরকার কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি কেহ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

২। স্বাধীনতার অধিকার—Right to Freedom

ভারতের সকল নাগরিকেরই বাক্-স্বাধীনতা, সভা-সমিতি গঠনের স্বাধীনতা, দেশের মধ্যে অবাধ ভ্রমণের ও বসবাস করার স্বাধীনতা থাকিবে। নাগরিকগণ তাহাদের ইচ্ছামত ভারতের মধ্যে সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়, দান ও হস্তান্তর করিতে পারিবে ও যে-কোন পেশা, বৃত্তি বা ব্যবসায় গ্রহণ করিতে পারিবে। বে-আইনীভাবে কাহাকেও আটক রাখা যাইবে না।

উপরি-উক্ত অধিকার সম্পর্কে মনে রাখিতে হইবে যে, কোন অধিকার যদি নীতি-বিরোধী হয় এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, শান্তি-শৃঙ্খলা ও জনস্বার্থ ব্যাহত করে, তাহা হইলে রাষ্ট্র এই অধিকারগুলি সম্পর্কে নাগরিকগণকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করিতে পারে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে আটক আইনের (Preventive Detention Act) প্রয়োগ নাগরিকগণের এই স্বাধীনতার অধিকার কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। পরবর্তী কালে এই আইন সংশোধিত হইলেও বিনা বিচারে যে-কোন ব্যক্তিকে অন্ততঃ তিনমাস কাল আটক রাখা যায়।

৩। শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার—Right against Exploitation

দাস-ব্যবসায়, বেগার খাটান ও অনুরূপভাবে জোর করিয়া শ্রম আদায় করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ১৪ বৎসরের কমবয়স্ক শিশুদের কারখানা, খনি বা অন্য কোন বিপজ্জনক কার্যে নিযুক্ত করাও নিষিদ্ধ হইয়াছে। অবশ্য জনস্বার্থের উন্নতিকল্পে রাষ্ট্র সকলকেই কাজ করিতে বাধ্য করিতে পারে।

৪। ধর্মাচরণের অধিকার—Right to Religion

নাগরিকগণ যে-কোন ধর্ম গ্রহণ বা বর্জন করিতে পারিবে ও নিজ নিজ ধর্মের অনুষ্ঠান পালন করিবার তাহাদের স্বাধীনতা থাকিবে। সরকারী অর্থে সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত কোন বিদ্যালয়ে কোন ধর্মসম্বন্ধীয় শিক্ষা দেওয়া চলিবে না।

অবশ্য নাগরিকগণের ধর্মাচরণ রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা ও সাধারণ নীতিজ্ঞান-বিরোধী হইলে চলিবে না।

৫। শিক্ষা ও সংস্কৃতি রক্ষার অধিকার—Educational and Cultural Rights

ভারতের যে-কোন স্থানে বসবাসকারী নাগরিকগণের কোন বিশেষ ভাষা, লিপি বা সংস্কৃতি থাকিলে, তাহাদের উহা রক্ষা করিবার অধিকার থাকিবে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি তাহাদের ইচ্ছামত বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

৬। সম্পত্তির অধিকার—Right to Property

আইনের অনুমোদন ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে তাহার সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করা চলিবে না। ক্ষতিপূরণ প্রদান না করিয়া জনসাধারণের স্বার্থে কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা চলিবে না। ক্ষতিপূরণের নীতি ও পরিমাণ আইন দ্বারা স্থির করিতে হইবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা ও রক্ষার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিবার ফলে ভূমি-সংস্কারমূলক আইন গ্রহণে সরকারের কতকগুলি বাধা উপস্থিত হয়। এই বাধাগুলি দূর করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালে সংবিধানের কতকগুলি ধারা সংশোধন করা হয়। সংশোধিত আইনের বলে জনস্বার্থের উন্নতি-কল্পে রাষ্ট্রের উপর ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শিল্প ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান দখল বা পরিচালনা করিবার ব্যাপক ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে।

৭। শাসনতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিকারের অধিকার—Right to constitutional Remedies

যদি কোন কারণে নাগরিক অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা হইলে এই অধিকারগুলি রক্ষার দাবি করিয়া নাগরিকগণ সুপ্রিম কোর্ট বা উচ্চ আদালতে আবেদন করিতে পারিবে এবং আদালত বিচার করিয়া যথোপযুক্ত আদেশ প্রদান করিবে।

কিন্তু এ সম্পর্কে মনে রাখিতে হইবে যে, জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্রপতির উপর সংবিধান যে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে তাহার বলে তিনি নাগরিকগণের অধিকার রক্ষার জন্য কোন বিচারালয়ে আবেদন করিবার অধিকার স্থগিত রাখিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত জরুরি অবস্থা যতদিন বাহাল থাকে ততদিন পর্যন্ত সরকার নাগরিকগণকে সংবিধান-প্রদত্ত অধিকারগুলি হইতে বঞ্চিত রাখিতে পারে।

মৌলিক অধিকারগুলির বৈশিষ্ট্য—Features of the Fundamental Rights

মৌলিক অধিকারগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহার কোনটি অবাধ নহে। এই অধিকারগুলি কতকগুলি যুক্তি-সম্মত বাধা দ্বারা সীমায়িত এবং এই

বাধাগুলির যুক্তিযুক্ততা একমাত্র বিচারালয় কর্তৃক স্থিরীকৃত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, একমাত্র ভারতীয় নাগরিকগণই এই অধিকারগুলি ভোগ করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, এই অধিকারগুলি সাময়িকভাবে সংকুচিত করা যাইতে পারে। চতুর্থতঃ, এই অধিকারগুলি ভারতের আইনসভা, শাসন কর্তৃপক্ষ ও কতিপয় ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের কার্যের বাধাস্বরূপ কাজ করে।

মৌলিক অধিকারগুলি আলোচনা করিলে আরও দেখা যায় যে, শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত অধিকারগুলি এইরূপ সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতার দ্বারা এরূপভাবে সংকুচিত করা হইয়াছে যে, জনসাধারণ এই অধিকারগুলি ভোগ করিবার সুযোগ খুব কমই পাইবে।

অধিকারগুলিকে যে-সমস্ত বিধি-নিষেধ দ্বারা সংকুচিত করা হইয়াছে, সেগুলি আলোচনা করিলে মনে হয় যে, কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের সদিচ্ছা ও সহযোগিতার উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। সেইজন্য অন্যান্য দেশের মৌলিক অধিকারগুলির অনুরূপ কতকগুলি অধিকার প্রদান করিয়া সেই অধিকারগুলি যাহাতে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত না হয়, সেইজন্য এরূপ চরম প্রতিকার-ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ভারতের সংবিধানে আরও কতকগুলি মৌলিক অধিকারের উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। কিন্তু সেগুলিকে মৌলিক অধিকারের পর্যায়ভুক্ত না করিয়া রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে কতকগুলি আদর্শ হিসাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। এই আদর্শগুলি রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি নামে সংবিধানে স্থান পাইয়াছে।

ভারত-শাসনতন্ত্রের রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি—Directive Principles of State Policy in the Indian Constitution

স্বাধীন আয়ারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের অনুকরণে ভারতের সংবিধানেও কতকগুলি রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি সংযোজিত হইয়াছে। ভারতের শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে ভারতকে একটি জনকল্যাণকর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল গণতান্ত্রিক উপায়ে জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করা। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত করিবার পক্ষে রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। পূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এই গণতান্ত্রিক আদর্শ বলবৎ করা একান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ শাসনতন্ত্রে কতকগুলি নির্দেশাত্মক নীতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং

শাসকবর্গ যাহাতে উক্ত নীতি অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাহার জন্যও যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতিগুলির মধ্যে প্রধান পার্থক্য হইল যে, কোন মৌলিক অধিকার সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে ক্ষুণ্ন হইলে বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বারা তাহার প্রতিবিধান সম্ভব, কিন্তু শাসনকর্তৃপক্ষের দ্বারা যদি নির্দেশাত্মক নীতিগুলি উপেক্ষিত হয় তাহা হইলে তাহার প্রতিবিধানের কোন সুযোগ নাগরিকগণকে দেওয়া হয় নাই। সুতরাং নির্দেশাত্মক নীতি অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করা বা না-করা সম্পূর্ণরূপে শাসনকর্তৃপক্ষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এস্থলে আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন নির্দেশাত্মক নীতি বলবৎ করিতে গিয়া যদি কোন মৌলিক অধিকারের সহিত সংঘর্ষ বাধে তাহা হইলে নির্দেশাত্মক নীতি কার্যক্ষেত্রে আর প্রযুক্ত হইতে পারিবে না। এরূপ ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। শাসনতন্ত্রে বর্ণিত নির্দেশাত্মক নীতিসমূহের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে দেওয়া হইল।

মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন যাহাতে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, এরূপ জনকল্যাণকর একটি সমাজব্যবস্থা গঠন করিবার জন্য রাষ্ট্র সচেষ্ট থাকিবে। সমস্ত নাগরিকের জীবিকা অর্জনের উপযুক্ত ব্যবস্থা, জনসাধারণের স্বার্থে সম্পদের অধিকার নিয়ন্ত্রণ, সমান কার্যের জন্য স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সমান পারিশ্রমিক প্রদান, শ্রমিক শ্রেণীর নিরাপত্তা রক্ষা, শিশু ও যুবকদের শোষণ ও অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা, সকল নাগরিকেরই কর্ম ও শিক্ষার ব্যবস্থা, বেকার অবস্থায়, বার্ধক্যে, অসুস্থতায় ও অক্ষমতার ক্ষেত্রে সাহায্য করা প্রভৃতি শাসন-কর্তৃপক্ষের কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

চৌদ্দ বৎসরের অনধিক বালকবালিকাদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা-ব্যবস্থা, অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলির অর্থনৈতিক ও শিক্ষাবিষয়ক উন্নতিসাধন, মাতৃমঙ্গল, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ও এই উদ্দেশ্যে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার-বর্জন, কৃষির উন্নতি, পশুপালন, বিশেষতঃ উত্তম পশুপ্রজনন, গো-হত্যা নিবারণ, গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থা-সংগঠন প্রভৃতি কার্য নির্দেশাত্মক নীতিগুলির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত আরও তিনটি বিষয় সম্পর্কে নির্দেশাত্মক নীতি শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রথমটি হইল পার্লামেন্ট সভা কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন, স্থান ও বস্তুসমূহ রক্ষা করা রাষ্ট্রের একটা দায়িত্ব বলিয়া বিবেচিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, শাসনবিভাগ হইতে বিচারবিভাগের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ

সম্পর্কেও রাষ্ট্রের কর্তব্য নির্ধারিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নীতি-সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং পররাষ্ট্রের সহিত ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক সম্পর্ক বজায় রাখা, আন্তর্জাতিক আইন, সন্ধি প্রভৃতির প্রতি সম্মান-প্রদর্শন এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সহযোগিতার মনোভাব লইয়া বিরোধসমূহের মীমাংসা করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট থাকিবে।

মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতি—Fundamental Rights and the Directives

মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতিগুলির মধ্যে মূলগত পার্থক্য দেখা যায়। নির্দেশাত্মক নীতিগুলি এরূপ কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ করে যাহা রাষ্ট্র সর্বদা কার্যে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিবে, অপর পক্ষে মৌলিক অধিকারগুলির দ্বারা রাষ্ট্রকে কতিপয় নির্দিষ্ট কার্য করিতে বিরত থাকিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, মৌলিক অধিকারগুলি এককভাবে বলবৎ করা যায় কিন্তু নির্দেশাত্মক নীতিগুলি উপযুক্ত আইন প্রণয়ন ছাড়া বলবৎ করা যায় না। তৃতীয়তঃ, নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎ করা যায় না, কিন্তু মৌলিক অধিকারগুলি আদালত কর্তৃক যথোপযুক্ত নির্দেশ দ্বারা বলবৎ করা যায়। চতুর্থতঃ, প্রচলিত কোন আইনের সহিত মৌলিক অধিকারগুলির বিরোধের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারগুলি অগ্রাধিকার পাইবে কিন্তু নীতিগুলি অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হইবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, নির্দেশাত্মক নীতিগুলির তুলনায় অধিকারগুলিকে অগ্রাধিকার ও অধিক মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটিলে মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ রহিবে।

নির্দেশাত্মক নীতি সম্পর্কে বলা যায় যে, প্রস্তাবনায় উল্লিখিত উচ্চ আদর্শগুলির পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে মাত্র। এই আদর্শগুলি শাসনকার্যে ও আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে বলবৎ হইলে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথ যে অনেক পরিমাণে সুগম হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

সংক্ষিপ্তসার

নাগরিক

একটি রাষ্ট্রের আনুগত্যে বদ্ধ স্থায়ী বাসিন্দাকে নাগরিক বলা হয়। নাগরিকগণ রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবে কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা পাইয়া থাকে; আর তাহাদের কতকগুলি দায়িত্বও থাকে।

নাগরিক ও বিদেশী

বিদেশী হইল ভিন্নদেশবাসী। যে রাষ্ট্রে বিদেশী সাময়িকভাবে বাস করে, সেখানকার কর্তৃপক্ষ তাহার অবস্থানকালে তাহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিলেও বিদেশী সর্বপ্রকার নাগরিক অধিকার বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক অধিকার দাবী করিতে পারে না। বিদেশীকে দেশ হইতে বহিষ্কার করা যায় কিন্তু সেনাবাহিনীতে যোগদান করিতে বাধ্য করা যায় না।

নাগরিকতা অর্জন ও বর্জনের উপায়

পুত্র-কন্যাগণ পিতৃত্বের ভিত্তিতে অথবা জন্মস্থানের ভিত্তিতে নাগরিকতা প্রাপ্ত হয়। কোন কোন দেশ উভয় নীতিই প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহাতে অনেক অসুবিধা হয়। ইহা ছাড়া, বিবাহের দ্বারা স্ত্রীলোকদিগের নাগরিকত্ব নির্ধারিত হয়। ভিন্ন রাষ্ট্রে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া, বা সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিয়া, বা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আবেদন করিয়া নূতন নাগরিকত্বলাভ করা যায়। এই পদ্ধতি-গুলির দ্বারা পূর্বতন নাগরিকত্ব বিনষ্ট হয় ও নূতন নাগরিকত্ব সৃষ্ট হয়।

সুনাগরিকগণের গুণ

বুদ্ধিমত্তা, আত্মসংযম, বিচারবুদ্ধি, সমাজচেতনা হইল সু-নাগরিকের প্রধান গুণ।

পূর্ণ নাগরিক জীবনের অন্তরায় ও তাহার প্রতিকার

নাগরিক জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তির পথে প্রধান অন্তরায় হইল সাধারণের কাজে উদাসীনতা, স্বার্থপরতা ও দলগত স্বার্থবুদ্ধি। শাসন-ব্যবস্থার উৎকর্ষ-সাধন ও শিক্ষা-বিস্তারের দ্বারা নাগরিকদের নৈতিক উন্নতিসাধন করিতে পারিলে অন্তরায়গুলি দূর হইয়া সু-নাগরিক গঠন সম্ভব হয়।

নাগরিক অধিকার

অধিকারের সাধারণ অর্থ হইল ক্ষমতা। কিন্তু অবাধ ক্ষমতার প্রয়োগ ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজ-জীবনে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে। সেইজন্য এই ক্ষমতাগুলি কতকগুলি কর্তব্যের দ্বারা সীমায়িত করা হয়। এই অধিকারগুলি ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু এগুলি এরূপভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে যাহাতে

সমাজের অন্য লোকের অধিকার ক্ষুণ্ণ না হয়। কাজেই ব্যক্তিবিশেষের অধিকার প্রয়োগ অন্যের প্রতি তাহার কর্তব্যবোধ দ্বারা সীমাবদ্ধ। এক ব্যক্তির যাহা অধিকার, অন্যের তাহা কর্তব্য। এই পারস্পরিক সম্বন্ধ রাষ্ট্র আইনের দ্বারা অব্যাহত রাখে।

পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার

অধিকারগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়; যথা—পৌর অধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার। জীবন-ধনসম্পত্তির অধিকার, বাক্ স্বাধীনতা, ধর্মাচরণের স্বাধীনতা প্রভৃতি পৌর অধিকার। ভোটদান অধিকার, সরকারী কাজে নিযুক্ত হইবার অধিকার প্রভৃতিকে রাজনৈতিক অধিকার বলা হয়। কিন্তু এই অধিকার-গুলির কোনটিই শর্তহীন নয়।

মৌলিক অধিকার

মানুষের এমন কতকগুলি প্রাথমিক অধিকার আছে, যেগুলি ব্যতীত তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ সম্ভব হয় না। তাই শাসনতন্ত্র কর্তৃক এই অধিকারগুলি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হয়। জীবন ও সম্পত্তির অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার প্রভৃতিকে মৌলিক অধিকার বলা হয়।

নাগরিক কর্তব্য

যে পরিবারের স্নেহ-যত্নে নাগরিক লালিত-পালিত হয় এবং যে সমাজের প্রভাবে তাহার চরিত্র গঠিত হয়, সেই পরিবার ও সমাজের প্রতি নাগরিকের আনুগত্য প্রদর্শন করা পবিত্র কর্তব্য।

রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা, যথাযথভাবে ভোটদান করা ও প্রয়োজন মত অন্যভাবে রাষ্ট্রকে সাহায্য করা নাগরিকের কর্তব্য।

অধিকার ও কর্তব্য

অধিকার ও কর্তব্য হইল একই আদর্শের দুইটি বিভিন্ন রূপ। আমার যাহা অধিকার অন্যের তাহা কর্তব্য এবং অন্যের যাহা অধিকার আমার তাহা কর্তব্য। আবার রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কেও নাগরিকের যাহা অধিকার রাষ্ট্রের তাহা কর্তব্য এবং রাষ্ট্রের যাহা অধিকার নাগরিকের তাহা কর্তব্য। নাগরিকগণের এই অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সঠিক ধারণা জন্মিলে সমাজ-জীবনের অগ্রগতি সম্ভব হয়।

ভারতীয় নাগরিক ও মৌলিক অধিকার

সর্বভারতে এক-নাগরিকত্ব বলবৎ করা হইয়াছে। নাগরিক অধিকার অনেক পরিমাণে সহজলভ্য করা হইয়াছে। সংবিধান কর্তৃক ভারতীয় নাগরিকগণের প্রয়োজনীয় মৌলিক অধিকার-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং প্রয়োজন হইলে এই অধিকারগুলি রক্ষার জন্য নাগরিকগণ যাহাতে আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্র কর্তৃক অর্পিত গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলি হইল :

১। আইনের চক্ষে সমানাধিকার, ২। স্বাধীনতার অধিকার, ৩। ধর্ম-সম্পর্কিত অধিকার, ৪। সম্পত্তির অধিকার, ৫। শিক্ষা ও কৃষ্টিগত অধিকার, ৬। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অন্যায় ও অবিচার-প্রতিকারের অধিকার।

রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি

মৌলিক অধিকার ব্যতীত ভারতের শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপরিচালনার কতকগুলি নির্দেশাত্মক নীতি স্থান পাইয়াছে। এগুলি স্বাধীন আয়ারের শাসনতন্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই নীতিগুলি শাসনকার্যে ও আইন-প্রণয়নে শাসনকর্তৃপক্ষের সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হয়। ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যাহাতে একটি জনহিতকর সমাজব্যবস্থা গঠিত হয়, তদুদ্দেশ্যেই এই নীতি-গুলি শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে; নীতি হিসাবে প্রশংসনীয় হইলেও এগুলির বিশেষ কোন কার্যকারিতা আছে বলিয়া মনে হয় না, কেন-না, এই নীতিগুলি উপেক্ষিত হইলেও এগুলিকে আদালত দ্বারা বলবৎ করা যায় না।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. Distinguish between citizens and aliens. How can citizenship be acquired.

H. S. (Comp.) 1962

উঃ—নাগরিক হইল রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী এবং এই হিসাবে তাহাকে রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। রাষ্ট্র স্বদেশে ও বিদেশে নিজের নাগরিকের নিরাপত্তা রক্ষা করে। পরিবর্তে নাগরিককে রাষ্ট্রের আইন মান্য করিতে হয় এবং রাষ্ট্র কর্তৃক ধার্য কর প্রদান করিতে হয়। নাগরিক হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তি রাষ্ট্রের নিকট কতকগুলি সুখ-সুবিধা পাইতে পারে—এইগুলি হইল পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার।

ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক সাময়িকভাবে অন্য দেশে বাস করিলে সে দেশে সে বিদেশী বলিয়া পরিগণিত হয়। বিদেশী যে দেশে সাময়িকভাবে বাস করে, সে দেশের আইন-কানুন তাহাকে মানিতে

হয় ও সাধারণ করও প্রদান করিতে হয়। স্বদেশী রাষ্ট্র দেশের মধ্যেই বিদেশীর নিরাপত্তা রক্ষা করে, বিদেশী ভিন্ন দেশে গেলে তাহার নিরাপত্তা রক্ষা করার দায়িত্ব স্বদেশের নাই। বিদেশী কিছু পৌর অধিকার ভোগ করিলেও রাজনৈতিক অধিকার দাবী করিতে পারে না। নাগরিকের ন্যায় বিদেশীকে আপৎকালে যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য করা যায় না, কিন্তু স্বদেশ উপযুক্ত কারণ থাকিলে বিদেশীকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে পারে।

দুই প্রকারে রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া যায়, যথা—(১) জন্মাধিকার ও (২) অর্জন। জন্মাধিকার দুই প্রকার—একটি হইল রক্তগত অধিকার, অপরটি হইল জন্মভূমিগত অধিকার। প্রথমোক্ত নীতি অনুযায়ী কোন ব্যক্তির জন্মকালে তাহার পিতা যে দেশের নাগরিক ছিল সে সেই দেশের নাগরিক হইবে, তাহার জন্মস্থান যে-কোন দেশ হউক না কেন। ভারতীয় পিতার সন্তান যে-কোন দেশে জাত হউক না কেন সে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইবে। দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে যদি কোন ভারতীয় পিতার সন্তান মার্কিন দেশে জন্মগ্রহণ করে তাহা হইলে পিতা ভারতীয় হওয়া সত্ত্বেও সে মার্কিন দেশের নাগরিক বলিয়া-বিবেচিত হইবে। এই নিয়মে জন্মস্থান বিচার করিয়া নাগরিকত্ব স্থির হয়।

ইহা ছাড়া নানা উপায়ে অন্য দেশে নাগরিকত্ব অর্জন করা যায়। বিবাহের দ্বারা স্ত্রীলোকগণ স্বামীর নাগরিকত্ব অর্জন করে। ভিন্ন রাষ্ট্রের অধীনে চাকুরী লইয়া, বহুদিন ভিন্ন রাষ্ট্রে বসবাস করিয়া বা ভিন্ন রাষ্ট্রে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া বা সামরিক বাহিনীতে যোগদান করিয়া ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া যায়।

2. Define a citizen. What are the hindrance to good citizenship?

নাগরিক কাহাকে বলে? সুনাগরিকতার বাধা কি? H. S. (Hu.) 1960

উঃ—প্রথম প্রশ্নের প্রথম ভাগের উত্তর দ্রষ্টব্য।

নাগরিক জীবনের চরম সার্থকতা নির্ভর করে ব্যক্তিগত জীবনে কতকগুলি গুণের সমাবেশে। যে গুণগুলি থাকিলে সু-নাগরিক হওয়া যায় সেগুলি হইল বুদ্ধিমত্তা, আত্মসংযম ও সমাজচেতনা। এই গুণগুলির অভাবই হইল পূর্ণ নাগরিক জীবনের অন্তরায়। অন্তরায়গুলির মধ্যে উদাসীনতা (indolence) হইল প্রধান। উদাসীনতার কারণ হইল কর্তব্য বোধের অভাব। নাগরিক জীবন যে শুধুমাত্র কতকগুলি অধিকার লইয়া গঠিত নয়, এ কথা সকল নাগরিকেরই স্মরণ রাখিতে হইবে। কি সাধারণ নাগরিক, কি সরকারী কর্মচারী প্রত্যেকেরই নিজ কর্তব্যপালনে সচেতন থাকা উচিত। নাগরিকগণ যদি কর্তব্যপালনে বিমুখ হয় তাহা হইলে গণতন্ত্র একনায়কত্বে পরিণত হইয়া তাহাদের অধিকার পর্যন্ত ক্ষুণ্ণ করিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, নাগরিকগণ যদি অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক হইয়া স্বার্থান্বেষণে ব্যস্ত থাকে তাহা হইলে এই স্বার্থপরতা (Private Self-interest) তাহাদের আদর্শ নাগরিক জীবন গঠনের বাধাস্বরূপ হইবে। সমাজ-জীবনের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বার্থ বলি দিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, দলীয় মনোভাব (Party Spirit) নাগরিক জীবনের এক অভিশাপ রূপে দেখা দিয়াছে। দলীয় স্বার্থ যখন প্রবল হয়, জাতীয় স্বার্থ তখন নষ্ট হয়। দলীয় স্বার্থের হানাহানিতে

অনেক দেশে বৃহত্তর জনকল্যাণের পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়াছে। এই দলীয় মনোভাবের আতিশয্যে ভারত, আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে।

শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন ও সু-শিক্ষা প্রসার দ্বারা নাগরিকগণের নৈতিক উন্নতিসাধন করিতে পারিলে অন্তরায়গুলি দূর হইয়া সু-নাগরিক গঠন সম্ভব হইবে।

3. Define a citizen. What are the qualities of a good citizen?

H. S. (Hu.) 1961

নাগরিক কাহাকে বলে? সু-নাগরিকের কি কি গুণ থাকা উচিত?

উঃ—নাগরিক হইল রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী এবং এই অধিবাসী হিসাবে প্রত্যেক নাগরিকই রাষ্ট্রপ্রদত্ত সমগ্র অধিকারই—পৌর, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক—ভোগ করিতে পারে। পক্ষান্তরে নাগরিককে রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিতে হয় অর্থাৎ রাষ্ট্রের আইন-কানুন মানিয়া চলিতে হয় ও প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নাগরিককে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্য সু-নাগরিকতার উপর নির্ভর করে, কারণ গণতন্ত্র হইল জনগণের শাসন। তাই দেশে সু-নাগরিকের সংখ্যা বেশী হইলে সু-শাসন সম্ভব হয়। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলিয়াছেন যে, নাগরিকতার সারমর্ম হইল—'সাধারণের হিতার্থে ব্যক্তির শিক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত মার্জিত বুদ্ধির প্রয়োগ'—("Citizenship is the contribution of one's instructed judgment to public good".)। সমাজের প্রত্যেক নাগরিক এরূপভাবে তাহার চিন্তাধারা ও কার্যাবলী পরিচালিত করিবে যাহাতে সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধিত হয়। তাই নাগরিক জীবনের চরম সার্থকতা নির্ভর করে ব্যক্তিগত জীবনে কতকগুলি গুণের সমাবেশ আর এই গুণগুলি হইল বুদ্ধিমত্তা, আত্মসংযম, বিচারবুদ্ধি ও সমাজচেতনা। নাগরিককে সকল সময়ে নিজের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সমানভাবে সজাগ থাকিতে হইবে। প্রত্যেক নাগরিকই তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিয়া সমষ্টিগত জীবনকে উন্নততর করিবার জন্য যত্নবান হইবে। সমষ্টির কল্যাণ-কার্যে উদাসীনতা, স্বীয় স্বার্থসাধনে অত্যধিক তৎপরতা ও দলীয় স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দেওয়া—এইগুলিই হইল সু-নাগরিকতার প্রধান অন্তরায়। সুশিক্ষার সাহায্যে এই অন্তরায়গুলি দূর করিতে পারিলে নাগরিক জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে।

4. What is meant by the term Rights? "Rights and Duties go together." Explain.

H. S. (Hu.) 1961

অধিকার বলিতে কি বুঝ? "অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত"। উক্তিটি বিশদভাবে বুঝাইয়া দাও।

উঃ—সাধারণ অর্থে অধিকার বলিতে আমরা বুঝি নাগরিকের স্ব-ইচ্ছায় কিছু করিবার বা না করিবার অবাধ ক্ষমতা। কিন্তু একজনের এইরূপ অবাধ অধিকার অন্য ব্যক্তির অধিকার ভোগে বাধা জন্মাইতে পারে। সেই জন্য সমাজ-ব্যবস্থায় কাহারও এইরূপ অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত অধিকার স্বীকৃত হয় না। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল আইনের সাহায্যে সমাজে এইরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করা যে পরিবেশে প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ করিয়া সমষ্টিগত জীবনের উন্নতিসাধন করিতে

পারে। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে সমস্ত অধিকারের প্রয়োজন সেইগুলিকে প্রকৃত অধিকার বলা হয়। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন, অধিকার হইল মানুষের সামাজিক জীবনের সেই সকল ক্ষমতা, যেগুলির অভাবে মানুষ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে পারে না। সুতরাং যে ক্ষমতাগুলি মানুষের পূর্ণতা প্রাপ্তির সহায়ক—অথচ অন্য ব্যক্তির ন্যায্য অধিকার ক্ষুণ্ণ করে না—সেইগুলি প্রকৃত অধিকার আর যেগুলি পূর্ণতা প্রাপ্তির অন্তরায় সেগুলিকে অধিকার না বলিয়া অনধিকার বলা যায়।

অধিকার ও কর্তব্য একই আদর্শের দুইটি বিভিন্ন প্রকাশ। একটিকে বাদ দিয়া অপরটি থাকিতে পারে না। আমার যাহা অধিকার অন্যের তাহা কর্তব্য এবং অন্যের যাহা অধিকার আমার তাহা কর্তব্য। আমার যেরূপ বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে, অন্যেরও সেইরূপ বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে। আমার কর্তব্য হইল অন্যকে বাঁচিয়া থাকিতে দেওয়া ও অন্যের কর্তব্য হইল আমার বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার ক্ষুণ্ণ না করা। তাই অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আবার রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কেও নাগরিকের যাহা অধিকার রাষ্ট্রের তাহা কর্তব্য এবং রাষ্ট্রের যাহা অধিকার, নাগরিকের তাহা কর্তব্য। নাগরিক রাষ্ট্রের নিকট হইতে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা দাবী করিতে পারে এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল এই নিরাপত্তা রক্ষা করা। আবার রাষ্ট্র নাগরিকগণের নিকট হইতে আনুগত্য ও কর প্রদান দাবী করিতে পারে এবং নাগরিকের কর্তব্য হইল রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ও কর প্রদান। অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে নাগরিকগণের সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিলে সমাজ-জীবনের অগ্রগতি সম্ভব হয়।

5. What are the fundamental duties of a citizen in a modern State?

বর্তমান রাষ্ট্রের নাগরিকগণের মৌলিক কর্তব্য কি কি?

উঃ—কর্তব্যের অর্থ হইল দায়িত্ব অর্থাৎ যেগুলি নাগরিক হিসাবে প্রত্যক্ষ ব্যক্তির পক্ষে অবশ্যকরণীয়। অধিকারের ন্যায় কর্তব্য আবার দুই প্রকারের হইতে পারে, যথা, নৈতিক কর্তব্য ও আইনগত কর্তব্য। পিতার কর্তব্য হইল পুত্রকে শিক্ষা দেওয়া—এই কর্তব্য হইল নৈতিক, ইহা পালন না করিলে পিতা সমাজে নিন্দনীয় হইলেও শাস্তি পান না। কিন্তু কর প্রদান করা হইল নাগরিকগণের আইনগত কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন না করিলে নাগরিক শাস্তি পায়।

আইনগত কর্তব্য ছাড়াও প্রত্যেক নাগরিকের কতকগুলি নৈতিক কর্তব্য আছে। এই কর্তব্যগুলি হইল পরিবারের প্রতি ও সমাজের প্রতি। মানুষ যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করে ও যে সামাজিক পরিবেশে সে বর্ধিত হয়, সেই পরিবার ও সমাজের প্রতি তাহার আনুগত্য ও শ্রদ্ধা থাকা উচিত। মানুষ যে সমাজ-বিরোধী কোন কাজ করিবে না তাহা যথেষ্ট নহে, সে তাহার চিন্তাধারা ও কার্যকলাপ এরূপভাবে পরিচালিত করিবে যাহাতে তাহার নিজের ও সমাজের মঙ্গল হয়।

রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের প্রধান কর্তব্য হইল আনুগত্য স্বীকার করা। আনুগত্যের অর্থ হইল, রাষ্ট্রের কার্যে বাধা না দিয়া সর্বতোভাবে রাষ্ট্রের ন্যায়সঙ্গত কাজে সাহায্য করা। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র প্রবর্তিত আইন মান্য করা নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য। রাষ্ট্রপ্রণীত আইন যদি অন্যায় বা অসঙ্গত মনে হয় তাহা হইলে নাগরিকের কর্তব্য হইল জনমত সৃষ্টি করিয়া আইনানুমোদিতভাবে অসঙ্গত আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্র পরিচালনা কার্যের ব্যয়-নির্বাহের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের

পক্ষে সময়মত ধার্য কর প্রদান করা। পরিশেষে বলা যায় যে, সততা ও সুবিবেচনা সহকারে ভোটদান করাও প্রত্যেক নাগরিকের গুরু দায়িত্ব বলিয়া বিবেচিত হয়।

6. Distinguish between (i) Civil and Political Rights and (ii) Moral and Legal Rights.

পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার এবং নৈতিক ও আইনগত অধিকারের মধ্যে পার্থক্য কর।

উঃ—যে অধিকারগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় ও যেগুলি রাষ্ট্র আইন দ্বারা রক্ষা করে, সেইগুলিকে আইনগত অধিকার (Legal Rights) বলা হয়। এই আইনগত অধিকার ছাড়াও মানুষের কতকগুলি নৈতিক অধিকারের (Moral Rights) কথা বলা হইয়া থাকে। এই অধিকারগুলি দেশের নৈতিক মতবাদ দ্বারা সমর্থিত হয়। বৃদ্ধ পিতার সন্তান কর্তৃক পালিত হইবার অধিকার আছে। ইহা হইল পিতার একটি নৈতিক অধিকার। সন্তান তাঁহাকে পালন না করিলে সে সমাজে নিন্দিত হইবে, কিন্তু রাজদ্বারে শাস্তি পাইবে না। কিন্তু স্ত্রী স্বামীর নিকট ভরণপোষণের দাবী করিতে পারে। স্ত্রীর এই অধিকার শুধু নৈতিক নয়—ইহা আইনগতও বটে। ইহা ভঙ্গ করিলে লোকে শাস্তি পায়।

আইনগত অধিকারগুলিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়, যথা, পৌর অধিকার (Civil Rights) ও রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights)। নাগরিকের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা সম্পর্কিত অধিকারগুলিকে পৌর অধিকার বলা হয়। জীবনের অধিকার, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা ও মতামত প্রকাশের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, চুক্তি করিবার অধিকার প্রভৃতি হইল এই পর্যায়ভুক্ত। রাজনৈতিক অধিকার হইল মানুষের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার ও সরকারী কাজে নিযুক্ত হইবার অধিকার।

7. What are the Directive Principles of State policy as stated in the Indian Constitution? What is their significance?

H. S. (Hu.), Comp. 1960

ভারতের সংবিধান বর্ণিত নির্দেশাত্মক নীতিগুলি কি? নীতিগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

উঃ—মৌলিক অধিকার ব্যতীত ভারতের শাসনতন্ত্র রাষ্ট্র পরিচালনায় কতকগুলি মূলনীতি সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এইগুলি স্বাধীন আয়ারের শাসনতন্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই নীতিগুলি সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, শাসন কর্তৃপক্ষ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে ও শাসনব্যাপারে এই নীতিগুলি দ্বারা পরিচালিত হইবে।

শাসনতন্ত্রে বিধিবদ্ধ এই নীতিগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমভাগে উল্লিখিত নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রের আদর্শ বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক আদর্শের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। এই আদর্শ হইল ভারতে একটি জনকল্যাণকর সমাজব্যবস্থা গঠন করা ও সেই উদ্দেশ্যে দেশের সমগ্র সম্পদের ন্যায্য বন্টন-ব্যবস্থার সাহায্যে আয় বৈষম্য দূর করিয়া সকল শ্রেণীর সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করা।

দ্বিতীয়ভাগে উল্লিখিত আদর্শ হইল সমস্ত নাগরিকের উপযুক্ত ব্যবস্থা, শ্রমিক শ্রেণীর নিরাপত্তা রক্ষা, সমান কাজের জন্য সকলকে সমান পারিশ্রমিক দেওয়া, সকল নাগরিকেরই কর্ম ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

তৃতীয়ভাগে উল্লিখিত আদর্শ হইল, অনুন্নত সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ও শিক্ষাবিষয়ক উন্নতি, চাষের উন্নতি, মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠা, পশুপালন, গ্রাম-পঞ্চায়েৎ গঠন, বিনা যুদ্ধে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সালিশীর সাহায্যে শান্তিস্থাপন, শাসনবিভাগ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ ও জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন ঐতিহাসিক স্থান ও বস্তু রক্ষা করা।

মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতিগুলির পার্থক্য হইল যে, মৌলিক অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হইলে আদালত সাহায্যে প্রতিবিধান পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু নির্দেশাত্মক নীতিগুলি ক্ষুণ্ণ হইলে ইহার কোন প্রতিবিধান নাই।

এখন প্রশ্ন হইল যে, তাহা হইলে এই নীতিগুলির কি কোন মূল্য বা তাৎপর্য নাই? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, প্রস্তাবনায় উল্লিখিত উচ্চ আদর্শগুলির পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে মাত্র। এই নীতিগুলি হইল শিশুরাষ্ট্র ভারতের আদর্শ এবং একটি আদর্শ ছাড়া কোন নবগঠিত রাষ্ট্রের উন্নতি সম্ভব নয়। এই আদর্শগুলি শাসনকার্যে এবং আইন প্রণয়ন-ব্যাপারে বলবৎ হইলে দেশের যে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হইবে, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে ভারতের সংবিধানে এই নীতিগুলি স্থান পাইয়াছে। নীতিগুলি এখনও পর্যন্ত শাসনক্ষেত্রের সর্বত্র প্রযুক্ত না হইলেও বলা যাইতে পারে যে, অনেক বিষয়ে শাসনকর্তৃপক্ষ এই নীতি কার্যক্ষেত্রে বলবৎ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সুতরাং নীতিগুলি একেবারে নিরর্থক হয় নাই।

18- What are the Fundamental Rights of the Indian citizen under the constitution of India? Why are they called 'Fundamental'?

H. S. (Com.) 1960

ভারতীয় নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলি কি? এই অধিকারগুলিকে কেন মৌলিক বলা হয়।

উঃ—মানুষের এমন কতকগুলি প্রাথমিক অধিকার আছে, যেগুলি ব্যক্তিত্ব বিকাশের অপরিহার্য অবস্থা বলিয়া সর্বদেশে স্বীকৃত হয়। এই অধিকারগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিবার উদ্দেশ্যে অন্যান্য অধিকার হইতে পৃথক করিয়া শাসনতন্ত্রে স্থান দেওয়া হয়। এইজন্য এই অধিকারগুলিকে মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) বলা হয়। জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতি এই মৌলিক অধিকার পর্যায়ভুক্ত।

স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রে ভারতের নাগরিকগণের এইরূপ সাতটি মৌলিক অধিকার স্থান পাইয়াছে। এই অধিকারগুলির তাৎপর্য নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। সাম্যের অধিকার—Right to Equality.

জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে রাষ্ট্র সকল নাগরিকের প্রতি সমান ব্যবহার করিবে।

রাষ্ট্র জাতি বা ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকগণের মধ্যে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করিবে না। আইনের চক্ষে সকল নাগরিকই সমান এবং কার্যের উপযুক্ত বিবেচিত হইলে সব নাগরিকেরই সরকারী কাজে নিযুক্ত হইবার সমান অধিকার থাকিবে। যে কোন আকারে অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কেবলমাত্র সামরিক ও শিক্ষা-সংক্রান্ত উপাধি ব্যতীত অন্য কোনরূপ উপাধি প্রদান করা হইবে না। তবে ভারত সরকার বর্তমানে 'ভারত রত্ন,' 'পদ্ম বিভূষণ', 'পদ্মশ্রী' প্রভৃতি উপাধি বিতরণ করিতেছেন। সমাজব্যবস্থায় সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে প্রকৃত গণতন্ত্র সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠাকল্পে উপাধি প্রদান প্রথা রহিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২। স্বাধীনতার অধিকার—Right to Freedom

ভারতের সকল নাগরিকেরই বাক্-স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকিবে। ইহা ছাড়া সকল নাগরিকই নিরস্ত্রভাবে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ, সংঘ প্রভৃতি গঠন করিতে পারিবে। ভারতে যে-কোন অংশে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ, বসবাস, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়, যে কোন বৃত্তি গ্রহণ বা ব্যবসায় করিবার স্বাধীনতা প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে। সরকার যদি কোন ব্যক্তিকে আটক করে তাহা হইলে তাহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আটক করিবার কারণ জানাইতে হইবে এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহাকে কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। বন্দী ব্যক্তি যদি মনে করে যে, তাহাকে অন্যায়ভাবে আটক করা হইয়াছে তাহা হইলে তাহাকে আদালতে উপস্থিত করিবার জন্য হেবিয়াস্ কর্পাস্ রিট্ (Habeas Corpus Writ) জারি করিবার জন্য সে আবেদন করিতে পারিবে। এই অবস্থায় আদালত যদি আটক ব্যক্তির নির্দোষিতা সম্পর্কে বিশ্বাসী হয়, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তির আদেশ দিতে পারে।

৩। শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার—Rights against Exploitation.

দাস ব্যবসায়, বেগার খাটান ও অনুরূপভাবে বলপূর্বক শ্রম আদায় করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ১৪ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদের খনি, কারখানা বা অন্য কোন বিপজ্জনক কার্যে নিযুক্ত করা যাইবে না।

৪। ধর্মাচরণের অধিকার—Right to Freedom of Religion.

নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতকে এক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এইজন্য সকল নাগরিকেরই ধর্মাচরণের স্বাধীনতা থাকিবে। রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা বা জনস্বার্থ ও সাধারণ নীতিজ্ঞানের বিরোধী না হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে তাহার ধর্মাচরণ করিতে পারিবে। সরকারের সহিত সম্পর্কিত কোন বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা ব্যাপারে কাহাকেও যোগদান করিতে বাধ্য করা যাইবে না।

৫। শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত অধিকার—Right to Education.

ভারতের বিভিন্ন নাগরিকগণের উপর তাহাদের নিজস্ব ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। সরকার-পরিচালিত বা সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে সকল সম্প্রদায়ের সমান প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

৬। সম্পত্তি রক্ষার অধিকার—Right to Property.

আইনের অনুমোদন ব্যতীত বা ক্ষতিপূরণ প্রদান না করিয়া কাহারও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা চলিবে না বা জনসাধারণের স্বার্থে কোন সম্পত্তি, শিল্পব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করা চলিবে না। ১৯৫১ সালে এই অধিকার সম্পর্কে কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে। ১৯৫১ সালের সংশোধনী আইনের বলে জনস্বার্থের উন্নতিকল্পে রাষ্ট্রের উপর ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দখল বা পরিচালনা করিবার ব্যাপক ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে।

৭। শাসনতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিকারের অধিকার—Right to Constitutional Remedies.

ভারতের সংবিধান উল্লিখিত মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষার জন্য নাগরিকগণ সুপ্রিম কোর্ট বা উচ্চ বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হইতে পারে এবং বিচারালয়গুলি মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষার জন্য নানা ধরণের আদর্শ বা নির্দেশ জারী করিতে পারে।

এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হইলে সেই ঘোষণাকাল বলবৎ থাকাকালে রাষ্ট্রপতি নাগরিকগণের সুপ্রিম কোর্টে মৌলিক অধিকার রক্ষার আবেদন স্থগিত রাখিবার আদেশ দিতে পারেন। সুতরাং জরুরী অবস্থার ঘোষণাকালে শাসন-কর্তৃপক্ষ এই মৌলিক অধিকারগুলি হরণ করিতে পারে। এই ব্যবস্থার দ্বারা বুঝা যায় যে, ভারতের শাসনতন্ত্র এক হস্তে যে মৌলিক অধিকারগুলি নাগরিকগণকে দিয়াছে, অপর হস্ত দিয়া নাগরিকগণকে সে অধিকারগুলি হইতে বঞ্চিত করিতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আইন ও স্বাধীনতা

(Law and Liberty)

আইন—Law

যখনই বহুলোক একসঙ্গে বাস করে, তখনই এই সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাপনের জন্য সকলকেই কতকগুলি সাধারণ নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়, নতুবা সঙ্ঘবদ্ধ জীবন অচল হয়। পরিবার হইল মানুষের আদি ও প্রাথমিক সঙ্ঘ। এখানেও পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই পরিবারের কর্তার নির্দেশ অনুযায়ী চলিতে হয়, নতুবা পরিবার চলিতে পারে না। এইরূপ দেখা যায় যে, মানুষ সমাজে বিদ্যালয়, শ্রমিকসঙ্ঘ, ক্রীড়াসঙ্ঘ প্রভৃতি যে সমস্ত অসংখ্য সঙ্ঘ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির সু-পরিচালনার জন্য কতকগুলি বিধি-নিষেধ ও আইন-কানুন সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই নিয়ম অনুসারেই সঙ্ঘগুলির সদস্যগণের পরিচালিত হইতে হয়।

রাষ্ট্র হইল মনুষ্য-সৃষ্ট সঙ্ঘগুলির মধ্যে সর্ব-প্রধান। রাষ্ট্রের সদস্য হওয়া প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে বাধ্যতামূলক এবং রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্রও সমাজস্থিত অন্যান্য সঙ্ঘগুলির কার্যক্ষেত্র অপেক্ষা বহুদূর-বিস্তৃত। এইজন্য রাষ্ট্র নিজের কর্মক্ষেত্র স্থির করিতে এবং নাগরিকগণের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি বিধি-নিষেধ সৃষ্টি করে। রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত এই বিধিনিষেধগুলিকে আইন বলা হয়। আইনের সাহায্যে রাষ্ট্র প্রথমতঃ তাহার নিজের কাজগুলি সুনিয়ন্ত্রিত করে। রাষ্ট্র সরকার বা শাসন-ব্যবস্থা গঠন করিয়া ইহার সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করে। শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ না থাকিলে সরকার স্বৈরাচারী হইতে পারে। এইজন্য সরকারী কার্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে যে আইন সৃষ্টি হয়, তাহাকে শাসনতান্ত্রিক আইন (Constitutional Law) বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ, নাগরিকগণের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য যে নিয়ম-কানুন রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত হয়, তাহাকে সাধারণ আইন (Ordinary Law) বলা হয়।

রাষ্ট্র-প্রবর্তিত আইনের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ব্যক্তি-নির্বিচারে ইহা প্রযোজ্য। আইনের চক্ষে ছোট-বড় নাই—সকলেই সমান। দ্বিতীয়তঃ, এই আইন সকলে সব সময়ে মানিতে বাধ্য। রাষ্ট্রীয় আইন অমান্য করিলে শাস্তি পাইতে হয়। কোন কোন লোক নৈতিক কর্তব্যবোধে আইন মান্য করে, আর কেহ কেহ শাস্তির ভয়ে আইন মানে। লোকে কেন আইন মান্য করে, একটু বিচার করিয়া দেখিলে ইহার সদুত্তর পাওয়া যায়। আইন যদি এরূপ হয় যে, ইহা মান্য করিলে ব্যক্তি ও সমষ্টির মঙ্গল হয়, তাহা হইলে ব্যক্তি ও সমষ্টির স্বার্থে লোকের আইন মানিবার ইচ্ছা হয়। সুতরাং আইন প্রণয়ন করিবার সময় জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আইন প্রণয়ন করা উচিত। যদি আইন অধিক-সংখ্যক লোকের স্বার্থ-বিরোধী হয়, তাহা হইলে সে আইন বলবৎ করা রাষ্ট্রের পক্ষে কঠিন হয়। এককথায় বলিতে গেলে আইন যতই জনমত প্রতিফলিত করিতে সমর্থ হইবে, আইনের বাধ্যবাধকতা অর্থাৎ আইন মানিবার কর্তব্যবোধ ততই বৃদ্ধি পাইবে।

আইনের উৎস—Sources of Law

আধুনিককালে শাসন-ব্যবস্থার একটি বিভাগের উপর অর্থাৎ আইনসভার উপর **আইন প্রণয়নের** (**Legislation**) ভার থাকে। আইনসভা একটা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আইন প্রণয়ন করে। বর্তমান যুগে অধিকাংশ আইনই এইরূপে প্রণয়ন করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক দেশেই এমন বহু আইন আছে যাহা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তৈয়ারী হয় নাই। মানুষের বহু প্রাচীন প্রথা ও আচার-ব্যবহার হইতেই এই-গুলির উৎপত্তি হইয়াছে। যখন সকলেই এই প্রচলিত **প্রথাগুলি** (Customs) মানিয়া চলে এবং রাষ্ট্রও এই প্রথাগুলিকে আইন বলিয়া স্বীকার করে, তখন এইগুলি আইনের মর্যাদা পায়।

তৃতীয়তঃ, প্রথার মত **ধর্মীয় অনুশাসনগুলিও** (Religious rules) আইন সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিয়াছে। প্রচলিত ধর্মের বিধিগুলি যদি শাসন-পরিচালনা-কার্যে সাহায্য করে, তাহা হইলে রাষ্ট্র এই বিধিগুলিকে সমর্থন করিয়া আইনের মর্যাদা দেয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের আইনের মধ্যে ধর্মীয় বিধিগুলি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

চতুর্থতঃ, অভিজ্ঞ আইনবিদ্গণ তাঁহাদের **ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ** (Scientific discussion by eminent jurists) দ্বারা অনেক সময় নূতন আইন সৃষ্টি করিতে ও প্রচলিত আইনের পরিবর্তনের সাহায্য করিয়াছেন।

পঞ্চমতঃ, বিচারালয়ের **সিদ্ধান্তগুলি** (Adjudication) আইন-সৃষ্টিতে সাহায্য করে। বিচারকগণ শুধু আইন প্রয়োগ করেন না, তাঁহার প্রয়োজনমত প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যাও করেন। আইনের অর্থ যদি সুস্পষ্ট না হয় তাহা হইলে বিচারকগণ ব্যাখ্যা করিয়া যে সিদ্ধান্ত করেন, তাহাই সঠিক আইন বলিয়া গণ্য হয়। একজন বিচারক কর্তৃক ব্যাখ্যাত আইন অনুসারে যখন অন্যান্য বিচারকগণ বিচারকার্য পরিচালনা করেন, তখন এই সিদ্ধান্ত আইনে পরিণত হয়।

ষষ্ঠতঃ, আইনের অসম্পূর্ণতার জন্য অনেক সময়ে বিচারকগণের নিজেদের ন্যায়বোধ ও বিবেকবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া বিচারকার্য পরিচালনা করিতে হয়। এই **ন্যায়ধর্মের** (Equity) ভিত্তিতে অনেক আইন গঠিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় আইন ও নৈতিক নিয়ম—Law and Morality

রাষ্ট্রকর্তৃক প্রবর্তিত আইন ও নৈতিক নিয়মের মধ্যে বহু পার্থক্য দেখা যায়। নৈতিক নিয়মগুলি মানুষের চিন্তাধারা, কার্যের উদ্দেশ্য ও বাহিরের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে, আর রাষ্ট্রীয় আইন শুধু মানুষের বাহিরের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং নৈতিক নিয়মগুলির প্রয়োগ ক্ষেত্র বহুদূর-বিস্তৃত। দ্বিতীয়তঃ, নৈতিক নিয়ম ভঙ্গ করিলে কোন দৈহিক শাস্তি নাই, শুধু নিজের বিবেক-দংশন ভোগ করিতে হয়, অপরপক্ষে রাষ্ট্রীয় আইন ভঙ্গ করিলে শাস্তি পাইতে হয়। তৃতীয়তঃ, নৈতিক

নিয়মগুলি মানুষের ঔচিত্য ও অনৌচিত্য, ন্যায় ও অন্যায়বোধের একটা নির্দিষ্ট মান দ্বারা নির্ধারিত হয়। রাষ্ট্রীয় আইনের ক্ষেত্রে এরূপ কোন নির্দিষ্ট মান নাই। সাধারণের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করিয়া রাষ্ট্রীয় আইন প্রবর্তিত হয়। রাষ্ট্রীয় আইন সব সময়ে নৈতিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় না। অকৃতজ্ঞতা, পরবিদ্বেষ প্রভৃতি নৈতিক অপরাধ হইলেও বে-আইনী নহে। খাদ্য-বরাদ্দের সময় (Rationing) এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে চাউল লওয়া বে-আইনী হয়, কিন্তু অন্য সময়ে এই কার্য আইন-সম্মত। সুতরাং দেখা যায় যে, নীতিবিরুদ্ধ বলিয়াই যে মানুষের আচরণ বে-আইনী হয় তাহা সব সময়ে সত্য নহে। জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার জন্য রাষ্ট্র মানুষের অনেক আচরণকে বে-আইনী ঘোষণা করিতে পারে।

এতগুলি পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, নৈতিক নিয়ম ও রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। মানুষের ধর্মগত ধারণা হইতেই উভয় নিয়মের জন্ম হইয়াছে। প্রচলিত নীতিজ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন করা উচিত, নতুবা লোকে আইন মান্য করে না। রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য হইল মানুষের নৈতিক উন্নতির সাহায্য করিয়া সু-নাগরিক সৃষ্টি করা। সুতরাং রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল এমন আইন সৃষ্টি করা যেগুলি মানুষের নৈতিক উন্নতি সাধন করিয়া মানুষের মনে বিচারবুদ্ধি সঞ্চারিত করিতে পারে। এইজন্য অনেক সময় রাষ্ট্রকে পুরাতন আইন বা সামাজিক আচার-প্রথার স্থলে নূতন আইন প্রবর্তন করিতে হয়। এইরূপে নূতন আইনের দ্বারাও রাষ্ট্র মানুষের ঔচিত্যবোধ সৃষ্টি করিতে পারে। ভারতে রাষ্ট্রীয় আইনের সাহায্যে সতীদাহ-প্রথা বন্ধ হইলে মানুষের নীতিবোধ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এই কু-প্রথা আপনা হইতেই বিলুপ্ত হইয়াছে।

স্বাধীনতা—Liberty

ব্যক্তির স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতাকেই সাধারণতঃ স্বাধীনতা বলা হয়। কিন্তু এই শব্দটি এত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে যে, এই শব্দটি সম্বন্ধে একটি নির্দিষ্ট ধারণা করা প্রয়োজন। 'স্বাধীনতা' শব্দটিকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। রাষ্ট্রজন্মের পূর্বে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা নির্ধারিত স্বাধীনতার অধিকারী ছিল, সেই স্বাধীনতাকে **প্রাকৃতিক স্বাধীনতা** (Natural Liberty) বলা হয়। প্রকৃতির রাজ্যে স্বাধীনতা সুনিয়ন্ত্রিত করিবার বা স্বাধীনতা রক্ষা করিবার কোন কর্তৃপক্ষ ছিল

না। সুতরাং এই প্রাকৃতিক স্বাধীনতা বলিতে সবলের স্বেচ্ছাচারিতা ব্যতীত আর কিছু বুঝায় না।

দ্বিতীয়তঃ, **পৌর স্বাধীনতা** (Civil Liberty) অর্থে এই শব্দটিকে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপারে কতকগুলি অধিকার ভোগ করা ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। এই স্বাধীনতা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের সহায়ক বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রই তাহার নাগরিকগণকে এই পৌর স্বাধীনতা ভোগ করিবার সম্পূর্ণ সুবিধা প্রদান করিয়া থাকে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা, স্বাধীনভাবে চলাফেরা, বাক্-স্বাধীনতা, ধর্মমতের স্বাধীনতা প্রভৃতি কতকগুলি অধিকারের সমষ্টিকে পৌর-স্বাধীনতা বলা হয়।

তৃতীয়তঃ, স্বাধীনতা বলিতে **রাজনৈতিক স্বাধীনতাও** (Political Liberty) বুঝায়। রাজনৈতিকক্ষেত্রে শাসনপরিচালনা-ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার সমষ্টিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আখ্যা দেওয়া হয়। প্রত্যেক বয়স্ক ও যোগ্যব্যক্তির ভোট দিবার ও ভোট পাইবার ক্ষমতা, যোগ্যতাসম্পন্ন হইলে রাজকার্যে নিযুক্ত হইবার অধিকার ও সরকারের অনুসৃত নীতির নিরপেক্ষ সমালোচনা করিবার অধিকারগুলিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলা হয়।

চতুর্থতঃ, স্বাধীনতা বলিতে বর্তমান যুগে **অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও** (Economic Liberty) বুঝায়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হইল যে, প্রত্যেক মানুষকে তাহার নিজের শিক্ষা ও সামর্থ্যানুযায়ী কার্য করিয়া জীবিকা অর্জনের সম্পূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে। অনশনের ভয় বা বেকার হইবার ভয় থাকিলে মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া যায়। পৌর স্বাধীনতা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা একদিকে যেমন মানুষকে তাহার অধিকার সম্বন্ধে আত্মসচেতন করে, অপর দিকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সেইরূপ মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তাহার অন্যবিধ স্বাধীনতাকে সার্থক করিয়া তুলে। কাজ করিয়া জীবিকা-অর্জনের অধিকার, নির্দিষ্ট সময় কাজ করিয়া উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অধিকার, অসুস্থ বা বেকার অবস্থায় ভাতা পাইবার অধিকার প্রভৃতিকে সাধারণতঃ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলা হয়। প্রায় প্রত্যেক সভ্য দেশের শাসনতন্ত্রে এই অধিকারগুলি স্থান পাইয়াছে।

পঞ্চমতঃ, স্বাধীনতা শব্দটিকে **জাতীয় স্বাধীনতা** (National Liberty) অর্থেও ব্যবহার করা হইয়া থাকে। জাতীয় স্বাধীনতার অর্থ হইল, ভিন্ন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা করিবার অধিকার। এই স্বাধীনতার

অবর্তমানে কোন জাতিই পৌর স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রভৃতির অধিকারী হইতে পারে না। যে স্বাধীনতা অপরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে, সে স্বাধীনতা কখনও পূর্ণ স্বাধীনতা হইতে পারে না। বৃটিশশাসিত ভারতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সব দিক দিয়াই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। দেশ স্বাধীন হইবার পর ব্যক্তি-স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে।

স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য ও আইনের সহিত ইহার সম্পর্ক—True Liberty and its relation to Law and Authority

সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় মানুষের নিজ ইচ্ছানুসারে কার্য করিবার অবাধ ক্ষমতা। ব্যক্তির এই অবাধ ক্ষমতাপ্রয়োগের ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। সবল ব্যক্তির স্বাধীনতা দুর্বল ব্যক্তির স্বাধীনতাকে হরণ করিতে পারে। অধিক শক্তিশালী রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে। এইরূপ অবাধ স্বাধীনতার ফলে সমাজে মুষ্টিমেয় অধিকতর শক্তিশালী বা চতুর ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারী হইবে ; অপরপক্ষে, দুর্বল ও নিরীহ প্রকৃতির লোকদের কোন স্বাধীনতা থাকিবে না। স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত হইবে। এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্বাধীনতা শুধু ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের একচেটিয়া অধিকারের বস্তু নয়। সমাজের প্রত্যেক নাগরিকই এই স্বাধীনতার সমান অধিকারী। প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবে নিরঙ্কুশভাবে স্বাধীনতা ভোগ করিয়া তাহার ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশের সুযোগ পায়, সেইজন্যই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের অভিভাবক হিসাবে এই স্বাধীনতা ভোগ করিবার মত অবস্থা সমাজে সৃষ্টি করে। একজনের স্বাধীন ইচ্ছাপ্রয়োগের ফলে যাহাতে অপরের স্বাধীনতা নষ্ট না হয়, সেজন্য রাষ্ট্র ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা প্রয়োগকে কতকগুলি বিধিনিষেধ সৃষ্টি দ্বারা সীমাবদ্ধ করে। এই বিধি-নিষেধগুলিকে আইন বলা হয় আর আইনের উদ্দেশ্য হইল প্রত্যেক ব্যক্তিকে অপরের স্বাধীনতার হানি না করিয়া নিজ স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ দেওয়া। রাষ্ট্র যদি এই বিধিনিষেধগুলি দ্বারা সমাজ-জীবন নিয়ন্ত্রিত না করিত, তাহা হইলে মানব-সমাজের অবস্থা হব্‌স-বর্ণিত প্রাকৃতিক পরিবেশের 'জোর যার মুল্লুক তার' অবস্থার অনুরূপ হইত। সুতরাং প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার স্বাধীন ইচ্ছা এইরূপভাবে প্রয়োগ করিবে যাহাতে সমাজের অন্য লোকের অনুরূপ স্বাধীনতা কোনরূপে ক্ষুণ্ণ না হয়। স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিয়া

পারস্পরিক সুবিধা-অসুবিধাবোধের ভিত্তির উপর প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে রাষ্ট্র সাহায্য করে। আর এইজন্যই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রয়োজন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃত স্বাধীনতার অধিকারী হইতে হইলে এই সার্বভৌম শক্তিকে মানিয়া লইতে হইবে। নতুবা একজনের স্বাধীনতা অধিকতর বলশালী বা চতুর ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। সুতরাং সার্বভৌম শক্তি ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা পরস্পর-বিরোধী নয় (Sovereignty and Liberty are not contradictory)। আইন হইল রাষ্ট্রের প্রধান অস্ত্র, যাহার দ্বারা রাষ্ট্র স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিয়া সমাজে এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করে, যে-পরিবেশে প্রত্যেক ব্যক্তি রাষ্ট্রনির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে নিজ ইচ্ছামত কার্য করিতে পারে। সমষ্টিগত জীবনের কল্যাণ-সাধনের জন্যই রাষ্ট্র আইনের দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতার সীমারেখা নির্ধারণ করে। আইনের দ্বারা রাষ্ট্র তিন প্রকারে ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগের ক্ষেত্র প্রসারিত করে। প্রথমতঃ, ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনতা যদি অন্য ব্যক্তির অধিকতর শক্তির জন্য ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা হইলে আইন তাহাকে রক্ষা করে। দ্বিতীয়তঃ, শাসকসম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাচারিতায় যাহাতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিনষ্ট না হইতে পারে, সেজন্যও রাষ্ট্র বিশেষ ধরণের আইন-প্রণয়ন ও প্রয়োজনমত প্রয়োগ করিয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, আইনের দ্বারা রাষ্ট্র সমাজে এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করে, যে-পরিবেশে প্রত্যেক ব্যক্তি এই স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ পাইয়া ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ সাধন করিতে পারে। এই সুযোগ-সৃষ্টির জন্যই বর্তমান রাষ্ট্রগুলি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশুপালন ও শিশুরক্ষা, মাদকদ্রব্য-বর্জন প্রভৃতি বিষয়ক জনহিতকর আইন প্রবর্তন করিতেছে। সুতরাং আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে কোনরূপ বিরোধ থাকিতে পারে না। একে অন্যের পরিপূরক। এইজন্যই বলা হয় যে, আইন হইল প্রকৃত স্বাধীনতার নির্ধারক ও রক্ষক (Law is the condition of liberty)।

ব্যক্তি-স্বাধানতা রক্ষা করিবার বিভিন্ন উপায়—Safeguards of Liberty

স্বাধীনতা ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অপরিহার্য সহায়ক বলিয়া সর্বদেশে বিবেচিত হয়। সেইজন্য সকল দেশেই এই ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশে একটা সুনির্দিষ্ট লিখিত শাসনতন্ত্রের

সাহায্যে নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্রে নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলি সুসংবদ্ধভাবে লিখিত হইয়াছে। এই অধিকারগুলির কোনটি যদি শাসন-কর্তৃপক্ষের কার্য দ্বারা ব্যাহত হয়, তাহা হইলে নাগরিকগণ সুপ্রিম কোর্টে ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারে ও এই আদালতের নির্দেশ অনুসারে শাসন-কর্তৃপক্ষকে কার্য পরিচালনা করিতে হইবে। সুতরাং অনেক দেশে লিখিত শাসনতন্ত্র ও উচ্চ বিচারালয় ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে।

কিন্তু ইংলণ্ডে কোন লিখিত শাসনতন্ত্র নাই বা সেখানকার উচ্চ বিচারালয়ের শাসন-কর্তৃপক্ষ বা আইনসভার কার্যের বৈধতা বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। ইংলণ্ডে কতিপয় অ-লিখিত আইন ও নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা নাগরিক অধিকার-গুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাহায্য করে। ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় আইনের প্রাধান্য ও আইনের নিরপেক্ষতা নীতি (Rule of Law) বিশেষ কার্যকরী হইয়া নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত করিয়াছে। যদি কোন নাগরিক বিনা বিচারে শাসন-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বন্দী হয়, তাহা হইলে বন্দী ব্যক্তির আবেদনক্রমে বিচারালয় ঐ ব্যক্তির বিচার করিবার জন্য তাহাকে আদালতে উপস্থিত করিবার আদেশ দিতে পারে। বিনা বিচারে কাহারও ব্যক্তি-স্বাধীনতা নষ্ট হইতে পারে না। ইংলণ্ডের আইনের চক্ষে সকল নাগরিকই সমান।

ক্ষমতার বিভাগ করিয়া (Separation of Powers) অনেক সময় ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু ক্ষমতার এই বিভাগ ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার একটি অপরিহার্য উপকরণ বলিয়া সর্বক্ষেত্রে গণ্য হইতে পারে না। গ্রেট বৃটেনে ক্ষমতার বিশেষ কোন বিভাগ নাই, তাহা সত্ত্বেও গ্রেটবৃটেনবাসী স্বাধীন।

নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থার দ্বারা (Independence of the Judiciary) ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব বলিয়া অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন। বিচারালয়গুলি যদি শাসনবিভাগ ও আইনসভার নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হয়, তাহা হইলে ন্যায়বিচার সম্ভব হয়। ন্যায়-বিচারের দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতা যে অনেক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ রাখা যায় ইহা অনস্বীকার্য।

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় (Democracy) ব্যক্তি-স্বাধীনতা সর্বতোভাবে রক্ষিত হয়। এই শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি সাম্যের অধিকারী

হইয়া স্বীয় অধিকার সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ থাকে। স্বাধীনতা কোন দিক দিয়া একটু বিপন্ন হইলে নিজেই তাহা প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়। এইজন্যই বলা হয় যে, নাগরিকগণের আত্মচেতনভাবই হইল তাহাদের স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ।

সংক্ষিপ্তসার

আইন

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইন বলিতে বুঝায় কতকগুলি নিয়মের সমষ্টি, যে নিয়মগুলি ব্যক্তিগত জীবনে পারস্পরিক আচরণের মান নির্ণয় করে। আইনগুলির পিছনে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির অনুমোদন আছে বলিয়া জনসাধারণ এগুলিকে মান্য করে।

আইনের উৎস

প্রথা, ধর্মীয় অনুশাসন, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, ন্যায়নীতি, আইনবিদ্‌গণের আলোচনা ও আইনপরিষদ্‌ কর্তৃক নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আইন-প্রণয়ন—এইগুলিই হইল আমাদের জন্মদাতা। বর্তমানে অধিকাংশ আইনই—শেষোক্ত পদ্ধতিতে রচিত হয়।

নৈতিক নিয়ম

নৈতিক নিয়ম ও রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য দেখা যায়।

(১) নৈতিক নিয়ম মানুষের চিন্তা ও বাহিরের আচরণ উভয়কেই নিয়ন্ত্রিত করে—রাষ্ট্রীয় আইন শুধু মানুষের বাহিরের আচরণের একটা প্রধান অংশ নিয়ন্ত্রিত করে।

(২) নৈতিক নিয়ম মানুষের বিবেক বা জনমত দ্বারা অনুমোদিত হয়, রাষ্ট্রীয় আইন রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির দ্বারা বলবৎ করা হয়।

(৩) নৈতিক নিয়মগুলি মানুষের ঔচিত্যবোধের মান দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। সমাজের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করিয়া রাষ্ট্রীয় আইন পরিবর্তিত হইতে পারে।

(৪) নীতিজ্ঞান-বিরোধী কার্যকলাপ সবসময়ে বে-আইনী বলিয়া পরিগণিত হয় না, অপরপক্ষে নীতিজ্ঞান-বিরোধী না হইলেও অনেক কার্যকলাপ বে-আইনী হইতে পারে।

উপরি-উক্ত পার্থক্য থাকা-সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় আইন ও নৈতিক নিয়ম ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। প্রচলিত নীতিজ্ঞান-সম্মত না হইলে কোন রাষ্ট্রীয় আইনই জনমতের

সমর্থন পাইতে পারে না। মানুষের নৈতিক জীবনের উৎকর্ষ-সাধন করাই হইল উভয়বিধ আইনের উদ্দেশ্য।

স্বাধীনতা ও আইনের সহিত সম্পর্ক

স্বাধীনতা শব্দটি প্রাকৃতিক স্বাধীনতা, পৌর স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, জাতীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নহে। তাহা হইলে সমাজে অধিক শক্তিশালী ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহারও স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হইল নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতার প্রয়োগে অপরের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় না। এইজন্য রাষ্ট্র কতকগুলি বিধি-নিষেধ সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করে। রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে যে স্বাধীনতা প্রয়োগ করা যায়, তাহাই হইল প্রকৃত স্বাধীনতা, কেন না স্বাধীনতা প্রয়োগের এই সীমারেখা স্থির করিয়া রাষ্ট্র সকল ব্যক্তিকেই স্বাধীনতা উপভোগের সুযোগ দেয়। সুতরাং আইন না থাকিলে স্বাধীনতার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। রাষ্ট্র আইন-প্রণয়ন দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করে, স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখে ও স্বাধীনতা বৃদ্ধি করে।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার উপায়

লিখিত শাসনতন্ত্র, নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা, আইনের অনুশাসন, ক্ষমতার স্বাতন্ত্রীকরণ প্রভৃতি নাগরিক অধিকার রক্ষার উপায় বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু স্বাধীনতা রক্ষা করিবার ঐকান্তিক ইচ্ছাই হইল স্বাধীনতা রক্ষার প্রধান উপায়।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. "Law is generally defined as the command of the sovereign." Discuss and indicate the relation between Law and Liberty.

"আইন হইল সার্বভৌমের নির্দেশ"—এই উক্তিটি বুঝাইয়া দাও এবং আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক বিচার কর।

উঃ—জন অষ্টিনের মতে আইন হইল সার্বভৌমের আদেশ। আইন যে ভাবেই প্রচারিত হউক না কেন, ইহার একমাত্র উৎস হইল সার্বভৌম শক্তি। অষ্টিনপ্রদত্ত আইনের এই সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ; কেননা রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট আইন ছাড়াও প্রত্যেক দেশে প্রচলিত রীতি-নীতি হইতে উদ্ভূত

এমন কতকগুলি নিয়ম দেখা যায় যেগুলি লোকে মান্য করে। রাষ্ট্র এই প্রথাগত আইনগুলিকে বলবৎ করে। সুতরাং আইন বলিতে শুধু আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত আইনগুলিকে বুঝায় না। নাগরিকগণের কার্য নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট আইন ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত রীতিনীতি-গুলির সমষ্টিকে আইন বলা হয়।

স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়। তাহা হইলে সমাজে একমাত্র অধিক শক্তিশালী বা অধিক চতুর ব্যক্তির স্বাধীনতা ব্যতীত অপর কাহারও স্বাধীনতা থাকিত না। স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হইল নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতা প্রয়োগে অপরের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় না। এইজন্য রাষ্ট্র আইনের আকারে কতকগুলি বিধি-নিষেধ সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করে। রাষ্ট্র কর্তৃক আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে যে স্বাধীনতা ভোগ করা যায়, তাহা হইল প্রকৃত স্বাধীনতা, কেননা, স্বাধীনতা ভোগের এই সীমারেখা স্থির করিয়া রাষ্ট্র সকল ব্যক্তিকেই স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ দেয়। সুতরাং আইন না থাকিলে স্বাধীনতার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। রাষ্ট্র আইন-প্রণয়ন দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করে, স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখে ও স্বাধীনতা বৃদ্ধি করে। তাই বলা হয় যে, আইন হইল স্বাধীনতার রক্ষক (Law is the condition of liberty)

2. Indicate the connection between Law and Morality.

আইন ও নৈতিক নিয়মের সম্পর্ক বিচার কর।

উঃ—রাষ্ট্রীয় আইন ও নৈতিক নিয়মের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। (১) নৈতিক নিয়ম মানুষের অভিপ্রায় ও বাহিরের আচরণ উভয়কে নিয়ন্ত্রণ করে—রাষ্ট্রীয় আইন শুধু মানুষের বাহিরের আচরণের একটা প্রধান অংশ নিয়ন্ত্রণ করে।

(২) নৈতিক নিয়ম মানুষের বিবেকবুদ্ধি বা জনমত দ্বারা অনুমোদিত হয়। রাষ্ট্রীয় আইন রাষ্ট্রের শক্তির দ্বারা বলবৎ করা হয়।

(৩) রাষ্ট্রীয় আইন মানুষের ঔচিত্যবোধের মান দ্বারা স্থিরীকৃত হয়, সমাজের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করিয়া রাষ্ট্রীয় আইন প্রবর্তিত হয়।

(৪) নীতি-বিরোধী কাজ সব সময়ে বে-আইনী বলিয়া গণ্য হয় না, অপরপক্ষে নীতি-বিরোধী না হইলেও অনেক কাজ বে-আইনী বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

উপরি-উক্ত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় আইন ও নৈতিক নিয়ম ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। মানুষের নৈতিকজ্ঞান হইতেই উভয়বিধ নিয়মের জন্ম হইয়াছে। প্রচলিত নীতিজ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন করা হয়। প্রচলিত নীতিজ্ঞান বিরোধী হইলে লোকে সে আইন মান্য করে না। রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য হইল মানুষের নৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করিয়া সু-নাগরিক সৃষ্টি করা। সুতরাং রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল এমন আইন সৃষ্টি করা যেগুলি মানুষের নৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে পারে। এইজন্য রাষ্ট্রকে অনেক সময় পুরাতন আইন ও সামাজিক আচার-প্রথার স্থলে নূতন আইন প্রবর্তন করিতে হয়। এইরূপে নূতন আইনের দ্বারাও রাষ্ট্র মানুষের ঔচিত্যবোধ সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে। ভারতে রাষ্ট্রীয় আইনের সাহায্যে সতীদাহ প্রথা বন্ধ হইলে মানুষের নীতিজ্ঞান বৃদ্ধির ফলে এই প্রথা আপনা হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে।

3. Law is the condition of liberty. Explain. H. S. (Com.) 1960

স্বাধীনতা আইনের উপর নির্ভরশীল—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

উঃ—সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় মানুষের নিজ ইচ্ছানুসারে কাজ করিবার অবাধ ক্ষমতা। কিন্তু এরূপ স্বাধীনতার ফল হইল স্বেচ্ছাচারিতা। এই স্বেচ্ছাচারিতার ফলে অন্যের স্বাধীনতা নষ্ট হয়। আমার যদি যাহা খুসী তাহা করিবার অবাধ ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে অন্য লোকের স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। সকলে যাহাতে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে, সেইজন্য রাষ্ট্র মানুষের অবাধ ক্ষমতার উপর কতকগুলি বিধি-নিষেধ আরোপ করিয়া অবাধ স্বাধীনতাকে প্রকৃত স্বাধীনতায় পরিণত করে। সুতরাং স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হইল নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা—যে স্বাধীনতা অপর লোকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না।

স্বাধীনতার আবার বিভিন্ন রূপ আছে, যথা, (১) পৌর স্বাধীনতা, (২) রাজনৈতিক স্বাধীনতা, (৩) জাতীয় স্বাধীনতা।

(১) পৌর স্বাধীনতা ব্যতীত ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববিকাশ সম্ভব হয় না। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা, স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা, বাক্-স্বাধীনতা প্রভৃতি কতকগুলি অধিকারের সমষ্টিকে পৌর স্বাধীনতা বলা হয়।

(২) প্রত্যেক বয়স্ক ও যোগ্য ব্যক্তির ভোট দিবার ও ভোট পাইবার ক্ষমতা, যোগ্য হইলে সরকারী কাজে নিযুক্ত হইবার অধিকার প্রভৃতির সমষ্টিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলা হয়।

(৩) জাতীয় স্বাধীনতার অর্থ হইল ভিন্ন রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন সমষ্টিগত জীবন পরিচালনার অধিকার। এই স্বাধীনতার অবর্তমানে কোন জাতিই পৌর বা রাজনৈতিক অধিকার যথাযথভাবে ভোগ করিতে পারে না।

উত্তরের অপরাংশের জন্য ১নং প্রশ্নের উত্তরের শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য।

4. What is meant by the term Sovereignty? How far is sovereignty consistent with Individual liberty?

সার্বভৌমিকতা বলিতে কি বুঝ। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিকতা কতদূর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উঃ—সার্বভৌমত্ব হইল রাষ্ট্রের আদিম ও চরম ক্ষমতা—যে ক্ষমতার বলে দেশের সকল লোক ও সকল প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে এবং বিদেশী রাষ্ট্রের সম্পর্কেও সেই রাষ্ট্র সম্পূর্ণ স্বাধীন। রাষ্ট্র গঠনের সর্বপ্রধান উপাদান হইল এই সার্বভৌম শক্তি। এই শক্তি ব্যতীত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না এবং এই উপাদানটিই রাষ্ট্রকে সামাজিক অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হইতে স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে। সার্বভৌম ক্ষমতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই ক্ষমতা অসীম—ইহা দেশের অভ্যন্তরের বা বৈদেশিক কোন শক্তি দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। দ্বিতীয়তঃ, এই ক্ষমতা অবিভাজ্য অর্থাৎ ইহার বিভাগ সম্ভব নয়। তৃতীয়তঃ, এই ক্ষমতা স্থায়ী। রাষ্ট্র ব্যতীত এই ক্ষমতার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, আবার এই ক্ষমতা ব্যতীত রাষ্ট্র থাকিতে পারে না। সরকারের পরিবর্তনে এই ক্ষমতার কোন ব্যত্যয় হয় না। চতুর্থতঃ, এই ক্ষমতা হস্তান্তরযোগ্য নহে। সার্বভৌম ক্ষমতার আবার দুইটি রূপ আছে, যথা, আইনগত সার্বভৌমত্ব (Legal Sovereignty) ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব (Political Sovereignty)।

এখন প্রশ্ন হইল রাষ্ট্রের এই অসীম ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা কি পরস্পর বিরোধী? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, রাষ্ট্রের এই অবাধ ক্ষমতার বর্তমানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। কিন্তু একটু বিশদভাবে আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিরোধী নহে, পরন্তু এই ক্ষমতা ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করে ও ইহার প্রয়োগক্ষেত্র প্রসারিত করে।

স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নয়। স্বেচ্ছাচারিতার ফলে অন্যের স্বাধীনতা নষ্ট হয়। আমার যদি যাহা খুশী তাহা করিবার অবাধ ক্ষমতা থাকে, তাহা হইল অন্য লোকের স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। সকলে যাহাতে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে, সেইজন্য রাষ্ট্র মানুষের অবাধ ক্ষমতার উপর কতকগুলি বিধি-নিষেধ আরোপ করিয়া অবাধ স্বাধীনতাকে প্রকৃত স্বাধীনতায় পরিণত করে। এই বিধি-নিষেধগুলিকে আইন বলা হয়। আইনের উদ্দেশ্য হইল প্রত্যেক ব্যক্তিকে অপরের স্বাধীনতার হানি না করিয়া নিজ স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ দেওয়া। রাষ্ট্র যদি ইহার সার্বভৌমশক্তির সাহায্যে এই বিধি-নিষেধগুলি সমাজে বলবৎ না করিত, তাহা হইলে মানবসমাজের অবস্থা হব্স্ বর্ণিত প্রাকৃতিক পরিবেশের 'জোর যার মুল্লুক তার' অবস্থার অনুরূপ হইত।

সুতরাং প্রকৃত স্বাধীনতার অধিকারী হইতে হইলে এই সার্বভৌমশক্তিকে মানিয়া লইতে হইবে। নতুবা একজনের স্বাধীনতা অধিকতর শক্তিশালী বা চতুর ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। কাজেই সার্বভৌমশক্তি ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার মধ্যে কোন অসংগতি নাই।

সপ্তম অধ্যায়

সরকার

(The Government)

সরকারের বিভিন্ন রূপ—Forms of Government

প্রত্যেকটি রাষ্ট্র একই উপাদনে—জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূ-ভাগ, সরকার ও সার্বভৌমশক্তি—গঠিত বলিয়া রাষ্ট্রের শ্রেণী-বিভাগ করা সম্ভব নয়। কিন্তু বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরণের শাসন-ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। শাসন-ব্যবস্থার এই বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টট্ল্ বিশদ আলোচনা করেন।

অ্যারিস্টট্লের শ্রেণী-বিভাগ—Aristotle's Classification

অ্যারিস্টট্লের রচনায় দুই প্রকারের শাসন-ব্যবস্থার উল্লেখ দেখা যায়। যথা, স্বাভাবিক (Normal) ও বিকৃত (Perverted)। জনকল্যাণের জন্য যে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়, সেই শাসন-ব্যবস্থাকে তিনি স্বাভাবিক শাসন-ব্যবস্থা আখ্যা দিয়াছেন। আর যে শাসন-ব্যবস্থা শুধুমাত্র শাসকশ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত হয়, তাহাকে তিনি বিকৃত শাসন-ব্যবস্থা বা কু-শাসন বলেন। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের শাসন-ক্ষমতা যাঁহারা পরিচালনা করেন, তাঁহাদের সংখ্যানুসারে স্বাভাবিক ও বিকৃত এই দুইটি প্রধান শ্রেণীকে আরও কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেন।

অ্যারিস্টট্ল্ নিম্নলিখিতভাবে সরকারের শ্রেণী-বিভাগ করেন।

শাসন-ক্ষমতা পরিচালনাকারীর সংখ্যা	স্বাভাবিক	বিকৃত
একব্যক্তি	রাজতন্ত্র	স্বৈরতন্ত্র
একাধিক ব্যক্তি (একটি সংসদ)	অভিজাত-তন্ত্র	ধনিকতন্ত্র
বহুব্যক্তি (জনসাধারণ)	গণতন্ত্র	বিকৃত গণতন্ত্র

অ্যারিস্টট্লের এই শ্রেণী-বিভাগের বিরুদ্ধে সমালোচনা হইয়াছে। তিনি যে

নীতি-অনুসারে **সরকারের** শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছিলেন তাহা বর্তমান যুগে অচল। বর্তমান যুগের শাসন-ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিশ্রধরণের। কোন দেশেও নিছক রাজতন্ত্র অথবা অভিজাত-তন্ত্র বা গণতন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় রাজতন্ত্র, অভিজাত-তন্ত্র ও গণতন্ত্রের সংমিশ্রণ দেখা যায়। ইংলণ্ডের রাণী রাজতন্ত্রের প্রতীক, লর্ড সভা অভিজাত-তন্ত্রের প্রতীক, আর কমন্স সভা হইল গণতন্ত্রের প্রতীক। ইহা ছাড়া, অ্যারিস্টট্লের শ্রেণী-বিভাগে আধুনিক এককেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রভৃতি শাসন-ব্যবস্থার কোন স্থান নাই।

অ্যারিস্টট্লের শ্রেণী-বিভাগ প্রধানতঃ নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আধুনিককালেও যখন ভাল ও মন্দ রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য করা হয়, তখন কোন রাষ্ট্রকে পুলিসি রাষ্ট্র বা যুদ্ধবাদী রাষ্ট্র বলা হয়, আবার কোনটিকে বা কল্যাণ-রাষ্ট্র বলা হয়। জনসাধারণের হিতসাধন করাই হইল আধুনিক কল্যাণ-রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষণ। সুতরাং রাষ্ট্রের শ্রেণী-বিভাগের ক্ষেত্রে বর্তমান যুগে অ্যারিস্টট্লের নৈতিক মানের গুরুত্ব বিশেষ হ্রাস পায় নাই।

আধুনিক শ্রেণী-বিভাগ—Modern Classification

বর্তমানকালে নিম্নলিখিতভাবে শাসন-ব্যবস্থার শ্রেণী-বিভাগ করা হয়।

১। রাজতন্ত্র, ২। অভিজাত-তন্ত্র, ৩। গণতন্ত্র, ৪। একনায়ক-তন্ত্র, ৫। আমলাতন্ত্র।

রাজতন্ত্র—Monarchy

যে শাসন-ব্যবস্থায় রাজাই হইলেন শাসন-ব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি, তাহাকে রাজতন্ত্র বলা হয়। এই ব্যবস্থায় সরকারের সমস্ত শাসন-ক্ষমতা রাজার হস্তে ন্যস্ত থাকে। রাজতন্ত্র সাধারণতঃ জন্মগত উত্তরাধিকারের উপর নির্ভর করে। কদাচিৎ রাজা আবার জনগণদ্বারা নির্বাচিতও হইতে পারেন। প্রাচীন পোলাণ্ডে এইরূপ নির্বাচিত রাজা ছিলেন।

রাজতন্ত্র আবার **অবাধ রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy)** ও **নিয়মতান্ত্রিক বা সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র (Constitutional or Limited Monarchy)** হইতে পারে। অবাধ রাজতন্ত্রে একমাত্র রাজার ইচ্ছায়ই শাসন-কার্য পরিচালিত হয়। এই শাসন-ব্যবস্থায় শাসিতের ইচ্ছার কোন স্থান নাই। প্রাচীনকালে ইংলণ্ড, ফরাসী প্রভৃতি দেশে এই শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

অবাধ রাজতন্ত্রের সুবিধা হইল যে, একমাত্র রাজার হস্তে ক্ষমতা থাকে বলিয়া রাজা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন এবং রাজা প্রজাবৎসল হইলে তাহাদের নানাবিধ হিতসাধন করিতে পারেন। কিন্তু এই শাসন-ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল যে, শাসন-কার্যে জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা জন্মিতে পারে না। রাজা অত্যাচারী হইলে জনসাধারণের আদৌ কোন স্বাধীনতা থাকে না এবং স্বাধীনতার অভাবে তাহাদের ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে একজন রাজা শাসন-ব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় হইলেও কার্যতঃ তাঁহার কোন ক্ষমতা থাকে না। তাঁহার সমস্ত ক্ষমতাই জনগণের প্রতিনিধিগণের দ্বারা গঠিত মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হয়। ইংলণ্ডে এই শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এইজন্য ইংলণ্ডের রাজার সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি রাজত্ব করেন কিন্তু শাসন করেন না (He reigns but does not govern)।

অভিজাত-তন্ত্র—Aristocracy

দেশের শাসনকার্য যখন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের সাহায্যে পরিচালিত হয়, তখন তাহাকে অভিজাত-তন্ত্র বলা হয়। জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির সংখ্যা স্বভাবতঃই কম বলিয়া অনেক সময় অভিজাত-তন্ত্রকে অল্পসংখ্যক লোকের দ্বারা পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা বলা হইত। পুরাকালে শাসনকার্যে গুণ বলিতে অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য বুঝাইত, যথা, অভিজাত বংশে জন্মলাভ, বিত্তসম্পদ, সামরিক খ্যাতি প্রভৃতি। বর্তমান যুগে অভিজাত-তন্ত্র অচল হইলেও প্রত্যেক দেশের শাসন-ব্যবস্থায় দেখা যায় যে, দেশের প্রকৃত শাসকগোষ্ঠী প্রায়ই উচ্চবংশজাত ও ধনিক শ্রেণী হইতেই নির্বাচিত হন।

গণতন্ত্র—Democracy

গণতন্ত্র বলিতে এমন একটি শাসন-ব্যবস্থা বুঝায়, যেখানে শাসন-ক্ষমতার প্রধান উৎস হইল জনসাধারণ এবং জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এ সম্পর্কে পরে বিশদ আলোচনা আছে।

একনায়ক-তন্ত্র—Dictatorship

একনায়ক-তন্ত্র রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা একটি রাজনৈতিক দল দ্বারা সমর্থিত এক-

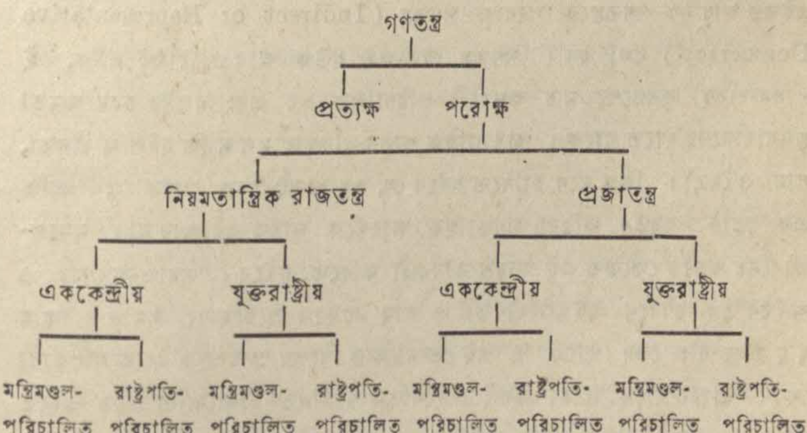
জন নেতার হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানীতে নাৎসীদল কর্তৃক সমর্থিত নেতা হিট্‌লারই ছিলেন জার্মানীর ভাগ্য-বিধাতা। একনায়ক-তন্ত্র সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা পরে করা হইবে।

আমলাতন্ত্র—Bureaucracy

যখন শাসনকার্য একদল স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের সাহায্যে পরিচালিত হয়, তখন তাহাকে আমলাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বলা হয়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা যোগ্যতা স্থির করিয়া এই কর্মচারিগণকে সরকারী কার্যে নিযুক্ত করা হয়। ইঁহারা অত্যধিক পরিমাণে ধরা-বাঁধা নিয়মের দাস হইয়া পড়েন, সেজন্য সরকারী কার্যে বিলম্ব হয়। জনসাধারণের সহিত ইঁহাদের বিশেষ কোন সংযোগ থাকে না বলিয়া ইঁহারা জনসাধারণের স্বার্থ-সম্পর্কে উদাসীন থাকেন। আমলাতান্ত্রিক সরকার সাধারণতঃ সুদক্ষ হয়।

গণতন্ত্র ও ইহার বিভিন্নরূপ—Democracy and its different forms

শাসন-ব্যবস্থাকে সাধারণতঃ গণতন্ত্র ও একনায়ক-তন্ত্র এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা আবার নানাপ্রকারের হইতে পারে। নিম্নে গণতন্ত্রের বিভিন্ন রূপের একটা তালিকা দেওয়া হইল।



গণতন্ত্র—Democracy

গণতন্ত্র শব্দটি Demos ও Cratos এই দুইটি গ্রীক শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। Demos শব্দটির অর্থ হইল জনসাধারণ এবং Cratos শব্দটির অর্থ হইল ক্ষমতা।

সুতরাং গণতন্ত্র শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল গণশাসন অর্থাৎ যে শাসন-ব্যবস্থায় জনগণই হইল শাসন-ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী। এই শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ এব্রাহাম লিঙ্কন্ অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, জনসাধারণকে লইয়া জনসাধারণের কল্যাণে জনসাধারণকর্তৃক যে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয় (Government of the people, for the people and by the people.) তাহাকেই গণতন্ত্র বলা হয়। জনসাধারণকে লইয়া ও জনসাধারণের কল্যাণে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হইতে পারে, কিন্তু জনসাধারণ দ্বারা শাসন-কার্য কিভাবে পরিচালিত হইতে পারে ইহা চিন্তার বিষয়।

প্রাচীন গ্রীস ও রোমের রাষ্ট্রগুলি ছিল ছোট ছোট নগর-রাষ্ট্র। ক্রীতদাসশ্রেণীর লোকের শাসন-ক্ষমতায় কোন অধিকার ছিল না। মুষ্টিমেয় লোক প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিত এবং শাসনকার্যে যাহারা অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতার অধিকারী ছিল, তাহাদিগকেই নাগরিক বলা হইত। বর্তমান যুগে দেশজোড়া বৃহৎ রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে এবং এই রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসীমাত্রই হইল রাষ্ট্রের নাগরিক। এইরূপ বৃহৎ রাষ্ট্রের সমগ্র নাগরিকের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব নহে। তাই নাগরিকগণ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং শাসনকার্য এই নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক পরিচালিত হয়। এইজন্য আধুনিক গণতন্ত্রকে পরোক্ষ গণতন্ত্র (Indirect or Representative Democracy) বলা হয়। গণতন্ত্র প্রত্যক্ষই হউক আর পরোক্ষই হউক, এই শাসন-ব্যবস্থা জনগণের মত অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে থাকে। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার মূল নীতি হইল স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'জন প্রতি এক ভোট' প্রবর্তন করিয়া গণতান্ত্রিক আদর্শকে সার্থক করা যায় না। সমাজ-জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই আদর্শ কার্যকরী করিতে হইবে। সমাজ-ব্যবস্থায় ও অর্থনৈতিক জীবনে এই স্বাধীনতা ও সাম্য একান্ত প্রয়োজন। সমাজ-ব্যবস্থায় যদি উচ্চ-নীচ ভেদ থাকে ও এই ভেদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অধিকারী কোন সম্প্রদায় থাকে, তাহা হইলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধনী ও দরিদ্রের গুরুতর পার্থক্য থাকিলে গণতন্ত্র সফল হয় না। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত না করিতে পারিলে গণতান্ত্রিক আদর্শ পূর্ণ হয় না। ভারতে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নূতন শাসনতন্ত্রে অস্পৃশ্যতাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। মন্দির,

জলাশয়, হোটেল, বিদ্যালয় প্রভৃতি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হইয়াছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও জমিদারী-প্রথার বিলোপসাধন, অনেক বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ ও নানাবিধ শ্রমিক-কল্যাণকর আইন-প্রণয়ন দ্বারা প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপন করিবার পথের বাধা দূর করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুতরাং গণতন্ত্র বলিতে এমন একটি শাসন-ব্যবস্থা বুঝায়, যে-ব্যবস্থায় সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই সমান সুযোগ-সুবিধা পাইয়া তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ করিতে পারে।

গণতন্ত্রের গুণ—Merits of Democracy

(ক) গণতন্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহার কারণ হইল যে, এই ব্যবস্থায় যাঁহারা শাসন করেন তাঁহারা জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকেন। ইহাতে শাসকশ্রেণী যাহা খুশী তাহা করিতে পারেন না। শাসকগণ জনগণদ্বারা নির্বাচিত ও জনগণের নিকট দায়ী বলিয়া সর্বদা সতর্ক থাকেন ও জনমত অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

(খ) এই শাসন-ব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকই তাহার ন্যায্য অধিকার রক্ষা করিবার সুযোগ পায়। অন্য কোন শাসন-ব্যবস্থায় জনস্বার্থ এরূপভাবে রক্ষা হয় না।

(গ) গণতন্ত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশ-গ্রহণ করিতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তিই শিখে যে, সে রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এই মনোভাব ব্যক্তিকে স্বদেশপ্রেমিক করে ও তাহার রাজনৈতিক চেতনা জাগরিত করিয়া তাহাকে সু-নাগরিক করে।

(ঘ) গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রধান গৌরব হইল যে, মূঢ় ও মূক জনগণকে ভোটদান করিবার ক্ষমতা দিয়া ইহা তাহাদিগকে নিজ নিজ অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করে। ইহাতে সাধারণ লোকের মনুষ্যত্ব বিকাশ লাভ করে।

(ঙ) এই শাসন-ব্যবস্থায় সমষ্টিগত জীবনের সর্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণ সাধিত হয়; প্রত্যেক ব্যক্তি "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"—এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নিজ শক্তি অনুযায়ী সমষ্টিগত কল্যাণসাধনে সহায়তা করে। ফলে ব্যক্তি ও সমষ্টির মঙ্গল হয়।

(চ) গণতন্ত্র মানুষে মানুষে পার্থক্য দূর করিয়া স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করে।

গণতন্ত্রের দোষ—Defects of Democracy

গণতন্ত্র সবচেয়ে উৎকৃষ্ট শাসন-ব্যবস্থা হইলেও ইহার যে একেবারেই কোন ত্রুটি নাই, একথা বলা চলে না। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি সচরাচর দেখা যায়।

(ক) গণতান্ত্রিক শাসনের অর্থ হইল, যাহারা সংখ্যায় বেশী তাহাদের শাসন। সুতরাং গণতন্ত্রে গুণ ও যোগ্যতা অপেক্ষা সংখ্যার উপর বেশী জোর দেওয়া হয়। সংখ্যাধিক্যের উপর জোর দেওয়ার ফলে গণতন্ত্র অনেক ক্ষেত্রে অক্ষম ও বিকৃত গণতন্ত্র অর্থাৎ অযোগ্য লোকের দ্বারা পরিচালিত কু-শাসনে পরিণত হয়।

(খ) গণতন্ত্রের আদর্শ অনুযায়ী মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য করা হয় না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গণতন্ত্রের কাজ অল্পসংখ্যক চতুর ও বিবেকবর্জিত লোক দ্বারা পরিচালিত হয়। ইহারা ছলে-বলে-কৌশলে অজ্ঞ জনসাধারণের ভোট সংগ্রহ করিয়া নিজেদের স্বার্থে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করে।

(গ) গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় যে আইন তৈয়ারী হয়, তাহাও যে দলের হাতে ক্ষমতা থাকে সেই দলের স্বার্থের জন্যই রচিত হয়। ইহাতে অন্যান্য দলের স্বার্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নষ্ট হয়।

(ঘ) গণতন্ত্র অজ্ঞলোকের দ্বারা পরিচালিত সংখ্যাধিক্যের শাসন-ব্যবস্থা। সুতরাং এই শাসন-ব্যবস্থায় গুণ ও যোগ্যতার সমাদর হয় না। ফলে সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান যেগুলির চর্চা মানুষের অধ্যাত্ম জীবন-গঠনের সহায়ক, সেগুলি উপযুক্তভাবে সমাদর পায় না।

(ঙ) এই শাসন-ব্যবস্থার প্রধান দোষ হইল যে, ইহা স্থায়ী হইতে পারে না। নির্বাচকমণ্ডলীর ইচ্ছার উপর ইহার স্থায়িত্ব নির্ভর করে এবং নির্বাচকমণ্ডলী খুসীমত ইহার পরিবর্তন করিতে পারে। স্থায়ী নয় বলিয়া এই শাসন-ব্যবস্থায় কোন দীর্ঘমেয়াদী জনহিতকর নীতি বা গঠনমূলক কার্য সম্ভব নহে।

গণতন্ত্রের সাফল্যের উপাদান—Essential conditions for the success of Democracy

রাজতন্ত্রে, অভিজাত-তন্ত্রে বা একনায়ক-তন্ত্রে এক ব্যক্তি বা অল্পসংখ্যক ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা থাকে, কিন্তু গণতন্ত্রে জনসাধারণ দ্বারা শাসনকার্য পরিচালিত

হয়। সুতরাং গণতন্ত্রের সাফল্য যে জনসাধারণের বিচারবুদ্ধি, দায়িত্ববোধ ও কর্মক্ষমতার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ইংরাজ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে গণতন্ত্রের সাফল্য প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, দেশের লোকের শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকা চাই। দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণকে তাহাদের অধিকার রক্ষা করিবার জন্য সর্বদা সজাগ থাকিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, জনসাধারণকে তাহাদের কর্তব্যপালনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সুতরাং গণতন্ত্রের সাফল্য অনেক পরিমাণে নাগরিকগণের অধিকার রক্ষা করিবার দৃঢ়সঙ্কল্প ও কর্তব্যপালনে তৎপরতা—এই দুইটি গুণের উপর নির্ভর করে। এজন্য চাই বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষিত নাগরিক। সু-শিক্ষার বিস্তার ব্যতীত সু-নাগরিক সৃষ্টি হইতে পারে না। সুতরাং গণতন্ত্র সফল করিতে হইলে দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার করিয়া তাহাদের মধ্যে বিচারবুদ্ধি ও কর্তব্যবোধ সঞ্চারিত করিতে হইবে। জনমতই হইল গণতন্ত্রের প্রকৃত ভিত্তি। সুতরাং প্রকৃত শিক্ষাদ্বারা জনমতকে সুশিক্ষিত ও সুসংবদ্ধ করিতে পারিলে গণতন্ত্রের সাফল্য নিশ্চিত।

অনেক দেশে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য একনায়ক-তন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে লোকের মনে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিফল প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা সত্য যে, গণতন্ত্র সবসময়ে মানুষের স্বাধীনতা ও সাম্য আনিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিয়া অভিজাত-তন্ত্র বা একনায়ক-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যুক্তিযুক্ত নহে। মোটর-যান মধ্যে মধ্যে অচল হয় বলিয়া গো-যান প্রবর্তন করা যেরূপ নির্বোধের কার্য, গণতন্ত্রের দোষ-ত্রুটির জন্য গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা পরিহার করিয়া একনায়ক-তন্ত্র বা অভিজাত-তন্ত্র গ্রহণ করাও সেইরূপ নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। আসল কথা হইল গণতন্ত্রের দোষ-ত্রুটি দূর করিয়া ইহার প্রকৃত সার্বজনীন রূপ দিতে হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, নাগরিকগণের কর্মক্ষমতা ও দায়িত্ববোধের উপর গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। নাগরিকগণ যদি তাহাদের অধিকার-রক্ষায় ও কর্তব্যপালনে তৎপর হন, তাহা হইলে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার সাফল্য অবধারিত। এজন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে সকলে যাহাতে সমান অধিকার পায় তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

পরোক্ষ গণতন্ত্রে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ—Methods of Direct Democracy as applied to Indirect Democracy

বর্তমান যুগে রাষ্ট্রগুলির দেশজোড়া আয়তন ও বহু জনসমষ্টি লইয়া গঠিত বলিয়া জনসাধারণের পক্ষে আর প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাই তাহারা প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া এই প্রতিনিধিদের হস্তে শাসনভার ন্যস্ত করে। প্রতিনিধিদের হস্তে শাসনভার ছাড়িয়া দিলেও অনেক সময়ে ভোটদাতাগণ আইন-প্রণয়নে সরাসরিভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। সুইজারল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় এইরূপ প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিগুলি হইল চারি প্রকার।

১। গণনির্দেশাধিকার—Referendum

এই ব্যবস্থায় আইনসভা যে আইনের প্রস্তাব করে, সেই প্রস্তাব জনসাধারণের বিবেচনার জন্য পাঠান হয়। যদি ভোটদাতাগণ অধিক সংখ্যার ভোটে প্রস্তাবটি সমর্থন করে, তাহা হইলে প্রস্তাবটি আইনে পরিণত হয়। আইনসভার আর পৃথক অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না।

২। গণ-প্রস্তাব অধিকার—Initiative

ভোটদাতাগণ যদি মনে করেন যে, কোন বিষয়ে আইন তৈয়ারী করা প্রয়োজন, তাহা হইলে নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোটদাতা সেই আইনের একটা প্রস্তাব আইনসভার নিকট পাঠাইতে পারে। আইনসভা সেই আইনের প্রস্তাবটিকে ভোটদাতাগণের সম্মতির জন্য পুনরায় পাঠাইতে পারে। যদি ভোটদাতাগণ সংখ্যাধিক্যে প্রস্তাবটি পাস করে, তাহা হইলে তাহা আইনে পরিণত হয়।

সুতরাং দেখা যায় যে, প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্যে ভোটদাতাগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করিলেও শাসন-ব্যাপারে একেবারে উদাসীন থাকিতে পারে না। প্রতিনিধিগণও খুসীমত কাজ করিতে পারে না।

৩। গণভোট—Plebiscite

গণভোট অনেকটা গণনির্দেশাধিকারের অনুরূপ। গণভোট সাহায্যে শাসন-কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীতি স্থির করিবার জন্য জনমত গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে ভারত-বিভাগের সময় আসাম রাজ্যের শ্রীহট্ট জেলা ভারতের অন্তর্ভুক্ত

হইবে, না পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইবে, ইহা নির্ণয় করিবার জন্য গণভোট গ্রহণ করা হইয়াছিল।

৪। প্রত্যাবর্তনের আদেশ—Recall

নির্বাচিত প্রতিনিধির কার্যে যদি ভোটদাতাগণ অসন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে এই ব্যবস্থার দ্বারা তাঁহার পরিবর্তে অন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। কিছুসংখ্যক ভোটদাতা নির্বাচিত প্রতিনিধির নির্বাচন বাতিল করিয়া নূতন নির্বাচনের দাবী করিতে পারেন। যদি দ্বিতীয়বারের নির্বাচনে পূর্বনির্বাচিত প্রতিনিধি নির্বাচিত না হন, তাহা হইলে তাঁহাকে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পদত্যাগ করিতে হয়।

উপরি-উক্ত ব্যবস্থাগুলির দ্বারা একদিকে যেরূপ জনসাধারণকে শাসনকার্যে সক্রিয় ও উৎসাহী করা যায়, অপরদিকে সেইরূপ শাসকশ্রেণীর দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি হয়। জনসাধারণ যদি তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে সজাগ থাকে, তাহা হইলে আইনসভা বা শাসন-কর্তৃপক্ষ তাহাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হয় না।

কিন্তু এই ব্যবস্থাগুলির দোষ হইল যে, ইহাতে প্রতিনিধিগণের দায়িত্ববোধ কমিয়া যায়, কারণ তাঁহারা জানেন যে, ভোটদাতাগণ ইচ্ছা করিলেই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত বাতিল করিতে পারেন। বহু জনসমষ্টি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রেও সচরাচর এই পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। ইহা ছাড়া, জনসাধারণের উপর আইন-তৈয়ারীর ও শাসননীতি নির্ধারণের ভার ন্যস্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়।

একনায়ক-তন্ত্র—Dictatorship

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে আধুনিক একনায়ক-তন্ত্রের জন্ম হয়। যুদ্ধের পরে রাশিয়া, ইতালি, জার্মানী, পোলাণ্ড প্রভৃতি ইউরোপের কয়েকটি দেশে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশের পুনর্গঠন সমস্যা ও বেকার সমস্যাই ছিল প্রধান সমস্যা। এ সমস্যাগুলির সমাধান করিতে সেই সময়কার সরকার সম্পূর্ণ অকৃতকার্য হয়। ফলে, দেশের গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার উপর জনসাধারণের আস্থা কমিয়া যায়। এই সুযোগে একনায়ক-তন্ত্রের আবির্ভাব হয়। রুশ দেশে এই সময়ে যে বিপ্লব ঘটে তাহার ফলে সেই দেশে সাম্যবাদী দল শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিয়া দলীয় একনায়ক-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। রুশ দেশের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্যান্য অনেক দেশেই এই একনায়ক-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু

ইতালি ও জার্মানদেশে একনায়ক-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইতালির ফ্যাসিস্ট-নেতা মুসোলিনি ও জার্মানীর নাৎসী-নায়ক হিট্‌লার রুশীয় সাম্যবাদ গ্রহণ করেন নাই।

একনায়ক-তন্ত্রের মূলনীতি হইল এক জাতি, এক রাষ্ট্র ও এক নায়ক। একনায়ক-তন্ত্রে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা দলের নেতার উপর ন্যস্ত হয় ও রাষ্ট্রের সকল কার্যকলাপই দলের নায়কের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। একনায়ক-তন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার অধীনে একটি মাত্র দল থাকে ও নেতা হইলেন দলের সর্বময় কর্তা। দেশে অন্য কোন রাজনৈতিক দল থাকিতে দেওয়া হয় না। বল-প্রয়োগ করিয়া অন্য দলগুলিকে বিনষ্ট করা হয়। অবাধ দলীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য দলের নেতা ব্যক্তির সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটি কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। এই উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষা, সাহিত্য, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র, বেতার প্রভৃতি সব কিছুই রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয়। একনায়ক-তন্ত্র অনুসারে রাষ্ট্রই হইল সর্বশক্তিমান এবং এই সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তির কোনও অভিযোগ দূরের কথা, কোন অধিকারও থাকিতে পারে না। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র ও দলীয় নেতৃত্ব অভিন্ন হইয়া রাষ্ট্রের ইচ্ছা নেতার ইচ্ছায় পরিণত হয়।

গণতন্ত্র ও একনায়ক-তন্ত্র—Democracy and Dictatorship

গণতন্ত্রের ভিত্তি হইল স্বাধীনতা ও সাম্য। কিন্তু একনায়ক-তন্ত্রে ইহাদের কোন স্থান নাই। গণতন্ত্র ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বীকার করে এবং রক্ষা করে, একনায়ক-তন্ত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় না। গণতন্ত্রে বিভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক দল থাকিতে পারে, কিন্তু একনায়ক-তন্ত্রে একটি মাত্র দল থাকে। অন্য দলগুলির অস্তিত্ব বরদাস্ত করা হয় না। গণতন্ত্র পারস্পরিক সম্মতি, সুবিধা ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত, আর একনায়ক-তন্ত্র হইল দলীয় স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য একনায়ক-তন্ত্রে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী, জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও দলীয় স্বার্থ, জাতীয় স্বার্থ বলিয়া গণ্য করা হয়। গণতন্ত্রে শাসকশ্রেণী শাসিতের নিকট তাহাদের কাজের জন্য দায়ী থাকে। একনায়ক-তন্ত্রে শাসকের আদৌ কোন দায়িত্ব নাই। সুতরাং গণতন্ত্র ও একনায়ক-তন্ত্র দুইটি পরস্পর-বিরোধী আদর্শ।

একনায়ক-তন্ত্রের গুণ—Merits of Dictatorship

একনায়ক-তন্ত্রের যে কোন গুণ নাই একথা বলা ঠিক নহে। এই শাসন-ব্যবস্থায় জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। একনায়ক-তন্ত্র জটিল সমস্যাসমূহের দ্রুত

সমাধান করিতে পারে। একটি মাত্র দলের উপর ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে বলিয়া একনায়ক-তন্ত্র যুদ্ধ প্রভৃতি জরুরী অবস্থায় জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করিতে অধিকতর সাহায্য করে। সু-নাগরিক সৃষ্টি করিতেও একনায়ক-তন্ত্রের কার্যকারিতা কম নহে। রুশ দেশে একনায়ক-তন্ত্র জনগণকে অনেক ক্ষেত্রে স্বদেশপ্রেমিক করিয়া তাহাদের আত্মত্যাগ দ্বারা জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার শিক্ষা দিয়াছে। একনায়ক-তন্ত্রে যে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী ভাব একেবারে বিনষ্ট হয়, তাহা বলা আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও সার্বজনীন শিক্ষাবিস্তারে জার্মানী, ইতালি ও বিশেষ করিয়া রুশ দেশ একনায়ক-তন্ত্রের অধীনে অতি স্বল্পকালের মধ্যে যে অভাবনীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা গণতন্ত্রে কোথাও সম্ভব হয় নাই।

দোষ—Defects

একনায়ক-তন্ত্রের যতই গুণ থাকুক না কেন তাহা সত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, এই শাসন-ব্যবস্থা আদৌ কাম্য নহে। রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য হইল প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমান সুযোগ দিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করা। একনায়ক-তন্ত্রে ব্যক্তির এই ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্ভব নহে, কারণ একনায়ক-তন্ত্র হইল ব্যক্তি-বিশেষের শাসন এবং এই শাসন শেষ পর্যন্ত শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ আইনের শাসন মানিতে চায়, কিন্তু কোন ব্যক্তিবিশেষের শাসনের প্রতি স্বাধীন চিন্তাশীল মানুষের শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না। সুতরাং জনকল্যাণকর হইলেও এই শাসন-ব্যবস্থা কেহই পছন্দ করে না। অনগ্রসর ও অপরাধপ্রবণ জনগণকে শাসন করিবার জন্য একনায়ক-তন্ত্রের উপযোগিতা থাকিতেও পারে, কিন্তু জ্ঞানী, গুণী ও রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন জনগণের ক্ষেত্রে একনায়ক-তন্ত্র ব্যক্তিত্ব-বিকাশের একটা প্রধান অন্তরায় বলিয়া বিবেচিত হয়। একনায়ক-তন্ত্র অনেক সময় উগ্র জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলির উপর আধিপত্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করে। ইহার ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হয় ও জগতের শান্তি নষ্ট হয়। জার্মানী ও ইতালির একনায়ক-তন্ত্রের ইহাই ছিল প্রধান দোষ এইজন্যই তাহাদের পতন ঘটিয়াছিল।

প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র—Republic

যখন বংশানুক্রমিক রাজার পরিবর্তে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান শাসনকর্তা হইয়া থাকেন, তখন তাহাকে প্রজাতন্ত্র বলা হয়। এই শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণের ইচ্ছা পরোক্ষভাবে কার্যকরী হয়। ভারত একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা—Unitary Government

এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, সমগ্র দেশের জন্য একটি শাসন-ব্যবস্থা চালু থাকে এবং একটিমাত্র সরকারের হাতে সমস্ত শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। দেশে বিভিন্ন ধরণের স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা থাকিতে পারে, যেমন, প্রাদেশিক শাসন, জেলা ও মহকুমা শাসন ইত্যাদি। কিন্তু এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই হইল সকল ক্ষমতার অধিকারী। প্রদেশিক বা জেলার সরকারগুলি সর্ববিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের আজ্ঞাধীন। এই স্থানীয় সরকারের নিজস্ব কোন ক্ষমতা থাকে না। তাহারা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মত কাজ করে মাত্র। সুতরাং এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতার কোন ভাগ হয় না। একটিমাত্র সরকার অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারই হইল সর্ববিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। ইংলণ্ড, ফরাসী প্রভৃতি দেশে এই ধরণের শাসনব্যবস্থা দেখা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা—Federal Government

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় একটি কেন্দ্রীয় সরকার ও কতকগুলি স্থানীয় সরকার পাশাপাশি থাকে। সরকারের সমুদয় ক্ষমতা শাসনতন্ত্র দ্বারা দুই ভাগে ভাগ করিয়া একভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেওয়া হয়, অপর ভাগ স্থানীয় সরকার-গুলির (রাজ্য বা প্রাদেশিক) হাতে দেওয়া হয়। এইরূপে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় দুইটি সরকার পাশাপাশি শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং এই উভয় সরকারের শাসন ক্ষমতার সীমা একটি লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বারা নির্ধারিত হয়। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারগুলি নিজ নিজ সীমার মধ্যে স্বাধীনভাবে তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন করে। একে অপরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারগুলির স্থানীয় শাসন-ব্যাপারে স্বাধীন থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বর্তমান ভারত প্রভৃতি হইল যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার উদাহরণ।

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য—Features or Characteristics of a Federal Government

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়:

১। একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির সহ-অস্তিত্ব। যেমন, ভারতে দেশের সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য বিষয়গুলির শাসনকার্য পরিচালনা

করিবার জন্য দিল্লীতে একটি কেন্দ্রীয় সরকার আছে ও স্থানীয় স্বার্থ-সংক্রান্ত বিষয়গুলির পরিচালনার জন্য পশ্চিমবাংলা, বিহার, আসাম প্রভৃতি ১৬টি রাজ্যে স্থানীয় সরকার আছে।

২। সরকারের ক্ষমতাসমূহের বিভাগ ও বণ্টন :

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সরকারের সমুদয় ক্ষমতা ভাগ করিয়া একটা নির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বণ্টন করা হয়।

৩। লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য :

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতার এই বিভাগ শাসনতন্ত্র দ্বারা সম্পাদিত হয়। সুতরাং উভয় সরকারের ক্ষমতার উৎস বলিয়া শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়।

৪। নিরপেক্ষ ও স্বাধীন উচ্চ বিচারালয়ের অবস্থিতি :

শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য হইল যুক্তরাষ্ট্রের একটা বিশেষত্ব। শাসনতন্ত্রের এই প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য সকল যুক্তরাষ্ট্রেই একটি উচ্চ বিচারালয় থাকে। ভারতে এই উদ্দেশ্যে একটি সুপ্রিম কোর্ট সৃষ্টি হইয়াছে।

৫। রাজস্বের বণ্টন-ব্যবস্থা :

যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। ক্ষমতা বণ্টনের সঙ্গে রাজস্বও ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। রাজ্য সরকারগুলি নির্ধারিত রাজস্ব দ্বারা তাহাদের নিজেদের শাসনকার্যের ব্যয় নির্বাহ করে।

এককেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার পার্থক্য—Distinction between Unitary and Federal Governments

১। এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় একটি মাত্র শাসন-ব্যবস্থা থাকে এবং এই শাসন-ব্যবস্থা হইল কেন্দ্রীয় সরকার। যুক্তরাষ্ট্রে দুই জাতীয় সরকার—কেন্দ্রীয় ও স্থানীয়—পাশাপাশি থাকে।

২। এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতার কোন ভাগ হয় না—সমুদয় শাসন-ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে, যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ হয়।

৩। এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারই হইল সমস্ত ক্ষমতার উৎস।

স্থানীয় সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ক্ষমতা পায়। আর যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার উৎস হইল শাসনতন্ত্র। কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারগুলি উভয়েই শাসনতন্ত্র হইতে ক্ষমতা পায়, সুতরাং এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য, আর যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য দেখা যায়।

৪। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র সাধারণতঃ লিখিত ও অনমনীয় হয়। ইহার কারণ হইল যে, যুক্তরাষ্ট্রে দুইটি প্রায় সমান ক্ষমতার অধিকারী সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ হয় বলিয়া ভবিষ্যতে এই ক্ষমতা-ভাগ সম্পর্কে উভয় সরকারের মধ্যে যাহাতে কোন বিরোধ না হয়, সেজন্য এই ক্ষমতা ভাগের বিষয় একটা দলিলে লেখা থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার বা স্থানীয় সরকার কেহই যাহাতে অন্যের বিনা সম্মতিতে এই দলিলে লিখিত ক্ষমতা-ভাগের পরিবর্তন করিতে না পারে, সেজন্য এই দলিল অর্থাৎ শাসনতন্ত্র অনমনীয় অর্থাৎ সহজে পরিবর্তন করা যায় না। কিন্তু এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতার কোন ভাগ হয় না বলিয়া শাসনতন্ত্র লিখিত বা অনমনীয় হওয়ার প্রয়োজন নাও হইতে পারে।

৫। ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারগুলির মধ্যে বিরোধ ঘটিলে যাহাতে সেই বিরোধের নিষ্পত্তি হয়, সেইজন্য যুক্তরাষ্ট্রে একটা সুপ্রিম কোর্ট থাকে। কিন্তু এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় এই জাতীয় আদালতের কোন প্রয়োজন হয় না।

যুক্তরাষ্ট্রের গঠন-পদ্ধতি—Process of Formation of a Federal Government

যুক্তরাষ্ট্র সাধারণতঃ দুইভাবে গঠিত হইতে পারে। প্রথমতঃ, কতকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র একত্রিত হইয়া একটি মাত্র সার্বভৌম ক্ষমতাবিশিষ্ট রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারে। এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সাধারণতঃ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় ও পূর্ব-অবস্থিত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি স্থানীয় সরকারে পরিণত হয় এবং তাহারা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অর্পিত ক্ষমতাগুলি ব্যতীত অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলির অধিকারী হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই পদ্ধতিতে গঠিত হয়।

আবার, একটি বড়দেশের এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে কতকগুলি স্থানীয় সরকারে ভাগ করিয়া নবগঠিত স্থানীয় সরকারগুলির হাতে নির্দিষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়। অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে। ক্যানাডায় এই

পদ্ধতিতে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। ভারতে এই উভয় পদ্ধতির সহযোগে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার বিভাগ—Distribution of powers in a Federal Government

একটি নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার ভাগ করা হয়। যে বিষয়গুলি সমগ্র জাতীয় স্বার্থের সহায়ক বলিয়া সমগ্র দেশে একই ধরণের শাসন-ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়, সেই সমস্ত বিষয় সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনক্ষমতা-ভুক্ত করা হয়। আর যে যে বিষয়গুলি শুধু স্থানীয় স্বার্থ-সম্পর্কিত বলিয়া বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরণের শাসন-ব্যবস্থা প্রয়োজন, সেই সেই বিষয়গুলিকে স্থানীয় সরকারের শাসনক্ষমতা ভুক্ত করা হয়। এই নীতি অনুযায়ী দেখা যায় যে, দেশরক্ষা, রেল, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগ, পররাষ্ট্রসম্পর্ক, টাকা-পয়সা-সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন থাকে, আর কৃষি, জলসেচ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর কর্তৃত্ব স্থানীয় বা প্রাদেশিক সরকারের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আবার কোন কোন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনক্ষমতাসমূহকে দুই ভাগের পরিবর্তে তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যথা, যুক্তরাষ্ট্রীয়, স্থানীয় ও যুগ্ম (concurrent) ক্ষমতা। যুগ্ম ক্ষমতার অর্থ হইল যে, কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়-সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকার উভয়েই আইন প্রণয়ন করিতে পারে। কিন্তু যে যুক্তরাষ্ট্রে এই ব্যবস্থা থাকে সেখানে নিয়ম থাকে যে, একই বিষয়ে উভয় সরকার কর্তৃক তৈয়ারী আইনের মধ্যে যদি বিরোধ হয়, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের তৈয়ারী আইনই বলবৎ হইবে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে এই ব্যবস্থা চালু আছে।

যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ও সাফল্যের উপাদান—Conditions essential to the formation and success of a Federation

যুক্তরাষ্ট্র সব দেশে গঠন করা সম্ভব নয় এবং গঠন করিলেও যে সাফল্যের সহিত কাজ করিবে ইহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা যাহাতে ভালভাবে কাজ করিতে পারে, সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলগুলির পরস্পরের সংলগ্ন (Geographical Contiguity) হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। বিভিন্ন অঞ্চলগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে তাহাদের মধ্যে একতা জন্মিতে পারে

না। একতার অভাবে তাহারা সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিয়া এক জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারে না। পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চল পরস্পরের নিকট হইতে বহুদূরে অবস্থিত বলিয়া উভয় প্রদেশের লোকের মধ্যে মেলামেশা সম্ভব নহে। এইজন্য উভয় এলাকার মধ্যে সহযোগিতার অভাব দেখা যায়। ফলে জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি পাইতে বিলম্ব ঘটিতেছে। ইহা ছাড়াও, যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটি অঞ্চলের মধ্যে রাজনৈতিক দিক দিয়া সমতা (equality) থাকাও একান্ত আবশ্যক। নতুবা কোন যুক্তরাষ্ট্রই সাফল্যের সহিত কাজ করিতে পারে না। যদি কয়েকটি প্রদেশ ভোটের জোরে অধিক ক্ষমতাশালী হয়, তাহা হইলে এই বড় প্রদেশগুলি দলবদ্ধভাবে ছোট ছোট প্রদেশগুলির উপর আধিপত্য করিতে পারে। ভারতের পার্লামেণ্ট সভায় উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই, বিহার প্রভৃতি রাজ্যের সদস্যসংখ্যা এত বেশী যে, তাহাদের একত্রিত ভোট সাহায্যে তাহারা সর্বভারতীয় বিষয়ে যে-কোন নীতি নির্ধারণ করিতে পারে। এই জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার উচ্চকক্ষ সিনেট ছোট-বড় সকল রাজ্যগুলি হইতে সমান সংখ্যক অর্থাৎ দুইজন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য দেশের জনসাধারণের শিক্ষা, একাত্মবোধ ও কর্মদক্ষতাও একান্ত প্রয়োজন।

এককেন্দ্রীয় সরকারের সুবিধা—Advantages of Unitary Government

এক কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম সুবিধা হইল যে, দেশের সর্বত্র একই ধরণের আইন ও একই রকমের শাসন-ব্যবস্থা চালু থাকে। দ্বিতীয়তঃ, একই শাসন ব্যবস্থা চালু থাকে বলিয়া শাসন-ব্যয়ও কম হয়। তৃতীয়তঃ, জরুরী অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে।

অসুবিধা—Disadvantages

এই ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল যে, স্থানীয় সরকারগুলির কোন বিষয়ে এমন কি স্থানীয় শাসন-ব্যাপারেও কোন হাত থাকে না, কাজেই স্থানীয় সমস্যাগুলির দ্রুত সন্তোষজনক কোন সমাধান বা আদৌ কোন সমাধান হয় না। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় সরকারের এই অত্যধিক ক্ষমতার জন্য স্থানীয় লোক শাসন-কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। ইহাতে গণতন্ত্রের আদর্শ অর্থাৎ জনগণের দ্বারা পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়। তৃতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সব কাজ ন্যস্ত থাকে বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সব কাজ ঠিকমত করা সম্ভব হয় না।

যুক্তরাষ্ট্রের সুবিধা—Advantages of Federal Government

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার অনেক সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থার দ্বারা একটি খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন দেশকে একত্রিত করা যায়। অথচ এই একতার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলগুলি তাহাদের স্বতন্ত্র স্থানীয় সরকারের সাহায্যে তাহাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যে দেশে নানা ভাষা-ভাষী ও নানা ধর্মের লোক থাকে, এই ব্যবস্থার দ্বারা সেই দেশের আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ, এই ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারগুলির সাহায্যে স্থানীয় সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান করা যায়। এজন্য দূরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করিতে হয় না। চতুর্থতঃ, এই ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই শাসন-ব্যবস্থা অধিক সংখ্যক লোককে শাসন-কার্যে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ দেয়। ইহাতে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায়। পঞ্চমতঃ, এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় শাসনের ভারমুক্ত হয়। ফলে, কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র দেশের জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত ব্যাপারে অধিক মনোযোগ দিতে পারে।

অসুবিধা—Disadvantages

প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শাসন-ব্যবস্থা চালু থাকে বলিয়া সমগ্র শাসন-ব্যবস্থা জটিল হয়। দ্বিতীয়তঃ, দুই রকম শাসন-ব্যবস্থার জন্য শাসন-ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা সাধারণতঃ দুর্বল হয়, কারণ সব বিষয়েই আঞ্চলিক সরকারগুলির মত লইতে হয়। মতের পার্থক্য হইলে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না অথবা সিদ্ধান্ত-গ্রহণে বিলম্ব হয়। যুদ্ধ প্রভৃতি জরুরী অবস্থায় এই ত্রুটি মারাত্মক হয়। চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা থাকে এবং শক্তিশালী কয়েকটি প্রদেশ একত্রিত হইয়া স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে।

উপরে যুক্তরাষ্ট্রের যে অসুবিধাগুলির উল্লেখ করা হইল তাহা যুক্তরাষ্ট্রের গঠন-পদ্ধতির সংস্কার করিয়া দূর করা যায়। বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড ও অতি অল্পকালের মধ্যে ভারত আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ও

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে এই দেশগুলির যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা।

আইনসভা-প্রধান বা মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকার—Parliamentary or Cabinet Government

মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকারের শাসন-বিভাগের সমুদয় ক্ষমতা একটি মন্ত্রিসভার হাতে থাকে। এই ব্যবস্থায় শাসন-বিভাগীয় ও আইন-বিভাগীয় ক্ষমতার একত্র সমাবেশ হয়। মন্ত্রিগণকে আইনসভার সদস্য হইতে হয়। আইনসভার সদস্য হিসাবে তাঁহারা আইন প্রণয়ন করেন, আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং শাসনকার্য পরিচালনা করেন। মন্ত্রিসংসদ তাঁহাদের নীতি ও কার্যের জন্য ব্যক্তিগতভাবে ও যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। আইনসভা যদি অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে, তাহা হইলে মন্ত্রিপরিষদের একজোটে পদত্যাগ করিতে হয়। আইন-সভার যে দল সংখ্যায় বেশী হয়, সেই দলের নেতাগণকে হইয়া মন্ত্রিসংসদ গঠিত হয় এবং মন্ত্রিপরিষদ আইনসভার নিকট দায়ী বলিয়া এই শাসন-ব্যবস্থাকে দায়িত্ব-শীল সরকার (Responsible Government) বলা হয়। এই শাসন-ব্যবস্থায় অবশ্য একজন রাজা বা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি থাকেন। আইনতঃ তিনি সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হইলেও মন্ত্রিসংসদই হইল প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। বর্তমানে ভারতে এই শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার—Presidential or Non-Parliamentary Government

এই শাসন-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল শাসন-বিভাগীয় ক্ষমতা ও আইন-বিভাগীয় ক্ষমতার পৃথকীকরণ। এই ব্যবস্থায় একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির হস্তে নির্ধারিত কালের জন্য শাসনক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। রাষ্ট্রপতি স্বয়ং বা তাঁহার সাহায্য-কারী মন্ত্রিগণ আইনসভার সদস্য হইতে পারেন না এবং আইনসভার নিকট তাঁহারা দায়ী নহেন। আইনসভাও অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিয়া রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত মন্ত্রিগণকে পদচ্যুত করিতে পারে না। রাষ্ট্রপতি নির্ধারিত কার্যকালে শাসনতন্ত্র অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এই শাসন-ব্যবস্থা দেখা যায়।

মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকারের গুণাগুণ—Merits and Demerits of Parliamentary Government

মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকারের প্রধান গুণ হইল যে, আইনসভা ও শাসন-বিভাগ সহযোগিতামূলকভাবে একত্রে কাজ করে বলিয়া শাসনকার্য সুপরিচালিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রিসংসদ আইনসভার নিকট দায়ী থাকে বলিয়া শাসকগোষ্ঠী যাহা খুশী তাহা করিতে পারেন না। তৃতীয়তঃ, এই শাসন-ব্যবস্থায় আলাপ-আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ থাকে বলিয়া বিভিন্ন দলের মতভেদ দূর করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হয়। চতুর্থতঃ, প্রয়োজনমত পরিবর্তন করা সম্ভব বলিয়া এই শাসন-ব্যবস্থা জরুরী অবস্থায় বিশেষ কার্যকরী হয়। ইংলণ্ডে যুদ্ধের সময় সর্বদলীয় সরকার গঠিত হইয়া জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখে।

এই গুণগুলি থাকাসত্ত্বেও বলিতে হইবে যে, মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকার দুর্বল। মন্ত্রিগণের মধ্যে ঐক্যের অভাবে অনেক সময় শাসন-ব্যবস্থা স্থায়ী হয় না। আপৎকালে এই ঐক্যের অভাবে দেশের স্বার্থহানি হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রিসংসদের স্থায়িত্ব দলের সমর্থনের উপর নির্ভর করে। বারবার মন্ত্রিপরিষদের পরিবর্তন ঘটিলে শাসন-ব্যবস্থার উন্নতি বাধা পায়। তৃতীয়তঃ, এই শাসন-ব্যবস্থায় একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসংসদের বিশেষ করিয়া প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পায়।

রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের গুণাগুণ—Merits and Demerits of Presidential Government

রাষ্ট্রপতি চালিত সরকারের প্রধান গুণ হইল ইহার স্থায়িত্ব। নির্ধারিত কালের জন্য রাষ্ট্রপতি শাসনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য নির্বাচিত হন। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে তাঁহাকে অপসারিত করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধ প্রভৃতি জরুরী অবস্থায় এই শাসন-ব্যবস্থায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। তৃতীয়তঃ, এই শাসন-ব্যবস্থায় শাসকগণকে আইনসভার নিকট কোন কৈফিয়ৎ দিতে হয় না বলিয়া তাঁহারা শাসনকার্যে মন দিতে পারেন।

এই শাসন-ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল যে, আইনসভা ও শাসন-বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা না থাকার ফলে সময় সময় শাসনকার্যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ, নির্ধারিত কার্যকালের মধ্যে রাষ্ট্রপতি কাহারও নিকট দায়ী নহেন বলিয়া অনেক বিষয়ে তিনিই যাহা খুশী তাহা করিতে পারেন।

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রকৃতি—Nature of Indian Federation

ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উপজাতি-অধ্যুষিত কয়েকটা বিশেষ এলাকা ব্যতীত ভারতরাষ্ট্রের আঙ্গিক অংশ-গুলিকে রাজ্য বলা হয়। দুইটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। পূর্ব-অবস্থিত কতকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র তাহাদের পৃথক রাষ্ট্রীয় সত্তা পরিত্যাগ করিয়া নূতন এক সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারে। ইহাকে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতি বলা হয়। অপরপক্ষে একটি এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থাকে কতকগুলি আঙ্গিক রাজ্যে বিভক্ত করিয়া একটি যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি হইতে পারে। ক্যানাডার যুক্তরাষ্ট্র এই পদ্ধতিতে গঠিত হইয়াছে। গঠনপদ্ধতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রকে ক্যানাডার যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতের যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন ও ক্যানাডীয়—এই পদ্ধতির সংমিশ্রণে গঠিত হইয়াছে। বৃটিশ-শাসিত ভারতে মূলতঃ এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল। নূতন শাসনতন্ত্র এই এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থাকে কতকগুলি 'ক' শ্রেণীর আঙ্গিক রাজ্যে পরিবর্তিত করিয়া ক্যানাডীয় পদ্ধতিতে একটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। অপরপক্ষে বৃটিশ-শাসিত ভারত সরকারের ক্ষমতা-বহির্ভূত দেশীয় রাজ্যগুলিকে 'খ' ও 'গ' শ্রেণীর আঙ্গিক রাজ্যে পরিবর্তিত করিয়া পূর্বতন বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলির সমবায়ে এক নূতন যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং গঠন-পদ্ধতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অভিনবত্ব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশে যে সমুদয় আঙ্গিক রাজ্য লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় তাহারা সমক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের যুক্তরাষ্ট্র চারিটি বিভিন্ন শ্রেণীর আঙ্গিক রাজ্য লইয়া গঠিত হইয়াছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত সম্পর্কে এই বিভিন্ন রাজ্যগুলির ক্ষমতা ও মর্যাদার তারতম্য পরিলক্ষিত হইত। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এমন কতকগুলি বিশেষ অংশ আছে যেগুলি সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল বলিয়া পরিচিত। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যগুলির সহিত সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পনেরটি প্রধান আঙ্গিক রাজ্য ব্যতীত অন্য তিন শ্রেণীর উপবিভাগের সহিত একটি ক্ষীণ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইত। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে পনেরটি প্রধান আঙ্গিক রাজ্য ব্যতীতও স্ব-শাসিত প্রজাতন্ত্র, স্ব-শাসিত

প্রদেশ ও জাতীয় অঞ্চল বলিয়া পরিচিত তিন শ্রেণীর উপ-বিভাগ আছে এবং এই প্রত্যেকটি উপ-বিভাগের পৃথক প্রতিনিধি-নির্বাচন অধিকার বর্তমান।

তৃতীয়তঃ, ক্ষমতা-বিভাগের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অভিনবত্ব প্রকটিত হয়। মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র ও অষ্ট্রেলিয়া সাধারণতন্ত্র হইতে পৃথক পদ্ধতিতে ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার ভাগ করা হইয়াছে। মার্কিন দেশের ও অষ্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় সরকার শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত নির্দিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী, আর রাজ্যসরকারগুলিকে অনুল্লিখিত ক্ষমতার অধিকারী করা হইয়াছে। সুইস্ দেশেও শাসনতন্ত্র কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতাসমূহ ব্যতীত অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহের অধিকারী হইল ক্যাণ্টন সরকারগুলি। কিন্তু ভারতের শাসনতন্ত্র ক্যানাডীয় পদ্ধতি অনুসারে সরকারের সমুদয় ক্ষমতাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকা—এই তিন ভাগে ভাগ করিয়াছে। ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারই হইল অনুল্লিখিত ক্ষমতার অধিকারী। ভারতে রাজ্য সরকারগুলির মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র বা অষ্ট্রেলিয়ার রাজ্য সরকারগুলির শাসনতন্ত্রের ন্যায় কোন নিজস্ব শাসনতন্ত্র নাই, যাহা তাহারা নিজ ইচ্ছানুসারে সংশোধন করিতে পারে। এ বিষয়ে ভারতীয় রাজ্যগুলির পদমর্যাদা ক্যানাডীয় সদস্য রাষ্ট্রগুলির অনুরূপ। ভারতের রাজ্য সরকারগুলির গঠনপদ্ধতি ও ক্ষমতাসমূহ ভারতের শাসনতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়।

চতুর্থতঃ, ভারতের শাসনতন্ত্রের একটি সম্পূর্ণ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা আদৌ অনমনীয় নহে। প্রয়োজন ক্ষেত্রে এই শাসনব্যবস্থাকে এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় সহজেই পরিবর্তিত করা যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশেষ অবস্থার সম্মুখীন হইবার জন্য বহু ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন। এই বিশেষ ক্ষমতার বলে রাষ্ট্রপতি ও কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট সভা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্যসরকারগুলির উপর প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহ পরিচালনা করিতে পারিবেন। অন্য কোন দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের এরূপ ক্ষমতা-বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয় না।

পঞ্চমতঃ, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীভাবের এরূপ আতিশয্য দেখা যায়, যাহা অষ্ট্রেলিয়া এমন কি ক্যানাডা বা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায়ও দেখা যায় না। ভারতে যে সর্বভারতীয় নিয়োগ সংসদ (Union Public Service Commission) আছে, তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য সম্পাদনের জন্য লোক নিয়োগ করে। কিন্তু সর্বভারতীয় নিয়োগ সংসদ কর্তৃক

মনোনীত কর্মচারী রাজ্য সরকারগুলির শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, সমগ্র ভারতের (যুক্তরাষ্ট্রীয় ও রাজ্য সম্পর্কিত) জন্য একটিমাত্র নির্বাচন সংসদ (Election Commission) আছে। এই সংসদ সমুদয় নির্বাচন ব্যাপার পরিচালনা করে। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত কেন্দ্রীয় প্রধান হিসাব-পরীক্ষক রাজ্য সরকারগুলির আয়ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়া থাকেন। চতুর্থতঃ, রাজ্যপালগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন এবং রাজ্যপাল ইচ্ছা করিলে রাজ্য আইনসভাগুলি কর্তৃক অনুমোদিত খসড়া আইনগুলিকে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিতে পারেন। একমাত্র ক্যানাডা ব্যতীত অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। উপরি-উক্ত কেন্দ্রপ্রাধান্য ভারতের রাজ্য সরকারগুলির দুর্বলতা ও অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট পদমর্যাদা সূচিত করে।

ষষ্ঠতঃ, সমগ্র ভারতে এক অখণ্ড ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও সুইস্ দেশে নাগরিকগণের দ্বিবিধ নাগরিকত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতে নাগরিকত্ব অর্জন বা বর্জন সম্পর্কিত আইন-প্রণয়ন ও পরিবর্তন করিবার একমাত্র অধিকারী হইল পার্লামেণ্ট সভা। এতদ্ব্যতীত যুক্তরাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভারতের শাসনতন্ত্র অনমনীয় হইলেও ইহাই একমাত্র শাসনতন্ত্র যাহার পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভারতের শাসনতন্ত্র সমগ্র ভারতের জন্য একই প্রকারের ফৌজদারী ও দেওয়ানী কার্যবিধি প্রবর্তন করিয়াছে এবং সমগ্র ভারতের জন্য একই বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের ন্যায় শুধুমাত্র শাসনতন্ত্রের রক্ষক নহে। ইহা ভারতের রাজ্যগুলি হইতে আনীত আপীল মামলার বিচার করিবার সর্বোচ্চ আদালত।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে স্বভাবতই মনে হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রচলিত সংজ্ঞা আছে, ভারতে প্রতিষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্র সে সংজ্ঞা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীভাবের আতিশয্যের জন্য ইহাকে একটি নিখুঁত যুক্তরাষ্ট্র আখ্যা না দিয়া যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ একটি শাসনব্যবস্থা বলা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। ভারতের অতীত ও বর্তমান ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে মনে হয় যে, শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ এই নবীন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অসংখ্য অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিবার প্রচেষ্টা রাষ্ট্রব্যবস্থার স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা আনয়ন করিবে। সকল যুক্তরাষ্ট্রেই অল্পবিস্তর পরিমাণ কেন্দ্রপ্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এমন কি যুক্তরাষ্ট্রগুলির মধ্যে

আদর্শস্থানীয় মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রেও বর্তমান যুগে এই কেন্দ্রপ্রাধান্য বিচারবিভাগীয় নির্দেশ দ্বারা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের ক্ষেত্রে এই কেন্দ্রপ্রাধান্য অপরিহার্য। যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রকে এককেন্দ্রীক রাষ্ট্র হইতে পৃথক করা যায়, যথা, ক্ষমতার বিভাগ, লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র, নিরপেক্ষ উচ্চ বিচারালয়—তৎসমুদয়ই ভারতে বর্তমান। একমাত্র কেন্দ্রপ্রাধান্যের জন্য ইহাকে যুক্তরাষ্ট্র আখ্যা না-দেওয়া সমীচীন নহে।

ভারতের শাসনতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য—Federal and Unitary Features of the Indian Constitution

ভারতের শাসনতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অন্তরালে এই শাসনতন্ত্রে এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার একাধিক নিদর্শন বর্তমান রহিয়াছে। বস্তুতঃ, এই শাসনতন্ত্র এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সংমিশ্রণে গঠিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এই শাসনতন্ত্রে স্থান পাইলেও ইহার কেন্দ্রীভাবের আতিশয্য কাহারও দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য—Federal Features

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় এই যুক্তরাষ্ট্রেও কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার ভাগ ও বণ্টন (Division and Distribution of Powers) হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, একটি বিশদভাবে লিখিত শাসনতন্ত্র কর্তৃক ক্ষমতা বিভক্ত হইয়াছে। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের ন্যায় ভারতের শাসনতন্ত্র শুধু লিখিত নয়, সাধারণভাবে বলিতে গেলে এই শাসনতন্ত্র অনমনীয়ও বটে। তৃতীয়তঃ, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মত ভারতেও একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিচারালয় শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে শাসনতন্ত্র-সম্পর্কিত বিরোধের মীমাংসা করে। চতুর্থতঃ, এই শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে কিছু পরিমাণে রাজস্ব বণ্টনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য—Unitary Features

ভারতের শাসনতন্ত্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি হইতে ইহার মূলতঃ এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রবণতা প্রকটিত হয়।

প্রথমতঃ বলা যায় যে, ভারতের শাসনতন্ত্র একটি পূর্ণাঙ্গ লিখিত শাসনতন্ত্র।

এই শাসনতন্ত্র দ্বারা শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের গঠন, প্রকৃতি ও কার্যক্ষেত্র নির্ধারিত হয় নাই, পরন্তু রাজ্য সরকারগুলিও এই একই শাসনতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। রাজ্য সরকারগুলির নিজস্ব কোন পৃথক শাসনতন্ত্র গঠন বা পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা নাই। দ্বিতায়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল সদস্য রাজ্যগুলির রাজনৈতিক সমতা (Political equality of States) ; ভারতের যুক্তরাষ্ট্রে এই নীতি সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করা হয় নাই। তৃতীয়তঃ, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা-বণ্টন নীতি যেরূপভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির শাসনভার অর্পিত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। চতুর্থতঃ, ভারতের শাসনতন্ত্রে একটি সুদীর্ঘ যুগ্ম বিষয়ের তালিকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং ক্ষমতা-বণ্টন ব্যাপারে অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। এই উভয় ব্যবস্থা দ্বারা রাজ্য সরকারগুলির যুক্তরাষ্ট্র-সুলভ স্বাধীন সত্তা ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। পঞ্চমতঃ, সমগ্র ভারতের জন্য একদফা নাগরিকত্ব, একটিমাত্র আপীল আদালত ও একটিমাত্র নির্বাচন সংসদ প্রতিষ্ঠা দ্বারা এই শাসনতন্ত্রের কেন্দ্রীভাবের আতিশয্য সূচিত হয়। ষষ্ঠতঃ, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাকে অনায়াসে এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্য সরকারগুলির শাসনকার্য পরিচালিত হইতে পারে। অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। পরিশেষে ভারতের শাসনতান্ত্রিক আইনানুসারে ভারতের যে-কোন রাজ্যের সীমানা কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক পরিবর্তিত হইতে পারে। উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি হইতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, ভারতের যুক্তরাষ্ট্র মূলতঃ এককেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার আদর্শে গঠিত হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তসার

সরকারের শ্রেণী-বিভাগ

শাসন-ব্যবস্থাকে নানাভাবে ভাগ করা হয় ; অ্যারিস্টট্‌ল্ গুণবাচক ভিত্তির উপর সরকারকে স্বাভাবিক ও বিকৃত এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছিলেন। তাহার

পর শাসকের সংখ্যানুসারে উক্ত দুই শ্রেণীর ছয়টি বিভিন্ন নামকরণ করেন। জনকল্যাণের জন্য এক ব্যক্তি দ্বারা যখন শাসনকার্য পরিচালিত হয়, তাহাকে রাজতন্ত্র আখ্যা দেন। শাসনক্ষমতা কতিপয় অথবা বহু ব্যক্তির হস্তে থাকিলে, তাহাকে যথাক্রমে অভিজাত-তন্ত্র ও গণতন্ত্র আখ্যা দেন। বিকৃত শ্রেণীকেও সংখ্যানুসারে স্বৈরতন্ত্র, ধনিকতন্ত্র ও বিকৃত গণতন্ত্র আখ্যা দেন। এই প্রকার শাসনের উদ্দেশ্য হইল শাসকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা।

বর্তমানকালে নিম্নলিখিত শাসন-ব্যবস্থাগুলি দেখা যায় :

রাজতন্ত্র

জন্মগত উত্তরাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত একব্যক্তির শাসনকে রাজতন্ত্র বলা হয়। রাজা যখন নিজ ইচ্ছানুসারে অবাধে ক্ষমতা পরিচালনা করেন, তখন ইহা অবাধ রাজতন্ত্র বলিয়া অভিহিত হয়। রাজার ক্ষমতা যখন শাসনতন্ত্র কর্তৃক সীমাবদ্ধ হইয়া শুধু নামসর্বস্ব রাজা হিসাবে থাকে, তখন এই শাসন-ব্যবস্থাকে নিয়ম-তান্ত্রিক রাজতন্ত্র বলা হয়।

অভিজাত-তন্ত্র

স্বল্পসংখ্যক জ্ঞানী ও গুণী লোকের দ্বারা যখন শাসনকার্য পরিচালিত হয়, তখন তাহাকে অভিজাত-তন্ত্র বলা হয়।

প্রজাতন্ত্র

রাষ্ট্রের প্রধান যখন রাজার পরিবর্তে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি থাকেন, তখন তাহাকে প্রজাতন্ত্র বলা হয়। প্রজাতন্ত্রে জনসাধারণের ইচ্ছাই পরোক্ষভাবে কার্যকরী হয়।

গণতন্ত্র

এই শাসন-ব্যবস্থায় জনগণই হইল শাসনক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী। তাহারা প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করে। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রগুলি আয়তনে ও লোকসংখ্যায় বৃহৎ বলিয়া প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কার্যকরী করা সম্ভব নয়। এইজন্য পরোক্ষ গণতন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে। গণতন্ত্রে সাফল্যের জন্য রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

ও সাম্য একান্ত প্রয়োজন। এই শাসন-ব্যবস্থা ব্যক্তিত্ব-বিকাশে সাহায্য করে ও সাধারণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করে।

বর্তমানে গণতন্ত্রকে বিশেষভাবে কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে পরোক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনে গণনির্দেশ, গণভোট প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

একনায়ক-তন্ত্র

প্রথম মহাযুদ্ধের পর গণতন্ত্রের কতকগুলি দুর্বলতার সুযোগ লইয়া একনায়ক-তন্ত্রের আবির্ভাব হয়। একনায়ক-তন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হইল যে, অন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে নির্মূল করিয়া একটিমাত্র দল শাসনক্ষমতা হস্তগত করে। এই দলের নেতাই হইলেন সর্বশক্তিমান পুরুষ এবং তাঁহার নির্দেশেই সমস্ত শাসনকার্য পরিচালিত হয়। নেতার পশ্চাতে দলের সমর্থন থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইতালী, জার্মানী ও রুশিয়ায় একনায়ক-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। একনায়ক-তন্ত্র সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থার উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু আংশিকভাবে কার্যকরী হইলেও বলপ্রয়োগ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই শাসন-ব্যবস্থা স্থায়ী হইতে পারে না।

আমলাতন্ত্র

স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ লইয়া আমলাতন্ত্র গঠিত হয়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা করিয়া ইহাদের যোগ্যতা স্থির করা হয়। জনসাধারণের সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক থাকে না। ইহারা ধরাবাঁধা নিয়মে কাজ করেন। সুদক্ষ হইলেও এই শাসন-ব্যবস্থাকে দায়িত্বশীল বলা চলে না।

এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা

এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সরকারের ক্ষমতার কোন ভাগ হয় না। কেন্দ্রীয় সরকারই হইল সমুদয় ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী। স্থানীয় সরকারগুলি সব-বিষয়েই কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা

যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারগুলির মধ্যে ভাগ করা হয়। স্থানীয় ব্যাপারে স্থানীয় সরকারগুলি স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে।

এককেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার পার্থক্য

(১) এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতার কোন ভাগ হয় না, যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতার ভাগ হয়। (২) এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় একটিমাত্র সরকার থাকে, যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলি পাশাপাশি থাকে। (৩) এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য, আর যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য দেখা যায়। (৪) এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় লিখিত ও অনমনীয় শাসন-তন্ত্রের কোন প্রয়োজন হয় না বা (৫) কোন সুপ্রিম কোর্টেরও প্রয়োজন হয় না, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে উভয় সরকারের মধ্যে ভবিষ্যৎ বিরোধ মিটাইবার জন্য লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র ও একটি উচ্চ আদালতের প্রয়োজন হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের উপাদান—১। বিভিন্ন অঞ্চলগুলির অবিচ্ছিন্নতা, ২। একতাবোধ, ৩। রাজনৈতিক সমতা, ৪। জনগণের মধ্যে শিক্ষা ও সংহতি বোধ।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা-ভাগ নীতি

যোগাযোগ, প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা প্রভৃতি জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে, আর কৃষি, শিক্ষা প্রভৃতি স্থানীয় স্বার্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি স্থানীয় সরকারের উপর ন্যস্ত থাকে।

এককেন্দ্রীয় সরকারের গুণাগুণ

এককেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান গুণ হইল ইহার অখণ্ডতা এবং এই অখণ্ডতার জন্য ইহা শক্তিশালী শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু ইহার দোষ হইল যে, বিভিন্ন অঞ্চলগুলির বিভিন্ন সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হয় না। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অভাবে লোকশিক্ষার কোন ব্যবস্থা সম্ভব হয় না।

যুক্তরাষ্ট্রের গুণাগুণ

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্ন দেশকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব। এই ব্যবস্থার সাহায্যে আঞ্চলিক স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্য একসঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে পারে। বহুসংখ্যক লোক এই শাসন-ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

কিন্তু ইহার দোষ হইল যে, শাসনক্ষমতা ভাগ হওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হইয়া পড়ে এবং কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে না। বড়বড়

আঞ্চলিক সরকারগুলি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করিবার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হইতে পারে।

মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকার ও ইহার গুণাগুণ

মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসন-ব্যবস্থায় শাসন-কর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে সহযোগিতা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা দেখা যায়। এই ব্যবস্থায় মন্ত্রিসংসদ আইন-সভার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে কাজ করে। আইনসভা ও শাসনকর্তৃপক্ষের মধ্যে ক্ষমতার পৃথকীকরণ না-থাকার জন্য সহযোগিতার ভিত্তিতে দক্ষতার সহিত শাসনকার্য পরিচালিত হয় কিন্তু আইনসভার আস্থা হারাইলে মন্ত্রিসংসদকে পদত্যাগ করিতে হয় বলিয়া এই ব্যবস্থা স্থায়ী হয় না। দলীয় শাসনের ফলে জাতীয় স্বার্থ অনেক সময় উপেক্ষিত হয়।

রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসন-ব্যবস্থা ও ইহার গুণাগুণ

রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যবস্থায় শাসনকর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে কোন যোগসূত্র থাকে না, সুতরাং প্রত্যেক বিভাগই স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে। জরুরী অবস্থায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও সম্ভব হয়। কিন্তু এই অবস্থায় সহযোগিতা থাকে না বলিয়া আইন-সভা ও শাসন-বিভাগের মধ্যে গুরুতর মতভেদের ফলে শাসনকার্যের ক্ষতি হয়। আইনসভার নিকট দায়ী নয় বলিয়া শাসন-বিভাগও যাহা খুসী তাহা করিতে পারে।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. Distinguish between Direct and Representative or Indirect Democracy. What are the defects of Democratic form of government?

H. S. (Hu.) 1961

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্রের পার্থক্য কর। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার দোষ কি?

উঃ—জনসাধারণকে লইয়া, জনসাধারণের কল্যাণে, জনসাধারণ কর্তৃক যে শাসন-ব্যবস্থা, (Government of the people, for the people and by the people) তাহাকে গণতন্ত্র বলা হয়। গণতন্ত্র আবার দুই প্রকারের হইতে পারে, যথা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে রাষ্ট্রের সীমা নগরেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং সেজন্য প্রাচীন রাষ্ট্রগুলিকে নগর-রাষ্ট্র বলা হইত। এই নগর-রাষ্ট্রগুলির সকল নাগরিকই একত্র হইয়া আইন-প্রণয়ন ও শাসনকার্য

পরিচালনা করিত। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিকই আইনসভার সদস্য হিসাবে আইন-প্রণয়ন ও করধার্য ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করে। সুতরাং প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে ভোটদাতা ও আইনসভার সদস্য—এ দুই-ই অভিন্ন। বর্তমানযুগে সুইজারল্যাণ্ডের চারিটি ক্ষুদ্র ক্যাণ্টনে (বিভাগে) এই ব্যবস্থা চালু আছে। রাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা যদি স্বল্প হয় তাহা-হইলে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কার্যকরী হইতে পারে। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রগুলি আয়তনে ও জনসংখ্যায় শুধু বিশাল নয়, এই রাষ্ট্রগুলির সমস্যাগুলিও জটিলতাপূর্ণ। ভারত, চীন প্রভৃতি বিশালায়তনের ও বিপুল জনসংখ্যা দ্বারা অধ্যুষিত দেশে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সম্ভব নহে। দেশের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক লোকের পক্ষে একস্থানে মিলিত হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইহা ছাড়াও সাধারণ লোকের রাজনৈতিক জ্ঞান এত কম যে, তাহাদের পক্ষে দক্ষতার সহিত শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এই কারণে বর্তমান যুগে পরোক্ষ গণতন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। এই শাসন-ব্যবস্থায় প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকগণ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং এই নির্বাচিত প্রতিনিধি-গণ আইনসভা, মন্ত্রিসভা প্রভৃতি গঠন করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করেন। অবশ্য এই নির্বাচিত শাসকগণ তাঁহাদের কার্যের জন্য জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকেন। সুতরাং পরোক্ষ গণতন্ত্রে ভোটদাতা ও আইনসভা দুইটি পৃথক সংস্থা। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল জনসাধারণের হিতসাধন করা। পরোক্ষ গণতন্ত্রে নির্বাচন দ্বারা দক্ষ লোকের হস্তে শাসনভার অর্পিত হয়, সুতরাং পরোক্ষ গণতন্ত্র বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই।

(ক) গণতান্ত্রিক শাসনের অর্থ হইল, যাহারা সংখ্যায় বেশী তাহাদের শাসন। সুতরাং গণতন্ত্রে গুণ ও যোগ্যতা অপেক্ষা সংখ্যার উপর বেশী জোর দেওয়া হয়।

(খ) গণতন্ত্রের আদর্শ অনুযায়ী মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য করা হয় না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গণতন্ত্রের কাজ অল্পসংখ্যক চতুর ও বিবেক-বর্জিত লোক দ্বারা পরিচালিত হয়।

(গ) গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় যে আইন তৈয়ারী হয়, তাহাও যে-দলের হাতে ক্ষমতা থাকে সেই দলের স্বার্থের জন্যই রচিত হয়। ইহাতে অন্যান্য দলের স্বার্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নষ্ট হয়।

(ঘ) গণতন্ত্র অজ্ঞলোকের দ্বারা পরিচালিত সংখ্যাধিক্যের শাসন-ব্যবস্থা। সুতরাং এই শাসন-ব্যবস্থায় গুণ ও যোগ্যতার সমাদর হয় না।

(ঙ) এই শাসন-ব্যবস্থার প্রধান দোষ হইল যে, ইহা স্থায়ী হইতে পারে না। নির্বাচকমণ্ডলীর ইচ্ছার উপর ইহার স্থায়িত্ব নির্ভর করে এবং নির্বাচকমণ্ডলী খুসীমত ইহার পরিবর্তন করিতে পারে।

2. What do you understand by Dictatorship? State its demerits. Has dictatorship any merits? If so what are they?

একনায়ক-তন্ত্র বলিতে কি বুঝ? ইহার দোষ বর্ণনা কর। ইহার কোন গুণ থাকিলে লিখ।

উঃ—একনায়ক-তন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার অধীনে একটিমাত্র দল থাকে এবং দলের নেতার হস্তে সর্বময় কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকে। দেশে অন্য কোন রাজনৈতিক দল থাকিতে দেওয়া

হয় না। অবাধ দলীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দলের নেতা ব্যক্তির সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটি কার্য নিয়ন্ত্রণ করে। একনায়ক-তন্ত্রে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র ও দলীয় নেতৃত্ব অভিন্ন হইয়া রাষ্ট্রের ইচ্ছা নেতার ইচ্ছায় পরিণত হয়।

একনায়ক-তন্ত্র তিন প্রকারের হইতে পারে, যথা, সামরিক, সাম্যবাদী ও ফ্যাসিবাদী।

সামরিক একনায়ক-তন্ত্র বহু পুরাতন হইলেও বর্তমান যুগেও এই শাসন-ব্যবস্থা লোপ পায় নাই। যখনই সেনাবাহিনীর কোন অধিনায়ক সৈন্যগণের সাহায্যে শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিয়া সেনাবাহিনীর সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করেন তখন এই শাসন-ব্যবস্থাকে সামরিক একনায়ক-তন্ত্র বলা হয়। ফরাসী দেশে নেপোলিয়নের শাসন, বর্তমানে স্পেন দেশে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর শাসন ও অতি-আধুনিক কালে পাকিস্তানে ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানের শাসন ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে ইউরোপের দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু গণতন্ত্রের দুর্বলতার সুযোগে রুশিয়াতে সাম্যবাদী একনায়ক-তন্ত্র এবং ইতালি ও জার্মানিতে ফ্যাসিবাদী একনায়ক-তন্ত্রের অভ্যুত্থান ঘটে। রুশীয় একনায়ক-তন্ত্রের উদ্দেশ্য হইল শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করা ও অর্থনৈতিক জীবনে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সাময়িকভাবে এখানে বিত্তহীন শ্রমিক শ্রেণীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইতালিতে ফ্যাসিস্ট-নেতা মুসোলিনী ও জার্মানির নাৎসি নায়ক হিট্‌লার তাঁহাদের দলের সাহায্যে রাজ্য শাসন করিতেন। ফ্যাসিস্ট একনায়ক-তন্ত্রের মূল নীতি হইল—এক জাতি, এক রাষ্ট্র, এক নায়ক।

একনায়ক-তন্ত্রে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশ সম্ভব নহে, কারণ একনায়ক-তন্ত্র হইল ব্যক্তি-বিশেষের শাসন এবং এই শাসন পশুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত। একনায়ক-তন্ত্র অনেক সময় উগ্রজাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলির স্বাধীনতা নষ্ট করে। ফলে, যুদ্ধ অনিবার্য হয় ও জগতে শান্তি নষ্ট হয়। জার্মানি ও ইতালির একনায়ক-তন্ত্রের ইহাই ছিল প্রধান দোষ।

একনায়ক-তন্ত্রের যে কোন গুণ নাই একথা বলা ঠিক নহে। এই শাসন-ব্যবস্থায় জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় ও জটিল সমস্যাসমূহের দ্রুত সমাধান হয়। সু-নাগরিক সৃষ্টি করিতেও একনায়ক-তন্ত্রের কার্যকারিতা কম নহে। কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও সার্বজনীন শিক্ষা-প্রসারে বিশেষ করিয়া রুশদেশ একনায়ক-তন্ত্রের অধীনে অতি স্বল্পকালের মধ্যে যে অভাবনীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা গণতন্ত্রে কোথাও সম্ভব হয় নাই।

8. Distinguish between Democracy and Dictatorship. Is Democracy suited to India? Justify your answer.

গণতন্ত্র ও একনায়ক-তন্ত্রের পার্থক্য কর। ভারতে কি গণতন্ত্র উপযোগী? যুক্তি দ্বারা উত্তর সমর্থন কর।

উঃ—১। গণতন্ত্রের ভিত্তি হইল স্বাধীনতা, সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার। একনায়ক-তন্ত্রে ইহাদের কোন স্থান নাই।

২। গণতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বীকৃত ও রক্ষিত হয়, কিন্তু একনায়ক-তন্ত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বীকৃতই হয় না।

৩। গণতন্ত্রে বিভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক দল থাকিতে পারে, কিন্তু একনায়ক-তন্ত্রে শুধু একটিমাত্র দল থাকে—অন্যদলের অস্তিত্ব বরদাস্ত করা হয় না।

৪। গণতন্ত্র পারস্পরিক সম্মতি ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত, আর একনায়ক-তন্ত্র দলীয় স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত।

৫। গণতন্ত্রে শাসকশ্রেণী শাসিতের নিকট তাহাদের কাজের জন্য দায়ী থাকে। একনায়ক-তন্ত্রে শাসকের আদৌ কোন দায়িত্ব নাই,—কাজেই নায়ক স্বৈরাচারী হয়।

সুতরাং গণতন্ত্র ও একনায়ক-তন্ত্র দুইটি পরস্পর-বিরোধী আদর্শ।

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা ভারতের বর্তমান অবস্থায় কতদূর উপযোগী তাহাই আলোচ্য বিষয়। মহামতি জন স্টুয়ার্ট মিল্ গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য যে কয়েকটি সামাজিক অবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইল—(১) দেশের লোকের শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিবার ইচ্ছা ও সামর্থ্য; (২) অধিকার রক্ষা করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প ও (৩) কর্তব্য পালনে তৎপরতা। ভারতের অধিবাসিগণ বহুদিন পরাধীন ছিল, সুতরাং তাহাদের স্বাধীনতা অর্জন করিবার ইচ্ছা ও সামর্থ্য পূর্ণভাবে আছে তাহা স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতের শাসনকার্য বর্তমানে ভারতীয়গণ কর্তৃকই পরিচালিত হইতেছে—ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ভারতের অধিবাসিগণের মধ্যে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিবার ইচ্ছা ও সামর্থ্য বিদ্যমান। স্বাধীনতা রক্ষা করিবার দৃঢ় সঙ্কল্পও ভারতীয়গণের মধ্যে দেখা যায়, তবে বহুদিন পরাধীন থাকার ফলে ও সু-শিক্ষার অভাবে ভারতীয়গণের মধ্যে কর্তব্য পালনের একান্ত অভাব দেখা যায় এবং এই কারণে শাসন-ব্যবস্থায় নানারূপ বিশৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার অভাব উপস্থিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীতও গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য দেশে অর্থ নৈতিক সাম্য একান্ত প্রয়োজন। ভারতে বর্তমানে অর্থ নৈতিক সাম্য দূরের কথা, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে এত পার্থক্য রহিয়াছে যে, এই অসাম্য দূর না হইলে প্রকৃত গণতন্ত্র সাফল্য লাভ করিতে পারিবে না।

4. Distinguish between Unitary and Federal Government. Give examples.
H. S. (Com.) 1961

এককেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের উদাহরণসহ পার্থক্য লিখ।

উঃ—১। এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থায় একটিমাত্র প্রধান শাসন-ব্যবস্থা থাকে এবং সেই শাসন-ব্যবস্থা হইল কেন্দ্রীয় সরকার। যুক্তরাষ্ট্রে দুই জাতীয় সরকার—কেন্দ্রীয় ও স্থানীয়—পাশাপাশি থাকে।

২। এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসন-ক্ষমতার কোন ভাগ হয় না—যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ হয়—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রে ক্ষমতার এই ভাগ দেখা যায়।

৩। এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারই হইল সমস্ত ক্ষমতার উৎস, আর যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্রই হইল ক্ষমতার উৎস। এই কারণে এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের আর যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য দেখা যায়।

৪। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র সাধারণতঃ লিখিত ও অনমনীয় হয়, কিন্তু এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার শাসনতন্ত্র লিখিত ও অনমনীয় নাও হইতে পারে।

৫। যুক্তরাষ্ট্রে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় থাকিবেই, এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ইহার কোন গুরুত্ব নাই। ভারত যুক্তরাষ্ট্র, তাই এখানে একটি সুপ্রিম কোর্ট আছে।

5. What are the conditions of success of a Federation.

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের উপাদান কি কি ?

উঃ—যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা যাহাতে ভালভাবে কাজ করিতে পারে, সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে ভৌগোলিক নৈকট্য (Geographical contiguity) থাকা একান্ত আবশ্যক। এই নৈকট্যের অভাবে প্রদেশগুলির একতাবোধ জন্মিতে পারে না। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে এই নৈকট্য নাই, কিন্তু ভারতের আন্দামান প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র অঞ্চল ব্যতীত অন্যান্য অংশগুলির মধ্যে এই নৈকট্য বর্তমান আছে। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিভিন্ন অঞ্চল লইয়া গঠিত হইলেও যুক্তরাষ্ট্র একটিমাত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র। সুতরাং ইহার নাগরিকগণের মধ্যে এক-জাতীয়তাবোধ একান্ত আবশ্যক। তৃতীয়তঃ, এই জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধিতে ভৌগোলিক নৈকট্য ও এক জাতি, এক ভাষা ও এক ধর্ম বা একই ঐতিহ্য সাহায্য করে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য জাতিগত, ভাষাগত, ধর্মগত বা ভাবগত ঐক্য থাকা একান্ত প্রয়োজন। চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে রাজনৈতিক সমতা (Political equality) বাঞ্ছনীয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উচ্চ কক্ষে প্রত্যেক অঞ্চল হইতে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া মার্কিন দেশে ছোট-বড় সকল অঞ্চলগুলির রাজনৈতিক সমতা রক্ষা করা হইয়াছে। ভারতে প্রত্যেক রাজ্য হইতে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে রাজ্যসভায় প্রতিনিধির সংখ্যা স্থির হয়। রাজনৈতিক সমতা না থাকিলে বড় বড় রাজ্যগুলি ভোটের জোরে ছোট ছোট রাজ্যগুলির মতামত উপেক্ষা করিতে পারে। ইহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য দেশের জনসাধারণের শিক্ষা, একাত্মবোধ ও কর্মদক্ষতা একান্ত প্রয়োজন।

6. Distinguish between Parliamentary and Presidential forms of government and indicate their respective merits and demerits.

আইনসভা-প্রধান ও রাষ্ট্রপতিচালিত সরকারের পার্থক্য কর। ইহাদের দোষ-গুণ লিখ।

উঃ—আইনসভা-প্রধান শাসন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের সমুদয় ক্ষমতা একটি মন্ত্রিসভার হাতে থাকে। মন্ত্রিগণ তাঁহাদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। আইনসভা অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিলে তাহাদের পদত্যাগ করিতে হয়। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাগণ মন্ত্রিসংসদ গঠন করেন এবং এই ব্যবস্থায় শাসন বিভাগীয় ও আইন বিভাগীয় ক্ষমতার একত্র সমাবেশ হয়। ভারতে এই শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

রাষ্ট্রপতিচালিত শাসন-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল শাসন-বিভাগীয় ক্ষমতা ও আইন বিভাগীয় ক্ষমতার পৃথকীকরণ। এই ব্যবস্থায় একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি থাকেন। রাষ্ট্রপতি তাঁহার অধস্তন সহকর্মিগণের সাহায্যে শাসন পরিচালনা করেন। তিনি আইনসভার সদস্য নহেন ও আইনসভার নিকট দায়ী নহেন।

মন্ত্রিসংসদ-চালিত সরকারের গুণ হইল (১) আইনসভা ও শাসন-বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা থাকার ফলে শাসনকার্য সু-পরিচালিত হয়। (২) মন্ত্রিসংসদ আইনসভার নিকট দায়ী থাকে বলিয়া তাঁহারা

যাহা খুসী তাহা করিতে পারেন না। (৩) বিভিন্ন মতাবলম্বী দলগুলির মধ্যে আলাপ-আলোচনার সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বলিয়া দেশের সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হয়।

ইহার ত্রুটি হইল যে, এই শাসন-ব্যবস্থা দুর্বল ও অস্থায়ী। মন্ত্রিসংসদের সদস্যগণের মতভেদ হইলেই ইহাদের পতন ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, দলীয় সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহার পুনঃপুনঃ পরিবর্তন সম্ভব এবং বার বার পরিবর্তন হইলে কোন দীর্ঘমেয়াদী কার্যসূচী গ্রহণ করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করা সম্ভব হয় না। তৃতীয়তঃ, এই শাসন-ব্যবস্থায় একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং শেষ পর্যন্ত দলের ক্ষমতা দলের নেতার হস্তে কেন্দ্রীভূত হয়।

রাষ্ট্রপরিচালিত শাসন-ব্যবস্থার গুণ হইল যে, এই ব্যবস্থায় শাসন-কর্তৃপক্ষ ও আইনসভার মধ্যে প্রত্যক্ষ কোন যোগসূত্র থাকে না। সুতরাং প্রত্যেক বিভাগই পরস্পরের প্রভাবমুক্ত হইয়া নিজ নিজ কার্য করিবার সুযোগ পায়। আইনসভার প্রভাবমুক্ত বলিয়া শাসনকর্তৃপক্ষ স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারে ও জরুরী অবস্থায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে।

কিন্তু ইহার দোষ হইল যে, দায়িত্বশীল নয় বলিয়া শাসনকর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতে পারে। আর ক্ষমতা পৃথকীকরণের ফলে আইনসভা ও শাসনকর্তৃপক্ষের মধ্যে সহযোগিতার অভাবে গুরুতর মতভেদ ঘটিয়া শাসনকার্যে অচল অবস্থা সৃষ্টি হইতে পারে।

7. Distinguish between Unitary and Federal forms of government. Is India Unitary or Federal? H. S. (Hu.) 1961

এককেন্দ্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার পার্থক্য কর। ভারতের শাসন-ব্যবস্থা এককেন্দ্রীয় অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয়?

উঃ—পার্থক্যের জন্য ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।

ভারতের বর্তমান শাসন-ব্যবস্থা মুলতঃ যুক্তরাষ্ট্রীয়। যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতে পূর্ণভাবে দেখা যায়। ক্ষমতা বিভাজন, লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়, রাজস্বের বণ্টন প্রভৃতি হইল যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতের শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয়, রাজ্য ও যুগ্মতালিকায় ভাগ করা হইয়াছে। ভারতের শাসনতন্ত্র লিখিত ও অনমনীয়। ভারতে সুপ্রিম কোর্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের কাজ করে।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র-সুলভ বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা সত্ত্বেও ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার কতকগুলি নিদর্শন রহিয়াছে। ভারতের এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি হইল যে, (১) একই শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির গঠন, প্রকৃতি ও কার্যক্ষেত্র স্থান পাইয়াছে। রাজ্য সরকারগুলির কোন পৃথক শাসনতন্ত্র গঠন বা পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা নাই। (২) ভারতে সদস্য রাজ্যগুলির কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা নাই। (৩) ক্ষমতা বিভাজনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির শাসনভার অর্পিত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। (৪) এই শাসনতন্ত্রে ক্ষমতা বণ্টন ব্যাপারে অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। (৫) সমগ্র ভারতের জন্য এক দফা নাগরিকত্ব, একটিমাত্র আপীল আদালত ও একটিমাত্র নির্বাচন সংসদ প্রতিষ্ঠা দ্বারা এই শাসনতন্ত্রের কেন্দ্রীভাবের আতিশয্য সূচিত হয়। (৬) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাকে অনায়াসে

এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করা যায়। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এই শাসনতন্ত্রে স্থান পাইলেও ইহার কেন্দ্রীভাবের আতিশয্য কাহারও দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না।

8. Distinguish between Parliamentary and Presidential forms of Government. Is the Government of India Presidential or Parliamentary ?

H. S. (Hu.) Comp. 1960

আইনসভা-প্রধান ও রাষ্ট্রপতিচালিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য কর। ভারতের শাসনব্যবস্থা মন্ত্রিসংসদ-চালিত অথবা রাষ্ট্রপতি-চালিত ?

উঃ—পার্থক্যের জন্য ৬নং প্রশ্নের উত্তরের প্রথমভাগ দ্রষ্টব্য।

ভারতের শাসন-ব্যবস্থার শীর্ষস্থানে একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি থাকিলেও এই শাসন-ব্যবস্থা মূলতঃ আইনসভা-প্রধান বা মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসন-ব্যবস্থা। মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসন-ব্যবস্থার আইনতঃ সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হইলেন একজন রাজা কিম্বা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি। কিন্তু কার্যতঃ শাসনক্ষমতা একটি মন্ত্রিসভার হস্তে ন্যস্ত থাকে। এই সভাই শাসন পরিচালনা করেন। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতারা মন্ত্রিসংসদ গঠন করিয়া আইনসভার অনুমোদনে সমস্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। মন্ত্রিসভা তাহাদের নীতি ও কার্যের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। মন্ত্রিসভার কার্য যদি আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত না হয়, তাহা হইলে মন্ত্রিসভার পদত্যাগ করিতে হয়। এই শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল শাসন-বিভাগীয় ও আইন-বিভাগীয় ক্ষমতার একত্র সমাবেশ।

ভারতের রাষ্ট্রপতি হইলেন শাসক-প্রধান। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা মন্ত্রিসভার হস্তে ন্যস্ত। সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস দলের নেতাগণ মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া আইনসভার অনুমোদনে শাসনকার্য, আইন-প্রণয়ন ও আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করেন। আইনসভার আস্থা হারাইলে তাঁহাদের পদত্যাগ করিতে হইবে। সুতরাং শাসকবর্গ আইনসভার নিকট দায়ী। এইজন্য ইহাকে দায়িত্বশীল সরকার বলা হয়।

9. Discuss the merits and demerits of democracy as a form of government.

H. S. (Com) 1962, 1964

গণতন্ত্রের গুণ ও দোষ বর্ণনা কর।

উঃ—গণতন্ত্র হইল সেই শাসনব্যবস্থা যে শাসনব্যবস্থায় জনগণই হইল প্রকৃত শাসনক্ষমতার অধিকারী। এই শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ এব্রাহাম লিন্‌কন্ অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, জনসাধারণকে লইয়া জনসাধারণের কল্যাণে জনসাধারণ কর্তৃক যে শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয় তাহাকেই গণতন্ত্র বলে (A government of the people, for the people and by the people)।

গুণ (Merits)

অধুনা গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহার প্রথম কারণ হইল যে, এই শাসন-ব্যববস্থায় শাসকগোষ্ঠী শাসিতের নিকট দায়ী থাকে। তাহাতে স্বৈরাচারের সম্ভাবনা দূরীভূত হয়।

দ্বিতীয়তঃ এই শাসন-ব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকই তাহার ন্যায্য অধিকার রক্ষা করিবার সুযোগ পায়। জনস্বার্থ এই শাসন-ব্যবস্থায় যেরূপভাবে সংরক্ষিত হয়, অন্য কোন শাসন-ব্যবস্থায় তাহা সম্ভব হয় না।

তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্র প্রত্যেক ব্যক্তিকেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ দিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে।

চতুর্থতঃ, এই শাসন-ব্যবস্থায় সমষ্টিগত জীবনের সর্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণ সাধিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"—এই আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নিজ সামর্থ্যমত সমষ্টিগত জীবনের কল্যাণ সাধনে তৎপর হয়।

পঞ্চমতঃ, এই শাসন-ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রীর ভাব প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করে। লর্ড ব্রাইসের মতে, এই শাসন-ব্যবস্থার প্রধান কৃতিত্ব হইল যে, মূঢ় ও মূক জনগণকে ভোটদানের ক্ষমতা দিয়া উহা তাহাদের স্ব স্ব অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে।

দোষ (Demerits)

গণতন্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইলেও ইহা একেবারে দোষবিমুক্ত নহে। গণতন্ত্র সংখ্যাধিক্যের প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে, গুণের উপর নয়। গণতন্ত্র সাম্যের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই শাসন-ব্যবস্থায় 'জন প্রতি এক ভোট' এই নীতি কার্যকরী হইয়া যোগ্যতার সমাদর হ্রাস পাইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ গণতন্ত্র বলিতে সংখ্যাধিক্যের শাসন বুঝায়। আর এই সংখ্যাধিক্য গঠিত হয় অক্ষম ও অশিক্ষিত লোকের দ্বারা। সুতরাং অক্ষম ও অশিক্ষিত লোক দ্বারা পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা কখনই সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্রকর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্রে কোন শ্রেণীবিভাগ স্থান পায় না। সকল মানুষই সমপর্যায়ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গণতন্ত্রের কার্য পরিচালিত হয় মুষ্টিমেয় চতুর ও বিবেকবর্জিত লোকের দ্বারা। ইহারা প্রধানতঃ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করে।

চতুর্থতঃ, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সার্বজনীন কল্যাণের জন্য আইন করা হয়। কিন্তু দেখা যায় যে, যে সম্প্রদায় সংখ্যাধিক্যের জোরে শাসনক্ষমতা অধিকার করিয়াছে তাহারাই নিজেদের সুবিধার্থে আইন-প্রণয়ন করে।

পঞ্চমতঃ মেইন, লেকি প্রমুখ লেখকগণ ইহার কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, গণতন্ত্র অধ্যাত্ম জীবনের উৎকর্ষের প্রতিকূলতা করে।

ষষ্ঠতঃ, এই শাসন-ব্যবস্থা স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। নির্বাচকদের ইচ্ছার উপর এই শাসন-ব্যবস্থার স্থায়িত্ব নির্ভর করে। নির্বাচকমণ্ডলী খুসীমত সরকার পরিবর্তিত করিতে পারে, স্বল্পকালস্থায়ী সরকার কোন সুদূরপ্রসারী নীতি বা জনহিতকর গঠনমূলক কার্য করিতে পারে না।

10. State and explain the chief characteristics of the Indian Federation.

H. S. (Com) 1960, 1962

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর।

উঃ—নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার ও ১৬টি রাজ্য সরকারের অবস্থিতি এবং অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার ভাগ বণ্টন হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, একটি লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বারা ক্ষমতা বিভক্ত হইয়াছে। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের ন্যায় ভারতের শাসনতন্ত্র শুধু লিখিত নয়, সাধারণভাবে বলিতে গেলে এই শাসনতন্ত্র অনমনীয়ও বটে। তৃতীয়তঃ অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ভারতেও একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চতুর্থতঃ, এই শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে কিছু পরিমাণ রাজস্ব বণ্টনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতের শাসনতন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু ভারতের শাসনতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার অন্তরালে এই শাসনতন্ত্রে এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার একাধিক নিদর্শন রহিয়াছে। প্রথমতঃ, ভারতে একই শাসনতন্ত্র দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির গঠন, প্রকৃতি ও কার্যক্ষেত্র স্থির হইয়াছে। রাজ্য সরকারগুলির নিজস্ব কোন পৃথক শাসনতন্ত্র গঠন বা পরিবর্তনের ক্ষমতা নাই। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—রাজ্যগুলির মধ্যে রাজনৈতিক সমতা—এই শাসনতন্ত্রে কার্যকরী করা হয় নাই।

তৃতীয়তঃ, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বণ্টন নীতি এরূপভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের উপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির শাসনভার অর্পিত হইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। চতুর্থতঃ, ভারতের শাসনতন্ত্রে একটি যুগ্ম বিষয়ের তালিকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ও ক্ষমতা বণ্টন ব্যাপারে অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। এই উভয় ব্যবস্থা দ্বারা রাজ্যসরকারগুলির যুক্তরাষ্ট্র-সুলভ স্বাধীন সত্তা ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। পঞ্চমতঃ, সমগ্র ভারতের জন্য একদফা নাগরিকত্ব, একটি মাত্র আপীল আদালত ও একটিমাত্র নির্বাচন সংসদ প্রতিষ্ঠা দ্বারা এই শাসনতন্ত্রের এককেন্দ্রীয় ভাব সূচিত হয়। ষষ্ঠতঃ, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে এই শাসন-ব্যবস্থাকে এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় পরিবর্তন করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্যসরকারগুলির শাসনকার্য পরিচালিত হইতে পারে। অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

অষ্টম অধ্যায়

শাসনতন্ত্র (Constitution)

সংজ্ঞা—Definition

প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই একটা নিজস্ব শাসনতন্ত্র থাকে। শাসনতন্ত্র ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। মানুষের দৈনন্দিন জীবন যেরূপ কতকগুলি বিধি-নিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, রাষ্ট্রের কার্যকলাপও তদ্রূপ কতকগুলি বিধি-নিষেধের দ্বারা সীমায়িত। এই বিধি-নিষেধগুলির অবর্তমানে রাষ্ট্র স্বৈরাচারী হইতে পারে। শাসনতন্ত্র বলিতে আমরা বুঝি কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় আইনকানুন, এবং কতকগুলি বিধি-নিষেধ ও প্রথা, যেগুলি অনুসরণ করিয়া রাষ্ট্র শাসনকার্য পরিচালনা করে। রাষ্ট্রের কার্য পরিচালনা করে সরকার। শাসনতন্ত্র নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্ধারিত করিয়া শাসনব্যবস্থা চালু রাখে—সরকারের কি কি ক্ষমতা থাকিবে ও কিভাবে সেই ক্ষমতাসমূহ শাসনকার্যে প্রয়োগ করা হইবে, কি নিয়ম অনুসারে সরকার গঠিত ও পরিচালিত হইবে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কি সম্পর্ক বিদ্যমান থাকিবে ও সর্বোপরি শাসক ও শাসিতের কি কি অধিকার ও দায়িত্ব থাকিবে। সুতরাং শাসনতন্ত্র হইল কতকগুলি লিখিত ও অ-লিখিত আইনের সমষ্টি, যেগুলির দ্বারা একদিকে সরকারের সংগঠন ও কার্যকলাপ অপর দিকে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। কোন দেশের বর্তমান শাসনতন্ত্র বলিতে বুঝায় সেই দেশের রাষ্ট্রগঠনকালীন মূল শাসনতন্ত্র ও পরবর্তী কালের শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন—এই উভয়ের সমষ্টিকে শাসনতন্ত্র বলা হয়।

শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ—Classification of Constitution

পূর্বতন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা শাসনতন্ত্রের দুইটি ভাগের উল্লেখ করিয়াছেন। একটি হইল **অ-লিখিত (Unwritten)**, অপরটি হইল **লিখিত (Written)**। অ-লিখিত শাসনতন্ত্র কোন পূর্ব-পরিকল্পিত নিয়ম অনুযায়ী গঠিত হয় না। এই শাসনতন্ত্র বিভিন্ন প্রথা ও আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তির উপর ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। আইনসভা বা কোন প্রতিনিধিমূলক সংসদ দ্বারা রচিত আইন এই শাসনতন্ত্রে খুব কমই দেখা যায়। এই শাসনতন্ত্র কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোন নির্দিষ্ট

প্রতিনিধি-সংসদ দ্বারা রচিত হয় না। ইহা ক্রমবিবর্তনের ফলে গড়িয়া উঠে। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র অ-লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই শাসনতন্ত্র কতকগুলি প্রথা এবং বিধিব্যবস্থা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের সমষ্টিমাত্র। যে প্রথা ও বিধিব্যবস্থাগুলি বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে, অ-লিখিত হইলেও সেগুলি লিখিত আইনের মতই কার্যকরী হয়।

লিখিত শাসনতন্ত্রে প্রত্যেকটি বিষয়ই লিপিবদ্ধ থাকে। এই জাতীয় শাসনতন্ত্র পূর্ব-পরিকল্পনানুযায়ী একটি নির্দিষ্ট প্রতিনিধি-সংসদ দ্বারা রচিত হয়। শাসক-শাসিতের সম্পর্ক এই শাসনতন্ত্রে বিশদভাবে লিখিত থাকে। লিখিত শাসনতন্ত্র একটিমাত্র বৃহৎ আইনের দ্বারা গঠিত হইতে পারে, যেমন আমাদের ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্র, অথবা ইহা বিভিন্ন সময়ে রচিত আইনের সমষ্টিও হইতে পারে। বর্তমান যুগে অধিকাংশ দেশেই লিখিত শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে। আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র, ফরাসী দেশ, ভারত, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে এই লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বারা শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

লিখিত ও অ-লিখিত শাসনতন্ত্রের পার্থক্য সুস্পষ্ট নয়—Distinction between a Written Constitution and an Unwritten one—not well-marked

শাসনতন্ত্রের উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগ সুস্পষ্ট নয়, বিজ্ঞানসম্মতও নয়। প্রথমতঃ বলা যায় যে, কোন অ-লিখিত শাসনতন্ত্রই সম্পূর্ণ অ-লিখিত হইতে পারে না। অ-লিখিত শাসনতন্ত্রে অনেক লিখিত অংশ থাকে—উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বৃটিশ শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ অ-লিখিত হইলেও সম্পূর্ণভাবে অলিখিত নয়। ম্যাগ্‌না কার্টা, অধিকারের সনদ্ (Bill of Rights) প্রভৃতি কতকগুলি লিখিত অংশ এই অ-লিখিত শাসনতন্ত্রে স্থান পাইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, লিখিত শাসনতন্ত্রেও অ-লিখিত অংশ থাকে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র মূলতঃ লিখিত হইলেও ক্যাবিনেটের উৎপত্তি, রাষ্ট্রপতির পরোক্ষ নির্বাচন-নীতির পরিবর্তন প্রভৃতি শাসনতান্ত্রিক নিয়মগুলি অ-লিখিত প্রথার দ্বারা প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে। সুতরাং লিখিত শাসনতন্ত্রে অ-লিখিত অংশের ও অ-লিখিত শাসনতন্ত্রে লিখিত অংশের অস্তিত্ব বিদ্যমান। সকল শাসনতন্ত্রই লিখিত ও অ-লিখিত বিধিব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন

শাসনতন্ত্রে লিখিত অংশ বেশী, অ-লিখিত অংশ কম, আবার কোন শাসনতন্ত্রে অ-লিখিত অংশ বেশী, লিখিত অংশ কম। সুতরাং ইহাকে মূলগত পার্থক্য বলা যায় না।

তৃতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রের এইরূপ শ্রেণীবিভাগের ফলে পরোক্ষভাবে এই ভুল ধারণা জন্মিতে পারে যে, যে-দেশে লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বারা শাসন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেখানকার উচ্চ আদালত আইনসভা-রচিত আইনকে শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া বে-আইনীরূপে বাতিল করিতে পারে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে একথা সত্য নয়। ফরাসী দেশের শাসনতন্ত্র লিখিত, কিন্তু সে দেশের উচ্চ আদালত আমেরিকা যুক্ত-রাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের মত আইনসভাপ্রণীত কোন আইনকে বে-আইনী বলিয়া বাতিল করিতে পারে না।

চতুর্থতঃ, বলা হয় যে, অ-লিখিত শাসনতন্ত্র অপেক্ষা লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতা অধিকতর সুরক্ষিত করা যায়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, ব্যক্তি-স্বাধীনতা শাসনতন্ত্রের লিখিত প্রকৃতির উপর চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে না। বৃটিশ শাসনতন্ত্র অ-লিখিত, তাহা সত্ত্বেও বৃটিশ জাতি স্বাধীন, আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে জার্মানীর লিখিত শাসনতন্ত্র হিট্‌লারের শাসন-সময়ে জার্মান জাতির অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই।

কোন শাসনতন্ত্রই সম্পূর্ণরূপে লিখিত বা অ-লিখিত হইতে পারে না বা হওয়া বাঞ্ছনীয়ও নয়। শাসনতন্ত্র যদি সম্পূর্ণভাবে লিখিত হয়, তাহা হইলে জাতীয় জীবনে অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়। শাসনতন্ত্র জাতীয় জীবনের রাষ্ট্রনৈতিক আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের জীবন্ত প্রতীক। জাতীয় জীবনধারা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনদর্শন ও আদর্শ পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন শাসনতন্ত্রে স্থান পাইয়া জাতীয় জীবনের অগ্রগতির পথ সুগম করিয়া দেয়। সুতরাং জাতীয় জীবনের প্রয়োজনেই শাসনতন্ত্র ধীরে ধীরে বিবর্তনের মধ্য দিয়া প্রথা ও আদালতের সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিপুষ্ট ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।

অ-লিখিত শাসনতন্ত্রের সুবিধা ও অসুবিধা—Merits and Demerits of Unwritten Constitution

অ-লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইল যে, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে এই শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিয়া শাসনতন্ত্রকে সময়োপযোগী করা যায়। জাতীয় জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে শাসনতন্ত্রকে পরিবর্তন করিয়া উহা জাতীয় অগ্রগতির পথ

সুগম করে। অ-লিখিত শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তনশীল বলিয়া ইহার সংস্কার সকল সময়ে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সাধিত হইতে পারে।

অ-লিখিত শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তন করা যায় বলিয়া ইহার কোন স্থায়িত্ব থাকে না। প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে সাধারণের দাবীতে ইহা পরিবর্তিত হইতে পারে। ফলে শাসনতন্ত্রের অনেক উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যও নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। অ-লিখিত শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ প্রচলিত প্রথা ও আচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং ইহার বিধি-নিষেধগুলি সুস্পষ্ট হইতে পারে না। স্পষ্টতার অভাবের দরুণ শাসকগণ তাঁহাদের নিজেদের ইচ্ছামত ইহার ব্যাখ্যা করিতে পারেন ও সেজন্য ব্যক্তি-স্বাধীনতা অনেক সময় ব্যাহত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় অ-লিখিত শাসনতন্ত্র একেবারেই অনুপযোগী।

লিখিত শাসনতন্ত্রের সুবিধা ও অসুবিধা—Merits and Demerits of Written Constitution

লিখিত শাসনতন্ত্রে শাসক-শাসিতের সম্পর্কের সমস্ত বিষয় সুস্পষ্টরূপে লিখিত থাকে বলিয়া ইহাতে কোন বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এই সুস্পষ্টতার জন্য শাসকবর্গ ও জনসাধারণ তাহাদের ন্যায্য অধিকার ও দায়িত্বসম্বন্ধে সচেতন থাকিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় লিখিত শাসনতন্ত্র অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করিয়া দিয়া এই লিখিত শাসনতন্ত্র উভয় সরকারের কার্যের সীমারেখা স্থির করিয়া দেয়। অ-লিখিত শাসনতন্ত্র অপেক্ষা ইহা অধিকতর স্থায়ী।

লিখিত শাসনতন্ত্রের দোষ হইল যে, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে ইহার দ্রুত পরিবর্তন সম্ভব নয়। সহজে পরিবর্তন করা যায় না বলিয়া দেশে অসন্তোষের সৃষ্টি হইতে পারে। অনেক সময় জাতীয় জীবনের রাষ্ট্রনৈতিক অগ্রগতির পথে ইহা বাধা সৃষ্টি করিয়া দেশে বিদ্রোহ ঘটাইতে পারে।

নমনীয় ও অ-নমনীয় শাসনতন্ত্র—Flexible and Rigid Constitution

শাসনতন্ত্রের লিখিত ও অ-লিখিত এই শ্রেণীবিভাগ অলীক ও অবাস্তব বলিয়া লর্ড ব্রাইস্ শাসনতন্ত্রকে নমনীয় ও অ-নমনীয় এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনপদ্ধতি সহজ কি জটিল এই পার্থক্যের ভিত্তির উপর এই শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। যদি শাসনতন্ত্র সহজেই পরিবর্তন করা চলে অর্থাৎ

দেশের আইনসভা সাধারণ আইনের মত শাসনতন্ত্র-বিষয়ক আইনও ভোটাধিক্যে যদি পরিবর্তন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে নমনীয় শাসনতন্ত্র বলা হয়। এই ব্যবস্থায় শাসনতান্ত্রিক আইনের পরিবর্তনের জন্য কোনরূপ বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয় না। শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইন একই পর্যায়ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। দেশের আইনসভা উভয়বিধ আইন পরিবর্তনের অধিকারী হয়। বৃটিশ শাসনতন্ত্র নমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পার্লামেণ্ট সভা সাধারণ আইন পরিবর্তন পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক আইনগুলিও পরিবর্তন করিয়া থাকে। এজন্য কোন বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। ইংলণ্ডে শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে কোন প্রভেদ করা হয় না ও রাজাসহ পার্লামেণ্ট সভা উভয়বিধ আইনপ্রণয়ন ও পরিবর্তনের পূর্ণ-অধিকারী।

অপর পক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রকে অ-নমনীয় বলা হয়। এই শাসনতন্ত্রের যদি একটি সামান্যতম পরিবর্তনও করিতে হয় তাহা হইলে একটা বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। দেশের আইনসভা সাধারণ আইন-পরিবর্তন-পদ্ধতিতে শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তন করিতে পারে না। মার্কিন দেশে শাসনতান্ত্রিক আইনের পরিবর্তন করিতে হইলে নিম্নলিখিত জটিল পদ্ধতির আশ্রয় লইতে হয়। কংগ্রেস-সভার দুই পরিষদের মোট সদস্যদের $\frac{2}{3}$ অংশকে এই পরিবর্তনের প্রস্তাব সমর্থন করিতে হইবে, বিকল্পে ৫০টি রাজ্যের $\frac{2}{3}$ অর্থাৎ তেত্রিশটি রাজ্য দ্বারা পরিবর্তনের জন্য বিশেষ একটি সভা আহ্বান করিয়া প্রস্তাবটি সমর্থন করাইতে হইবে। এইরূপে সমর্থিত পরিবর্তনের প্রস্তাব ছত্রিশটি রাজ্যের আইনসভা কিংবা আহূত সভায় উপস্থিত $\frac{3}{4}$ সংখ্যক সদস্য দ্বারা সমর্থিত হইতে হইবে। এই পদ্ধতি সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি অপেক্ষা বহু গুণে জটিল, সেই জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এযাবৎ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শাসনতন্ত্র-পরিবর্তনের সংখ্যা অতি অল্প। যে দেশে অনমনীয় শাসনতন্ত্র প্রচলিত, সেখানে শাসনতান্ত্রিক আইনগুলি সাধারণ আইন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। শাসনতান্ত্রিক আইনগুলিকে একটা বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়।

নমনীয় শাসনতন্ত্রের সুবিধা ও অসুবিধা—Merits and Demerits of Flexible Constitution

নমনীয় শাসনতন্ত্রের অনেকগুলি সুবিধা আছে। প্রথমতঃ, শাসনতন্ত্র-পরিবর্তনের

জন্য বিশেষ কোন অসুবিধা নাই বলিয়া জাতীয় প্রগতির সঙ্গে ইহার সমন্বয় সম্ভব করা যায়। শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তন করা যায় বলিয়া বিনা রক্তপাতে শাসনতন্ত্রের আমূল পরিবর্তন সাধন করা যায়। সহজে পরিবর্তনশীল বলিয়া জনমতের দাবী পূরণ করা যায় ও তাহাতে জনমত শান্ত থাকে। লোকে ইচ্ছা করিয়া শাসনতন্ত্র ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করে না।

স্থায়িত্বের অভাব হইল এই শাসনতন্ত্রের প্রধান ত্রুটি। সদা পরিবর্তনশীল জনমতের প্রভাবে এই শাসনতন্ত্রও পরিবর্তিত হইতে পারে। নিয়ত পরিবর্তনশীল শাসনতন্ত্র জনগণের আস্থাভাজন হইতে সক্ষম হয় না। নাগরিক অধিকার ও স্বার্থ এইরূপ পরিবর্তনশীল শাসনতন্ত্র দ্বারা সুরক্ষিত হইতে পারে না। সুতরাং জনসাধারণ এই শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে স্বভাবতই সন্দেহপরায়ণ হইয়া উঠে।

অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের গুণ ও অপগুণ—Merits and Demerits of Rigid Constitution

অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইল ইহার স্থায়িত্ব। এই শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন শুধু জনমতের প্রভাবে হয় না। এই শাসনতন্ত্রের আইনগুলি লিখিত বলিয়া ইহা স্পষ্ট এবং ইহার মধ্যে অনিশ্চয়তা কম। দ্রুত ও সহজে পরিবর্তনশীল নয় বলিয়া জনগণের অধিকার ও স্বার্থ ইহা দ্বারা অধিকতরভাবে সুরক্ষিত হয় ও সেজন্য শাসনতন্ত্রে জনগণের আস্থা থাকে। যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থায় অ-নমনীয় শাসনতন্ত্র অতীব উপযোগী।

কিন্তু ইহার ত্রুটি হইল যে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা যায় না বলিয়া জাতীয় অগ্রগতির পথে উহা অনেক সময় বাধা সৃষ্টি করে। ফলে জনগণের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। জাতীয় জীবনের পরিবর্তনের সহিত যদি শাসনতন্ত্রের সামঞ্জস্য বিধান না করা যায়, তাহা হইলে সে শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইতে পারে না।

শাসনতন্ত্রের স্বরূপ—Nature of a Constitution—শাসনতন্ত্রকে যেরূপ লিখিত ও অ-লিখিত ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করা যুক্তিসংগত নয় তদ্রূপ নমনীয় ও অনমনীয় রূপে ইহার শ্রেণীবিভাগ করা কতদূর যুক্তিসংগত তাহা বিচারসাপেক্ষ। সংক্ষেপে বলা যায় যে, শাসনতন্ত্র শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারিত করে। শাসক-শাসিতের এই সম্পর্ক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয় হইলেও ইহার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব লাঘব হয় না। মানুষের চিন্তাধারা, প্রয়োজন ও আদর্শ ক্রমশঃ নূতন রূপ পরিগ্রহ করিতেছে এবং এই পরিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্য

রাখিবার জন্য শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনও জাতীয় জীবনে অনস্বীকার্য। যেখানে এই পরিবর্তনের কোন ব্যবস্থা নাই, সেখানে শাসনতন্ত্রের মর্যাদা হানি হইবার সম্ভাবনা বর্তমান থাকে। তাই প্রত্যেক দেশের শাসনতন্ত্রে—কি লিখিত বা অ-লিখিত, কি নমনীয় বা অ-নমনীয়,—পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ব্যবস্থা থাকা অতীব প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। যে শ্রেণীরই শাসনতন্ত্র হউক না কেন, সকল শাসনতন্ত্রই অল্পবিস্তর তিনটি উপাদানের সমাবেশে গঠিত হয়। প্রথমতঃ, দেখা যায় যে, প্রত্যেক শাসনতন্ত্রে অল্পবিস্তর পরিমাণে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রণীত শাসনতান্ত্রিক আইন স্থান পায়। দ্বিতীয়তঃ, প্রচলিত প্রথা ও বিধিবিধান দ্বারা শাসনতন্ত্রের অনেকাংশ পরিপুষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ, বিচারালয়গুলির সিদ্ধান্তও শাসনতন্ত্রের পরিবর্ধনে ও পরিবর্তনে অনেক সহায়তা করে। বৃটেন ও মার্কিন দেশের শাসনতন্ত্রে পার্থক্য থাকিলেও এই উভয় শাসনতন্ত্রই শেষোক্ত উপাদানটির দ্বারা প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে। কিন্তু এই সঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শাসনতন্ত্রের উপর উপরি-উক্ত তিনটি উপাদানের প্রভাব সর্বত্র সমানভাবে কার্যকরী নাও হইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত হইলেও প্রচলিত প্রথা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের প্রভাব হইতে মুক্ত নয়। অপরপক্ষে বৃটেনের শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ প্রচলিত প্রথা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রণীত আইনের প্রভাব হইতে মুক্ত নয়।

সাধারণতঃ বৃটিশ শাসনতন্ত্রকে নমনীয় ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রকে অ-নমনীয় বলা হয়। বিশেষ বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এই পার্থক্য মূলগত পার্থক্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। বৃটিশ শাসনতন্ত্র অতি সহজেই সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতিতে পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক পরিবর্তিত হইতে পারে, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় যে, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র সাধারণ আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি হইতে পৃথক একটি জটিল পদ্ধতি ব্যতীত পরিবর্তিত হইতে পারে না। কিন্তু এই নিয়মতান্ত্রিক জটিল পদ্ধতি ছাড়াও মার্কিন দেশের শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের অন্য পন্থা আছে ও সেই পন্থা অনুসরণ করিয়া মার্কিন দেশের শাসনতন্ত্রের সময়োপযোগী বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। এ কথা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, জাতীয় রাজনৈতিক জীবনধারার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান শাসনতন্ত্র ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ফিলাডেলফিয়ায় রচিত ও ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে গৃহীত আদি

শাসনতন্ত্র হইতে বহুলাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে। প্রশ্ন হইল এই অসংখ্য পরিবর্তন শাসনতন্ত্রের অ-নমনীয়তা সত্ত্বেও কি ভাবে সম্ভব হইল? নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে মাত্র ২৩টি সংশোধন হইয়াছে। অবশিষ্ট পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সম্ভব হইয়াছে প্রথা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। প্রথাগত বিধির দ্বারাই ক্যাবিনেটের উৎপত্তি হইয়াছে। বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বারা জাতীয় বা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস-সভার ক্ষমতা বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বারা ধীরে ধীরে এরূপ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, আদি শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ তাহা কল্পনাও করিতে পারিতেন না। এইরূপে যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের গঠনপ্রকৃতি ও তাৎপর্য উভয়েরই পরিবর্তন হইয়াছে। সুতরাং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন-পদ্ধতি শাসনতন্ত্র-পরিবর্তনের একমাত্র পদ্ধতি বা পন্থা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। যেখানে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সহজ নয় সেখানে অন্য উপায়ে—প্রথা বা বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বারা—শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সহজসাধ্য করা হয়। শাসনতন্ত্র কোন ক্রমেই স্থাণুর মত থাকিতে পারে না। সুতরাং সকল শাসনতন্ত্রই পরিবর্তনশীল। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে মার্কিন শাসনতন্ত্র বৃটিশ শাসনতন্ত্র অপেক্ষা কম নমনীয় নহে।

বর্তমান যুগে নানা কারণে শাসনতন্ত্রগুলি অ-নমনীয়তার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। এমন কি সর্বাপেক্ষা অধিক নমনীয় বৃটিশ শাসনতন্ত্রও ক্রমশই অ-নমনীয় হইয়া উঠিতেছে। ইহার প্রধান কারণ হইল, মৌলিক অধিকারগুলির রক্ষাকল্পে জনসাধারণ বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিতেছে ও সেইজন্য অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে এই ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা করা হয়। শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তনশীল নয় বলিয়া শাসনকর্তৃপক্ষ সহসা ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংকুচিত করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এই অ-নমনীয় শাসনতন্ত্র ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রাদেশিক সরকারগুলির ও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অব্যাহত রাখে।

শাসনতন্ত্র-পরিবর্তনের বিভিন্ন পদ্ধতি—Methods of Constitutional Amendment

শাসনতন্ত্র লিখিত হউক আর অ-লিখিত হউক, নমনীয় হউক আর অ-নমনীয়

হউক, জাতীয় অগ্রগতির জন্য ইহার পরিবর্তন অপরিহার্য। কিন্তু এই পরিবর্তনের পদ্ধতি সকল দেশে এক প্রকারের নয়।

নমনীয় শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনে কোনরূপ জটিলতা নাই। সাধারণ পদ্ধতিতে সাধারণ আইনের মত আইনসভাই ইহার পরিবর্তন করিতে পারে—যেরূপভাবে ইংলণ্ডে পরিবর্তিত হয়।

কিন্তু অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে।

প্রথমতঃ, অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের জন্য সমগ্র ভোটদাতার সম্মতির প্রয়োজন হয়। সুইস দেশ ও অষ্ট্রেলিয়ায় এই নিয়ম অনুসারে শাসনতন্ত্র পরিবর্তিত করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসনতান্ত্রিক আইনের পরিবর্তনের জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলির সংখ্যাধিক্যের সম্মতির প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রস্তাব ¾ রাজ্য দ্বারা সমর্থিত হওয়া চাই। অষ্ট্রেলিয়া ও সুইস দেশেও নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যাধিক্য ছাড়া প্রাদেশিক সরকার-গুলির সংখ্যাধিক্যের সম্মতি প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, অনেক দেশে সাধারণ আইনসভা একটা নির্দিষ্ট বিশেষ পদ্ধতি দ্বারা শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে পারে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভার উভয় কক্ষের ⅔ অংশ সভ্যের সম্মতিতে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সম্ভব হয়। ভারতেও কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সাধারণ আইনসভা কর্তৃক প্রস্তাবিত সংশোধন একটা খসড়া বিলের আকারে আইনসভায় পেশ করাইয়া সমগ্র সদস্যসংখ্যা ও উপস্থিত সদস্যসংখ্যার নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্য দ্বারা প্রস্তাবিত সংশোধন অনুমোদন করাইতে হইবে। তারপর ভারতের রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাইলে ইহা কার্যকরী হইবে।

শাসনতন্ত্রের বিষয়বস্তু—Contents of a Constitution

শাসনতন্ত্রের বিষয়বস্তু কি এ সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। শাসনতন্ত্র কি শুধু সরকারের ক্ষমতার উৎস বলিয়া বিবেচিত হইবে, না শুধু ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে পরিগণিত হইবে—ইহাই বিচার্য বিষয়। শাসনতন্ত্রের প্রধান কার্য হইল, রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া ব্যক্তিত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তির পথ সুগম করিয়া দেওয়া। এইজন্য শাসনতন্ত্রে নিম্নলিখিত বিধি-নিষেধগুলি স্থান পায়।

প্রথমতঃ, শাসনকার্য পরিচালনা করিবার নিমিত্ত শাসকশ্রেণী নির্বাচন করিয়া তাহাদের ক্ষমতা শাসনতন্ত্র সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত করিয়া দেয়। শাসনতন্ত্র এক দিকে যেমন সরকার কি কি কার্য করিবে তাহা স্থির করিয়া দেয়, অপর দিকে সেইরূপ সরকার কি কি কার্য করিতে পারিবে না তাহাও নির্ধারণ করিয়া সরকারের কার্যের সীমারেখা স্থির করিয়া দেয়।

দ্বিতীয়তঃ, শাসনতন্ত্র ব্যক্তি-স্বাধীনতার উৎস। সমাজ-জীবনে নাগরিকগণ অন্য ব্যক্তির ও সরকারের সম্পর্কে কি পরিমাণ অধিকার ভোগ করিতে পারে শাসনতন্ত্র তাহা স্থির করিয়া পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত করে। শাসনতন্ত্র অন্যের ও সরকারের সম্পর্কে নাগরিক কর্তব্যও নির্ধারণ করিয়া দেয়।

তৃতীয়তঃ, সরকারের কার্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সেজন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক শাসনতন্ত্র স্থির করে। বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা পরস্পর-বিরোধী না হইয়া কিভাবে পরিচালিত হইলে শাসনকার্য উন্নততর হইতে পারে, শাসনতন্ত্র সে নির্দেশও দেয়।

চতুর্থতঃ, সরকারী কার্যে লোক নিয়োগ করিবার জন্য কতকগুলি মৌলিক আইন শাসনতন্ত্রে সন্নিবদ্ধ করা হয়। এই আইনানুসারে গঠিত একটি সাধারণ নিয়োগ-সংসদ (Public Service Commission)-গঠনের ব্যবস্থা থাকে। এই নিয়োগ-সংসদই যোগ্যতানুসারে পরীক্ষা করিয়া বা অন্য পন্থায় সরকারী কর্মী নিয়োগ করিয়া থাকে।

পরিশেষে প্রত্যেক শাসনতন্ত্রেই শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের একটি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি স্থিরীকৃত থাকে, যে পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সম্ভব হয়। কোন্ কর্তৃপক্ষ শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে যোগ্যতাসম্পন্ন বা কি পদ্ধতিতে সংশোধন করা যাইবে—সকল বিষয় স্পষ্টভাবে শাসনতন্ত্রে লিখিত থাকে।

সংক্ষিপ্তসার

শাসনতন্ত্র—স্থায়িভাবে আইনের ভিত্তির উপর শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারণ করা হইল শাসনতন্ত্রের কার্য। শাসনতন্ত্র ব্যতীত কোন রাষ্ট্রের কল্পনা করা যায় না।

সরকারের কার্য কিভাবে পরিচালিত হইবে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে পারস্পরিক কি সম্পর্ক হইবে এবং সরকার ও জনগণের মধ্যে কি সম্পর্ক

হইবে—শাসনতন্ত্র এইগুলি স্থির করে। সরকারের কার্যের সীমারেখা স্থির করিয়া শাসনতন্ত্র ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে।

শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ—শাসনতন্ত্রকে সাধারণত লিখিত ও অ-লিখিত শাসনতন্ত্রে ভাগ করা হয়। যে শাসনতন্ত্রে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক বিশদভাবে লিখিত থাকে এবং পূর্ব-পরিকল্পনানুযায়ী একটি প্রতিনিধিসংসদ দ্বারা ইহা রচিত হয়, তাহাকে লিখিত শাসনতন্ত্র বলা হয়। আর যে শাসনতন্ত্র ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রথা, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত প্রভৃতির দ্বারা গড়িয়া উঠে তাহাকে অ-লিখিত শাসনতন্ত্র বলা হয়। ইহা কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট প্রতিনিধি-সংসদ দ্বারা গঠিত হয় না।

শাসনতন্ত্রের এই শ্রেণীবিভাগ যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ কোন শাসনতন্ত্রই সম্পূর্ণরূপে লিখিত বা অ-লিখিত হইতে পারে না। লিখিত শাসনতন্ত্রে অ-লিখিত অংশ থাকিতে পারে (যেমন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত হইলেও অনেক ক্ষেত্রে অ-লিখিত প্রথার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে), আবার অ-লিখিত শাসনতন্ত্রে লিখিত অংশ থাকিতে পারে (যেমন বৃটিশ শাসনতন্ত্রে ম্যাগনা কার্টা, অধিকারের সনদ প্রভৃতি লিখিত অংশ স্থান পাইয়াছে)।

লিখিত শাসনতন্ত্র সুস্পষ্ট। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ইহা অপরিহার্য। কিন্তু ইহার প্রধান দোষ হইল যে, সহজে পরিবর্তন করা যায় না বলিয়া উহা অনেক সময় জাতীয় অগ্রগতির পথ রোধ করে।

অ-লিখিত শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তন করা যায় বলিয়া ইহা জাতীয় জীবনের প্রয়োজন মিটাইতে পারে। কিন্তু ইহা অস্থায়ী ও অস্পষ্ট।

শাসনতন্ত্রকে অন্য দিক দিয়া নমনীয় ও অ-নমনীয় এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। সাধারণ পদ্ধতিতে সাধারণ আইনের মত যে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা যায় তাহাকে নমনীয় শাসনতন্ত্র বলা হয়, যেমন বৃটিশ শাসনতন্ত্র। রাজাসহ পার্লামেণ্ট সভা একই পদ্ধতিতে সাধারণ আইন ও শাসনতান্ত্রিক আইনের পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। অপরপক্ষে, যে শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে হইলে সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি অপেক্ষা জটিলতর ভিন্ন পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় তাহাকে অ-নমনীয় শাসনতন্ত্র বলা হয়, যথা, মার্কিন শাসনতন্ত্র।

নমনীয় শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তন করা যায় বলিয়া জাতীয় অগ্রগতি ব্যাহত হয় না—বিনা রক্তপাতে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সম্ভব। কিন্তু ইহার দোষ হইল যে, ইহার কোন স্থায়িত্ব নাই। জনমতের চাপে সদাসর্বদা ইহার রদবদল হইতে পারে।

অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইল ইহার স্থায়িত্ব। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার রক্ষা করিতে এই শাসনতন্ত্র অধিকতর উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয় কিন্তু ইহার প্রধান দোষ হইল যে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা যায় না বলিয়া উহা জাতীয় অগ্রগতির অন্তরায় হইতে পারে।

শাসনতন্ত্রের স্বরূপ—সকল দেশের শাসনতন্ত্রই প্রধানতঃ তিনটি উপাদান দ্বারা গঠিত হয়: নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রচিত আইন, বিভিন্ন প্রথা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত। যে সমস্ত দেশের শাসনতন্ত্র নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা দুরূহ, সেখানে প্রথা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত দ্বারা শাসনতন্ত্রের অনেক পরিবর্তন ঘটে; উদাহরণস্বরূপ আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলা যাইতে পারে। আবার, বৃটিশ শাসনতন্ত্র প্রধানতঃ প্রথা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইহার অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। অধুনা যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রথা আবির্ভাবের ফলে ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে সকল দেশের শাসনতন্ত্রই অ-নমনীয় হইয়া উঠিতেছে।

শাসনতন্ত্র-পরিবর্তনের বিভিন্ন পদ্ধতি—নমনীয় শাসনতন্ত্র পরিবর্তনে কোন জটিলতা নাই। সাধারণ আইনসভা সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে ইহার পরিবর্তন করিতে পারে। কিন্তু অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন পদ্ধতিতে প্রভেদ দেখা যায়। সাধারণ আইনসভা ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া, বা প্রতিনিধি সংসদ্ আহ্বান করিয়া, কিংবা নির্বাচকমণ্ডলীর সমর্থন দ্বারা কিংবা যুগপৎ আইনসভার সমর্থন ও নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যাধিক্যের সমর্থন দ্বারা অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা হয়।

শাসনতন্ত্রের বিষয়বস্তু—শাসনতন্ত্র শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। সুতরাং ইহাতে থাকে—(ক) শাসকের ক্ষমতা ও ক্ষমতার সীমা, (খ) শাসিতের অধিকার, (গ) সরকারের বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক, (ঘ) শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিবার নির্ধারিত পদ্ধতি।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. Define the term 'constitution' and distinguish between written and unwritten constitutions. State the merits and demerits of each. [H. S. (Com) 1960]

শাসনতন্ত্র শব্দটির সংজ্ঞা নির্দেশ কর। লিখিত ও অ-লিখিত শাসনতন্ত্রের পার্থক্য নির্দেশ করিয়া উহাদের গুণ ও দোষ বর্ণনা কর।

উঃ—প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই একটি নিজস্ব শাসনতন্ত্র থাকে। শাসনতন্ত্র ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। প্রত্যেক দেশের শাসনকার্যই কতকগুলি বিধিবদ্ধ আইন ও নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এই সকল আইন ও নীতির সমষ্টিকে শাসনতন্ত্র বা সংবিধান বলা হয়। সুতরাং শাসনতন্ত্র হইল কতকগুলি লিখিত ও অ-লিখিত আইনের সমষ্টি, যাহা দ্বারা একদিকে সরকারের সংগঠন ও কার্যকলাপ, অপর দিকে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়।

শাসনতন্ত্র লিখিত বা অ-লিখিত হইতে পারে। অ-লিখিত শাসনতন্ত্র কোন পূর্ব-পরিকল্পিত নিয়ম অনুযায়ী কোন প্রতিনিধিমূলক সংসদ দ্বারা গঠিত হয় না। এই শাসনতন্ত্র বিভিন্ন প্রথা ও আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে। যে প্রথা ও বিধি-ব্যবস্থাগুলি শাসন-ব্যবস্থায় বহুদিন হইতে প্রচলিত থাকে, অ-লিখিত হইলেও সেগুলি লিখিত আইনের মত কার্যকরী হয়। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র অ-লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা কিভাবে গঠিত হইবে এবং রাজার ও পার্লামেণ্টের সহিত ইহার কি সম্পর্ক হইবে তাহা প্রাচীন প্রচলিত প্রথা দ্বারাই স্থির হয়।

শাসন-ব্যবস্থার গঠনপ্রণালী যখন লিখিত থাকে, তখন শাসনতন্ত্রকে লিখিত শাসনতন্ত্র বলা হয়। লিখিত শাসনতন্ত্র পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী একটি নির্দিষ্ট প্রতিনিধি সংসদ দ্বারা রচিত হয়। শাসন-ব্যবস্থার গঠন, প্রকৃতি ও শাসক-শাসিত সম্পর্ক এই শাসন-ব্যবস্থায় বিশদভাবে লিখিত থাকে। বর্তমানে অধিকাংশ দেশের শাসন-ব্যবস্থাই লিখিত শাসনতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হয়। ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের শাসনতন্ত্র লিখিত।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, লিখিত ও অ-লিখিত শাসনতন্ত্রের পার্থক্য সর্বত্র সুস্পষ্ট নহে। কারণ কোন শাসনতন্ত্রই সম্পূর্ণভাবে লিখিত বা সম্পূর্ণভাবে অ-লিখিত হইতে পারে না। লিখিত শাসনতন্ত্রে অ-লিখিত অংশ থাকিতে পারে, আবার অ-লিখিত শাসনতন্ত্রে লিখিত অংশ থাকিতে পারে।

লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইল যে, ইহা সুস্পষ্ট। এই সুস্পষ্টতার জন্য শাসকবর্গ ও জনসাধারণ তাহাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, লিখিত বলিয়া ইহা অধিকতর স্থায়ী হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় লিখিত শাসনতন্ত্র অপরিহার্য।

লিখিত শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তন করা যায় না বলিয়া ইহা জাতীয় জীবনের প্রয়োজন মিটাইতে পারে না, ফলে দেশে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়।

অ-লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইল যে, অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিয়া সময়োপযোগী করা যায়। সহজে পরিবর্তন করা যায় বলিয়া ইহা বিপ্লবের আশংকামুক্ত থাকে।

অ-লিখিত শাসনতন্ত্রের প্রধান ত্রুটি হইল যে, ইহা সহজে পরিবর্তন করা যায় বলিয়া ইহার কোন স্থায়িত্ব থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, প্রচলিত প্রথা ও আচারের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহার বিধিগুলিও

সুস্পষ্ট হয় না। ফলে, শাসকগণ তাঁহাদের খুসীমত ইহার ব্যাখ্যা করিতে পারেন এবং সেজন্য অনেক সময় ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

2. Define the term 'Constitution'. Distinguish between rigid and flexible constitutions. Illustrate your answer by reference to the Constitution of India. [H. S. (Com) 1961]

শাসনতন্ত্র শব্দটির সংজ্ঞা নির্দেশ কর। ভারতের শাসনতন্ত্রের উদাহরণ সাহায্যে নমনীয় ও অ-নমনীয় শাসনতন্ত্রের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও।

উঃ—প্রথম প্রশ্নের প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য।

শাসনতন্ত্রকে নমনীয় ও অ-নমনীয় এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যে শাসনতন্ত্র সহজে অর্থাৎ সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে সাধারণ আইনসভা কর্তৃক পরিবর্তন করা যায়, তাহাকে নমনীয় শাসনতন্ত্র বলা হয়। ইংলণ্ডের আইনসভা রাজা-সহ পার্লামেণ্ট সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে শাসনতান্ত্রিক আইনও পরিবর্তন করিতে পারে। শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তনের জন্য কোন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয় না। সুতরাং ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তন করা যায়। এখানে সাধারণ আইন ও শাসনতান্ত্রিক আইন সম-পর্যায়ভুক্ত।

কিন্তু অনমনীয় শাসনতন্ত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সাধারণ আইনসভা সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে পারে না। শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের জন্য বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন হয়, কারণ, সাধারণ আইন অপেক্ষা শাসনতান্ত্রিক আইনগুলিকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ আইনসভা কংগ্রেস সাধারণ আইন প্রণয়ন করিতে পারিলেও শাসনতান্ত্রিক আইন প্রণয়ন বা পরিবর্তন করিতে পারে না। এজন্য বিশেষ জটিল পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। এইজন্য ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের ন্যায় মার্কিন শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তন করা যায় না। ভারতের শাসনতন্ত্র সাধারণভাবে বলিতে গেলে দুষ্পরিবর্তনীয়। কারণ ভারতের আইনসভা পার্লামেণ্ট সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে এই শাসনতন্ত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবর্তন করিতে পারে না। শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় আইনসভার দুইটি সভাই দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে পাশ হইয়া রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাইলে তবেই কার্যকরী হয়। কিন্তু সাধারণ আইন অধিকাংশ সভ্যের অনুমোদনে পাস হয়। কিন্তু ভারতের শাসনতন্ত্রের কতকগুলি বিষয়, যেমন রাজ্যগুলির সীমানা নির্ধারণ প্রভৃতি—সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে পাস করা যায়। সুতরাং ভারতের শাসনতন্ত্রের কিছু অংশ নমনীয় বলা যায়।

নবম অধ্যায়

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ

(Organs of Government)

বিভিন্ন বিভাগ—Different organs

সরকারকে নানাধরণের কাজ করিতে হয়, যথা—আইন প্রণয়ন করা, শাসন করা ও বিচার করা। সরকারের এই তিনটি প্রধান কাজ যথাক্রমে আইনসভা, শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগ দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। এই বিভাগগুলি কি, ইহাদের গঠন-প্রণালী ও কর্তব্য সম্পর্কে এখন আলোচনা করা যাউক।

আইনসভা ও ইহার কাজ—The Legislature and its functions

আধুনিককালে প্রত্যেক দেশেই আইনসভা থাকে। আইনসভার প্রধান কাজ হইল একটা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আইন প্রণয়ন করা। আইনসভা নূতন আইন প্রণয়ন করিতে পারে, পুরাতন আইনগুলিকে সংশোধন বা বাতিল করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, আইনসভা রাষ্ট্রের সমগ্র আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে। আইনসভার সম্মতি ব্যতীত শাসনকর্তৃপক্ষ রাজস্ব আদায় বা রাজস্ব ব্যয় করিতে পারে না। এই উপায়ে আইনসভা শাসনকর্তৃপক্ষের কাজের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে পারে। তৃতীয়তঃ, মন্ত্রিপরিষদ-চালিত শাসন-ব্যবস্থায় শাসনকর্তৃপক্ষ আইনসভার নিকট ইহার শাসননীতি ও কার্যক্রমের জন্য দায়ী থাকে। শাসন-কর্তৃপক্ষের কার্য যদি আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত না হয়, তাহা হইলে মন্ত্রি-পরিষদের পদত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং আইনসভার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির উপরই শাসন-ব্যবস্থার ভাল-মন্দ নির্ভর করে। চতুর্থতঃ, আইনসভা শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তন করিতে পারে কিংবা পরিবর্তনের প্রস্তাব আনয়ন করিতে পারে। পঞ্চমতঃ, অনেক দেশে আইনসভা রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতি-গণকে নির্বাচন করে। ভারতের রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্ট সভা ও রাজ্যসভাগুলির নির্বাচিত সদস্যগণ দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সুইজারল্যাণ্ড ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিচারপতিগণ আইনসভার দ্বারা নির্বাচিত হন। ষষ্ঠতঃ, আইনসভা

কিছু বিচারবিষয়ক কার্যও করিয়া থাকে। আইনসভা রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী অথবা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিগণের কাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিতে পারে ও এই অভিযোগের বিচার করিতে পারে। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতের রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়া তাহার বিচার করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট সভার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায় যে, আইন-প্রণয়ন ছাড়াও আইনসভাকে অন্য নানাবিধ কাজ করিতে হয়।

আইনসভার গঠন—Organisation of the Legislature

আইনসভা বর্তমানে উচ্চপরিষদ (Upper House or Second Chamber) ও নিম্নপরিষদ (Lower House) এই দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হয়। আবার চীন, পাকিস্তান প্রভৃতি কয়েকটি দেশের আইনসভা একটিমাত্র পরিষদ লইয়া গঠিত।

যে সমস্ত আইনসভা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হয়, তাহাকে দ্বি-পরিষদ আইনসভা (Bi-cameral legislature) এবং একটি পরিষদ লইয়া গঠিত হইলে এক-পরিষদ আইনসভা (Unicameral legislature) বলা হয়। এক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চপরিষদ সিনেট ছাড়া অন্যান্য দেশের উচ্চপরিষদের ক্ষমতা কম। উচ্চপরিষদগুলি সাধারণতঃ বেশী সময়ের জন্য অধিক বয়স্ক সদস্যগণ দ্বারা গঠিত হয়। উচ্চপরিষদের গঠন-পদ্ধতি সর্বত্র সমান হয় না। ইংলণ্ডের লর্ডসভার অধিকাংশ সদস্য উত্তরাধিকারবলে কোন লর্ডের জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া লর্ডসভার সদস্য হন। আবার ক্যানাডায় গবর্ণর-জেনারেল উচ্চপরিষদের সদস্যগণকে আজীবন সদস্য হিসাবে মনোনয়ন করেন। ভারত প্রভৃতি কয়েকটি দেশের উচ্চপরিষদের সদস্যগণ পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি কয়েকটি দেশে উচ্চপরিষদের সদস্যগণ সরাসরি ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। আবার কয়েকটি দেশের উচ্চপরিষদের কিছুসংখ্যক সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হন ও অবশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত হন।

নিম্ন পরিষদের ক্ষমতা বেশী। ইহার গঠন-পদ্ধতিও সর্বত্র প্রায় সমান। নিম্নপরিষদের সদস্যগণ সাধারণতঃ ভোটদাতাগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

আইন-সভায় একটি পরিষদ বা দুইটি পরিষদ থাকিবে—Will legis latures be Unicameral or Bi-cameral?

পক্ষে যুক্তি—আধুনিককালে প্রায় সকল সভ্যদেশের আইনসভা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হয়। একটি পরিষদ থাকিলে সেই একটি পরিষদের ইচ্ছানুসারে আইন তৈয়ারী হয়। ইহাতে আর কেহ বাধা দিতে পারে না। কিন্তু দুইটি পরিষদ থাকিলে এই দ্বিতীয় (উচ্চ) পরিষদ নিম্নপরিষদের দ্রুত ও বিবেচনাহীন আইন-প্রণয়নে বাধা দিতে পারে। সুতরাং এদিক দিয়া উচ্চপরিষদের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ, উচ্চপরিষদ থাকিলে নিম্নপরিষদের রচিত আইনের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, নিম্নপরিষদের হাতে এত বেশী কাজ থাকে যে, নিম্নপরিষদের পক্ষে প্রত্যেকটি আইনের প্রস্তাবের বিশদ আলাপ-আলোচনা করা সম্ভব হয় না। অথচ বিশদ আলাপ-আলোচনা না করিয়া কোন আইন পাশ করাও উচিত নহে। এই কারণে উচ্চপরিষদ থাকিলে বিশেষ বিচার-বিবেচনা করা সম্ভব হয়। চতুর্থতঃ, দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, জ্ঞানীগুণী লোক ও বিশেষ স্বার্থগুলির প্রতিনিধিগণকে উচ্চপরিষদের সদস্য মনোনীত করিয়া আইনসভাকে দেশের সব রকম মতের প্রতিনিধিমূলক করা সম্ভব হয়। নিম্নপরিষদে নির্বাচন পদ্ধতিতে সব সময়ে যে যোগ্যব্যক্তির নিয়োগ হয় তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। উচ্চপরিষদ থাকিলে মনোনয়ন-পদ্ধতি দ্বারা যোগ্যব্যক্তির নিয়োগ সম্ভব হয়। পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় দ্বি-পরিষদ আইনসভা একান্ত অপরিহার্য। যুক্তরাষ্ট্রে যে সমস্ত অঞ্চল লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়, সেই অঞ্চলগুলির স্বতন্ত্র স্বার্থরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চপরিষদের প্রয়োজন দেখা যায়।

বিপক্ষে যুক্তি—উপরে উচ্চপরিষদের সপক্ষে যে যুক্তিগুলি দেখান হইল তাহা সম্পূর্ণভাবে মানিয়া লওয়া যায় না। প্রায় সব দেশেই আইনসভার নিম্নপরিষদই হইল অধিক ক্ষমতার অধিকারী এবং নিম্নপরিষদ যদি কোন আইন পাশ করিবে বলিয়া স্থির করে, তাহা হইলে উচ্চপরিষদ তাহাতে কোনক্রমে বাধা দিতে পারে না। সুতরাং এদিক দিয়া উচ্চপরিষদের বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। মনোনয়ন-পদ্ধতি দ্বারা যোগ্যব্যক্তির নিয়োগ সম্ভব, কিন্তু মনোনয়ন-পদ্ধতি গণতান্ত্রিক নীতি-বিরোধী। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়ও উচ্চপরিষদের বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে হয় না, কারণ লিখিত শাসনতন্ত্র ও উচ্চ আদালতের সাহায্যে আঞ্চলিক স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা থাকে, এজন্য উচ্চপরিষদের প্রয়োজন হয় না। ইহা

ছাড়া বলা যায় যে, উচ্চপরিষদ যদি নিম্নপরিষদের সহিত একমত হয়, তাহা হইলে উচ্চপরিষদ বাহুল্য মাত্র, আর যদি একমত না হয় তাহা হইলে ইহা ক্ষতিকর। উচ্চপরিষদ যতই কার্যকরী হউক না কেন, জনগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত নিম্ন-পরিষদের কার্যে বাধা সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা ইহার থাকিতে পারে না। আইন-সভায় দুইটি পরিষদ থাকিলে উভয় পরিষদের মতবিরোধ ঘটিলে কাজে অযথা বিলম্ব ঘটে। দুইটি পরিষদ ব্যয়সাপেক্ষও বটে।

উচ্চপরিষদের বিরুদ্ধে যতই যুক্তি দেখান হউক না কেন, প্রায় সব দেশের আইনসভাই দুই পরিষদ লইয়া গঠিত। আইন-প্রণয়নে বিশেষ বিচার-বিবেচনা করা ও নিম্নপরিষদ কর্তৃক রচিত আইনের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করাই হইল উচ্চ-পরিষদের প্রধান কাজ।

আইনসভার কার্যকাল ও সংগঠন—Duration and Organisation of the Legislature

আইনসভার কার্যকাল অতি দীর্ঘ বা অতি স্বল্প হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। অতি দীর্ঘ হইলে আইনসভা দ্রুত পরিবর্তনশীল জনমতের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে না। আবার স্বল্পস্থায়ী হইলে দীর্ঘমেয়াদী গঠনমূলক কোন নীতি নির্ধারণ বা গ্রহণ করিতে পারে না। এইজন্য আইনসভার স্থায়িত্ব চার বৎরের কম ও পাঁচ বৎসরের বেশী হওয়া উচিত নহে। ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি অনেক দেশের উচ্চ-পরিষদের সদস্যগণের এক নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট কাল অন্তে পরিবর্তিত হয়। এই ব্যবস্থার দ্বারা আইনসভাকে প্রচলিত জনমতের প্রতিনিধিমূলক করা হয়।

প্রত্যেক আইনসভায় আইনসভার সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন সভাপতি (President or Speaker) ও সহঃ-সভাপতি (Deputy Speaker) থাকেন। তিনিই সভার কার্য পরিচালনা করেন। সদস্যগণ যাহাতে স্বাধীনভাবে সভার কার্য পরিচালনা করিতে পারেন, সেজন্য সভার মধ্যে তাঁহারা বাক্-স্বাধীনতা ও অন্য কয়েকটি বিশেষ সুবিধার অধিকারী। সদস্যগণ তাঁহাদের কাজের জন্য বেতন ও ভাতা পাইয়া থাকেন।

আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি—Process of Law-making

একটি নির্ধারিত পদ্ধতিতে আইন তৈয়ারী হয় এবং সবদেশেই আইন মোটামুটি একই পদ্ধতিতে তৈযারী হয়। আইনসভার যে সদস্য আইন প্রণয়ন

করিতে ইচ্ছুক তাঁহাকে প্রথমেই আইনের একটি খসড়া (Drafting) প্রস্তুত করিতে হয়। খসড়া প্রস্তুত হইলে খসড়াটিকে আইনসভায় পেশ (Introduction) করিতে হয়। তারপর একটা নির্ধারিত দিনে খসড়াটির প্রথম পাঠ (First Reading) হয়। প্রথম পাঠের দিনে খুব জরুরী আইন ব্যতীত কোন আলাপ-আলোচনা হয় না। প্রথম পাঠের পর দ্বিতীয় পাঠ (Second Reading) হয়। এই সময়ে খসড়াটির মূলনীতির সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং আলোচনার পর খসড়াটিকে একটি কমিটিতে পাঠান হয় (Committee Stage)। কমিটি বিশেষভাবে খসড়াটি পরীক্ষা করিয়া সংশোধিত আকারে বা বিনা সংশোধনে (Report Stage) খসড়াটিকে আইনসভায় ফেরত পাঠায়। ইহার পর তৃতীয় পাঠ (Third Reading) হয়। তৃতীয় পাঠে খসড়াটি পাশ হইলে অন্য পরিষদ থাকিলে সেখানে পাঠান হয়। অন্য পরিষদ একই পদ্ধতিতে খসড়াটিকে আলোচনা করিয়া পাশ করিলে খসড়াটিকে রাজা, রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের নিকট পাঠান হয় এবং তাঁহার অনুমোদন পাইলে খসড়াটি আইন বলিয়া গণ্য হয়। আইনের প্রস্তাবকে খসড়া বা বিল বলে, এবং খসড়া পাস হইলে আইন বলা হয়। ভারত, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে প্রথম পাঠের পরেই বিলটিকে কমিটিতে পাঠান হয়। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব একটু ভিন্ন পদ্ধতিতে পাস হয়। আইন-প্রণয়নে উভয় পরিষদের মধ্যে বিরোধ ঘটিলে বিরোধ নিষ্পত্তি করিবার জন্য প্রত্যেক দেশেই ব্যবস্থা আছে।

শাসন-বিভাগ—The Executive

ব্যাপক অর্থে শাসনকর্তৃপক্ষ বলিতে শাসন-ব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিশ বিভাগের অধস্তন কর্মচারী পর্যন্ত বুঝায়। সংকীর্ণ অর্থে শাসনকর্তৃপক্ষ বলিতে শাসনকার্যে নীতি ও কার্যক্রম যিনি বা যাঁহারা নির্ধারণ করেন তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে বুঝায়।

শাসনকর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বংশানুক্রমিক রাজা বা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হইতে পারেন। এই শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি আবার নামসর্বস্ব (Nominal) অথবা প্রকৃত (Real) শাসনকর্তৃপক্ষ হইতে পারেন। যখন শাসনকর্তৃপক্ষের আইন-সভার সহিত যোগসূত্র থাকে ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালিত হয়, তখন ইহাকে আইনসভা-প্রধান শাসনকর্তৃপক্ষ (Parliamentary executive) বলা হয়। ইংলণ্ড, ভারত প্রভৃতি দেশে এই শাসন-ব্যবস্থা

দেখা যায়। যেখানে রাষ্ট্রপতি প্রধান শাসনকর্তা এবং তিনি মন্ত্রিগণের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করেন, সেই শাসন-ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রপতি-প্রধান শাসন-ব্যবস্থা (Non-parliamentary or Presidential) বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিগণ হইলেন শাসনবিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। ইঁহারা শাসন-নীতি নির্ধারণ করেন। ইঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য নানা শ্রেণীর অসংখ্য কর্মচারী থাকেন। এই কর্মচারিবৃন্দ নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করেন। সাধারণতঃ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা করিয়া যোগ্যতা অনুযায়ী এই সমস্ত কর্মচারী নিযুক্ত হন। ইঁহারা একটা নির্দিষ্ট বয়স হইতে কাজ আরম্ভ করেন ও একটা নির্দিষ্ট বয়সে ইঁহাদের অবসর গ্রহণ করিতে হয়। ইঁহারাই হইলেন বিভাগীয় স্থায়ী কর্মচারী (Permanent Civil Service)।

শাসন-বিভাগের কার্য—Functions of the Executive

শাসন-বিভাগের কার্য নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায় :

১। শাসন-সংক্রান্ত কার্য—শাসন-বিভাগের প্রধান কার্য হইল আইন বলবৎ করিয়া দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং পুলিশ বাহিনী পরিচালনা ও হাজত-বাসের ব্যবস্থা করা।

২। কূটনৈতিক কার্য—পররাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক স্থির করা। এজন্য ভিন্ন দেশের সহিত দূত বিনিময় করা, চুক্তি সম্পাদন করা ও সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়া প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করা।

৩। সামরিক কার্য—পররাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করা এবং এজন্য স্থল, নৌ ও বিমান-বাহিনী গঠন করা।

৪। সাধারণ ও জরুরী আইন-প্রণয়ন কার্য—শাসনকর্তৃপক্ষ আইনসভার অঙ্গ হিসাবে সাধারণ আইন প্রণয়ন করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসন-ব্যবস্থায়ও পরোক্ষভাবে শাসনকর্তৃপক্ষ আইন-প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। আপৎকালে শাসনকর্তৃপক্ষ জরুরী আইন প্রণয়ন করিতে পারে। ভারতের রাষ্ট্রপতির ব্যাপক জরুরী আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা আছে।

৫। বিচার-বিষয়ক কার্য—অনেক দেশের উচ্চবিচারালয়ের বিচারপতিগণ

শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ঊর্ধ্বতন শাসনকর্তৃপক্ষ দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে মার্জনা করিতে পারেন।

বিচার-বিভাগ ও ইহার কার্য—The Judiciary and its functions

বিচারপতিগণ আইনসভা কর্তৃক রচিত আইনগুলিকে যথাযথভাবে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। বিচারপতিগণ যে শুধু আইনগুলি প্রয়োগ করিয়া আইন-ভঙ্গকারিগণকে শাস্তিদান করেন তাহা নহে, প্রয়োজনমত তাঁহারা প্রচলিত আইনগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া এরূপভাবে প্রয়োগ করেন যাহাতে দোষী ব্যক্তি শাস্তি পায় ও নির্দোষ ব্যক্তি অব্যাহতি পায়। এইরূপে একজন বিচারপতি কর্তৃক ব্যাখ্যা করা আইন অনুসারে যখন অন্য বিচারপতিগণ বিচার করেন তখন নূতন ব্যাখ্যা দ্বারা নূতন আইন সৃষ্টি হয়। বিচারপতিগণ আর এক প্রকারে আইন সৃষ্টি করেন। যদি কোন বিষয় প্রচলিত আইনের গণ্ডির অন্তর্ভুক্ত না হয়, তাহা হইলে বিচারপতিগণ তাঁহাদের বিবেক ও ন্যায়বুদ্ধি অনুসারে সেই সমস্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি করিয়া নূতন আইন সৃষ্টি করেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের বিচারপতিগণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য হইল শাসনতান্ত্রিক আইনের ব্যাখ্যা করা এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে বিরোধ ঘটিলে শাসনতান্ত্রিক আইনের ভিত্তিতে সেই বিরোধের মীমাংসা করা। ইহা ছাড়াও, বিচারপতিগণ নির্দিষ্টক্ষেত্রে আইনসভা বা শাসনকর্তৃপক্ষের অনুরোধে কোন আইন সম্বন্ধে তাঁহাদের পরামর্শ দিয়া থাকেন।

বিচারক-নিয়োগ পদ্ধতি—Mode of appointment of the Judiciary

সাধারণতঃ বিচারকগণ শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। সুইজারল্যাণ্ড, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে বিচারপতিগণ আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। আবার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যগুলির বিচারকগণ সাধারণ নির্বাচনে নিযুক্ত হন। শেষোক্ত দুইটি পদ্ধতির বিরুদ্ধে বলা যায় যে, আইনসভা কর্তৃক নিযুক্ত হইলে বিচারকগণ আইনসভার প্রভাবের অধীন থাকিতে পারেন। সুতরাং বিচারকার্যে যে স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা প্রয়োজন, আইনসভা কর্তৃক নিযুক্ত বিচারপতিগণের মধ্যে তাহা দেখা যায় না। আবার, সাধারণ নির্বাচন পদ্ধতিতে বিচারক নিয়োগের ত্রুটি হইল যে, সাধারণ ভোটদাতা বিচারকের যোগ্যতা স্থির করিয়া যোগ্যব্যক্তিকে নির্বাচন করিতে পারে না।

বিচার-ব্যবস্থার উপরই একটা দেশের শাসন-ব্যবস্থার উৎকর্ষ বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। বিচারপতি যদি বিচারকার্যে পক্ষপাতিত্ব করেন, তাহা হইলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। এজন্য নিরপেক্ষ, স্বাধীনচেতা ও আইনজ্ঞ বিচারপতি নিয়োগ করা একান্ত আবশ্যক। আইনসভা বা সাধারণ ভোটদাতা কর্তৃক নিযুক্ত বিচারক নিরপেক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া দুষ্কর। সুতরাং নির্দিষ্টকালের জন্য শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিচারক নিযুক্ত হওয়া কাম্য। বিচারকগণকে উপযুক্ত পরিমাণ বেতন দিয়া ও তাঁহাদের কার্যকালের স্থায়িত্ব স্থির করিয়া তাঁহাদিগকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়।

সরকারের বিভিন্ন কার্যের পৃথকীকরণ—Separation of Powers

সরকার সাধারণতঃ তিন প্রকার কাজ করিয়া থাকে, যথা, আইন-প্রণয়ন, আইন বলবৎ করা ও আইন প্রয়োগ করিয়া আইনভঙ্গ হইয়াছে কিনা স্থির করিয়া আইন-অমান্যকারীকে শাস্তি দেওয়া। সরকারের এই তিনটি কার্য যথাক্রমে আইন-সভা, শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হয়। সুতরাং সরকারের তিনটি প্রধান কার্যের জন্য তিনটি বিভাগ আছে। এই তিনটি বিভাগের মধ্যে কি সম্পর্ক হওয়া উচিত তাহা লইয়া মতভেদ দেখা যায় এবং এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী লেখক-গণ বহু আলোচনা করিয়াছেন।

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল ও রোমান দার্শনিকগণের আলোচনায় এই ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির উল্লেখ দেখা গেলেও গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে এই নীতির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ফরাসী লেখক মণ্টেস্কুই সর্বপ্রথম এই নীতিটির বিশদ আলোচনা করেন। তিনি বলেন, সরকারের তিনটি কাজ সম্পূর্ণ পৃথক এবং সেজন্য তিনটি পৃথক ও স্বাধীন বিভাগ দ্বারা এই কার্য পরিচালনা করা উচিত। যদি এই তিনটি কাজই অথবা যে-কোন দুইটি একটি হস্তে ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে স্বেচ্ছা-চারিতা প্রশ্রয় পায় এবং ইহার ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা হয়। সুতরাং ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এই তিনটি ক্ষমতা একহস্তে ন্যস্ত না হইয়া তিনটি পৃথক ও স্বাধীন হস্তে ন্যস্ত হওয়া কাম্য। পূর্বে রাজার হাতে যখন সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল, তখন তিনি তাঁহার খুসীমত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেন এবং তাঁহার খুসীমত বিচারকার্য পরিচালনা করিতেন। এই ব্যবস্থায় প্রজা-সাধারণের জীবন, ধন ও মানের কোন নিরাপত্তা থাকিতে পারে না। সুতরাং

শাসন-ব্যবস্থার এই অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচার নিরোধ করিবার জন্য প্রত্যেকটি বিভাগের কাজ এরূপভাবে পৃথক হওয়া উচিত যে, প্রত্যেক বিভাগ অপর বিভাগের অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচার প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়।

সমালোচনা—সরকারী বিভিন্ন কাজগুলি পৃথক হওয়া উচিত এ কথা মানিয়া লইলেও বাস্তব ক্ষেত্রে সরকারী কার্যে এইরূপ সূক্ষ্ম বিভাগ সম্ভব নহে। কারণ, প্রত্যেক বিভাগেরই অপর বিভাগ দুইটির কিছু-না-কিছু কাজ করিতে হয়। আইন প্রণয়ন করা আইনসভার প্রধান কাজ হইলেও ইহাকে কিছু কিছু শাসন-বিভাগীয় ও বিচার-বিভাগীয় কাজ করিতে হয়। অনুরূপভাবে অন্য দুইটি বিভাগেরও নিজের বিভাগীয় কাজ ব্যতীত অন্য দুইটি বিভাগেরও কিছু কাজ করিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, কোন দেশের শাসন-ব্যবস্থায়ই ক্ষমতার এইরূপ সূক্ষ্ম বিভাগ স্থান পায় নাই। ভারতে শাসন-বিভাগের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হইলেন রাষ্ট্রপতি। তাঁহার জরুরী আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা ও দণ্ডিত ব্যক্তিকে মার্জনা করিবার বিচার-বিষয়ক ক্ষমতা আছে। ভারতে প্রকৃত শাসন-ক্ষমতার অধিকারী হইল মন্ত্রিসংসদ। কিন্তু এই মন্ত্রিসংসদের সদস্যগণ আবার আইনসভার সদস্য এবং আইনসভার সদস্য হিসাবে তাঁহারা আইন প্রণয়ন করেন। শাসনকার্যের জন্য তাঁহারা আইনসভার নিকট দায়ী। বৃটিশ শাসনকালে ভারতের ক্ষমতার পৃথকীকরণ ছিল না। জেলাশাসক একাধারে জেলার শাসনকর্তা ও বিচারক ছিলেন। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইত। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রে বিচার-বিভাগকে শাসন-বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিবার নির্দেশ দেওয়া আছে এবং নির্দেশ অনুসারে কোন কোন রাজ্যে কার্য আরম্ভ হইয়াছে। ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায়ও এই ক্ষমতা-পৃথকীকরণ নীতি স্থান পায় নাই। রাজাই হইলেন শীর্ষস্থানীয় শাসনকর্তৃপক্ষ। আইন-প্রণয়নে রাজার সম্মতি অপরিহার্য। তিনি বিচারপতিগণকে নিয়োগ করেন ও দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির শাস্তি মকুব করিতে পারেন। কেবিনেট সদস্যগণ আইনসভার সদস্য হিসাবে আইন প্রণয়ন করেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতা-পৃথকীকরণ নীতির প্রয়োগ বিশেষভাবে দেখা যায়। রাষ্ট্রপতি, আইনসভা ও বিচার-বিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক ও পারস্পরিক প্রভাব-মুক্ত। কিন্তু পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি আইন-প্রণয়ন কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। আইনসভাও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উচ্চপদে নিয়োগসমূহ ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃত সম্পাদিত চুক্তিগুলি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। উচ্চবিচারালয়ের বিচারপতিগণও আইনসভার উচ্চপরিষদের সম্মতিক্রমে

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন, কিন্তু রাষ্ট্রপতির কাজ ও আইনসভা-প্রণীত আইন বিচারপতিগণ বে-আইনী বলিয়া অবৈধ ঘোষণা করিতে পারেন।

তৃতীয়তঃ, ক্ষমতার পূর্ণ পৃথকীকরণের ফলে তিনটি বিভাগের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে শাসন-ব্যবস্থা অচল হয়। দেহের উন্নতির জন্য যেরূপ প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা দরকার, সরকারের কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার জন্য বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে সেইরূপ সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। উদরের সহিত অসহযোগ ঘোষণা করিয়া হাত, পা, মুখ প্রভৃতি অঙ্গ-গুলি যদি নিষ্ক্রিয় থাকে, তাহা হইলে শুধু উদর নয়, সমস্ত দেহই দুর্বল হয়। সরকারের বিভিন্ন কাজগুলির মধ্যে এইরূপ পারস্পরিক সহযোগিতা না থাকিলে সুশাসন সম্ভব হয় না।

চতুর্থতঃ, বলা হয় যে, ক্ষমতাগুলি পৃথক না থাকিলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু এ যুক্তিও সমর্থন করা যায় না। ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় এই তিনটি ক্ষমতা বিশেষ পৃথক নাই, অধিকন্তু একত্রিত আছে, তাহা সত্ত্বেও ইংলণ্ডের লোক অতিমাত্রায় স্বাধীনতা ভোগ করে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা শুধুমাত্র ক্ষমতা-পৃথকীকরণের উপর নির্ভর করে না। ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রধান রক্ষাকবচ হইল জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার আন্তরিক প্রয়াস ও সদা-জাগ্রত দৃষ্টি (Eternal vigilance is the price of liberty)।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য বর্তমানে আর ক্ষমতা-পৃথকীকরণ নীতির কোন সার্থকতা নাই। স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থায় এই নীতি কার্যকরী করিবার প্রয়োজন ছিল বটে, কিন্তু আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই নীতির আর বিশেষ কোন উপযোগিতা নাই। তবে সরকারের বিভিন্ন কাজ বিভিন্ন ধরণের এবং এই বিভিন্ন ধরণের বিভিন্ন কাজগুলি যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, সেজন্য বিভাগগুলির কাজের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকা প্রয়োজন। আইনসভা বহুসংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত হয়। ইহার সদস্য-গণের বিশেষ কোন যোগ্যতার আবশ্যক হয় না। জনমত অনুসারেই ইহাদের কাজ করিতে হয়। কিন্তু বিচার-বিভাগের কাজ সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের। বিচারক-গণের বিশেষ যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন এবং বিচারকগণ জনমত অনুসারে বিচার-কার্য পরিচালনা করিলে বিচার-ব্যবস্থা ভাল হইতে পারে না। এই কারণে বিচারকের কাজ আইনসভার দ্বারা সম্পাদিত হওয়া উচিত নয়। সুতরাং বিচার-

বিভাগ ও আইনসভার কাজের মধ্যে পার্থক্য থাকা উচিত। এই পার্থক্য থাকিলে প্রত্যেক বিভাগের কাজ উপযুক্ত লোকের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া সমগ্র শাসন-ব্যবস্থার উন্নতি হইতে পারে।

ভারতে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির প্রয়োগ—Application of the Theory of Separation of Powers in India

১৯৪৭ সালের পূর্বে বৃটিশ শাসনকালে এই নীতি ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় আদৌ স্থান পায় নাই। তখন ভারতের গভর্ণর-জেনারেল ও প্রাদেশিক গভর্ণরগণ শুধুমাত্র শাসকপ্রধান ছিলেন না, তাঁহাদের হস্তে যথেষ্ট আইন-প্রণয়ন ক্ষমতাও ন্যস্ত ছিল। প্রাণদণ্ড মকুব করিবার বিচার-সম্পর্কিত ক্ষমতাও তাঁহাদের ছিল। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তেও জিলা শাসনের কাজ ও বিচারের কাজ ন্যস্ত ছিল। তাঁহারা যে-কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটকও রাখিতে পারিতেন।

দেশ স্বাধীন হইবার পর পূর্বতন অবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিলেও ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি সম্পূর্ণভাবে ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় গৃহীত হইয়াছে—একথা বলা চলে না। ভারতে পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকার ফলে শাসন-বিভাগ ও আইন-বিভাগের মধ্যে এখনও পর্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রহিয়াছে; যথা, মন্ত্রি-পরিষদের সদস্যগণকে অবশ্যই আইনসভার সদস্য হইতে হইবে এবং আইনসভার সদস্য হিসাবে তাঁহারা আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। এখনও পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালগণের হস্তে সাময়িকভাবে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা (ordinance making power) ন্যস্ত আছে। সংবিধানে বিচার-বিভাগকে শাসন-বিভাগ হইতে পৃথক করিবার ব্যবস্থার উল্লেখ থাকিলেও জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণ এখনও পর্যন্ত একাধারে জিলার প্রধান শাসক ও বিচারক হিসাবে কাজ করিতেছেন। নূতন শাসনতন্ত্রের নির্দেশ বলবৎ হইলে অবশ্য ম্যাজিষ্ট্রেটের হাত হইতে বিচার-বিভাগীয় কার্য অপসৃত হইবে।

শাসন-বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর—Departments of Government

শাসন-বিভাগের কাজ আবার বিভিন্ন উপ-বিভাগ দ্বারা সম্পাদিত হয়। এই উপ-বিভাগগুলিকে দপ্তর বলা হয়। প্রত্যেক দপ্তরের একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী থাকেন, যাঁহার হস্তে এই দপ্তর-সংক্রান্ত সমস্ত ভার ন্যস্ত থাকে। দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর একজন প্রধান কর্মসচিব (Chief Secretary), সহঃ-কর্মসচিব এবং অধস্তন

কর্মচারী থাকে। মন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে প্রধান কর্মসচিব তাঁহার অধস্তন সহকর্মিগণের সাহায্যে বিভাগীয় কার্য পরিচালনা করেন। বিভাগীয় কার্যের জন্য মন্ত্রিসংসদ-চালিত শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রী-মহাশয় আইনসভার নিকট দায়ী হইলেও এই স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দের কোন দায়িত্ব নাই। মন্ত্রিগণ বিভাগীয় শাসনকার্যের নীতি নির্ধারণ করেন ও স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ এই নীতিকে কার্যে রূপদান করে। এইরূপে প্রত্যেক দেশের শাসন-ব্যবস্থায় শাসনকার্য সু-পরিচালনার জন্য বহু বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ প্রায় ৬০টি দপ্তর আছে। ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা ২০ হইতে ২৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত এবং এই প্রত্যেকটি মন্ত্রীর একটি পৃথক দপ্তর আছে। ভারত সরকারের কার্য বর্তমানে ১৪টি বিভিন্ন দপ্তর দ্বারা পরিচালিত হয়। দপ্তরগুলি হইল :—১। পর-রাষ্ট্র ও আণবিক শক্তি, ২। অর্থ, ৩। পেট্রোল ও রাসায়নিক দ্রব্য, ৪। শিক্ষা, ৫। আভ্যন্তরীণ শাসন, ৬। রেল, ৭। দপ্তর-বিহীন মন্ত্রী, ৮। প্রতিরক্ষা, ৯। শ্রম ও নিয়োগ, ১০। পুনর্বাসন, ১১। আইন, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ, ১২। তথ্য, বেতার ও পার্লামেন্ট-সংক্রান্ত কার্য, ১৪। ইস্পাত, খনি ও গুরুশিল্প।

সংক্ষিপ্তসার

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ

সরকারের তিনটি প্রধান কাজ তিনটি বিভাগ দ্বারা সম্পাদিত হয়, যথা, আইনসভা, শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগ।

আইনসভা ও ইহার কার্য

আইনসভার প্রধান কার্য হইল (১) আইন প্রণয়ন করা। ইহা ছাড়াও আইনসভা (২) আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে, (৩) শাসনকর্তৃপক্ষের কার্য নিয়ন্ত্রণ করে ও (৪) বিচার-বিভাগীয় কিছু কার্য করে।

এক-পরিষদ ও দ্বি-পরিষদ আইনসভা

আইনসভা একটি অথবা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হইতে পারে। নিম্ন-পরিষদের সদস্যগণ ভোটদাতা কর্তৃক নির্বাচিত হন, আর উচ্চপরিষদের সদস্যগণ উত্তরাধিকার-সূত্রে, অথবা মনোনয়ন-পদ্ধতিতে বা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন।

বর্তমানে প্রায় সকল দেশের আইনসভা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হয়। উচ্চ-পরিষদের পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি বলা হয়:—১। নিম্নপরিষদের বিবেচনাহীন ও দ্রুত আইন-প্রণয়নে উচ্চপরিষদ বাধা দিতে পারে ২। আইন-প্রণয়নে নিম্ন-পরিষদের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করিতে পারে। ৩। বিশেষ শ্রেণী ও যোগ্য ব্যক্তিগণের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। ৪। যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক সরকারগুলির স্বার্থ রক্ষা করিতে পারে।

বিপক্ষে যুক্তি:—১। নিম্নপরিষদের ক্ষমতা বেশী বলিয়া এই পরিষদ ইচ্ছা করিলে উচ্চপরিষদের বিনা সম্মতিতে আইন পাশ করিতে পারে। ২। যুক্তরাষ্ট্রে লিখিত শাসনতন্ত্র ও উচ্চবিচারালয়ই আঞ্চলিক সরকারগুলির স্বার্থ রক্ষা করে। সেইজন্য উচ্চপরিষদের প্রয়োজন হয় না। ৩। উচ্চপরিষদ নিম্নপরিষদের সহিত একমত হইলে ইহা বাহুল্যমাত্র, আবার একমত না হইলে ইহা হানিকর।

আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি

আইনের প্রস্তাবককে আইনের খসড়া প্রণয়ন করিয়া আইনসভায় পেশ করিতে হয়। নির্দিষ্ট দিনে প্রথম পাঠ হয়। তাহার পর দ্বিতীয় পাঠ হয়। দ্বিতীয় পাঠের পর উহা একটি কমিটিতে যায়। কমিটি বিচার-বিবেচনা করিয়া আইন-সভায় পাঠায়। তারপর তৃতীয় পাঠে আইনটি পাশ হইলে অন্য পরিষদ থাকিলে সেই পরিষদের বিবেচনার জন্য পাঠান হয়। অপর পরিষদের সম্মতি পাইলে প্রস্তাবটি শাসন-বিভাগের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির সম্মতিক্রমে আইনের মর্যাদা লাভ করে।

শাসন-বিভাগ

শাসন-বিভাগের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদকে শাসনকর্তৃপক্ষ বলা হইলেও শাসনকার্যে নিযুক্ত সমুদয় কর্মচারিগণকে লইয়া শাসন-বিভাগ গঠিত হয়।

শাসন-বিভাগের কাজ

১। আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা কার্য, ২। বৈদেশিক ব্যাপার নিষ্পন্ন করিবার জন্য কূটনৈতিক কার্য, ৩। যুদ্ধ-পরিচালনা ও শান্তি-স্থাপনের জন্য সামরিক কার্য, ৪। সাধারণ ও জরুরী আইন-প্রণয়ন কার্য, ৫। বিচার-বিষয়ক কার্য।

বিচার-বিভাগ ও ইহার কার্য

১। বিচার-বিভাগ আইন প্রয়োগ করে ও আইন-ভঙ্গকারীকে শাস্তি দেয়, ২। আইনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া নূতন আইন সৃষ্টি করে, (৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসনতান্ত্রিক আইনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে।

বিচারক-নিয়োগ পদ্ধতি

(১) জনগণ কর্তৃক অথবা, (২) আইনসভা কর্তৃক বিচারকগণ নির্বাচিত হইতে পারেন। কিন্তু এই ব্যবস্থার দ্বারা বিচারকগণের স্বাধীনতা বা নিরপেক্ষতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। সেজন্য (৩) শাসনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিচারক-নিয়োগ পদ্ধতি সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি বলিয়া বিবেচিত হয়।

সরকারের বিভিন্ন কার্যের পৃথকীকরণ—Separation of powers

সরকারের তিনটি বিভিন্ন কার্য আছে, যথা, আইন-প্রণয়ন, শাসন ও বিচার-কার্য। এই তিনটি কার্য তিনটি পৃথক বিভাগ দ্বারা সম্পাদিত হয়। ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি অনুসারে বলা হয় যে, এই তিনটি বিভাগের কার্য এক হস্তে ন্যস্ত না হইয়া তিনটি পৃথক ও স্বাধীন বিভাগের হস্তে ন্যস্ত হওয়া উচিত, কারণ এক হস্তে একাধিক ক্ষমতা ন্যস্ত হইলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা নষ্ট হইতে পারে। ফরাসী লেখক মন্টেস্কু এই নীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

এই নীতিটির বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ক্ষমতার পৃথকীকরণ কার্যতঃ সম্ভবও নহে এবং কাম্যও নহে। কোন দেশের শাসন-ব্যবস্থায়ই এই নীতি সম্পূর্ণভাবে বলবৎ হয় নাই। প্রত্যেক বিভাগেরই অপর বিভাগের কিছু কিছু কার্য করিতে হয়। ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় এই নীতি কার্যকরী হয় নাই, তাহা সত্ত্বেও ইংলণ্ডের লোক স্বাধীন। বিভাগগুলির মধ্যে সহযোগিতা না থাকিলে শাসন-ব্যবস্থার কার্য সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে না। সুতরাং নীতি হিসাবে ইহা গ্রহণযোগ্য নহে। তবে কর্মদক্ষতার জন্য কিছু পরিমাণ পৃথকীকরণ থাকা উচিত।

শাসন-বিভাগের বিভিন্ন দপ্তর

শাসন-বিভাগের বিভিন্ন কার্যের জন্য বিভিন্ন দপ্তর থাকে এবং প্রত্যেক দপ্তরের জন্য একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী থাকেন। মন্ত্রীকে সাহায্য করিবার জন্য বহুসংখ্যক স্থায়ী কর্মচারী থাকে। আধুনিক সরকারগুলির প্রধান প্রধান বিভিন্ন দপ্তর হইল: আভ্যন্তরীণ, পররাষ্ট্র, অর্থ, শিল্প, শ্রমিক, খাদ্য, বেতার ইত্যাদি।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. What are the different organs of the Government ? Describe their respective functions.

সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলি কি ও উহাদের প্রত্যেকের কার্যের বিবরণ লিখ।

উঃ—আধুনিককালে সরকারগুলির কাজ প্রধানতঃ তিনটি বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়। বিভাগ তিনটি হইল, ১। আইনসভা, ২। শাসন-বিভাগ ও ৩। বিচার-বিভাগ।

আইনসভার কার্য—১। আইনসভার প্রধান কার্য হইল একটা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আইন প্রণয়ন করা। আইনসভা নূতন আইন প্রণয়ন করে ও পুরাতন আইন বর্জন বা সংশোধন করিতে পারে। ২। আইন পাস করিবার পূর্বে আইনসভা প্রত্যেকটি আইন বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনা করে, এইজন্য আইন প্রণয়ন করিতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। ৩। সরকারী আয়-ব্যয়ের আলোচনা ও মঞ্জুরি করা আইনসভার আর একটি কাজ। শাসনকর্তৃপক্ষ ও বিচার-বিভাগকে আইনসভা কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত ব্যয়ের উপর নির্ভর করিতে হয়। ৪। শাসন-কর্তৃপক্ষ তাহাদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। শাসনবিভাগীয় কার্য বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইতে গেলে অনেক দেশে আইনসভার অনুমোদন প্রয়োজন। ৫। রাষ্ট্রপতি ও বিচারপতিগণ অনেক দেশে আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। আইনসভার কিছু বিচার-বিভাগীয় কাজও থাকে। রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী প্রভৃতি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদিগকে অভিযুক্ত ও বিচার করিবার ক্ষমতা আইনসভার উচ্চ-কক্ষের হস্তে ন্যস্ত থাকে। সুতরাং আইন-প্রণয়ন ব্যতীতও আইনসভাকে আরও নানাবিধ কার্য করিতে হয়।

শাসন-বিভাগীয় কার্য—১। শাসন-বিভাগের প্রধান কার্য হইল আইনসমূহ প্রয়োগ করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করা। ২। বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা ও চুক্তি সম্পাদন করা। ৩। যুদ্ধ-পরিচালনা করিবার জন্য স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী গঠন ও পরিচালনা করা। ৪। জরুরী অবস্থায় শাসন-কর্তৃপক্ষ জরুরী আইন প্রণয়ন করিতে পারে। ভারতের রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমতা আছে। শাসন-কর্তৃপক্ষের কিছু কিছু বিচার-বিষয়ক ক্ষমতাও থাকে।

বিচার-বিভাগীয় কার্য—১। বিচার-বিভাগের প্রধান কার্য হইল আইন প্রয়োগ করা। ২। আইনগুলির প্রয়োগ ব্যতীতও তাঁহারা আইনগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। ৩। আইন ব্যাখ্যাকালে অনেক সময় তাঁহারা নূতন আইন সৃষ্টি করেন। ৪। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের বিচারপতিগণকে শাসনতান্ত্রিক আইনগুলির ব্যাখ্যা করিতে হয়। ৫। অনেক সময় বিচারপতিগণকে আইনসভা ও শাসন-বিভাগকে আইনসম্বন্ধীয় পরামর্শ দান করিতে হয়।

2. Describe the advantages of Separation of powers between the different organs of a Government. What are its limits ? [H. S. (Com.) 1961]

সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা পৃথকীকরণের সুবিধাগুলি বর্ণনা কর। ক্ষমতা পৃথকীকরণের সীমা কি ?

উঃ—সরকারের শাসন-পরিচালনা কার্য সাধারণতঃ তিনটি বিভাগ দ্বারা সম্পাদিত হয়, যথা, আইন-প্রণয়ন বিভাগ, শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগ। ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি অনুযায়ী বলা হয় যে, সরকারের এই তিনটি বিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক থাকিয়া স্বাধীনভাবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের কার্য

পরিচালনা করিবে। একে অপরের কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে না। যদি একাধিক ক্ষমতা একই ব্যক্তি বা একই ব্যক্তি-সংসদের উপর ন্যস্ত হয় তাহা হইলে স্বৈরাচারী-শাসন প্রবর্তন হইয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা নষ্ট হইতে পারে। পুরাকালে রাজার হাতে যখন আইন-প্রণয়ন, আইন বলবৎ ও বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজা স্বৈরাচারী হইয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতেন। এই মতবাদের প্রধান ব্যাখ্যাতা ও সমর্থক ছিলেন ফরাসী দার্শনিক মন্টেস্কু ও ইংরাজ লেখক ব্ল্যাকষ্টোন। ফরাসী দেশের ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের উপর এই মতবাদ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

এই মতবাদের বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ক্ষমতার পৃথকীকরণ কার্যতঃ সম্ভবও নহে, কাম্যও নহে। কোন দেশের শাসন-ব্যবস্থায়ই এই নীতি সম্পূর্ণভাবে বলবৎ হয় নাই। ভারতে মন্ত্রিমণ্ডলী আইনসভার সদস্য, আবার জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক দেশেই দেখা যায় যে, এক বিভাগ অন্য বিভাগের কিছু কিছু কার্য করে। সব দেশেই আইনসভা কিছু বিচার-বিষয়ক কার্য করে। সুতরাং বাস্তবক্ষেত্রে ক্ষমতার সূক্ষ্ম বিভাগ সম্ভব নহে। তৃতীয়তঃ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষমতা পৃথকীকরণের উপর একান্ত নির্ভরশীল নহে। ইংলণ্ডের শাসন-ব্যবস্থায় এই নীতি কার্যকরী হয় নাই, তাহা সত্ত্বেও ইংলণ্ডের লোক স্বাধীন। চতুর্থতঃ, এই মতবাদে বলা হয় যে, সরকারের তিনটি বিভাগই সমান ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় যে, আইনসভার ক্ষমতা অপর দুইটি বিভাগের ক্ষমতা অপেক্ষা বেশী। পঞ্চমতঃ, ক্ষমতার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণের ফলে তিনটি বিভাগের মধ্যে গুরুতর মতভেদ হইলে সরকারী কাজে অচল অবস্থার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

সুতরাং দেখা যায় যে, বিভাগগুলির মধ্যে সহযোগিতা না থাকিলে শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে না। তবে এই মতবাদের মূল্য হইল যে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিভগগুলির মধ্যে কিছু পরিমাণ স্বাতন্ত্র্য থাকিবে—বিশেষ করিয়া বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা অটুট রাখিতে হইবে। বিভিন্ন বিভাগগুলির কর্মদক্ষতার জন্য কিছু পরিমাণ পৃথকীকরণ কাম্য।

3. "The function of the legislature is not merely the making of laws." What other functions does the legislature in a democratic country discharge?
'আইন প্রণয়ন করাই আইনসভার একমাত্র কার্য নহে'। আইন প্রণয়ন ছাড়া আইনসভা অন্য কি কাজ করে তাহা লিখ।

উঃ—১নং প্রশ্নের দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ দ্রষ্টব্য।

4. What are the advantages and disadvantages of a bi-cameral form of legislature? [H. S. (Com.) Comp. 1960]
দ্বি-পরিষদ আইনসভার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি বর্ণনা কর।

উঃ—যে আইনসভা দুইটি কক্ষ—উচ্চ ও নিম্ন লইয়া গঠিত হয় তাহাকে দ্বি-পরিষদ আইনসভা বলা হয়। ভারতের আইনসভা পার্লামেন্ট—রাজ্যসভা ও লোকসভা এই দুইটি কক্ষ লইয়া গঠিত। সুতরাং ভারতের আইনসভা দ্বি-পরিষদযুক্ত।

বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্য দেশের আইনসভাই দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা জনপ্রিয় হওয়ার ফলে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আইনসভা দুইটি কক্ষ লইয়া গঠিত হইলে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ, আইনসভা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট হইলে উচ্চ-পরিষদ নিম্ন-পরিষদের দ্রুত ও বিবেচনাহীন আইন-প্রণয়নে বাধা দিয়া জনমত জাগ্রত করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে উভয় পরিষদ পরস্পরের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, দুইটি পরিষদ থাকিলে দেশের অধিকতর সংখ্যক লোক আইন প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। ফলে, আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন অধিকতরভাবে জনমত প্রতিফলিত করে। চতুর্থতঃ, উচ্চকক্ষ বিশেষ শ্রেণী ও যোগ্য ব্যক্তিগণের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় দ্বি-পরিষদ আইনসভার বিশেষ গুরুত্ব আছে। যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ-পরিষদ সাধারণতঃ বিভিন্ন প্রদেশ বা রাজ্যগুলির প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয় বলিয়া বিভিন্ন প্রদেশগুলির স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে।

উপরি-উক্ত যুক্তিগুলির ভিত্তিতে দ্বি-কক্ষ আইনসভার অস্তিত্ব সমর্থন করা হয়, কিন্তু এই যুক্তিগুলির বিরুদ্ধেও আবার অনেক যুক্তি দেখান যায়।

প্রথমতঃ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতি বর্তমান যুগে এরূপভাবে পরিকল্পিত হইয়াছে যে, কোন আইনই দ্রুত পাস করা যায় না। আর নিম্ন-পরিষদ অধিক ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া ইচ্ছা করিলে যে-কোনও আইন পাস করিতে পারে, তাহাতে উচ্চ পরিষদ বাধা দিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ উচ্চ পরিষদে বিশেষ স্বার্থ ও শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করিবার বিশেষ ব্যবস্থা করিলে গণতান্ত্রিক আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়। তৃতীয়তঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় লিখিত শাসনতন্ত্র ও উচ্চ আদালতই আঞ্চলিক সরকারগুলির অধিকারের রক্ষা-কবচের কার্য করে, সেজন্য উচ্চ-পরিষদের কোন আবশ্যকতা নাই। চতুর্থতঃ, উচ্চ-পরিষদের সর্ববাদিসম্মত কোন সংগঠন-প্রণালী আজও পর্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। পঞ্চমতঃ, ক্ষমতাবণ্টনের দিক দিয়াও উচ্চ-পরিষদ যদি নিম্ন-পরিষদের সহিত একমত হয় তাহা হইলে ইহা বাহুল্য, আর যদি নিম্ন-পরিষদের কার্যে বাধা দেয় তাহা হইলে ইহা ক্ষতিকর।

উচ্চ-পরিষদের প্রকৃত কার্য হইল নিম্ন-পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত আইনের ভুল-ত্রুটি সংশোধন, মতবিরোধহীন আইনের প্রস্তাব আনয়ন ও উপযুক্তভাবে প্রত্যেকটি আইনের প্রস্তাব বিবেচনা করা।

দশম অধ্যায়

নির্বাচকমণ্ডলী (The Electorate)

নির্বাচকমণ্ডলী ও ভোটাধিকার—The Electorate and the Right of voting.

আধুনিক যুগে গণতন্ত্র বলিতে পরোক্ষ গণতন্ত্র বুঝায়। জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে শাসন-ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে না, তাই তাহারা একটি নির্দিষ্টকালের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং এই নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনসাধারণের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করা সকল দেশেই একটা বিশেষ মূল্যবান রাজনৈতিক অধিকার বলিয়া বিবেচিত হয়। ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার অধিকার কাহাদের থাকা উচিত, নির্বাচনব্যবস্থা কি ধরণের হওয়া উচিত, ইহা লইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

দেশে যে সমস্ত লোকের ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার অধিকার থাকে, তাহাদের সমষ্টিগতভাবে ভোটদাতৃমণ্ডল বা নির্বাচকমণ্ডলী বলা হয়।

সার্বজনীন ভোটাধিকার: ইহার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি—Universal Franchise : Arguments for and against the System

গণতান্ত্রিক আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ভোটদানক্ষমতা আর মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই। বর্তমানে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিই ভোটদানের অধিকারী বলিয়া গণ্য হয়। যত অধিক সংখ্যক লোক ভোটদানের অধিকারী হইবে গণতন্ত্র হইবে তদনুরূপ ব্যাপক। অপরপক্ষে, যত বেশী সংখ্যক লোককে ভোটদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা হইবে, গণতন্ত্রের পরিসর সেই অনুপাতে সঙ্কীর্ণতর হইবে। একটা দেশে যখন আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই ভোটদানে অধিকার থাকে, তখন তাহাকে ব্যাপক বা সার্বজনীন ভোটাধিকার বলা হয়। কিন্তু সার্বজনীন ভোটাধিকার কার্যকরী হইলেও একটা দেশের সমস্ত নাগরিকেরই এই অধিকার থাকে না। সমস্ত জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ ভোটদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকে।

ভোটদান-ক্ষমতাকে সাধারণতঃ একটা অধিকার বলা হয়। কিন্তু এক দিকে ইহা যেমন একটি অধিকার বলিয়া গণ্য হয়, অন্য দিকে ইহা আবার একটি গুরু-দায়িত্ব বলিয়া পরিগণিত হয়। ভোটদান করা অধিকারই হউক আর কর্তব্যই হউক, প্রত্যেক ভোটদাতার এই অধিকার অর্জন করিবার ও যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। যেক্ষেত্রে এই অধিকার অর্জনের ও কর্তব্য-পালনের ক্ষমতার অভাব দেখা যায়, সেখানে ভোটদান-ক্ষমতা অর্পণ করা সমীচীন নয়। এই কারণে প্রত্যেক সভ্য দেশে অপ্রাপ্তবয়স্ক, বিকৃতমস্তিষ্ক, দেউলিয়া, দুর্বৃত্ত, বিদেশীয় প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদিগকে ভোটাধিকার দেওয়া হয় না।

প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রের ভোটাধিকার-নীতির পক্ষে বলা হয় যে, এই ক্ষমতা ব্যক্তি-মাত্রেরই জন্মগত অধিকার। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার ভিত্তি হইল জনসাধারণের সমষ্টিগত ইচ্ছা। সমষ্টিগত ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করিবার একমাত্র পন্থা হইল সার্বজনীন ভোটাধিকার-দান। ভোটদান করিবার মাধ্যমেই জনসাধারণ শাসন-কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া তাহাদের ইচ্ছাকে কার্যকরী করিতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। জনগণের সম্মতি তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সুতরাং জনগণের ভোটদান-ক্ষমতা না থাকিলে কোন শাসনব্যবস্থাকেই গণতন্ত্রসম্মত শাসন-ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, শাসকগোষ্ঠী স্বৈরাচারী হইয়া যাহাতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে না পারে তজ্জন্য জনগণের ভোটাধিকার একান্ত আবশ্যক। ভোটদান-ক্ষমতার প্রয়োগ না করিয়া জনগণ দায়িত্ববোধহীন ও অকর্মণ্য সরকারকে অপসারিত করিয়া নূতন সরকার গঠন করিতে পারে। পরিশেষে বলা যায় যে, রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসাবে সকল নাগরিকই সমান অধিকার দাবী করিতে পারে। এক দল লোককে ভোটাধিকার দান করিয়া অন্য সকলকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিলে, রাষ্ট্র তাহার সকল নাগরিকের নিকট হইতে সমান আনুগত্য লাভ করিতে পারে না। ফলে, রাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল হইয়া পড়ে ও এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার জন্য নাগরিকদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি ও ঈর্ষার সৃষ্টি হয়। সার্বজনীন স্বার্থের পরিবর্তে মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। এরূপ রাষ্ট্রকে কখনও কল্যাণ-রাষ্ট্র বলা যায় না।

প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দান করিবার বিরুদ্ধে মিল্, মেইন, লেকি প্রভৃতি মনীষিগণ অনেক যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভোটদান-

অধিকার নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করিবার যোগ্যতা যাহাদের নাই, তাহাদের ভোটদান অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা যুক্তিযুক্ত। মিল্ ভোটদান-ব্যাপারে ভোটদাতার শিক্ষার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যাহারা লিখিতে পড়িতে জানে না ও গণিতশাস্ত্রের প্রাথমিক সূত্রগুলির সহিত অপরিচিত, তাহাদের ভোটদান অধিকার দেওয়া সমীচীন নয়। সুতরাং মিলের মতে পূর্বে জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া পরে তাহাদের ভোটদান অধিকার দেওয়া উচিত ("Universal teaching must precede universal enfranchisement.")। শুধুমাত্র লিখিতে পড়িতে শিখিলে ও অঙ্কশাস্ত্রের প্রাথমিক সূত্রগুলির সহিত সামান্য পরিচয় হইলেই যে লোকের ভোটদানের যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়—এ কথা সত্য নয়। ভোটদান-ব্যাপারে সাধারণ কর্তব্যবুদ্ধি ও হিতাহিতজ্ঞান থাকা আবশ্যক, ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও মিলের উক্তির সমর্থন করা যায় না। সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভোটদাতা হিসাবে যে নিরক্ষর ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর তাহা সব সময়ে সত্য নয়। অধিকন্তু বর্তমানকালে দেখা যায় যে, ভিন্নমুখী নানাবিধ মতবাদ-প্রচারের ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া শিক্ষিত ব্যক্তির নিজস্ব মতের যতটা বিকৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, অজ্ঞ এবং সংবাদপত্র ও প্রচার-পুস্তিকা-পাঠে অক্ষম ব্যক্তির নিজস্ব মতের ততটা বিকৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। সাধারণ বুদ্ধি, পরার্থপরতা বা সমষ্টিগত হিতজ্ঞান প্রভৃতি যে গুণগুলি ভোটদানক্ষমতা প্রয়োগের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়, সেগুলি অশিক্ষিত লোকের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। ভোটদানের অধিকার থাকিলে লোকে তাহাদের অন্য অধিকার সম্বন্ধে সজাগ হইয়া অন্য অধিকারগুলি দাবী করিতে পারে। সুতরাং পূর্বে শিক্ষার বিস্তার, পরে ভোটদান-ক্ষমতার সম্প্রসারণ-নীতি গ্রহণ করা যায় না। মিলের নিজ দেশ ইংলণ্ডেও মিল্-বর্ণিত নীতি অনুসৃত হয় নাই। ইংলণ্ডে সংস্কার আইনগুলি পাস করিয়া যত সংখ্যক লোককে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, তদপেক্ষা অল্প সংখ্যক লোকই তখন লিখিতে পড়িতে পারিত। ভোটদানক্ষমতা সম্প্রসারণের ফলে জনগণের শিক্ষাবিস্তারের দাবী স্বীকৃত হইয়া শিক্ষাবিস্তারের পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল।

অনেকে বলেন যে, ভোটদাতার কিছু সম্পত্তির মালিক হওয়া চাই এবং কিছু করপ্রদানের ক্ষমতা থাকা চাই। সম্পত্তিহীন ব্যক্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূল্য ও মর্যাদা বুঝিতে পারে না, সেজন্য তাহারা সকল সময়েই ব্যক্তিগত সম্পত্তি যাহাতে নষ্ট হয় সেজন্য সচেষ্ট থাকে। কিন্তু অধুনা ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা ভোটদান-

অধিকারের একটি যোগ্যতা বলিয়া বিশেষ পরিগণিত হয় না। প্রকৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিমাত্রেরই ভোটদানের অধিকার থাকা উচিত এবং এই প্রকৃত শিক্ষাবিস্তার করা বর্তমান কল্যাণ-রাষ্ট্রের একটি প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার—Woman Suffrage

বহুদিন পর্যন্ত স্ত্রীজাতি ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। এমন কি ইয়ুরোপের বহু প্রগতিশীল দেশেও বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত স্ত্রীলোকদিগকে এই অধিকার দেওয়া হয় নাই। স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার দেওয়ার বিপক্ষে সাধারণতঃ যে যুক্তিগুলির অবতারণা করা হইত সেগুলি শুধু শিশুসুলভ নয়, সেগুলিকে পুরুষের স্বার্থপরতার পরিচায়কও বলা যাইতে পারে। অনেকের ধারণা যে, স্ত্রীজাতি যদি রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়, তাহা হইলে অনেক সময় স্বামী ও স্ত্রী, পিতা ও কন্যার মধ্যে মতভেদের ফলে গার্হস্থ্য জীবনের সুখশান্তি নষ্ট হইতে পারে। স্ত্রীজাতি অত্যধিক রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হইলে তাহাদের স্ত্রীসুলভ গুণগুলি অন্তর্হিত হইবে এবং তাহার ফলে শিশুপালন ও পারিবারিক জীবনযাপনে স্ত্রীজাতির অবশ্যকরণীয় কার্যগুলি ব্যাহত হইবে। ইহা ছাড়াও বলা হয় যে, স্ত্রীজাতি আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম নয়। আত্মরক্ষার জন্য তাহাদের পুরুষের উপর নির্ভর করিতে হয়, সুতরাং তাহাদের পৃথকভাবে ভোট দিবার অধিকার থাকিতে পারে না। যুদ্ধে যোগদান করিবার ক্ষমতাকে অনেকে ভোটদানের একটি অপরিহার্য যোগ্যতা বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে যুদ্ধে যোগদানের অক্ষমতাহেতু স্ত্রীজাতির ভোটাধিকার জন্মিতে পারে না। পরিশেষে বলা হয় যে, অনেক স্ত্রীলোক এই ভোটাধিকার চায় না, সুতরাং স্ত্রীলোকের ভোটাধিকারের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই।

কিন্তু সুখের বিষয় যে, প্রথম বিশ্বসমরের পরবর্তী কাল হইতে স্ত্রীলোকের ভোটদানের ন্যায্য অধিকার প্রায় সমস্ত সভ্য দেশ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। স্ত্রীলোকের ভোটদান অধিকার শুধু যে স্বীকৃত হইয়াছে তাহা নয়, আজ স্ত্রীজাতি ভোটদান-ব্যাপারে পুরুষের সমানাধিকার অর্জন করিয়াছে। ইংলণ্ডে পুরুষ ভোটদাতার সংখ্যা অপেক্ষা নারী ভোটদাতার সংখ্যা কিছু বেশী। নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকিলেও সেই পার্থক্যের অজুহাতে সমাজের একটি বিরাট ও বিশিষ্ট অংশকে ভোটদান-ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত রাখা যুক্তিযুক্ত নয়। জন স্টুয়ার্ট মিল্ স্ত্রীজাতির ভোটদান-ক্ষমতার একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন।

তাঁহার মতে মাতৃত্ব ও শিশুপালন স্ত্রীজাতির একমাত্র কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। স্ত্রীজাতি যদি মধ্যে মধ্যে ভোটদান করে, তাহাতে তাহাদের স্ত্রীসুলভ বৃত্তিগুলি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা যদি পুরুষের ব্যক্তিত্ববিকাশের অপরিহার্য উপাদান বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্যও অনুরূপ উপাদান অপরিহার্য—এ-কথা অস্বীকার করিবার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। স্ত্রী ও পুরুষের সমাবেশে সমাজ গঠিত। সুতরাং সমাজের একটি বৃহৎ অংশকে ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া পঙ্গু করিয়া রাখিলে সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। স্ত্রীজাতি আত্মরক্ষা করিতে পারে না বা যুদ্ধক্ষম নয়—এ-কথা বলাও যুক্তিযুক্ত নয়। সক্রিয়ভাবে সৈনিকের কার্য না করিলেও অন্য নানাপ্রকারের বিশেষ করিয়া ধাত্রী-হিসাবে স্ত্রীজাতি যুদ্ধের সময় বহু গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে স্ত্রীজাতি যে অনেক বিষয়ে পুরুষের সমান দক্ষতা অর্জন করিতে পারে, ইহার ভূরিভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং দৈহিক বা মানসিক অক্ষমতার অজুহাতে স্ত্রীজাতিকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিবার আর সঙ্গত কারণ নাই। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের নারীরা ভোটাধিকার অর্জন করেন ও দশ বৎসর পরে নূতন আইনের বলে তাঁহারা পুরুষের সমান অধিকার লাভ করেন। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে অষ্টাদশ-বর্ষীয়া সকল নারীরই পুরুষের সমান ভোটাধিকার আছে। ভারতের নূতন শাসন-তন্ত্রে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর প্রচারক ফরাসীদেশে ও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের জন্মভূমি সুইস্ দেশে এখনও পর্যন্ত স্ত্রীজাতির ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় নাই।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন—Direct and Indirect Election

সাধারণতঃ দুইটি পদ্ধতিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়—প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে। প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ভোটদাতাগণ নিজেরাই সরাসরিভাবে ভোটদান করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া থাকেন। আইনসভার নিম্নপরিষদের সদস্যগণ ও স্থানীয় সরকারগুলির আইনসভা ও বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্যমণ্ডলী সাধারণতঃ এই পদ্ধতিতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

গুণ—Merit

প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ভোটদাতাগণ সরাসরি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন

বলিয়া রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। তাঁহাদের অধিকার ও কর্তব্যসম্বন্ধে তাঁহারা অধিকতর সচেতন থাকেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকেও ভোটদাতাগণের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদের সুবিধা-অসুবিধা-সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিতে হয়। এইরূপে শাসক ও শাসিতের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়। ফলে, শাসকের দায়িত্ববোধ ও শাসিতের রাজনৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

দোষ—Demerit

কিন্তু এই পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি হইল যে, ভোটদাতাগণ যদি অশিক্ষিত হন তাহা হইলে তাঁহারা নির্বাচনপ্রার্থীর যোগ্যতা বিচার করিতে পারেন না। অনেক সময় ভোটদাতাগণ ভালমন্দ বুঝিতে না পারিয়া প্রচারের দ্বারা বিভ্রান্ত হন ও অযোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করিয়া দেশের বৃহত্তর স্বার্থের হানি করেন।

প্রত্যক্ষ নির্বাচনের এই ত্রুটির জন্য অনেকে **পরোক্ষ নির্বাচন** পছন্দ করেন। পরোক্ষ নির্বাচন দ্বারা যে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, তাঁহারা দুইটি পর্যায়ে ভোট-দানের ফলে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। প্রথমতঃ, দেশের প্রাথমিক ভোটদাতৃমণ্ডলী ভোট দিয়া একদল প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। এইরূপে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনসাধারণের পক্ষে আইনসভার প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। সুতরাং এই পদ্ধতিতে প্রতিনিধিগণ সোজাসুজি ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন না। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যেখানে দ্বি-কক্ষ আইনসভা আছে, সেখানে উচ্চপরিষদের সদস্যগণের একটি অংশ ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত নিম্নপরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

গুণ—Merit

পরোক্ষ নির্বাচনের পক্ষে বলা যায় যে, এই পদ্ধতিতে যোগ্যতর প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রাথমিক ভোটদাতাগণ ভোট দিয়া অপেক্ষাকৃত যোগ্যতর যে প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন, সেই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা আসল প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হন বলিয়া যোগ্যতর প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পরোক্ষ নির্বাচনের আর একটি সুবিধা হইল যে, আসল প্রতিনিধি নির্বাচনব্যাপারে অল্পসংখ্যক লোক অংশ গ্রহণ করে। সুতরাং নির্বাচনের উত্তেজনা বা নির্বাচন-সংক্রান্ত কলহ, অশান্তি ও দুর্নীতি কম হয়।

দোষ—Demerit

পরোক্ষ নির্বাচন গণতন্ত্রসম্মত পদ্ধতি নয় বলিয়া অনেকে ইহাতে আপত্তি করেন। এই পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধির সহিত প্রাথমিক ভোটদাতাগণের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না। প্রতিনিধিগণ অল্পসংখ্যক লোক দ্বারা নির্বাচিত হন বলিয়া অনেক সময়ে জনসাধারণের প্রতি তাঁহাদের দায়িত্ববোধের অভাব দেখা যায়। জনসাধারণও প্রতিনিধি-নির্বাচন ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া রাজনৈতিক ব্যাপারে ক্রমশঃ উদাসীন হইয়া পড়ে। ইহার প্রধান দোষ হইল যে, আসল প্রতিনিধি-নির্বাচন ব্যাপার অল্পসংখ্যক লোকের হস্তে থাকে। সুতরাং নির্বাচনে নানাবিধ দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। যুক্তির দিক দিয়া দেখিতে গেলেও পরোক্ষ নির্বাচন বাহুল্যমাত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ভোটদাতাগণ যদি যোগ্য মাধ্যমিক প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে সক্ষম বলিয়া বিবেচিত হন, তাহা হইলে সরাসরি আসল প্রতিনিধি-নির্বাচন ব্যাপারে তাঁহাদের অক্ষম ভাবিবার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না।

সংখ্যালঘিষ্ঠের নির্বাচন সমস্যা—Problem of Minority Representation

রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতেই বর্তমানে প্রতিনিধি নির্বাচন হইয়া থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলই সাধারণতঃ নির্বাচনে অধিক সংখ্যক ভোট পাইয়া আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বলিয়া গণ্য হয়। এই দলই মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করে। সংখ্যালঘু দল তাহাদের সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে না, ফলে, সংখ্যালঘু দলের স্বার্থ প্রতিপদেই ক্ষুণ্ন হইবার সম্ভাবনা। যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাহারা শাসনকার্য পরিচালনা করিবে—ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থ যাহাতে উপেক্ষিত না হয়, সেইজন্য আইনসভায় তাহাদের সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধি থাকা একান্ত আবশ্যক। ইহা ছাড়া, যে দল আজ সংখ্যালঘিষ্ঠ বলিয়া পরিচিত তাহারা ভবিষ্যতে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হইতে পারিবে না তাহা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না। সুতরাং আইনসভায় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের দাবী উপেক্ষণীয় নয়। গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুসারে প্রত্যেক আইনসভাই দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মতের প্রতিনিধিমূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মতে সংখ্যালঘু দলের

আইনসভায় উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করা গণতন্ত্রের একটা প্রধান উপাদান। সংখ্যালঘু দল যদি আইনসভায় প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে না পারে তাহা হইলে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইতে পারে না। নির্বাচনে এমনও হইতে পারে যে, সংখ্যালঘু দল শতকরা ৪৯টি ভোট পাইয়া একটি আসনও দখল করিতে পারিল না, আর শতকরা ৫১টি ভোট পাইয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সকল আসনগুলিই দখল করিল। এইরূপ নির্বাচনব্যবস্থার ফলে শতকরা ৪৯টি ভোটের অধিকারী দল একটিও আসন না পাইলে এ-জাতীয় নির্বাচনব্যবস্থাকে গণতন্ত্রসম্মত ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে না। মিলের মতে সংখ্যালঘু দলের আইনসভায় শুধুমাত্র কয়েকটি প্রতিনিধি প্রেরণ করিলে যথেষ্ট হইবে, তাহা নয়। প্রত্যেক সংখ্যালঘু দল যাহাতে তাহার সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে সেইজন্য অনুরূপভাবে নির্বাচকমণ্ডলীর পুনর্গঠন করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, নির্বাচকমণ্ডলীর দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা যদি দল-বিশেষের পক্ষে ভোট দেয় এবং এক-তৃতীয়াংশ সংখ্যা যদি অন্য দলের পক্ষে ভোট দেয়, তাহা হইলে সংখ্যাগুরু দল আইনসভায় দুই-তৃতীয়াংশ আসন দখল করিতে পারিবে এবং সংখ্যালঘুদল এক-তৃতীয়াংশ আসন দখলের অধিকারী হইবে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে সংখ্যাগুরু দলই সর্বত্র শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া শাসন-ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু দলের যে কোনপ্রকার ক্ষমতা থাকিবে না, এরূপ ব্যবস্থা কখনই গণতন্ত্রসম্মত ব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। সুতরাং প্রত্যেক সংখ্যালঘু দলের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সংখ্যালঘু দল যাহাতে তাহাদের সংখ্যানুপাতে আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে, সেজন্য নানারূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে। নিম্নে সেগুলির বিবরণ দেওয়া হইল।

সংখ্যালঘু দলের প্রতিনিধিত্ব প্রণালী—Methods of Minority Representation

১। একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটে আনুপাতিক নির্বাচন—Proportional Representation by single Transferable Vote (Hare Scheme)

এই নির্বাচন-পদ্ধতি অনুসারে সমগ্র দেশটিকে নির্বাচন উদ্দেশ্যে কতকগুলি

বৃহৎ অঞ্চলে ভাগ করিয়া এক একটি অঞ্চল হইতে একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেক নির্বাচন-প্রার্থী একটি নির্দিষ্টসংখ্যক ভোট পাইলেই নির্বাচিত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। এই নির্দিষ্টসংখ্যক ভোটকে Electoral quota বলা হয়। প্রত্যেক নির্বাচনকেন্দ্রে যত সংখ্যক বৈধ ভোট গণনা করা হয়, সেই সংখ্যাকে সেই কেন্দ্রের আসনসংখ্যার দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল যাহা হয়, তাহাই হইবে নির্দিষ্টসংখ্যক ভোট বা quota. এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক ভোটদাতাকে নির্বাচন-প্রার্থিগণের নামের একটি তালিকা দেওয়া হয় এবং ভোটদাতা একটির অধিক ভোট প্রদান করিতে পারেন না। এই তালিকায় ভোটদাতা যে প্রার্থীকে সর্বাপেক্ষা অধিক যোগ্য মনে করেন তাহার নামের পাশে '১' লিখিয়া দেন। ভোটদাতা তাঁহার পছন্দমত অন্য প্রার্থিগণের নামের পাশে যোগ্যতা অনুসারে যথাক্রমে ২, ৩, ৪, ৫ লিখিয়া দিতে পারেন। এই সংখ্যাগুলি হইল ভোটদাতার পছন্দের পরিমাপক।

ভোট-গণনার সময় যে সমস্ত প্রার্থী ভোটদাতাগণের প্রথম পছন্দ অনুসারে পূর্বোক্ত নির্দিষ্টসংখ্যক ভোট বা quota-র সমান ভোট পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হয়। যদি কোন নির্বাচন-প্রার্থী নির্দিষ্টসংখ্যক ভোট অপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই নির্বাচিত প্রার্থীর অতিরিক্ত ভোট তাহার পরবর্তী দ্বিতীয় পছন্দপ্রাপ্ত প্রার্থীদের হস্তান্তরিত করা হয়। অতঃপর তাঁহাদের ভোট গণনা করা হয়। দ্বিতীয় পছন্দপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে যাঁহারা নির্দিষ্টসংখ্যক ভোট পাইবেন, তাঁহাদিগকেও নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং তাঁহাদের অতিরিক্ত ভোটগুলি তৃতীয় পছন্দপ্রাপ্ত প্রার্থীদিগের মধ্যে হস্তান্তরিত হয়। এইরূপে সকল আসন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত গণনাকার্য চলিতে থাকে।

এই পদ্ধতি যাহাতে ত্রুটিবিহীন হয় সেইজন্য অনেক সময় quota ('কোটা') স্থির করিবার জন্য আসনসংখ্যার সহিত এক (১) যোগ করিয়া সেই সংখ্যা দ্বারা নির্বাচন-কেন্দ্রের সমগ্র বৈধ ভোটসংখ্যাকে ভাগ করা হয় এবং ভাগফলের সহিত এক (১) যোগ করা হয়। প্রণালীটি নিম্নে দেওয়া হইল :

$$\frac{\text{বৈধ ভোটসংখ্যা}}{\text{আসনসংখ্যা} + ১} + ১ = \text{নির্দিষ্টসংখ্যক ভোট বা quota.}$$

এই পদ্ধতির সুবিধা হইল যে, সংখ্যানুপাতে প্রত্যেকটি সংখ্যালঘু দল আইনসভায়

তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে। সাধারণ নির্বাচন-পদ্ধতিতে কোন প্রার্থী উপযুক্ত সংখ্যক ভোট না পাইলে ভোটদাতার ভোটটি কার্যকরী হয় না। কিন্তু এই পদ্ধতিতে ভোটদাতার একটি ভোট অন্ততঃ কার্যকরী হইবেই। ভোটদাতার প্রথম পছন্দ কার্যকরী না হইলে দ্বিতীয় পছন্দ, দ্বিতীয় না হইলে তৃতীয়—এইরূপে তাহার একটি পছন্দে একজন প্রার্থী নিশ্চয়ই নির্বাচিত হইবে। এই পদ্ধতির আরও একটি বিশেষ গুণ হইল যে, উহা যোগ্যতর ব্যক্তির নির্বাচন সম্ভব করিয়া আইনসভার মর্যাদা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

কিন্তু পদ্ধতিটি অতিশয় জটিলতাপূর্ণ ও ভোটগণনা করিতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। ইহা ব্যয়সাপেক্ষ ও সাধারণ ভোটদাতাগণ ইহার প্রয়োগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

২। তালিকা-প্রথায় আনুপাতিক নির্বাচন—Proportional Representation by the List System

তালিকা-প্রথা আনুপাতিক নির্বাচন-পদ্ধতির একটি প্রকারভেদ বলিয়া গণ্য হয়। একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট-পদ্ধতির ন্যায় তালিকা-প্রথায়ও মোট প্রদত্ত বৈধ ভোটসংখ্যাকে নির্দিষ্ট আসনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে যে ভাগফল হইবে উহাকে quota ('কোটা') বা নির্বাচনের উপযুক্ত ভোটসংখ্যা বলা হয়। এই প্রথায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল তাহার মনোনীত নির্বাচনপ্রার্থীদের একটি তালিকা প্রত্যেক ভোটদাতাকে প্রদান করে। তালিকায় প্রদত্ত প্রার্থিসংখ্যা নির্বাচন-কেন্দ্রের আসনসংখ্যার সমান হওয়া চাই। সেই কেন্দ্রে যতগুলি আসন পূরণ করিতে হইবে, ভোটদাতাগণ প্রত্যেকে সেই সংখ্যক ভোট প্রদান করিতে পারিবে। কিন্তু এই পদ্ধতির বিশেষত্ব হইল যে, ভোটদাতাকে প্রার্থীহিসাবে ভোট না দিয়া তালিকা-হিসাবে ভোট দিতে হয়। ভোটদাতা যে-কোন একটি তালিকাকে তাহার সমগ্র ভোট প্রদান করিবে। প্রত্যেক তালিকার উপর প্রদত্ত মোট ভোটসংখ্যাকে 'কোটা' দিয়া ভাগ করিলে যে ভোটসংখ্যা পাওয়া যাইবে, সেই সংখ্যক প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট তালিকা হইতে নির্বাচিত বলিয়া বিবেচনা করা হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, একটি নির্বাচন-কেন্দ্রে চারিটি আসন পূরণ করিতে হইবে এবং এই কেন্দ্রে প্রদত্ত মোট ভোটসংখ্যা হইল ৪,০০০ হাজার। তাহা হইলে ৪,০০০ ÷ ৪ অর্থাৎ ১,০০০ সংখ্যা 'কোটা' বলিয়া স্থির হইবে ও প্রত্যেক নির্বাচন-প্রার্থিদলের তালিকায় অন্ততঃপক্ষে 'কোটা' সংখ্যক ভোট পড়িলে সেই তালিকা

নৈতিক মতবাদের পার্থক্য অনুসারে সংগঠিত না হইয়া সামাজিক এবং ধর্মগত পার্থক্যের ভিত্তির উপর সংগঠিত হইয়াছিল। এইজন্য রাজনৈতিক দলগুলির হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি নামকরণও হইয়াছিল। বৃটিশ শাসনকালে নির্বাচন-প্রথার দ্বারা যখন আইনসভার আসনগুলি পূরণ করিবার ব্যবস্থা হইল তখন হইতে প্রত্যেক সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন-কেন্দ্রের মধ্য দিয়া নিজ নিজ প্রতিনিধি-নির্বাচন করিতে আরম্ভ করিল। আইন-পরিষদে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্টসংখ্যক আসন সংরক্ষিত ছিল এবং সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচনের দ্বারা এই আসনগুলি পূরণ করা হইত অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত আসনগুলি হিন্দু ভোটদাতৃগণের ভোট দ্বারা নির্বাচিত হিন্দু প্রতিনিধি দ্বারা পূরণ করা হইত, আর মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মুসলমানগণের প্রদত্ত ভোট দ্বারা নির্বাচিত হইত। হিন্দুর মুসলমান ভোটদাতার ভোটের প্রয়োজন হইত না, আবার মুসলমান প্রতিনিধির নির্বাচনের জন্য হিন্দুর ভোটপ্রার্থী হইতে হইত না। এক অঞ্চলের অধিবাসী ও সমস্বার্থসম্পন্ন হইলেও হিন্দুর প্রতিনিধিত্ব করিত হিন্দু, আর মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করিত মুসলমান।

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচনের পক্ষে একমাত্র যুক্তি হইল যে, শক্তিশালী সংখ্যাগরিষ্ঠদলের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদল একমাত্র পৃথক নির্বাচনের সাহায্যে প্রতিযোগিতা করিয়া তাহাদের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হয়। পৃথক নির্বাচন-প্রথার অবর্তমানে তাহাদের একটি প্রতিনিধিও হয়ত আইনসভার সদস্য নির্বাচিত না হইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদলের স্বার্থহানি হইবার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে।

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। এই ব্যবস্থা মানুষের চিন্তাধারাকে সঙ্কুচিত করিয়া সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন করে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়া উঠে, ফলে জাতীয় স্বার্থের হানি হয়। প্রত্যেক সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া অন্য সম্প্রদায়ের সমস্বার্থের ক্ষতি করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে। সরকারী চাকুরীগুলিতে যোগ্যতার মাপকাঠির পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক সংখ্যানুপাতের দাবীতে কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। ফলে, দুর্নীতি ও অযোগ্যতার কারণে শাসন-ব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে। পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নতির একটা প্রধান অন্তরায়। যে সম্প্রদায় সংখ্যালঘু বলিয়া বিশেষ সুযোগ-সুবিধার

অধিকারী হয়, তাহারা কখনই নিজ প্রচেষ্টা দ্বারা যোগ্যতা বৃদ্ধি করিয়া জাতীয় জীবনে একটা বিশিষ্ট আসন অধিকার করিবার প্রয়াস পায় না। ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার ফলে দেশ আজ দ্বিধাবিভক্ত। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের দাবী স্বীকার করিয়া লইলেও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

নির্বাচকমণ্ডলীর কর্তব্য—Functions of the Electorate

স্বৈরাচারী অথবা এক-নায়কের অধীন শাসন-ব্যবস্থায় নির্বাচকমণ্ডলী নিষ্ক্রিয় দর্শকের পর্যায়ে পরিণত হয়। শাসকের ইচ্ছানুসারেই শাসিতের কার্যাবলী পরিচালিত হয়। গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে আধুনিক যুগে শাসক-শাসিতের সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। শাসিতেরাই শাসকশ্রেণী নির্বাচন করিয়া শাসনকার্যকে চালু রাখে।

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রই ভোটদানের অধিকারী। ভোটদান-ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া নির্বাচকমণ্ডলী আইনসভার সদস্য নির্বাচন করে। আইনসভা শাসনকর্তৃপক্ষের কার্যের তদারক করে। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ক্ষমতা যে কেহই পরিচালিত করুক না কেন, ক্ষমতার একমাত্র উৎস হইল নির্বাচকমণ্ডলী।

প্রতিনিধি-নির্বাচন ব্যতীতও ভোটদাতৃমণ্ডলীর আর একটি কর্তব্য হইল শাসন-কর্তৃপক্ষের কার্যের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা। নির্বাচিত প্রতিনিধি বা শাসন-কর্তৃপক্ষ যদি নির্বাচকমণ্ডলীর মত উপেক্ষা করিয়া নিজেদের ইচ্ছামত আইন-প্রণয়ন বা শাসনকার্য পরিচালিত করে, তাহা হইলে ভোটদাতৃগণ শক্তিশালী জনমত গঠন করিয়া সর্বতোভাবে সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। নির্বাচক-মণ্ডলী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সরকারকে জনমত অনুসারে কার্যপরিচালনায় বাধ্য করিতে পারে। অল্পব্যবধানে নির্বাচন, প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ, গণভোট ও গণ-প্রস্তাব অধিকারের মধ্য দিয়া নির্বাচকমণ্ডলী সমগ্র শাসন-ব্যবস্থার উপর প্রত্যক্ষ-ভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। অপরপক্ষে, সভাসমিতি, শোভাযাত্রা, সংবাদপত্র প্রভৃতির মধ্য দিয়াও নির্বাচকমণ্ডলী সরকারের উপর পরোক্ষভাবে জনমতের শক্তিকে কার্যকরী করিতে পারে।

বর্তমান যুগে প্রত্যেক দেশের সরকারই দলীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নিজ নিজ নীতি ও কার্যক্রম আছে। এই নীতি ও কার্যক্রম নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক সমর্থিত না হইলে সেই দলের পক্ষে সরকার গঠন করা সম্ভব নয়। সুতরাং নির্বাচকমণ্ডলী শাসন-ব্যবস্থার নীতি ও কার্যক্রমের পরিবর্তন সাধন করিতে পারে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, নির্বাচকমণ্ডলী শুধু নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র নহে, তাহাদের কার্যের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। শাসন-ব্যবস্থা দক্ষ ও জনস্বার্থের পরিপোষক হইবে কিনা তাহা প্রধানতঃ নির্বাচকমণ্ডলীর যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। এইজন্য বলা হয় যে, গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে সুসংবদ্ধ ও সদাজাগ্রত জনমতের উপর।

ভারতে নির্বাচক ও নির্বাচন এলাকা—Voters and Constituencies in India

ভোটদাতা—Voters

ব্রিটিশ শাসনকালে শেষ পর্যন্ত ভারতে শতকরা মাত্র ১৪ জনের ভোটাধিকার ছিল। বর্তমান শাসনতন্ত্রের প্রধান কৃতিত্ব হইল ভারতে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার প্রবর্তন করা। লোকসভা ও রাজ্যের বিধানসভাগুলিতে ভোটদাতা হিসাবে গণ্য হইতে হইলে নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকা চাই :—(১) অন্ততঃ ২১ বৎসর বয়স্ক হওয়া চাই; (২) সুস্থমস্তিষ্ক হওয়া চাই; (৩) কোন নির্বাচন এলাকার বাসিন্দা হওয়া চাই; এবং (৪) নির্বাচনের সময় যেন কোন অসাধু বা বে-আইনী কার্য না করা হয়। নূতন সংবিধানের এই নিয়ম অনুসারে ভারতের প্রায় অর্ধেক সংখ্যক লোক ভোটাধিকার লাভ করিয়া ভারতকে প্রকৃত গণতন্ত্রে পর্যবসিত করিয়াছে। এই কারণেই প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে যে, ভারতে শাসনক্ষমতার উৎস হইল "আমরা ভারতবাসী" ("We the people of India")।

নির্বাচন এলাকা—Constituencies

লোকসভার নির্বাচনের জন্য রাজ্যগুলিকে আঞ্চলিক নির্বাচন এলাকায় ভাগ করা হইয়াছে। শাসনতান্ত্রিক আইন অনুসারে এই এলাকাগুলির সীমা এরূপভাবে স্থির করিতে হইবে যাহাতে যত সংখ্যক অধিবাসী পিছু একজন করিয়া সদস্য নির্বাচিত হইবে তাহা যেন ভারতের সর্বত্র সমান হয়। রাজ্যের বিধানসভার

নির্বাচন এলাকাও একই নীতিতে নির্ধারিত হয় অর্থাৎ জনসংখ্যা ও সদস্যের মধ্যে অনুপাত সকল এলাকায় যেন যথাসম্ভব সমান হয়। পূর্ববর্তী আদমশুমারীকে ভিত্তি করিয়া জনসংখ্যা এবং রাষ্ট্রপতির আদেশে নির্বাচন এলাকা স্থির হয়।

লোকসভা ও রাজ্য-বিধানসভার সদস্যগণ প্রত্যক্ষভাবে ভোটদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। কিন্তু রাজ্যসভার ২৩৮ জন সদস্য পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। বাকী ১২ জন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্বাচিত হন। রাজ্য-বিধানপরিষদের সদস্যগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়রূপেই নির্বাচিত হন। শিক্ষক ও গ্রাজুয়েটদের প্রতিনিধিগণ প্রত্যক্ষভাবে এবং রাজ্য-বিধানসভা স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা নির্বাচিত সদস্যগণ পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। নির্বাচনে গোপন ভোট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

সংক্ষিপ্তসার

নির্বাচকমণ্ডলী ও সার্বজনীন ভোটাধিকার—জনসংখ্যার যে অংশ ভোটদান করিয়া আইনসভার সদস্য নির্বাচন করিতে সক্ষম, তাহাকে নির্বাচকমণ্ডলী বলা হয়। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেরই ভোটদান ক্ষমতা থাকা গণতন্ত্রের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। বিকৃত মস্তিষ্ক, দেউলিয়া, দুর্বৃত্ত, বিদেশী প্রভৃতির ভোটদান-ক্ষমতা থাকে না। ভোটদান-ক্ষমতা এক নাগরিক অধিকার বলিয়া পরিগণিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা নাগরিক জীবনের একটা প্রধান কর্তব্য। এই কর্তব্য যাহারা সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে অক্ষম, তাহাদের এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়।

স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার—স্ত্রীজাতি পুরুষের উপর নির্ভরশীল, যুদ্ধে যোগদানে অক্ষম ও পারিবারিক সুখশান্তির পক্ষে অপরিহার্য—এই সমস্ত কারণে এতদিন পর্যন্ত তাহাদিগকে ভোটদান-ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছিল। অধুনা স্ত্রীজাতি জীবনের নানাক্ষেত্রে তাহাদের যোগ্যতা প্রমাণ করিয়া পুরুষের সমান ভোটদান-ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে। স্ত্রীজাতি রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিলে রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে অনেক নীচতা লোপ পাইবে ও রাষ্ট্রের শক্তি দ্বিগুণিত হইবে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন—প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ভোটদাতৃগণ ভোট দিয়া

সরাসরিভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। পরোক্ষ প্রথায় ভোটদাতৃগণ একদল মাধ্যমিক প্রতিনিধি নির্বাচন করেন ও এই প্রতিনিধিগণ আসল প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ভোটদাতা ও প্রতিনিধি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত থাকিয়া মতামতের আদান-প্রদান করিতে পারেন। এই প্রথা ভোটদাতার রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করে। পরোক্ষ নির্বাচনে ইহা সম্ভব নয়। ইহাতে প্রতিনিধি অল্পসংখ্যক ভোটদাতা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার দায়িত্বজ্ঞান সীমাবদ্ধ হয়। পরোক্ষ নির্বাচনে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র ও দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। কিন্তু পরোক্ষ নির্বাচনে যোগ্যতর প্রতিনিধির নির্বাচন সম্ভব হয় ও নির্বাচন-কার্যে বিশেষ কোন গোলযোগ ঘটে না।

সংখ্যালঘিষ্ঠদের নির্বাচন সমস্যা

সংখ্যালঘুদলের প্রতিনিধির অভাবে গণতন্ত্র কার্যকরী হইতে পারে না। এইজন্য নিম্নলিখিত নির্বাচনপ্রণালীগুলির দ্বারা সংখ্যালঘুদলের প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

১। একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটে আনুপাতিক নির্বাচন; ২। তালিকা-প্রথায় আনুপাতিক নির্বাচন; ৩। সীমাবদ্ধ ভোট; ৪। স্তূপীকারী ভোট; ৫। পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা।

এই প্রণালীগুলির মধ্যে পূর্বে ভারতে প্রবর্তিত পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর। এই ব্যবস্থায় জাতীয়তাবোধ নষ্ট হয় ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ-বিবাদ অনিবার্য হইয়া উঠে। ফলে, শাসনব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে।

নির্বাচকমণ্ডলীর কর্তব্য—১। প্রতিনিধি নির্বাচন করা; ২। প্রতিনিধির মাধ্যমে শাসনকর্তৃপক্ষের নীতি ও কার্যক্রমের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা; ৩। প্রত্যক্ষভাবে গণভোট, গণপ্রস্তাব-অধিকার ও প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দ্বারা সক্রিয়ভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করা।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. What is meant by adult suffrage? How do you justify it? Should there be any limitation to adult suffrage? [H. S. (Com.) 1960, 1963]

প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার বলিতে কি বুঝ? কি ভাবে ইহা সমর্থন কর? ইহার কি কোন বাধা আছে?

উঃ—গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুসারে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিই ভোটদানের অধিকারী বলিয়া গণ্য হয়। যত অধিক সংখ্যক লোক ভোটদানের অধিকারী হইবে গণতন্ত্র হইবে সেইরূপ ব্যাপক। আবার

যত অধিকসংখ্যক লোক ভোটদান-ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত থাকে, গণতন্ত্রের পরিসর সেই অনুপাতে সংকীর্ণ হয়। একটি দেশে যখন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই ভোটদানের ক্ষমতা থাকে তখন তাহাকে ব্যাপক বা সার্বজনীন ভোটাধিকার বলা হয়। কিন্তু সার্বজনীন ভোটাধিকার হইলেও অপ্রাপ্তবয়স্ক, উন্মাদ, দেউলিয়া, ভবঘুরে প্রভৃতি শ্রেণীর ভোট দিবার ক্ষমতা থাকে না।

পক্ষে যুক্তি—১। ভোটদান-ক্ষমতা ব্যক্তিমাত্রেরই জন্মগত অধিকার। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার ভিত্তি হইল জনসাধারণের সমষ্টিগত ইচ্ছা এবং এই ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করিবার একমাত্র উপায় হইল সার্বজনীন ভোটাধিকার দান।

২। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং জনগণের ভোটদান-ক্ষমতা না থাকিলে তাহারা প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া তাহাদের সম্মতি প্রকাশ করিতে পারে না।

৩। ভোটদান-ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া জনসাধারণ অকর্মণ্য ও দায়িত্বজ্ঞানহীন সরকারকে অপসারিত করিয়া স্বৈরাচার বন্ধ করিতে পারে।

৪। রাষ্ট্রের সকল নাগরিকই রাষ্ট্রের নিকট হইতে সমান অধিকার দাবী করিতে পারে। সুতরাং এই সাম্য-নীতির ভিত্তিতে সার্বজনীন ভোটাধিকার সমর্থন করা যায়।

বিপক্ষে যুক্তি: ১। মিল্, মেইন, লেকি প্রভৃতি মনীষিগণ সার্বজনীন ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, যাহাদের ভোটদানের উপযুক্ত যোগ্যতা নাই, তাহাদের ভোটাধিকার দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। এ সম্পর্কে মিল্ বলিয়াছেন যে, যাহারা লিখিতে পড়িতে জানে না ও গণিতশাস্ত্রের প্রাথমিক সূত্রের সহিত যাহাদের পরিচয় নাই, তাহাদের ভোটাধিকার দেওয়া উচিত নয়। তিনি বলেন, আগে শিক্ষা পরে ভোটদান-ক্ষমতা। (Universal teaching must precede Universal enfranchisement), কিন্তু মিলের এই মতের নীতি হিসাবে বা বাস্তব জীবনে বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। বর্ণপরিচয় থাকিলে তাহাকে শিক্ষিত বলা চলে না বা শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভোটদাতা হিসাবে বর্ণজ্ঞানহীন ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর একথা সবসময়ে সত্য নহে। বরঞ্চ ভোটদানের অধিকার থাকিলে লোকে তাহাদের অন্য অধিকার সম্বন্ধে সজাগ হইয়া অন্য অধিকারগুলি দাবী করিতে পারে। তবে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য যে, ভোটদাতার শিক্ষার প্রয়োজন ইহা অস্বীকার করা যায় না।

২। অনেকে বলেন যে, ভোটদাতার কিছু পরিমাণ সম্পত্তির মালিক হওয়া চাই এবং কিছু কর প্রদানের ক্ষমতা থাকা চাই। কিন্তু আধুনিককালে এই গুণগুলি আর ভোটদান-ক্ষমতার যোগ্যতা বলিয়া বিবেচিত হয় না।

প্রাপ্তবয়স্ক দায়িত্ববোধসম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিই বর্তমানে ভোটদান-ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া গণ্য হয়।

2. What do you understand by Minority Representation? Why is it advocated?
[H. S. (Com.) 1965]

সংখ্যালঘিষ্ঠের নির্বাচন বলিতে কি বুঝ? কেন ইহা সমর্থন করা হয়?

উঃ—রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতেই বর্তমানে প্রতিনিধি নির্বাচন হইয়া থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলই সাধারণতঃ নির্বাচনে অধিকসংখ্যক ভোট পাইয়া আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে সরকার গঠন করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করে। সংখ্যালঘুদল তাহাদের সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচনে অসমর্থ হইলে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। একটি দেশে জাতিভিত্তিক, ভাষাভিত্তিক, ধর্মভিত্তিক বা মতপার্থক্যভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থাকিতে পারে। সংখ্যালঘিষ্ঠ-দলের স্বার্থ যাহাতে উপেক্ষিত না হয়, সেজন্য আইনসভায় তাহাদের সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধি থাকা একান্ত আবশ্যক।

গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুসারে প্রত্যেক আইনসভাই দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মতের প্রতিনিধিমূলক হওয়া চাই। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মতে, সংখ্যালঘুদলের আইনসভায় উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা থাকা প্রকৃত গণতন্ত্রের একটি প্রধান উপাদান। মিলের মতে সংখ্যালঘু দলের আইনসভায় শুধুমাত্র কয়েকটি প্রতিনিধি প্রেরণ করিলে যথেষ্ট হইবে তাহা নয়, প্রত্যেক সংখ্যালঘু-দল যাহাতে ইহার সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে, সেজন্য অনুরূপভাবে নির্বাচকমণ্ডলীর পুনর্গঠন করা উচিত। সুতরাং প্রত্যেক সংখ্যালঘু দলের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সংখ্যালঘুদল যাহাতে আনুপাতিক হারে আইনসভায় প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটে আনুপাতিক নির্বাচন, তালিকা-প্রথায় আনুপাতিক নির্বাচন, স্তূপীকারী ভোট, সীমাবদ্ধ ভোটদান প্রভৃতি ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে।

একাদশ অধ্যায়

জনমত ও রাজনৈতিক দল

(Public Opinion and Political Parties)

গণতন্ত্র ও জনমত—Democracy and Public Opinion

গণতন্ত্র সফল করিবার একমাত্র উপায় হইল শিক্ষিত ও সচেতন জনমত সৃষ্টি করা। বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে শাসনকার্য-পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। অথচ জনগণ যদি তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে আত্মসচেতন এবং অধিকারগুলি রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর না হয়, তাহা হইলে গণতন্ত্রের অবসান হইয়া স্বৈরতন্ত্র বা একনায়কত্বের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং প্রকৃত গণতন্ত্রের অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা সচেতন ও সক্রিয় জনমতের উপর নির্ভর করে।

জনমতের প্রকৃতি—Nature of Public Opinion

জনমতের অর্থ এই নয় যে, দেশের সকল ব্যক্তিই একমত হইবে। প্রত্যেকটি বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির ও বিভিন্ন দলের বিভিন্ন মতামত থাকিতে পারে। জনমত বলিতে ইহাদের কোন একটি বিশেষ মত বুঝায় না। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতই যে সকল সময় নির্ভুল হইবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং জনমত বলিতে সর্ববাদিসম্মত মত বা সংখ্যাগরিষ্ঠদের মত বুঝায় না। এ অবস্থায় কোন্ মতকে জনমত বলা যায় তাহা স্থির করা এক সমস্যা। বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠদল যে মত পোষণ করে, সাধারণতঃ তাহাই জনমতরূপে পরিগণিত হয়। সংখ্যালঘিষ্ঠদল এই জনমত সমর্থন না করিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা যেন এই মতের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন না হয়। সংখ্যালঘু-দল যদি বিরুদ্ধমনোভাবাপন্ন হইয়া সক্রিয়ভাবে এই মতের বিরোধিতা করে, তাহা হইলে তাহাকে সুসংবদ্ধ জনমত বলা চলে না। তবে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠদল যদি তাহাদের সংখ্যাধিক্যের বলে সংখ্যালঘু দলের স্বার্থের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া নিজেদের স্বার্থসাধনের নিমিত্ত কোন মত পোষণ করে, তাহা হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত বলিয়াই তাহাকে জনমত বলা সমীচীন নয়।

জনসাধারণের প্রায়ই নিজস্ব কোন মতামত থাকে না। বুদ্ধিমান ও কর্মঠ ব্যক্তিগণ জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট সমস্যাসমূহ ও তাহাদের সমাধানের উপায়গুলি স্থির করেন এবং এইগুলি জনগণের মধ্যে প্রচার করিয়া জনসাধারণের মধ্যে মতের সৃষ্টি করিতে সহায়তা করেন। জনসাধারণ তাহাদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া এই সকল চিন্তানায়কদের মতে আস্থাবান হয়। এইরূপে জনসংখ্যার বিশাল এক অংশ যখন কোন নির্দিষ্ট মতের সমর্থক হয়, তখন তাহাকে জনমত বলা হয়। সুতরাং যে মত জনগণের বিচার-বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ও যাহার উদ্দেশ্য হইল জনগণের বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করা, সেই মতকেই প্রকৃত জনমত বলা হয়। ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষের স্বার্থ-সম্পর্কিত কোন মতকে জনমত আখ্যা দেওয়া চলে না।

জনমত-গঠনের বিভিন্ন উপায়—Organs of Public Opinion

নানা উপায়ে জনমত গঠিত ও প্রভাবিত হইয়া থাকে। বর্তমান যুগে জনমত-গঠনে **সংবাদপত্র** (Newspaper) এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র-পাঠার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। সংবাদপত্রগুলি যে নানাবিধ সংবাদ পরিবেশন করিয়া কেবল জনগণের জ্ঞানের পরিধি-বিস্তারে সহায়তা করে তাহা নয়, সম্পাদকীয় মন্তব্য ও সংবাদ পরিবেশন-পদ্ধতির মধ্য দিয়া তাহারা পাঠকদের মত-গঠনের সহায়তা করে। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে জনমত-গঠনে সংবাদপত্র যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে, তাহা অস্বীকার করা চলে না। সংবাদপত্রগুলি যদি এই গুরু দায়িত্বের কথা স্মরণ রাখিয়া তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন করে, তাহা হইলে দেশে প্রকৃত জনমত গঠিত হইতে পারে। সঠিক সংবাদ-পরিবেশন এবং নিরপেক্ষ ও গঠনমূলক সমালোচনা দ্বারা সংবাদপত্রগুলি জনমতকে শিক্ষিত ও চিন্তাশীল করিয়া তুলিতে পারে।

জনমত-গঠনে **শিক্ষায়তনগুলির** (Educational Institutions) প্রভাবও উপেক্ষণীয় নহে। বাল্যকাল ও কৈশোরে মানুষ যে শিক্ষালাভ করে, পরবর্তী জীবনে সে শিক্ষার প্রভাব অনতিক্রমণীয় হইয়া উঠে। দেশে যাঁহারা নেতা ও বিভিন্ন মতবাদের স্রষ্টা, তাঁহারা প্রায় সকলেই বাল্যের ও যৌবনের শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া থাকেন। এই কারণে একনায়ক-পরিচালিত দেশগুলিতে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সেই সমস্ত দেশের রাজনীতির মূলসূত্রগুলি সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়, যাহাতে পরবর্তী জীবনে তাহারা ঐভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে।

রাজনৈতিক দলসমূহ (Political Parties) দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জনসাধারণের নিকট জনসভা, সংবাদপত্র ও পুস্তিকা মারফত তাহাদের মতবাদ প্রচার করিয়া জনমত প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করে। রাজনৈতিক দলগুলির প্রচারকার্যের দ্বারা জনগণ দেশের বিভিন্ন সমস্যাগুলির সহিত পরিচিত হয় ও রাজনৈতিক ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে।

অধুনা **বেতার ও চলচ্চিত্রের (Radio and Cinema)** সাহায্যে প্রচার-কার্য পরিচালনা করা হয়। জনশিক্ষার প্রসার করিয়া জনমত-গঠনে বেতার ও চলচ্চিত্রের অবদান আদৌ উপেক্ষণীয় নহে।

দেশের **আইনসভার (Legislature)** তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা দ্বারাও জনমত সচেতন হইয়া রাজনৈতিক ব্যাপারে অধিকতর উৎসাহী হয়।

আইন ও জনমত—Law and Public Opinion

বর্তমান যুগে নাগরিকগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা রাষ্ট্র-প্রণীত আইন দ্বারা বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। আধুনিক রাষ্ট্রগুলি আইন প্রণয়ন করিয়া মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মসম্বন্ধীয় ও কৃষ্টিগত জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সহায়তা করিবার অধিকার দাবী করে। বস্তুতঃ মানব-জীবনের এমন কোন অংশ নাই যাহা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রপ্রভাবমুক্ত বলা যাইতে পারে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-প্রণীত আইন-কানুন ও বিধি-নিষেধগুলি যদি সার্বজনীন ও সর্ববাদিসম্মত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্র-প্রবর্তিত আইনগুলি ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সহায়ক না হইয়া তাহার অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারে। এইজন্যই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রয়োজন এবং গণতন্ত্রের মূল কথা হইল যে, শাসন-ব্যবস্থা জনমতের সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। জনগণের ভোট দ্বারা নির্বাচিত সদস্য লইয়া গঠিত আইনসভা আইন প্রণয়ন করে এবং আইনসভার প্রধান কর্তব্য হইল জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আইন প্রণয়ন করা। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যদি জনস্বার্থ-বিরোধী আইন প্রণয়ন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা জনগণের আস্থাহীন হইবেন ও পরবর্তী নির্বাচনকালে জনগণের সমর্থনলাভে বঞ্চিত হইবেন। সুতরাং শাসন-বিভাগ বা আইনসভার পক্ষে দীর্ঘকাল পর্যন্ত জনমত-বিরোধী কার্য করা সম্ভব নয়। আইনসভা-প্রণীত আইন

যদি দেশের জনমতকে প্রতিফলিত করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে সে আইনের বিশেষ কোন মর্যাদা থাকে না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাকে জনমতের বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হয়। যে শাসন-ব্যবস্থা জনমত দ্বারা সমর্থিত নয়, তাহা কখনও সুদৃঢ় ও স্থায়ী হইতে পারে না। জনগণের অকুণ্ঠ আনুগত্য ও বশ্যতার অভাবে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। জনগণ সভা-সমিতি, সংবাদপত্র, শোভাযাত্রা, প্রচার-পুস্তিকা প্রভৃতির দ্বারা আইনসভার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। নিয়মতান্ত্রিক উপায়গুলি ব্যর্থ হইলে জনসাধারণ তাহাদের চরম অস্ত্র 'বিদ্রোহ' দ্বারা শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। সুতরাং আইন-প্রণয়নে জনমতের জয় অবশ্যম্ভাবী।

ভারতে জনমত—Public Opinion in India

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ভারতে প্রকৃত জনমত বলিয়া কার্যতঃ কোন শক্তি ছিল না। জনমত-গঠনের প্রধান অন্তরায় ছিল দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও পরাধীনতা। পরাধীনতার অবসান হইবার ফলে ভারতবাসী ক্রমশঃ আত্ম-সচেতন হইয়া তাহার ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে অবহিত হইতে শিখিতেছে। শিক্ষাবিস্তার ও সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রদানের ফলে তাহাদের জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইতেছে। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিও অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে। রাজনৈতিক দলগুলি যদি তাহাদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ দ্বারা প্ররোচিত না হইয়া জাতীয় স্বার্থ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, তাহা হইলে অচিরে ভারতে শক্তিশালী ও সক্রিয় জনমত গঠিত হইবে।

বর্তমানে প্রাদেশিকতা ভারতে জনমত-গঠনের একটি প্রধান অন্তরায়রূপে দেখা দিয়াছে। প্রাদেশিকতার মূল কারণ হইল প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার অভাব। প্রকৃত শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত হইলে বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসিগণ এক অখণ্ড জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া নিজেদের ভারতবাসী বলিয়া মনে করিবেন। জনমত যাহাতে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়, সেজন্য দেশে প্রকৃত শিক্ষার প্রবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

রাজনৈতিক দল—Political Party

বর্তমানে সভ্য রাষ্ট্রগুলির শাসন-ব্যবস্থা দলীয় রাজনীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেজন্য আধুনিক গণতন্ত্রগুলিকে প্রতিনিধি-পরিচালিত গণতন্ত্র বলা

যাইতে পারে। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে সকলে একমতাবলম্বী হইতে পারে না। যে সমস্ত লোক একই নীতিকে কার্যকরী করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়, সেই সমস্ত লোক লইয়া এক একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। ব্যক্তিবিশেষের মত যতই যুক্তিযুক্ত ও গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন তাহা এককভাবে কার্যকরী হইতে পারে না। সেজন্য এক-নীতিতে আস্থাবান অধিকসংখ্যক লোক যদি একতাবদ্ধ হইয়া তাহাদের নীতি ও কার্যক্রম সফল করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়, তাহা হইলে সেই সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিকে প্রতিরোধ করা যায় না। সুতরাং রাজনৈতিক দল-গঠনের মূলনীতি হইল—একতাই বল। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল একই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া তাহাদের নীতি ও কার্যক্রম স্থির করে। জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ ও উৎকর্ষসাধন হইল রাজনৈতিক দলের মুখ্য উদ্দেশ্য। দলীয় স্বার্থসাধন করিবার উদ্দেশ্যে দল গঠিত হইলে, সে দল আদর্শভ্রষ্ট হইয়া কুচক্রী দলে (Faction) পরিণত হয়। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষসাধন করিবার নিমিত্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে। কিন্তু দলীয় শাসন ঈশ্বরানুমোদিত—এই কথা প্রচার করিয়া কোন রাজনৈতিক দলই বর্তমান যুগে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারে না। দলীয় শাসন-ব্যবস্থার পশ্চাতে জনগণের সমর্থন থাকা চাই।

রাজনৈতিক দলের কার্য—Functions of Political Parties

প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল একজন নেতা ও একাধিক উপনেতার অধীনে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। কোন রাজনৈতিক দল যদি বাস্তবক্ষেত্রে ইহার মত কার্যকরী করিতে মনস্থ করে, তাহা হইলে ইহার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হইল দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে ইহার দলীয় নীতি স্থির করা। জাতীয় সমস্যাগুলি নির্ধারণ করিয়া সেই সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে রাজনৈতিক দলগুলিকে তাহাদের কার্যক্রম স্থির করিতে হয়। জাতীয় সমস্যা ও সমস্যা-সমাধানের নীতি স্থির হইলে দলের কার্য হইল সেই নীতিকে নানা উপায়ে দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা। সংবাদপত্র, সভা-সমিতি ও পুস্তিকা-প্রকাশ প্রভৃতির মধ্য দিয়া জনমতকে দলের অনুকূল করিয়া গঠন করিবার জন্য প্রত্যেক দলকে প্রচারকার্য চালাইতে হয়। যত অধিকসংখ্যক লোক এই প্রচারকার্যের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া দলীয় নীতিতে আস্থাবান হয়, দলের সমর্থকসংখ্যা ততই বৃদ্ধি পায়। আইনসভার সাধারণ নির্বাচনের সময় প্রত্যেকটি

রাজনৈতিক দল সক্রিয় হয়। প্রার্থী নির্বাচন করিয়া সাধারণ নির্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়া রাজনৈতিক দলের আর একটি প্রধান কার্য। নিজ নিজ দলের প্রার্থীর পক্ষে ভোট-সংগ্রহের জন্য এই সময় প্রত্যেকটি দলকে জোর প্রচারকার্য চালাইতে হয়। নির্বাচনের পর যে দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সেই দলের নেতৃগণ মন্ত্রিসংসদ গঠন করিয়া শাসনকার্য-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শাসন-ক্ষমতার অধিকারী হইলে রাজনৈতিক দল তাহার নীতি ও কার্যক্রম অনুসারে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া জাতীয় সমস্যাগুলির সমাধান করিতে সচেষ্ট থাকে। এইরূপে নির্বাচনের সময় জনসাধারণের সমর্থনলাভের জন্য যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রদত্ত হয়, ক্ষমতালাভের পর সেগুলিকে যথাসম্ভব রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হয়। যে দলগুলি আইনসভার অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক আসন দখল করে, তাহারা বিরোধী দল বলিয়া পরিচিত হয়। প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকিলেও বিরোধী দল আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক ও প্রশ্নোত্তরের দ্বারা মন্ত্রিমণ্ডলীকে তাঁহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সর্বদা অবহিত রাখে। মন্ত্রিমণ্ডলী তাঁহাদের নির্বাচনকালীন প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করিয়া খুশীমত শাসনকার্য পরিচালনা করিলে, বিরোধী দল জনমত জাগ্রত করিয়া মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্যে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে।

রাজনৈতিক দলগুলিকে তাহাদের মতের পার্থক্য অনুসারে সাধারণতঃ চার ভাগে ভাগ করা হয়—উগ্র বামপন্থী (Extreme Left), বামপন্থী (Left), দক্ষিণপন্থী (Right) ও উগ্র দক্ষিণপন্থী (Extreme Right)। উগ্র বামপন্থী দল সব কিছুরই আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়া নূতন পরিবেশের সৃষ্টি করিতে চান। বামপন্থীরা প্রয়োজনমত বর্তমান অবস্থার প্রগতিমূলক পরিবর্তনের বিশ্বাসী। দক্ষিণপন্থীরা কোনরূপ পরিবর্তনের পক্ষপাতী নহেন। বর্তমান অবস্থাকে বজায় রাখা তাঁহারা সমীচীন মনে করেন। উগ্র দক্ষিণপন্থী-দল অতিরিক্তমাত্রায় রক্ষণশীল। তাঁহারা অধুনালুপ্ত পুরাতন ব্যবস্থার পক্ষপাতী।

দলীয় শাসনের গুণ—Merits of Party Government

প্রথমতঃ, রাজনৈতিক দল অসংবদ্ধ জনমতকে সুসংবদ্ধভাবে গঠন করিয়া ইহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলে। এই উদ্দেশ্যে দলগুলি নানাপ্রকারে প্রচারকার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। রাজনৈতিক দলগুলি দেশের বিভিন্ন সমস্যা ও তাহাদের

সমাধানের প্রস্তাব জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া জনসাধারণকে ঐ সমস্ত বিষয়ে সচেতন করিবার চেষ্টা করে। প্রচারকার্যের মধ্য দিয়া দেশবাসী ঐ সমস্ত জাতীয় সমস্যা ও তাহাদের সমাধান-প্রস্তাবগুলির সহিত পরিচিত হয়। ফলে, সাধারণ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে জনসাধারণের উৎসাহ জন্মে ও তাহাদের রাজনৈতিক অধিকার ও কর্তব্যজ্ঞান বৃদ্ধি পায়। সুতরাং রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকলাপের মধ্য দিয়া জনশিক্ষা বিস্তার লাভ করে।

দ্বিতীয়তঃ, সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক দলের অবর্তমানে শাসন-ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে না। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসংসদ গঠন করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং দলের নীতি ও নির্বাচনকালীন প্রতিশ্রুতি যথাসম্ভব সফল করিতে সচেষ্ট থাকে। কিন্তু আইনসভার সদস্যগণ যদি তাঁহাদের দলের নেতৃগণ কর্তৃক গঠিত মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্যে সহায়তা না করিয়া তাঁহাদের খুশীমত ভোট দেন, তাহা হইলে মন্ত্রিমণ্ডলীর শাসন-পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। দলের সদস্যগণের নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার অভাবে শাসন-কর্তৃপক্ষ স্থায়িভাবে কোন শাসননীতি প্রবর্তন করিতে পারে না। দলের সমর্থন ব্যতীত গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা স্থায়িত্বলাভ করিয়া দলীয় নীতি ও কার্যক্রম সফল করিতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, দলীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন না হইলে শাসনকার্যের কোনরূপ উৎকর্ষসাধন হওয়া সম্ভবপর হইত না। ক্ষমতার অধিকারীদল নিজ ইচ্ছানুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া যাইত। বর্তমান যুগে দলীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল শাসনকার্য পরিচালনা করিবার সুযোগ পায় এবং এই পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া শাসনকার্যের উৎকর্ষ সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসনকার্য-পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেও সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের বিরুদ্ধ সমালোচনার ভয়ে তাহারা জনস্বার্থ-বিরোধী কোন কাজ করিতে সাহসী হয় না।

দলীয় শাসন-ব্যবস্থার আর একটি গুণ হইল যে, যে-সমস্ত দেশে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান-নীতি শাসন-পরিচালনাক্ষেত্রে কার্যকরী করা হইয়াছে, সে সমস্ত দেশে রাজনৈতিক দলের মধ্য দিয়াই সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে। দলীয় শাসন-ব্যবস্থার ফলে শাসন-কর্তৃপক্ষ ও

আইনসভার মধ্যে যোগসূত্র ও সহযোগিতা স্থাপিত হইয়া শাসন-ব্যবস্থা অব্যাহত আছে।

দলীয় শাসনের দোষ—Demerits of Party Government

প্রথমতঃ, রাজনৈতিক দল মানুষের মধ্যে কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দলাদলির সূত্রপাত করে। দলের প্রাধান্য বজায় রাখিবার নিমিত্ত অনেক সময় ব্যক্তিত্ব উপেক্ষিত হয়। দলীয় সংহতি অব্যাহত রাখিবার জন্য কোনরূপ মতানৈক্য বরদাস্ত করা হয় না। দলের নেতার মাধ্যমে যে দলীয় নীতি নির্ধারিত হয়, বিবেকবুদ্ধি-বিরোধী হইলেও প্রত্যেক সদস্যকে সেই নীতি মানিয়া চলিতে হয়। ফলে, স্বাধীনভাবে চিন্তা করা বা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং দলীয় শাসন-ব্যবস্থা ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অন্তরায় সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়তঃ, দলীয় অনুশাসনের প্রতি অন্ধ ও অখণ্ড আনুগত্যের ফলে দলের সমর্থকগণ দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভুলিয়া দলীয় স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত হয়। জাতীয় সমস্যাগুলিকে নিরপেক্ষভাবে জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়া বিবেচনা না করিয়া দলীয় ক্ষুদ্র স্বার্থের দিক দিয়া বিবেচনা করা হয়।

তৃতীয়তঃ, আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিবার জন্য প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ভোটসংগ্রহ-ব্যাপারে তৎপর হয়। আর এই ভোটসংগ্রহ-ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলি সাধারণতঃ যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করে, তাহাতে দেশের নৈতিক আবহাওয়ার ও নৈতিক মানের অবনতি ঘটে। বিভিন্ন দলের বিশিষ্ট নেতৃগণ তাঁহাদের সামাজিক পদমর্যাদা ভুলিয়া পরস্পরের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ চালনা করিয়া সমাজে এরূপ দূষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি করেন, যাহাতে জনশিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। দুর্নীতি, মিথ্যাভাষণ ও মিথ্যাপ্রচার, কলহ ও দ্বন্দ্ব প্রভৃতি নানাবিধ দোষ সমাজদেহে দুষ্ট ব্রণের মত আবির্ভূত হয়।

চতুর্থতঃ, নির্বাচনদ্বন্দ্বে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সেইদল রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয় ও মন্ত্রিসংসদ গঠন করে। দলীয় আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকারী চাকুরী, সরকারী সাহায্য ও সম্মান যোগ্যতা বিচার না করিয়া দলের সমর্থনকারীদের মধ্যে অকুণ্ঠভাবে বিতরণ করিয়া দলের

সংহতি বজায় রাখিতে সচেষ্ট হয়। ফলে, যোগ্যব্যক্তি অপর দলভুক্ত বলিয়া সরকারী কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। ইহাতে শাসন-ব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে। অপরপক্ষে, যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতালাভ করিতে পারে না, সে দল বিরোধী-দল বলিয়া পরিচিত হয় ও সর্বদা সরকারী কার্যের ভাল-মন্দ বিবেচনা না করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ছিদ্রান্বেষণ করে ও সর্বপ্রকারে সরকারী কার্যে অন্তরায় সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট থাকে।

দলীয় শাসনের আর একটি প্রধান ত্রুটি হইল যে, দলের নেতৃত্ব যখন জনকয়েক স্বার্থপর কুচক্রী লোকের হস্তগত হয়, তখন এই কুচক্রী দল নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ-সাধনের নিমিত্ত জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিতে দ্বিধাবোধ করে না।

দুই-দল বনাম বহু-দল—Two-Party System vs. Multiple-Party System

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। অনেকে মনে করেন যে, শাসন-ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার জন্য বহুদল অপেক্ষা দুইটি দল থাকা ভাল। ইংলণ্ডে বহুদিন হইতে দুইটি প্রধান দলের দ্বারা শাসনকার্য পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। উভয় ব্যবস্থার সপক্ষে ও বিপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা হইয়া থাকে।

দুই দলের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি—Arguments for and against Two-Party System

দেশে দুইটি রাজনৈতিক দল থাকিলে যে দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সেই দল ক্ষমতার অধিকারী হইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারে। ইহাতে সরকার স্থায়িত্ব লাভ করিয়া নির্দিষ্ট নীতি অনুসারে ইহার কার্যক্রম রূপায়িত করিতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল স্থায়িত্বলাভ করিলেও ইহা জনমতবিরোধী কার্য করিতে সাহস পায় না। কারণ, শাসনকার্যে কোনপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিলে বিরোধী দল সমালোচনা দ্বারা জনমতকে ইহাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিতে পারে। ফলে, পরবর্তী নির্বাচনকালে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নির্বাচন দ্বন্দ্বে পরাজিত হইয়া ক্ষমতাচ্যুত হইবার সম্ভাবনা থাকে। দুইটি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হওয়ার ফলে শাসনকার্যও উৎকর্ষ লাভ করে। ইহা ছাড়া, দুইটি দল বর্তমান থাকিলে ভোটদাতাগণের পক্ষে প্রার্থী নির্বাচন করাও অধিকতর

সহজ ও সরল হয়। ভোটদাতাগণের মাত্র দুইটি নীতির সমর্থক দুইজন প্রার্থীর মধ্যে একজনকে নির্বাচন করিতে হয়। সুতরাং তাহারা সহজেই প্রার্থী স্থির করিতে পারে।

দেশে দুইটি মাত্র দল থাকিবার বিরুদ্ধে বলা হয় যে, ইহাতে জনমতের বিভিন্ন দিক সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হইতে পারে না। দেশে যদি উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল দুইটি মাত্র দল থাকে, তাহা হইলে মধ্যপন্থী কোন লোকের পক্ষে উল্লিখিত দুইটি দলের কোন দলেই বিবেকবুদ্ধি-সম্মতভাবে যোগদান করা সম্ভব নয়। দেশের সমস্যাগুলিও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। দুইটি মাত্র দল থাকিলে দেশের শাসকগোষ্ঠীও স্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করিয়া মন্ত্রিসংসদ স্থায়িত্বলাভ করে। ক্ষমতাচ্যুত হইবার আশঙ্কা কম থাকিলে মন্ত্রিসংসদ তাহাদের খুশীমত শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া সর্ববিষয়ে একাধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করে। ফলে, মন্ত্রিসংসদ সর্বেসর্বা হইয়া উঠে ও আইনসভার প্রাধান্য খর্ব হয়। দুই-দল ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল যে, ইহাতে কোন ব্যক্তির স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের ক্ষমতা থাকে না। ভোটদাতা নিজের বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া দলের অনুশাসন অনুসারে ভোট দিতে বাধ্য হয়।

বহু-দলের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি—Arguments for and against Multiple-Party System.

দুই-দল ব্যবস্থার উল্লিখিত গলদ থাকার জন্য অনেকে বহু-দলের অস্তিত্ব সমর্থন করেন। বহু-দল থাকিলে জনমত এই বিভিন্ন দলের মাধ্যমে প্রকাশিত হইতে পারে ও আইনসভাও অধিকতর প্রতিনিধিমূলক হইতে পারে। জনগণ তাহাদের স্বাধীন অভিমত ব্যক্ত করিবার অধিকতর সুযোগ লাভ করে। এই ব্যবস্থা দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের একাধিপত্য-বিস্তার প্রতিরোধ করা যায়। বিভিন্ন দল আলাপ-আলোচনা দ্বারা সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারে। ফলে, আইন-প্রণয়নকার্য ও শাসনকার্য বহু-দলের সমর্থনলাভ করিয়া ব্যাপক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু দল-ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু দলও শাসনকার্য-পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পায়। মন্ত্রিসংসদ একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া বহুদলের সম্মিলিত সমর্থনপুষ্ট বলিয়া

স্বৈরাচরী হইতে পারে না। এক-দল দ্বারা গঠিত মন্ত্রিসংসদ অপেক্ষা বহু-দল-সমর্থিত মন্ত্রিসংসদ দেশের জনমতকে অধিকতর প্রতিফলিত করিতে পারে এবং জাতীয় স্বার্থকে অধিকতর সংরক্ষিত করিতে সক্ষম হয়।

কিন্তু বহু-দলের বিপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল যে, এই ব্যবস্থায় শক্তিশালী ও স্থায়ী মন্ত্রিসংসদ গঠন করা সম্ভব নয়। দুই বা ততোধিক দলের সমর্থনে যে মন্ত্রিসংসদ গঠিত হয়, দলগুলির মধ্যে সামান্য মতানৈক্য হইলেই ঐ মন্ত্রিসংসদ ভাঙ্গিয়া পড়ে। আইনসভায় কোন দলেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকার ফলে মন্ত্রিসংসদকে দলগুলির সম্মিলিত সমর্থনের উপর নির্ভর করিতে হয়। মন্ত্রিগণের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে এক বা একাধিক দলের সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইয়া মন্ত্রিসংসদের পতন অনিবার্য হইয়া পড়ে। এই ব্যবস্থায় মন্ত্রিসংসদ যে শুধু অস্থায়ী হয় তাহা নয়, উহার দুর্বলতাও প্রকাশ পায়। মন্ত্রিসংসদের কোন সদস্যই স্বাধীনভাবে তাঁহার নিজের বিভাগের কার্য পরিচালনা করিতে পারেন না। সর্বদাই আলাপ-আলোচনা দ্বারা অন্য দলের সদস্যদের সম্মতির উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয়। ফলে, কোন নীতি কার্যকরী করিতে গেলে বহু সময় অতিবাহিত হয়। কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ইহাতে দেশের সুশাসন ও হিতকর কোন কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। অল্প সময়ের ব্যবধানে মন্ত্রিসংসদ পুনর্গঠিত হয় বলিয়া মন্ত্রিসংসদের সদস্যনির্বাচনে অনেক সময় দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। ইহা ছাড়া, বহু-দল থাকার জন্য জনসাধারণের পক্ষে প্রার্থীনির্বাচন করাও একটা সমস্যারূপে দেখা দেয়। বিভিন্ন দল তাহাদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থাপিত করিয়া সাধারণ ভোটদাতার কাছে একটা সমস্যার সৃষ্টি করে।

এক-দলীয় শাসন—One-Party Government.

বিগত প্রথম বিশ্বসমরের পরবর্তী কালে ইউরোপের কয়েকটি দেশে এক-দলীয় শাসন আরম্ভ হয়। রুশ দেশে প্রথম সাম্যবাদী দল কর্তৃক পরিচালিত এক-দলীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্যবাদী দল বলপ্রয়োগ দ্বারা অন্য দলগুলিকে বিতাড়িত করিয়া দলীয় এক-নায়কত্বের প্রতিষ্ঠা করে। রুশ দেশের বর্তমান শাসনতন্ত্রেও সাম্যবাদী ব্যতীত অন্য কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। রুশ দেশের পর জার্মানি ও ইতালিতে যথাক্রমে নাৎসী ও ফ্যাসিবাদী দলের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এক দলীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। নাৎসী দল ও ফ্যাসীবাদী

দল সাম্যবাদীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকে বল প্রয়োগ দ্বারা সমূলে উৎপাটিত করে। ইংলণ্ডেও যুদ্ধের সময় যে জাতীয় সরকার গঠিত হয়, তাহাকে কার্যতঃ এক-দলীয় সরকার বলা যাইতে পারে। জাতীয় বিপদের সময় ইংলণ্ডে বিভিন্ন দলগুলি তাহাদের দলগত বিভেদ বিসর্জন দিয়া জাতীয় স্বার্থরক্ষণে যত্নবান হয়। সুতরাং রাশিয়া, জার্মানি প্রভৃতি দেশের এক-দলীয় সরকার ও ইংলণ্ডের জাতীয় সরকারকে এক পর্যায়ভুক্ত করা উচিত নয়।

'এক-দলীয় সরকার' ব্যবস্থার সমর্থকগণ বলেন যে, কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করিয়া জাতিকে বিভিন্ন দলে ভাগ করিলে জাতীয় শক্তি ও একতা নষ্ট হয়। জাতির সমগ্র সদস্যই যদি এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তাহা হইলে, জাতীয় শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এক-দলীয়, দ্বি-দলীয় বা বহু-দলীয়, সকল শাসন-ব্যবস্থাই জনসাধারণ দলের নেতৃগণ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে। দলের নির্দেশ জনগণ অন্ধভাবেই পালন করিয়া থাকে। কোনরূপ দলীয় ব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। সুতরাং কৃত্রিম উপায়ে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া নানারূপ দল গঠন করিবার পরিবর্তে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকিলে জাতীয় ঐক্য বৃদ্ধি পাইতে পারে।

এক-দলীয় সরকারের সপক্ষে যতই যুক্তি দেখান হউক না কেন, এক-দলীয় সরকার যতদিন পর্যন্ত জনগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত না হইবে ততদিন এই সরকার স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে না। জার্মানি ও ইতালিতে ইতিমধ্যেই এক-দলীয় সরকারের অবসান ঘটিয়াছে। কিন্তু রুশ দেশে এক-দলীয় সরকার আজও সুপ্রতিষ্ঠিত ও ক্রমশঃই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। তাহার কারণ রুশ দেশের এক-দলীয় সরকার বল-প্রয়োগ-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও নানাবিষয়ে দেশের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়া জনসংখ্যার বিশাল এক অংশের আস্থাভাজন হইতে সমর্থ হইয়াছে। রুশ দেশের এক-দলীয় সরকারের ভবিষ্যৎ ইহার জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট গঠনমূলক কার্যের উপর নির্ভর করে।

দলব্যবস্থার ত্রুটি দূর করিবার উপায়—Means of Removing the Defects.

দলপ্রথার যে অসুবিধাগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা বহুলাংশে নাগরিক

জীবনের অসম্পূর্ণতার জন্যই দেখা যায়। দলপ্রথার কুফলগুলি দুই প্রকারে দূর করা সম্ভব। প্রথমতঃ, শাসন-ব্যবস্থা এরূপভাবে গঠন করিতে হইবে যাহাতে কোন ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষ শাসনব্যাপারে সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করিতে না পারে। এই নিমিত্ত শাসনব্যাপারে জনসাধারণের মতকে গুরুত্ব প্রদান করিবার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। দেশের শাসনতন্ত্রে যদি গণভোট, গণপ্রস্তাব ও গণপ্রত্যা-বর্তনের নির্দেশ দিবার অধিকার থাকে, তাহা হইলে দলীয় এক-নায়কত্বের পরিবর্তে সার্বজনীন সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। জনগণ যতই অধিকতর সক্রিয়ভাবে শাসনব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইবে শাসন-ব্যবস্থা হইতে সেই পরিমাণে দলীয় এক-নায়কত্বের ত্রুটিগুলি দূর হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সরকারী সাহায্য, সম্মান ও সরকারী চাকুরী বিতরণ করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তাহাদের সমর্থকগণকে বশীভূত রাখে। ইহাতে অনেক সময় নানাবিধ দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। এই ত্রুটি দূর করিবার জন্য শাসনতন্ত্রে এরূপ ব্যবস্থা থাকা উচিত যে, একমাত্র যোগ্যতা ব্যতীত অন্য কোন কারণে কোন ব্যক্তি সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত হইতে পারিবে না। তৃতীয়তঃ, শাসকবর্গ যাহাতে নিজেদের খুশীমত শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে সমর্থ না হয়, সেজন্য দেশের সংবিধান যথাসম্ভব অনমনীয় রাখিতে হইবে। জনগণের মৌলিক অধিকারগুলিও লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্রদ্বারা সুরক্ষিত করা একান্ত আবশ্যক। চতুর্থতঃ, শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত মৌলিক অধিকার রক্ষা এবং সরকারের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ উচ্চ বিচারালয় বর্তমানে শাসন-ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। পঞ্চমতঃ, সরকারের স্থায়ী কর্মচারিবৃন্দ যাহাতে দলনিরপেক্ষভাবে তাহাদের দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন করিতে পারে সেজন্য শাসনতন্ত্রে তাহাদের নিয়োগ, বেতন ও পদচ্যুতির বিধিগুলি সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। কোনরূপ প্রলোভন বা ভয়ের দ্বারা তাহারা যাহাতে কর্তব্যচ্যুত না হয়, সেজন্য শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ষষ্ঠতঃ, সংখ্যালঘু দলগুলির অধিকার যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেজন্যও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায় যে, নাগরিকগণ যদি সৎশিক্ষা পাইয়া প্রকৃত রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহারা সাম্প্রদায়িক বা দলগত স্বার্থের উর্ধ্বে উঠিয়া সব সময়ে জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণে যত্নবান হয়।

সংক্ষিপ্তসার

জনমত

গণতন্ত্রকে সফল করিতে হইলে শাসন-পরিচালনায় জনমতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। জনমতের কার্যকরী শক্তির অভাবে গণতন্ত্র বিকৃত হইয়া স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হইতে পারে।

জনমতের প্রকৃতি

জনমত বলিতে সকল ব্যক্তিই যে একমতাবলম্বী হইবে ইহা বুঝায় না বা কোন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতও বুঝায় না। যে মত জনগণের বিবেকবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ও যাহার উদ্দেশ্য হইল জনগণের বৃহত্তর কল্যাণসাধন করা, সেই মতকেই জনমত বলা হয়। সংখ্যালঘু দল এই মত সমর্থন না করিলেও সক্রিয়ভাবে এই মতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে না।

জনমত-গঠনের বিভিন্ন উপায়

দেশে প্রকৃত জনমত-গঠনে সংবাদপত্র, শিক্ষায়তন, রাজনৈতিক দল, চলচ্চিত্র ও বেতার বিশেষভাবে সহায়তা করে। বর্তমানে সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র ও বেতার-সাহায্যে জনমত প্রভূতভাবে প্রভাবিত হয়। এইজন্য এইগুলিকে ঠিকপথে পরিচালিত করা জাতীয় জীবনে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে।

আইন ও জনমত

গণতন্ত্রের ভিত্তি হইল জনমতের সমর্থন। রাষ্ট্র-প্রণীত আইন যদি জনমত প্রতিফলিত করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে সে আইন লোকে মান্য করিতে চায় না। জনমতের প্রতিকূলতা করিয়া কোন সরকারই স্থায়ী হইতে পারে না। জনগণ নানা উপায়ে, সংবাদপত্র, সভাসমিতি প্রভৃতি দ্বারা আইন-প্রণয়নে প্রভাব বিস্তার করে।

ভারতে জনমত

অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও পরাধীনতার জন্য ভারতে এতদিন পর্যন্ত কোনরূপ প্রকৃত জনমত গঠিত হইতে পারে নাই। স্বাধীনতালাভের পর জাতীয় জীবনে নানাদিক দিয়া যে পরিবর্তন দেখা যাইতেছে তাহাতে আশা করা যায় যে, শিক্ষাবিস্তার

হইলে ভারতে শক্তিশালী জনমত গঠিত হইতে পারিবে। জনমতগঠনে ভারতের সংবাদপত্রগুলির ও রাজনৈতিক দলগুলির যথেষ্ট দায়িত্ব আছে।

রাজনৈতিক দল

যখন একদল লোক একটি নির্দিষ্ট নীতি ও কার্যক্রম অবলম্বন করিয়া জাতীয় সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করে, তখন তাহাকে রাজনৈতিক দল বলা হয়। রাজনৈতিক দলের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল জাতীয় স্বার্থের উন্নতি করা।

রাজনৈতিক দলের কার্য

১। জাতীয়-সমস্যাগুলির নির্ধারণ করিয়া তাহাদের সমাধান করিবার নীতি ও কার্যক্রম জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করা, ২। প্রচারকার্য দ্বারা জনসাধারণ যাহাতে দলে যোগদান করে সেজন্য চেষ্টা করা, ৩। নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করা, ৪। সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া সরকার গঠন করা, ৫। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া দলীয় নীতি কার্যকরী করিয়া নির্বাচনকালীন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা।

দলীয় শাসনের গুণ

১। অসংবদ্ধ জনমতকে প্রচার-কার্যের দ্বারা সুসংবদ্ধ করিয়া জনশিক্ষা প্রচারে সাহায্য করে, ২। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনলাভ করিয়া মন্ত্রিসংসদ স্থায়ী হয়, ৩। দলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে শাসনকার্যের উন্নতি হয়, ৪। দলীয় শাসন প্রবর্তনের ফলে সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির মধ্যে সহযোগিতা স্থাপিত হয়।

দোষ

১। দলীয় শাসন মানুষের মধ্যে কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করে, ২। স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের বাধা সৃষ্টি করিয়া দলপ্রথা ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে, ৩। দলীয় স্বার্থ বড় করিয়া দেখা হয় বলিয়া দলপ্রথায় জাতীয় স্বার্থ অনেক সময় উপেক্ষিত হয়, ৪। দলপ্রথায় নির্বাচনকালে নানাপ্রকার দুর্নীতি প্রশ্রয় পায় ও লোকের নৈতিক মানের অবনতি ঘটে, ৫। সংখ্যালঘিষ্ঠ দল সবসময়ে সরকারী কাজের ভাল-মন্দ বিবেচনা না করিয়া বাধা দেয়।

দুই-দল বনাম বহু-দল—দুই-দলের গুণ

১। দুই-দল থাকিলে ভোটদাতার প্রার্থানির্বাচনের সমস্যা সহজ হয়। ২। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থন লাভ করিয়া শাসনপরিষদ স্থায়িত্ব লাভ করে। ৩। বিরোধীদলের সমালোচনার দ্বারা জনমত বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইতে পারে এই ভয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বে-আইনী কার্য করিতে পারে না।

দুই-দলের দোষ

১। ইহাতে দেশের জনমত বিশেষ করিয়া মধ্যপন্থী মত সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হইতে পারে না। ২। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বৈরাচারী হইবার সম্ভাবনা থাকে। ৩। মন্ত্রিসংসদ একটিমাত্র দলের নেতৃগণ দ্বারা গঠিত হয় বলিয়া দেশের বিভিন্ন জনমত মন্ত্রিসংসদের কার্যদ্বারা প্রতিফলিত হয় না।

বহু-দলের গুণ

বহু-দল থাকিলে ১। দেশের জনমত অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইবার সুযোগ পায় ও জনসাধারণ এই বিভিন্ন দলের মাধ্যমে তাহাদের মত প্রকাশ করিতে পারে। ২। মন্ত্রিসংসদ বহু-দলের সদস্য লইয়া গঠিত হয় বলিয়া ইহাকে জনমতের অধিকতর প্রতিনিধিমূলক বলা যাইতে পারে। ৩। বহু-দলের সহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মন্ত্রিসংসদ অত্যাচারী হইতে পারে না।

বহু-দলের দোষ

১। বহু-দলের সহযোগিতায় যে মন্ত্রিসংসদ গঠিত হয় তাহা স্থায়ী হইতে পারে না, ২। অস্থায়ী বলিয়া মন্ত্রিসংসদ জাতীয় অগ্রগতির জন্য কোন দীর্ঘ-মেয়াদী কার্যক্রম সফল করিতে পারে না, ৩। বহু-দলের সম্মতি-সাপেক্ষ বলিয়া শাসনপরিষদ কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে না, ৪। মন্ত্রিসংসদ-গঠনে দলাদলি বৃদ্ধি পায়।

এক-দলীয় শাসন

প্রথম মহাযুদ্ধের পর রাশিয়া, জার্মানি, ইতালি প্রভৃতি দেশে অন্য দলগুলিকে নির্মূল করিয়া এক-দলীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এক-দলীয় শাসনের উদ্দেশ্য হইল যে-কোন প্রকারে হউক না কেন দলীয়-নীতি বলবৎ করা। এক-দলীয়

সরকার দেশের স্বার্থে বিনাবাধায় দ্রুতগতিতে কার্য করিতে পারে। কিন্তু এই শাসন-ব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়।

দল-ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করিবার উপায়

১। শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণকে গণভোট, গণ-প্রস্তাব, প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ প্রভৃতি দ্বারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়া দলীয় শাসনের ত্রুটি দূর করা সম্ভব। ২। শুধুমাত্র যোগ্যতার ভিত্তির উপর সরকারী চাকুরি ও সরকারী সম্মান বিতরণ করিবার ব্যবস্থা হইলে, দলীয় শাসনের গলদ অনেক পরিমাণে কমিতে পারে। ৩। লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র এবং নির্ভীক ও নিরপেক্ষ বিচারপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত থাকিলে, রাজনৈতিক দল তাহাদের খুসীমত কার্য করিতে পারে না। ৪। সরকারী কর্মচারী ও সংখ্যালঘু দলের ন্যায্য অধিকারগুলি শাসনতন্ত্র দ্বারা সুরক্ষিত হইলে, দলীয় শাসনের ত্রুটি দূর করা সহজসাধ্য হয়।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. What do you understand by political parties? Explain their merites and defects.

রাজনৈতিক দল বলিতে কি বুঝ? ইহার গুণ ও দোষ আলোচনা কর।

উঃ—দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে একমতাবলম্বী একদল লোক যখন সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাহাদের নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করিতে চায়, তখন এই এক-মতাবলম্বী লোকদের লইয়া এক একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। একতা ও সঙ্ঘবদ্ধতা হইল রাজনৈতিক দলের ভিত্তি। গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রসারের ফলে রাজনৈতিক দল গড়িয়া উঠিয়াছে।

এ স্থলে রাজনৈতিক দলের সহিত কু-চক্রের পার্থক্য করা দরকার। কুচক্রীদলও (Faction) অনেক সময় নিজেদের রাজনৈতিক দল বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কুচক্রীদল অতি সংকীর্ণ আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়। রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য হইল দেশের সর্বসাধারণের মঙ্গল সাধন করা, আর কুচক্রীদল শুধু নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। কুচক্রীদলের বিশেষ কোন নীতি থাকে না।

গুণ: ১। রাজনৈতিক দল অসংবদ্ধ জনমতকে সুসংবদ্ধভাবে গঠিত করিয়া ইহাকে শক্তিশালী করে। দলের প্রচারকার্যের মধ্য দিয়া দেশবাসী জাতীয়-সমস্যাগুলি ও এই সমস্যাগুলির সমাধান প্রস্তাবগুলির সহিত পরিচিত হয়। ইহাতে জনশিক্ষা প্রসার লাভ করে।

২। সুসংবদ্ধ দলব্যবস্থা না থাকিলে শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে না। গণতান্ত্রিক

শাসন-ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে। দলের সমর্থন ব্যতীত কোন সরকারই স্থায়িত্ব লাভ করিয়া জনহিতকর কার্য সম্পাদন করিতে পারে না।

৩। দলীয় শাসনের আর একটি গুণ হইল যে, বিভিন্ন দলের প্রতিযোগিতায় শাসন-ব্যবস্থার উন্নতি হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ক্ষমতায় আসীন থাকে আর সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বিরোধী দল হিসাবে সর্বদাই ক্ষমতায় আসীন দলের কার্যের সমালোচনা করে এবং ভুল-ত্রুটি জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করে। এইজন্য ক্ষমতায় আসীন দল স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না।

দোষ : ১। রাজনৈতিক দল মানুষের মধ্যে কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দলাদলি সৃষ্টি করে।

২। দল ব্যবস্থায় মতামতের স্বাধীনতা থাকে না। দলীয় নীতি সকলকেই মানিতে হয়।

৩। দলের মতামত মানিয়া লইতে হয় বলিয়া দলের সমর্থকগণ দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভুলিয়া দলীয় স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত হয়। ইহাতে দেশের বৃহত্তর কল্যাণ ব্যাহত হয়।

৪। নির্বাচনকালে বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতার ফলে কলহ-বিবাদের সৃষ্টি হয় এবং ইহার ফলে দেশের নৈতিক আবহাওয়া বিষাক্ত হয়।

৫। দলাদলির ফলে অনেক সময় দলীয় কর্তৃত্ব অযোগ্য লোকের হস্তে যায় এবং এই অযোগ্য ব্যক্তিগণ দলের সাহায্যে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থসাধনে তৎপর হয়।

2. Discuss the relative advantages and disadvantages of (a) multi-party system. (b) two-party system, and (c) single party system.

বহু-দল, দুই-দল ও এক-দলীয় ব্যবস্থার আপেক্ষিক গুণ ও দোষ আলোচনা কর।

উঃ—কোন কোন দেশে এক-দলীয় শাসন-ব্যবস্থা দেখা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে জার্মানী, ইতালি ও রুশ দেশে এই এক-দলীয় শাসন-ব্যবস্থা চালু হয়। সাধারণভাবে বলিতে গেলে ইংলণ্ডে দুই-দলীয় শাসন-ব্যবস্থা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। আবার ফরাসী দেশ ও ভারতে বহু-দলের অস্তিত্ব দেখা যায়।

দেশে বহু-দল থাকিলে জনমত অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইবার সুযোগ পায়। দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী ও মধ্যপন্থী বিভিন্ন মতামত এই বিভিন্ন দলগুলির মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রিসংসদ বহুদলের সদস্য লইয়া গঠিত হয় বলিয়া ইহা জনমত অধিকতর প্রতিফলিত করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, বহুদলের সমর্থনে গঠিত বলিয়া মন্ত্রিসংসদ জনমত-বিরোধী কাজ করিতে পারে না।

কিন্তু এই ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল যে, ভিন্ন মতাবলম্বী বহু-দলের সহযোগিতায় মন্ত্রিসংসদ গঠিত হয় বলিয়া ইহা স্থায়ী হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, অস্থায়ী বলিয়া মন্ত্রিসংসদ কোন দীর্ঘ-মেয়াদী কার্যক্রম সফল করিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, বহু-দলের সম্মতি-সাপেক্ষ বলিয়া শাসকগণ কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে না।

দুই-দল থাকিবার প্রধান সুবিধা হইল যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনপুষ্ট মন্ত্রিসংসদ স্থায়ী হয়। দ্বিতীয়তঃ, দুই-দল থাকিলে ভোটদাতারও প্রার্থী নির্বাচনের সমস্যা সহজ হয়। তৃতীয়তঃ, বিরোধী দলের সমালোচনার ভয়ে শাসকগণ বে-আইনী কাজ করিতে পারে না।

দুই দলব্যবস্থার ত্রুটি হইল যে, ইহাতে দেশের বিভিন্ন জনমত বিশেষ করিয়া মধ্যপন্থী মত প্রকাশ পায় না। দ্বিতীয়তঃ, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ইচ্ছামত কাজ করিলে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বাধা দিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, একটিমাত্র দলের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত মন্ত্রিসভা দেশের জনমত প্রতিফলিত করিতে পারে না।

এক-দলীয় শাসনের সুবিধা হইল যে, ইহাতে দেশে দলাদলি হইবার সম্ভাবনা নাই। এক-দলীয় সরকার দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে ও নির্ভয়ে ইহার কার্যক্রমকে রূপদান করিতে পারে।

এই ব্যবস্থার প্রধান দোষ হইল যে ইহাতে দেশের জনমত আদৌ প্রতিফলিত হইতে পারে না। ইহাতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা নষ্ট হয়। মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া এই ব্যবস্থা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্তরায় সৃষ্টি করে।

3. What are the functions and utilities of Political parties in a democracy? [H. S. (Comp.) 1960] (Comp.)

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের কার্য ও উপযোগিতা কি?

উঃ—যখন একদল লোক একটি নির্দিষ্ট নীতি ও কার্যক্রম অবলম্বন করিয়া জাতীয় সমস্যা-সমাধানে বদ্ধপরিকর হয়, তখন তাহাকে রাজনৈতিক দল বলা হয়। ব্যক্তিবিশেষের মত এককভাবে কার্যকরী হইতে পারে না, সেজন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে মানুষ তাহাদের সমবেত মতকে কার্যকরী করিবার প্রয়াস পায়। রাজনৈতিক দলের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষ সাধন করা।

কার্য: ১। জাতীয় সমস্যাগুলি নির্ধারণ করিয়া তাহাদের সমাধান করিবার নীতি ও কার্যক্রম জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করা, ২। প্রচারকার্য দ্বারা জনসাধারণ যাহাতে দলে যোগদান করে সেজন্য চেষ্টা করা, ৩। নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করা, ৪। সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া সরকার গঠন করা, ৫। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া দলীয় নীতি কার্যকরী করিয়া নির্বাচনকালীন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা।

উপযোগিতা—১নং প্রশ্নের উত্তরের 'গুণ' দ্রষ্টব্য:

4. Define Public Opinion and explain how it is related to Democrrcy? [H. S. (Com.) Comp. 1961]

জনমতের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। গণতন্ত্রের সহিত ইহা কিভাবে সম্পর্কযুক্ত?

উঃ—জনমত বলিতে সর্ববাদীসম্মত মত বা সংখ্যাগরিষ্ঠের মত বুঝায় না। যে মত জনগণের বিচার-বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ও যাহার উদ্দেশ্য হইল জনগণের বৃহত্তর কল্যাণসাধন করা সেই মতকে জনমত বলা হয়।

গণতন্ত্র সফল করিবার একমাত্র উপায় হইল শিক্ষিত ও সচেতন জনমত সৃষ্টি করা। বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে শাসনকার্য পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। অথচ জনগণ যদি তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে উদাসীন থাকে এবং অধিকারগুলি রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প না হয়, তাহা হইতে গণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হয়। জনগণ যদি সুসংবদ্ধভাবে রাজনৈতিক ব্যাপারে তাহাদের মতামত প্রকাশ করে তাহা হইলে শাসকগোষ্ঠী জনমতের বিরুদ্ধে কোন কার্য করিতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত গণতন্ত্রের কার্যকারিতা সচেতন ও সক্রিয় জনমতের উপর নির্ভর করে।

5. Discuss the various ways in which public opinion is formed and expressed in a modern society.

কিভাবে জনমত গঠিত ও প্রচারিত হয় তাহা লিখ।

উঃ—নানা উপায়ে জনমত গঠিত ও প্রভাবিত হইয়া থাকে।

১। বর্তমান যুগে জনমত গঠনে সংবাদপত্র এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। সংবাদপত্রগুলি শুধু নানাবিধ সংবাদ পরিবেশন করিয়া জনগণের জ্ঞানের পরিধি বিস্তারে সাহায্য করে তাহা নয়, সম্পাদকীয় মন্তব্য ও সংবাদ পরিবেশন পদ্ধতির মধ্য দিয়া পাঠকদের মত গঠনে সাহায্য করে।

২। জনমত গঠনে শিক্ষায়তনগুলিও বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। বাল্যকালে ও কৈশোরে মানুষ যে শিক্ষা পায় পরবর্তী জীবনে সে শিক্ষার প্রভাব অনতিক্রমণীয়।

৩। রাজনৈতিকদলগুলি সংবাদপত্র, প্রচার-পুস্তিকা ও সভা-সমিতির মাধ্যমে তাহাদের মতবাদ প্রচার করিয়া জনমত গঠন ও প্রভাবিত করে।

৪। অধুনা বেতার ও চলচ্চিত্রের সাহায্যে প্রচার কার্যদ্বারাও জনমত সৃষ্টি করা হয়।

৫। দেশের আইনসভার তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনার দ্বারাও জনমত সচেতন হইয়া রাজনৈতিক ব্যাপারে জনগণ অধিকতর উৎসাহী হয়।

6. Define political party and point out the functions of political parties.
[H. S. (Com.) 1968]

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ বর্ণনা কর।

উঃ—উত্তরের প্রথম ভাগের জন্য ১নং উত্তরের ১ম ও ২য় অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

কার্যকলাপ ঃ

প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল একজন নেতা ও একাধিক উপনেতার অধীনে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। কোন রাজনৈতিক দল যদি বাস্তবক্ষেত্রে ইহার মত কার্যকরী করিতে মনস্থ করে, তাহা হইলে ইহার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হইল দেশের বিভিন্ন সমস্যাসম্পর্কে ইহার দলীয় নীতি স্থির করা। জাতীয় সমস্যাগুলি নির্ধারণ করিয়া সেই সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে রাজনৈতিক দলগুলিকে তাহাদের কার্যক্রম স্থির করিতে হয়। জাতীয় সমস্যা ও সমস্যাসমাধানের নীতি স্থির হইলে দলের কার্য হইল সেই নীতিকে নানা উপায়ে দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা। সংবাদপত্র, সভা-সমিতি ও পুস্তিকা-প্রকাশ প্রভৃতির মধ্য দিয়া জনমতকে দলের অনুকূল করিয়া গঠন করিবার জন্য প্রত্যেক দলকে প্রচারকার্য চালাইতে হয়। যত অধিক সংখ্যক লোক এই প্রচারকার্যের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া দলীয় নীতিতে আস্থাবান্ হয়, দলের সমর্থকসংখ্যা ততই বৃদ্ধি পায়। আইনসভার সাধারণ নির্বাচনের সময় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল সক্রিয় হয়। প্রার্থী নির্বাচন করিয়া সাধারণ নির্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়া রাজনৈতিক দলের আর একটি প্রধান কার্য। নিজ নিজ দলের প্রার্থীর পক্ষে ভোটসংগ্রহের জন্য এই সময় প্রত্যেকটি দলকে জোর প্রচারকার্য চালাইতে হয়। নির্বাচনের পর যে দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, সেই দলের নেতৃগণ মন্ত্রিসংসদ গঠন করিয়া শাসনকার্য-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শাসন-ক্ষমতার অধিকারী হইলে রাজনৈতিক দল তাহার নীতি ও কার্যক্রম অনুসারে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া জাতীয় সমস্যাগুলির সমাধান করিতে সচেষ্ট থাকে। এইরূপে নির্বাচনের সময় জনসাধারণের সমর্থন-লাভের জন্য যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রদত্ত হয়, ক্ষমতালাভের পর সেগুলিকে যথাসম্ভব রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হয়। যে দলগুলি আইনসভার অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক আসন দখল করে, তাহারা বিরোধীদল বলিয়া পরিচিত হয়। প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকিলেও বিরোধীদল আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক ও প্রশ্নোত্তরের দ্বারা মন্ত্রিমণ্ডলীকে তাঁহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সর্বদা অবহিত রাখে। মন্ত্রিমণ্ডলীকে তাঁহাদের নির্বাচনকালীন প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করিয়া খুশীমত শাসনকার্য পরিচালনা করিলে, বিরোধীদল জনমত জাগ্রত করিয়া মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্যে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে।

দ্বাদশ অধ্যায়

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা

(Nationalism and Internationalism)

জাতি—Nation

জাতি হইতে জাতীয়তার উৎপত্তি। সুতরাং জাতীয়তার তাৎপর্য বুঝিতে হইলে জাতি কাহাকে বলে তাহা জানা প্রয়োজন। যখন একদল লোক কুলগত, ভাষাগত, ধর্মগত বা সংস্কৃতিগত ঐক্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নিজেদের অন্য সকল জনসমষ্টি হইতে পৃথক মনে করে, তখন এই জনসমষ্টিকে জাতীয় জনসমাজ (Nationality) বলা হয়। যখন কোন জাতীয় জনসমাজ নিজস্ব জাতীয় সরকার গঠন করে বা নিজেদের এক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিবার জন্য সচেষ্ট হয়, তখন জাতীয় জনসমাজ জাতিতে (Nation) পরিণত হয়। (A nation is a nationality either independent or desiring to be so) উপরি-উক্ত ঐক্য বোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত জনসমষ্টি যখন রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা সম্পন্ন হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করে, তখন রাজনীতির ভাষায় তাহাদের জাতি বলা হয়।

সুতরাং জাতি গঠনের উপাদান হইল বাহ্যিক ও ভাবগত ঐক্য। অভিন্ন কুল, ভাষা, ধর্ম প্রভৃতি ঐক্য হইল বাহ্যিক ঐক্য। জাতি গঠনে এই বাহ্যিক ঐক্যগুলি অপরিহার্য নহে। সুইস দেশে তিনটি বিভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতি একই জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ভারতের ক্ষেত্রেও এই উক্তি সত্য। জাতি গঠনের প্রধান উপাদান হইল ভাবগত ঐক্য। এই ঐক্য একটি মানসিক অনুভূতির ফল। অতীতের সম-সুখ-দুঃখ ভোগের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের সম-আদর্শ এই ভাবগত ঐক্য সৃষ্টির প্রধান উপাদান।

বাহ্যিক ও ভাবগত ঐক্যের ফলে যখন একদল লোক ঐক্যবদ্ধ হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য জনসমাজ হইতে নিজেদের পৃথক মনে করে, তখনই তাহাদের জাতীয়-ভাবের উদয় হয়। এই জাতীয়ভাব বা সাজাত্য বোধ (Nationalism) জাতিগঠনের পরম পরিণতি।

জাতীয়তাবাদ—Nationalism

জাতীয়তাবোধ একটা মানসিক অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মানসিক অনুভূতির সক্রিয় বহিঃপ্রকাশের ফলে কতকগুলি জাতির সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া এক জাতির ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। এই অনুভূতি মানুষকে তাহার অধিকারগুলি সম্বন্ধে আত্মসচেতন করিয়া নির্যাতিত পরাধীন জাতিগুলির

মুক্তিলাভের পথের সন্ধান আনিয়া দেয়। প্রত্যেক মুক্ত জাতি তাহার নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিয়া জগৎসভায় তাহার ন্যায্য আসন লাভ করিতে পারে। জাতীয়তাবোধ-উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক জাতি তাহার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া নিজ অভিপ্রায় অনুযায়ী তাহার জাতীয় জীবন সংগঠন করিতে পারে। জাতীয়তাবোধ মানুষকে শিক্ষা দিয়াছে যে, জাতীর অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি লোক তাহাদের সমষ্টিগত জাতীয় জীবনের প্রতি নির্বিচারে আনুগত্য স্বীকার করিবে, কেন-না জাতির স্বার্থের সহিত ব্যক্তির স্বার্থ অবিচ্ছন্নভাবে জড়িত। সুতরাং জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি বিধান প্রত্যেক মানুষের পবিত্র কর্তব্য। রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে জাতীয় রাষ্ট্রগঠনই হইল প্রথম ও শেষ অধ্যায়।

সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে জাতীয়তাবোধ একটি মহান্ আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হয়। যদি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য ব্যক্তি-স্বাধীনতা অপরিহার্য হয়, তাহা হইলে ব্যক্তিসমষ্টির সমন্বয়ে যে জাতি গঠিত হয়, সেই সমষ্টিগত জীবনের পক্ষেও জাতীয় স্বাধীনতা অপরিহার্য। মানবসভ্যতা-বিকাশের জন্যই প্রত্যেক প্রকৃত স্বতন্ত্র জাতির এই অধিকার থাকা প্রয়োজন। এই অধিকারের বলে প্রত্যেক জাতি তাহার নিজস্ব গুণাবলী, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুষ্টিসাধন করিয়া জগৎ সভ্যতাকে উন্নততর করিতে সহায়তা করে।

• রাষ্ট্রনীতিতে জাতীয়তাবাদের আবির্ভাবের ফলে বহু দেশে একনায়কত্বের অবসান হইয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জাতীয়তাবাদ জাতির মধ্যে আত্মপ্রত্যয় সঞ্চারিত করিয়া একটা মহৎ কিছু করিবার অনুপ্রেরণা দেয়।

বিকৃত জাতীয়তাবাদ—Perverted Nationalism

কিন্তু এই জাতীয়তাবাদ যদি বিকৃত হয়, তাহা হইলে জাতির পক্ষে তাহার পরিণাম ভয়াবহ। জাতীয়তাবাদের বিকৃতি দুইটি কারণে ঘটিতে পারে। প্রথম কারণটি জাতির আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা হইতে উদ্ভূত হয়, আর দ্বিতীয়টি নির্ভর করে এক জাতির সহিত অন্য জাতির সম্পর্কের উপর। কতকগুলি ক্ষুদ্র উপজাতি বা সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে একটি পূর্ণ জাতি গঠিত হয়; মূলগত ঐক্য থাকিলেও এই সম্প্রদায়গুলি বিভিন্ন ভাষাভাষী বা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইতে পারে বা বিভিন্ন আচার-প্রথার দ্বারা তাহাদের সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় যে, এইরূপ এক বা একাধিক সম্প্রদায় মূল জাতি হইতে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য পৃথক ভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সাম্প্রদায়িক ভাষা, ইতিহাস ও কৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া এক পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিতে সচেষ্ট হয়। এই

মনোভাবের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া ক্যারেন জাতি বর্মা হইতে স্বাতন্ত্র্যের দাবী করিতেছে। শ্লোভাক ও শ্লোভেনিস্ সম্প্রদায়গুলিও চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে পৃথক হইবার দাবী জানাইতেছে। এই মনোভাবকে বিকৃত ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ বলা চলে। এই মনোভাবের ফলে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত জাতি তাহার সমষ্টিগত সংহতি ও ঐতিহ্য হারাইয়া ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইতে পারে—স্বদেশপ্রেম প্রাদেশিকতায় পর্যবসিত হয়। ভারতেও কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই স্বার্থপ্রণোদিত ভেদবুদ্ধি কিছু কার্যকরী হইয়াছে। এইরূপ মনোভাব জাতীয় জীবনের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিকর। সুতরাং অঙ্কুরেই ইহার বিনাশসাধন না করিলে জাতীয় জীবনে ইহা সংক্রামক ব্যাধির মত পরিব্যাপ্ত হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, যখন কোন জাতি স্বীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টিতে অত্যধিক আস্থাবান্ হইয়া অপর জাতিকে অবজ্ঞা করিতে শিখে এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ছলে-বলে-কৌশলে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জাতির উপর চাপাইতে চায়, তখন এই জাতীয়তাবাদ আক্রমণাত্মক মূর্তি ধারণ করিয়া বিশ্বশান্তির অন্তরায় হইয়া উঠে। এইরূপ বিকৃত জাতীয়তাবোধের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা শুধু নিজ জাতির প্রতি ভালবাসা বা আস্থারূপে প্রকাশ না পাইয়া অন্য জাতির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষে পরিণত হয়। ফলে, শক্তিশালী জাতিসমূহ নিজেদের জাতীয় গর্ব ও শক্তি প্রচার করিবার মানসে দুর্বল জাতিগুলির স্বাধীনতা হরণ করে। বর্তমান যুগে এই আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদ জাতির অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য পৃথিবী ব্যাপিয়া ইহার প্রভাব বিস্তার করিতে উদ্যত হইয়াছে। বড় বড় জাতিগুলি শিল্পের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ ও উৎপাদিত শিল্পজাত দ্রব্য অতিরিক্ত মুনাফায় বিক্রয় করিবার জন্য দুর্বল রাষ্ট্রগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন করে। ব্যবসায়-বাণিজ্য-প্রসারের উদ্দেশ্যে অথবা খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারের অজুহাতে ইয়ুরোপীয় জাতিসমূহ এশিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি মহাদেশের বহু ক্ষুদ্র জাতির স্বাধীনতা হরণ করিয়া বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। অনেক সময় এই উপনিবেশ খুঁজিতে গিয়া দুই বা ততোধিক বৃহৎ জাতির মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ বিদ্বেষমূলক ও আক্রমাণত্মক জাতীয়তাবোধের জন্য প্রত্যেক জাতীয় রাষ্ট্রকে সর্বদা প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের সহিত অথবা বিজিত জাতিগুলির সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। সেজন্য বিরাট সামরিক বাহিনী ও রণসম্ভার রাখা প্রয়োজন; কিন্তু ইহার ফলে আন্তর্জাতিক অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়ায় যে, সামান্য কোন কারণেই জাতিগুলির মধ্যে বিধ্বংসী যুদ্ধ বাধিয়া যায়। বড় বড় রাষ্ট্রগুলির সংকীর্ণ ও স্বার্থপ্রণোদিত জাতীয়তাবাদের

পরিণামে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তাহাতে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির অস্তিত্ব বিপদাপন্ন হয়। স্বার্থের এই হানাহানির কি ভীষণ পরিণাম, বিগত দুইটি মহাসমর তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। অধুনা আবার কয়েকটি বৃহৎ বিত্তশালী রাষ্ট্র অর্থসাহায্য দিয়া দুর্বল রাষ্ট্রগুলির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইতেছে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি যদি অর্থনৈতিক ব্যাপারে বৃহৎ রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হয়, তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত এই অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা তাহাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্রের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করিতে পারে।

জাতীয়তাবাদ একটা মহান্ আদর্শ। এই আদর্শ প্রত্যেক জাতিকেই প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করে। ইহার মূলনীতি হইল—আপনি বাঁচ ও অন্যকে বাঁচিতে দাও। কিন্তু আদর্শভ্রষ্ট জাতীয়তাবাদ একটা সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক এবং যখন এই জাতীয়তাবাদ ইহার মহান্ আদর্শভ্রষ্ট হইয়া আক্রমণাত্মক হইয়া উঠে তখন ইহা যুদ্ধবাদে পরিণত হয় আর যুদ্ধবাদ সাম্রাজ্যবাদেরই জন্মদাতা।

সাম্রাজ্যবাদ—Imperialism

আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদ হইতে সাম্রাজ্যবাদের উৎপত্তি হয়। যখন কোন শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্র বলপূর্বক দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে গ্রাস করিয়া তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে ও নানাভাবে এই দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে স্বীয় স্বার্থসাধনের জন্য শোষণ করে, তখনই সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুদয় হয়। বিজিত রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া তাহাদের ঐতিহ্য, কৃষ্টি, শিক্ষাদীক্ষা, ও কৃষি, শিল্পবাণিজ্য বিজেতাগণ তাহাদের ইচ্ছানুসারে নিয়ন্ত্রিত করে। সাম্রাজ্য ব্যাপিয়া একই শাসনব্যবস্থা ও একই আইন বলবৎ করা হয়। ইংলণ্ড, জার্মানি, ইতালি, জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি এমন কি ক্ষুদ্রকায় ও অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তিশালী রাষ্ট্র বেলজিয়াম ও হলাণ্ড পররাজ্য গ্রাস করিয়া সাম্রাজ্যবাদের প্রসার করিতে দ্বিধা করে নাই।

সাম্রাজ্যবাদীরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাহাদের এই লুণ্ঠনকার্য সমর্থনের অভিপ্রায়ে অনেক দার্শনিক তত্ত্বেরও অবতারণা করিয়া থাকে। তাহারা বলে যে, দুর্বল ও অক্ষম জাতিগুলির পক্ষে তাহাদের নিজেদের অগ্রগতির জন্য সবল ও বুদ্ধিমান্ জাতির সংস্পর্শে আসা উচিত বা সভ্য জাতিগুলি অনগ্রসর জাতিগুলিকে সভ্যতার

উচ্চস্তরে পঁহুছিয়া দিবার জন্য তাহাদের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং সভ্য জাতিগুলি নিঃস্বার্থে এই গুরুভার বহন করিতেছে।

সাম্রাজ্যবাদের পিছনে যে-কোন দার্শনিক তত্ত্বই থাকুক না কেন, সাম্রাজ্যবাদ যে একটা সর্বনাশা প্রলয়ংকর শক্তি ইহা আজ অবিসংবাদী সত্যরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠে, মানবসভ্যতা ও প্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত করিয়া সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর সভ্যতার পক্ষে বিপদস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। তাই আজ পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রচলন করিয়া সাম্রাজ্যবাদের কঠোরতা হয়ত কিছু প্রশমিত করা যায়। এই ব্যবস্থা দ্বারা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত উপনিবেশগুলিতে স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা চালু করিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলি তাহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী অন্ততঃ কিছু পরিমাণে নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

আন্তর্জাতিকতা—Internationalism

আন্তর্জাতিকতা শুধু একটা রাষ্ট্রনৈতিক অনুভূতির ব্যাপার নহে, ইহার একটা আধ্যাত্মিক তাৎপর্যও আছে। এই অনুভূতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে দেশ-কাল-পাত্র প্রভৃতি ক্ষুদ্র গণ্ডির বন্ধন ছিন্ন করিয়া মানুষ বিশ্বমানবতার স্তরে উপনীত হইতে পারে। আত্মপ্রীতি ও আত্মপ্রত্যয় মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ, কিন্তু পরবিদ্বেষ ও অবিশ্বাসের মনোভাব পোষণ করা দূষণীয়। স্বার্থসম্বন্ধে তৎপর হওয়া মানুষের ধর্ম কিন্তু স্বার্থপরতা সর্বদা পরিত্যাজ্য। ব্যক্তিগত জীবনে যদি এই নীতি প্রযোজ্য হয়, তাহা হইলে জাতীয় জীবনেও ইহার প্রয়োগ অস্বীকার করা যায় না। জাতীয় জীবনে এই নীতি কার্যকরী হইলে আন্তর্জাতিক বিদ্বেষ ও আন্তর্জাতিক কলহের আর সম্ভাবনা থাকে না। স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীভাব—এই মহান্ আদর্শ কোন জাতিবিশেষের জন্য রচিত হয় নাই, পরন্তু ইহা সর্বজাতির আদর্শ—এই মনোভাবের উদয় হইলে আন্তর্জাতিকতা প্রতিষ্ঠা করা সহজসাধ্য হয়। আন্তর্জাতিকতার প্রধান উদ্দেশ্য হইল, প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতিকে তাহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার সুযোগ দিয়া পরস্পরের মধ্যে আদর্শগত ও কৃষ্টিগত ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব করিয়া বিশ্বমৈত্রী প্রতিষ্ঠা করা। প্রত্যেক জাতি যদি তাহার জাতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পারে, তাহা হইলে

আন্তর্জাতিক বিদ্বেষ ও বিবাদের অবসান ঘটিবে। আন্তর্জাতিক নীতিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক আইন বর্তমান যুগে রাষ্ট্রগুলিকে নানাভাবে পরস্পরের সংস্পর্শে আনিয়া আন্তর্জাতিকতা-সৃষ্টির সহায়তা করিতেছে। আন্তর্জাতিকতা-বৃদ্ধির পথে একমাত্র অন্তরায় হইল রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির চলিত ভ্রান্ত ধারণা। রাষ্ট্রের এই সার্বভৌম শক্তির প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করে রাষ্ট্রের কতকগুলি মহান্ কর্তব্য পালনের উপর। রাষ্ট্রের এই কর্তব্য হইল আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া মানুষের সর্বাত্মক অগ্রগতিতে সাহায্য করা। যে সার্বভৌম শক্তির বলে রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃংখলার রক্ষক বলিয়া পরিগণিত হয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধবাদের দ্বারা বিশ্বশান্তি-বিনাশে সেই সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ হইতে পারে না—মানুষ যেদিন এই সত্য সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবে সেদিন জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জতিকতার মধ্যে কোনরূপ বিরোধ থাকিবে না—'দিবে আর নিবে মিলিবে মিলাবে'—এই নীতির দ্বারাই জাতীয় জীবন পরিচালিত হইবে। পারস্পরিক সদিচ্ছা ও সহযোগিতার উপর আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। বর্তমান জগতে এই নৈতিক মনোভাবের উদয় না হইলে পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তি স্থাপন করা সম্ভব নয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ—United Nations

মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে আন্তর্জাতিকতা হইল শ্রেষ্ঠ আদর্শ। এই আদর্শ প্রত্যেক জাতিকে তাহার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া বন্ধুত্বের সহিত অপরাপর জাতির সহিত বাস করিবার শিক্ষা দেয়। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সদিচ্ছার উপর এই আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি। লীগ্ অব্ নেশন্‌স ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংগঠনের দ্বারা জাতিসমূহ এই আদর্শে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতেছে।

পারস্পরিক সহযোগিতা যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতির পক্ষে অপরিহার্য, এই সত্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর অনেক জাতি বুঝিতে পারিয়া লীগ্ অব্ নেশন্‌সের প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের গঠনগত ও প্রকৃতিগত ত্রুটি থাকায় ইহা সম্পূর্ণরূপে ইহার উদ্দেশ্যসাধন করিতে পারে নাই। কয়েক বৎসর আংশিক সাফল্যের সহিত কাজ করিবার পর ইতালির সহিত আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময় এই প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা বিশেষরূপে প্রকাশ পায় ও ইহার নিষ্ক্রিয়তার ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শীঘ্রই আরম্ভ হইয়া ইহার ব্যর্থতা প্রমাণিত করে।

উদ্দেশ্য—Objectives

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহতা আরও ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। যুদ্ধে লিপ্ত জাতিগুলি ও নিরপেক্ষ জাতিগুলি এবার বুঝিতে পারিল যে, একটা আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ গঠন করিয়া তাহার মাধ্যমে এই সর্বনাশা যুদ্ধব্যবসায় বন্ধ করিতে না পারিলে মানুষের আর পরিত্রাণের পথ নাই। তাই যুদ্ধকালীন অবস্থায় যুদ্ধরত জাতিগুলির মধ্যে যুদ্ধশেষে একটি আন্তর্জাতিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার ইচ্ছা তীব্র হইয়া উঠে। প্রধানতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের চেষ্টায় এবং বৃটিশ ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রধানদ্বয়ের সহযোগিতায় এই আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) নামে গঠিত হয়। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের গঠন-ব্যাপারে বিজিত জাতিগুলির কোনপ্রকার প্রভাব ছিল না।

লীগ্ অব্ নেশন্সের ন্যায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এক মহান্ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হইল শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং নানাভাবে জাতিপুঞ্জের সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। ইহা ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন দেশের জনগণের মৌলিক অধিকার, তাহার মর্যাদা এবং মূল্য-সংরক্ষণ, জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিবিধান সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। জাতিপুঞ্জের সনদের ভূমিকায় ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল জাতির সমানাধিকার স্বীকৃত হইয়া যাহাতে সকল জাতি পরস্পরের সহিত বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশীর ন্যায় বাস করিতে পারে তাহার জন্যও জাতিপুঞ্জ সংকল্প করিয়াছে। সংকল্প কার্যে পরিণত হইলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত। যাটটি রাষ্ট্র লইয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত। বর্তমানে ইহার মোট সদস্য সংখ্যা হইল ৯৯। ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জন্ম হয়।

সংগঠন—Organisation

সাধারণ সভা (General Assembly), স্বস্তিপরিষদ্ (Security Council), আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice), অছি পরিষদ (Trusteeship Council), দপ্তরখানা (Secretariat) এবং আরও কতকগুলি শাখাসমিতি লইয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত।

সাধারণ সভা—General Assembly

প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের পাঁচজন প্রতিনিধি সাধারণ সভায় যোগদান করিতে পারে, কিন্তু কোন রাষ্ট্রের একটির বেশী ভোট দিবার ক্ষমতা নাই। আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের আলোচনা করা ও সেই সম্পর্কে সুপারিশ করা এই সভার প্রধান কার্য। ইহা ছাড়া, এই সভা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারে। এই সভার বৎসরে একটিমাত্র অধিবেশন বসে তবে বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ অধিবেশন বসিতে পারে।

নিরাপত্তা বা স্বস্তি পরিষদ—Security Council

পাঁচজন স্থায়ী (জাতীয় চীন, ফ্রান্স, সোভিয়েত রাশিয়া, গ্রেট বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) সদস্য ও দুই বৎসরের জন্য সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত দশজন—মোট পনের জন সদস্য লইয়া স্বস্তি পরিষদ গঠিত। এই পরিষদের প্রধান কার্য হইল শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক কলহের সমাধান করা। বিশ্বশান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে এই পরিষদ আন্তর্জাতিক বিবাদ সম্পর্কে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিতে পারে। ১। যে-কোন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে পারে, ২। বিরোধী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আলাপ-আলোচনার দ্বারা বিবাদের মীমাংসা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারে, ৩। মধ্যস্থতার দ্বারা মীমাংসা করিতে পারে, ৪। সালিশী ব্যবস্থার সুপারিশ করিতে পারে, অথবা ৫। স্বস্তি পরিষদ নিজে মীমাংসা করিতে পারে। শান্তিপূর্ণ উপায় ব্যর্থ হইলে এই পরিষদের বলপ্রয়োগ দ্বারা শান্তি-স্থাপনের ক্ষমতা আছে। এই পরিষদের যে-কোন সিদ্ধান্ত পরিষদের স্থায়ী পাঁচজন সদস্যের একজনের অসম্মতিতে বলবৎ করা যায় না।

কর্মসংস্থা—Secretariat

একজন প্রধানসচিবের অধীনে আটটি বিভাগ দ্বারা দপ্তরখানার কার্য পরিচালিত হয়। প্রধানসচিব স্বস্তিপরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হন।

আন্তর্জাতিক বিচারালয়—International Court of Justice

আন্তর্জাতিক বিচারালয় হলাণ্ডের হেগ্ সহরে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত পনর জন বিচারপতিকে লইয়া এই বিচারালয় গঠিত। আন্তর্জাতিক আইন-সংক্রান্ত বিষয়গুলির মীমাংসা করা এই আদালতের প্রধান কার্য।

অছি পরিষদ—Trusteeship Council

লীগ্ অব্ নেশন্সের সময়ে অছি পরিষদের উদ্ভব হয়। কিছু পরিবর্তিত আকারে এই পরিষদ নূতনভাবে গঠিত হইয়া অনগ্রসর জাতিসমূহের তদারক করে। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যগণ, অছি-শাসনের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলি ও সাধারণ সভা কর্তৃক তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত অছি-শাসনের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলির সমান সংখ্যক সদস্য লইয়া এই পরিষদ গঠিত।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ—Economic and Social Council

জাতিগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন ধরণের সামাজিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। সাধারণ সভা এই পরিষদের মোট ২৭ জন সদস্য নির্বাচন করে। এই সভার কার্য সভার অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার দ্বারা পরিচালিত হয়। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ, বিশ্ব ব্যাংক, কৃষিসংস্থা, মানবীয় অধিকার সংস্থা প্রভৃতি হইল এইরূপ কয়েকটি সংস্থা।

গত পাঁচ-ছয় বৎসরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্যের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিকক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করিতে এই সংগঠন অনেকটা সাফল্য অর্জন করিয়াছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে ইহার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়। ভারত-পাকিস্থান বিরোধ, ইসরাইল-আরব সীমান্ত-সমস্যা, ইরাণের তৈল লইয়া বিরোধ, কোরিয়ার গৃহযুদ্ধ, ভিয়েতনামের গৃহযুদ্ধ প্রভৃতি সমস্যাগুলির স্থায়ী সমাধান সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এখনও পর্যন্ত করিতে পারে নাই। যে জাতীয় চীন সরকারের চীনের মূল ভূখণ্ডে কোন অস্তিত্ব পর্যন্ত নাই, সেই চীন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য, আর বাস্তব চীন সাধারণ-তন্ত্র সরকার ইংলণ্ড, রাশিয়া, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াও জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ হইতে বঞ্চিত আছে। জার্মানি, জাপান প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রগুলিকে প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া যে অবস্থায় রাখা হইয়াছে তাহাতে স্বভাবতই জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যের প্রতি কাহারও বিশেষ আস্থা থাকিতে পারে না। স্বস্তিপরিষদের পাঁচটি স্থায়ী পদ চারিটি শক্তিশালী রাষ্ট্র ও একটি নামসর্বস্ব তাঁবেদার রাষ্ট্র কর্তৃক অধিকৃত আছে। এই নীতি ক্ষুদ্র-বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সমানাধিকারের পরিচায়ক নহে। আণবিক শক্তি ও হাইড্রোজেন বোমা নিয়ন্ত্রণ করিতে এখনও পর্যন্ত এই সঙ্ঘ সমর্থ হয় নাই।

সংক্ষিপ্তসার

জাতীয়তাবাদ ঃ প্রকৃত জাতীয়তাবাদ একটা উচ্চ আদর্শ। এই আদর্শ মানুষকে স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করে ও মহৎ কিছু করিবার অনুপ্রেরণা জোগায়। জাতীয় সংস্কৃতির উন্নতি করিয়া এই স্বদেশপ্রেম মানুষকে বিশ্বমানবতার ভাবে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু জাতীয়তাবাদ যখন বিকৃত হয়, স্বদেশপ্রেম যখন ভিন্ন দেশের প্রতি বিদ্বেষে পর্যবসিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির জাতীয়তাবোধকে নষ্ট করিতে উদ্যত হয় তখন এই জাতীয়তাবোধ মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়। এই বিকৃত জাতীয়তাবোধ হইতে যুদ্ধবাদের উৎপত্তি হইয়া ইহা শেষ পর্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলিকে করায়ত্ত করিয়া সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়। এই সাম্রাজ্যবাদ মানব সভ্যতার পরম শত্রু। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার দ্বারা সাম্রাজ্যবাদের দোষগুলি কিছু পরিমাণে দূর করা সম্ভব।

আন্তর্জাতিকতা ঃ মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে আন্তর্জাতিকতা হইল শ্রেষ্ঠ আদর্শ। এই আদর্শ প্রত্যেক জাতিকে তাহার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া বন্ধুত্বের সহিত অপরাপর জাতির সহিত বাস করিবার শিক্ষা দেয়। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সদিচ্ছা হইল এই আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি। লীগ্ অব্ নেশন্স্ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংগঠনের দ্বারা জাতিসমূহ এই আদর্শে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতেছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলিবার কালেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার পরিকল্পনা করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি রুজ্‌ভেল্টের আগ্রহাতিশয্যে যুদ্ধ শেষে বিজেতা ও নিরপেক্ষ জাতিসমূহকে লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। জগতে স্থায়ী শান্তি স্থাপন ও আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা হইল এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য। বর্তমানে প্রায় একশত জাতি এই আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যভুক্ত।

নিম্নলিখিত বিভাগগুলি লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত :—

১। সাধারণ সভা—সদস্য জাতিসমূহ হইতে পাঁচজন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া এই সভা গঠিত হইলেও প্রত্যেক জাতির একটি মাত্র ভোট আছে।

২। স্বস্তি পরিষদ—পাঁচজন স্থায়ী ও দশজন অস্থায়ী—মোট পনের জন সদস্য লইয়া এই পরিষদ গঠিত। এই পরিষদই হইল জাতিপুঞ্জের শাসন-বিভাগ।

কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইলে সমস্ত স্থায়ী সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন।

৩। অছি পরিষদ—আত্ম-নির্ধারণের অধিকারহীন জাতিসমূহের শাসন ব্যাপারে এই পরিষদ তত্ত্বাবধায়কের কাজ করে।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. What is nationalism? Is nationalism opposed to internationalism?
জাতীয়তা কাহাকে বলে? জাতীয়তা কি আন্তর্জাতিকতার বিরোধী?

উঃ—একদল লোকের মধ্যে যদি ঐক্যবোধ থাকে তাহা হইলে এই ঐক্যবোধ হইতে জাতীয়তার জন্ম হয়। যখন একদল লোক কুলগত, ভাষাগত, ধর্মগত বা সংস্কৃতিগত ঐক্য দ্বারা একতাবদ্ধ হয়, তখনই জাতীয়তাবাদের উন্মেষ দেখা যায়। কিন্তু জাতীয়তাবাদ একটা মানসিক অনুভূতির ফল। ইহা বাহ্যিক ঐক্য অর্থাৎ কুলগত, ভাষাগত বা ধর্মগত ঐক্য অপেক্ষা ভাবগত ঐক্যের উপর বেশী নির্ভর করে। যখন কোন নির্দিষ্ট জনসমষ্টি এই ভাবগত ঐক্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নিজেদের অন্য সকল জনসমষ্টি হইতে পৃথক মনে করে তখন তাহারা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবী করে। কারণ, এই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মাধ্যমেই তাহারা তাহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখিয়া নানা বিষয়ে আত্মোন্নতি করিতে পারে। তাই প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতি তাহাদের ভাষা, ধর্ম, রীতিনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতিকে শ্রদ্ধা করিতে শিখে। জাতীয়তাবাদের অর্থ হইল স্বদেশানুরাগ অর্থাৎ স্বদেশের প্রতি ভালবাসা এবং স্বদেশবাসীর প্রতি অনুরাগ।

কিন্তু স্বদেশের প্রতি এই ভক্তি ও অনুরাগ যখন বিদেশের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষে পর্যবসিত হয়, তখন জাতীয়তাবাদ বিকৃত রূপ ধারণ করে। ইহার ফলে জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ ঘটে, বিশ্বশান্তি ও সভ্যতা বাধা পায়। এই জন্যই জাতীয় ভাবের সহিত আন্তর্জাতিক ভাবের মিলন প্রয়োজন। নিজের দেশকে ভালবাসা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু অপর দেশের প্রতি ঘৃণা জাতীয়তাবোধের সহায়ক নহে। আন্তর্জাতিকতার প্রকৃত তাৎপর্য হইল সমগ্র জাতিগুলি ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া শান্তিপূর্ণভাবে পারস্পরিক আদান-প্রদানের সাহায্যে জাতীয় উন্নতি ও সামগ্রিক উন্নতি সাধন করিবে। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিতে গেলে আন্তর্জাতিকতার মূল কথা হইল—'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে'। সকল জাতিই যদি স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর পথে চলিতে থাকে তাহা হইলে এই পারস্পরিক সহযোগিতায় মানব সমাজের প্রভূত উন্নতি হইতে পারে। সুতরাং প্রকৃত জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতার মধ্যে কোন বিরোধ নাই।

2. Discuss the aims and organisation of the United Nations.
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও সংগঠন আলোচনা কর।

উঃ—যে উদ্দেশ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই একই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাসমরের পর জাতিপুঞ্জ জন্মলাভ করে। চিরতরে যুদ্ধের অবসান ঘটাইয়া বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করাই হইল এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য। শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক শান্তি ও

নিরাপত্তা রক্ষা করিতে ও নানাভাবে জাতিগুলির মধ্যে সদ্ভাব ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করিতে এই প্রতিষ্ঠান সাহায্য করে। ইহা ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন দেশের জনগণের মৌলিক অধিকার, তাহার মূল্য ও মর্যাদা সংরক্ষণ, জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিবিধান সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল জাতির সমানাধিকার স্বীকৃত হইয়া যাহাতে সকল জাতিই পরস্পরের সহিত বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশীর ন্যায় বাস করিতে পারে তাহার জন্যও জাতিপুঞ্জ সংকল্প করিয়াছে।

বর্তমানে প্রায় একশত জাতি এই সংস্থার সদস্যভুক্ত। নিম্নলিখিত বিভাগগুলি লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত:

১। সাধারণ সভা—সদস্য জাতিসমূহ হইতে পাঁচজন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া এই সভা গঠিত হইলেও প্রত্যেক জাতির একটি মাত্র ভোট আছে।

২। নিরাপত্তা বা স্বস্তি পরিষদ—পাঁচজন স্থায়ী ও দশজন অস্থায়ী মোট পনের জন সদস্য লইয়া এই পরিষদ গঠিত। এই পরিষদই হইল জাতিপুঞ্জের শাসনবিভাগ। কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইলে সমস্ত স্থায়ী সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন।

৩। অছি পরিষদ—আত্ম-নির্ধারণের অধিকারহীন জাতিসমূহের শাসনব্যাপারে এই পরিষদ তত্ত্বাবধায়কের কাজ করে।

৪। আন্তর্জাতিক আদালত—সাধারণ সভাকর্তৃক নির্বাচিত ১৫ জন বিচারপতি লইয়া এই আদালত গঠিত। আন্তর্জাতিক আইন-সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে এই আদালত মীমাংসা করে।

৫। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ—সাতাশ জন সদস্যসমন্বিত এই পরিষদ জাতিসমূহের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করে।

ইহা ছাড়াও কর্মসংস্থা, খাদ্য, স্বাস্থ্য ও শ্রমিক সম্পর্কিত বিষয়গুলির সমাধান করিবার জন্য বহু শাখা-সমিতি আছে।

8. Explain the meanings of Nation and Nationalism. [H. S. (Com.) 1965]
জাতি ও জাতীয়তার অর্থ ব্যাখ্যা কর।

উঃ—যখন একদল লোক বংশগত, ভাষাগত, ধর্মগত বা সংস্কৃতিগত ঐক্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নিজেদের অন্য সকল জনসমষ্টি হইতে পৃথক মনে করে, তখন এই জনসমষ্টিকে জাতীয় জনসমাজ বলা হয়। যখন কোন জাতীয় জনসমাজ নিজস্ব স্বাধীন জাতীয় সরকার গঠন করে বা নিজেদের এক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিবার জন্য সচেষ্ট হয়, তখন জাতীয় জনসমাজ (Nationality) জাতিতে (Nation) পরিণত হয়। উপরি-উক্ত ঐক্যবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত জনসমষ্টি যখন রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করে, তখন রাজনীতির ভাষায় তাহাদের জাতি বলা হয়।

দ্বিতীয় ভাগের উত্তরের জন্য প্রথম প্রশ্নের প্রথম ভাগের উত্তর দ্রষ্টব্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভারতের শাসন-ব্যবস্থা

(Government of India)

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র—The Federation of India

ভারতের নূতন সংবিধান ভারতকে একটি যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতে গঠিত করিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল: (১) একসঙ্গে একটি কেন্দ্রীয় সরকার ও কতকগুলি রাজ্য সরকারের পাশাপাশি অবস্থিতি, (২) ক্ষমতার বিভাগ ও বণ্টন, (৩) লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র, (৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ও (৫) রাজস্বের বণ্টন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রেও উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। আদি শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 'ক', 'খ' ও 'গ' এই তিন শ্রেণীর রাজ্য এবং 'ঘ' শ্রেণীর অঞ্চল লইয়া গঠিত হইয়াছিল। তাহার পর ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৫৬ সালে ভারত সরকার যে রাজ্য পুনর্গঠন আইন পাশ করেন, সেই আইন অনুসারে ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর হইতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র মাত্র দুই শ্রেণীর অঞ্চল লইয়া গঠিত হইয়াছে। ভাষার ভিত্তিতে বোম্বাই রাজ্য দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ফলে রাজ্য-সংখ্যা বর্তমানে ১৬টি হইয়াছে—

(ক) ১৬টি রাজ্য ও

(খ) ১০টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল।

(ক) রাজ্য—States

১। অন্ধ্রপ্রদেশ ২। আসাম
৩। বিহার ৪। গুজরাট
৫। মহারাষ্ট্র ৬। কেরল
৭। মধ্যপ্রদেশ ৮। মাদ্রাজ
৯। মহীশূর ১০। উড়িষ্যা
১১। পাঞ্জাব ১২। রাজস্থান
১৩। উত্তরপ্রদেশ ১৪। পশ্চিমবঙ্গ
১৫। জম্মু ও কাশ্মীর
১৬। নাগাভূমি

(খ) কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল—Union territories

১। দিল্লী ২। হিমাচল প্রদেশ
৩। মণিপুর ৪। ত্রিপুরা
৫। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ৬। লাক্ষাদ্বীপ মিনিকয় ও আমিনদিভ দ্বীপপুঞ্জ
৭। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল (নেফা) ৮। দাদ্রা ও নগর হেভেলি, গোয়া, দমন ও দিউ
৯। পণ্ডিচেরী

রাজ্য পুনর্গঠন আইন বলবৎ হওয়ার ফলে কেবলমাত্র জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশ, আসাম ও উড়িষ্যা ব্যতীত অন্যান্য রাজ্যগুলির আয়তন, জনসংখ্যা ও সম্পদের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে পূর্বতন বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়া জেলার কিয়দংশ ও পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গভুক্ত হইয়াছে এবং আয়তনে পূর্বতন বোম্বাই বৃহত্তম রাজ্য ও জনসংখ্যায় উত্তরপ্রদেশ বৃহত্তম রাজ্যে পরিণত হইয়াছে।

পুনর্গঠনের ফলে এক জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত ১৫টি রাজ্যে একই গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন হইয়াছে। প্রত্যেক রাজ্যেই একজন নিয়মতান্ত্রিক রাজ্যপাল, দায়িত্বশীল মন্ত্রিমণ্ডলী, একটি আইনসভা ও একটি উচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্তা দ্বারা শাসিত হইবে এবং এই অঞ্চলগুলির জন্য একমাত্র পার্লামেণ্ট সভা আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে।

অন্য নানা বিষয়ে বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থার অনুরূপ হইলেও ভারতের শাসন-ব্যবস্থা মূলতঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডার যুক্তরাষ্ট্র এই উভয়ের গঠন-পদ্ধতির সমন্বয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। ক্যানাডার মতই বৃটিশ ভারতের এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণ-পদ্ধতি দ্বারা কতকগুলি স্বায়ত্তশাসনশীল রাজ্যে বিভক্ত করা হইয়াছে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতিকে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন দেশীয় রাজ্যকে কেন্দ্রীকরণ-পদ্ধতির সাহায্যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যে পরিণত করা হইয়াছে।

ভারতের শাসনতন্ত্র লিখিত ও সাধারণভাবে এই শাসনতন্ত্রকে অনমনীয় বলা যাইতে পারে। এই শাসনতন্ত্র শাসনক্ষমতাগুলিকে ভাগ করিয়া দিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্য ও শাসনতান্ত্রিক আইনের ব্যাখ্যা করিবার জন্য একটি সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত আছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে কিছু পরিমাণ রাজস্বও ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্র হইলেও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, জরুরী অবস্থায় এই যুক্তরাষ্ট্রকে এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করা যায় এবং এই উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রের রচয়িতাগণ রাষ্ট্রপতির হস্তে বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি এই বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া রাজ্য সরকারগুলি বাতিল করিয়া শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন।

ক্ষমতা-বণ্টন—The Distribution of Powers

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সরকারের ক্ষমতাসমূহ কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে শাসনতন্ত্র কর্তৃক ভাগ করিয়া দেওয়া হয় ও প্রত্যেকটি সরকার স্বাধীনভাবে এই ক্ষমতাগুলি পরিচালনা করে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন থাকে। যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা ক্যানাডার সহিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বেশী সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় যুক্তরাষ্ট্রেই শাসনক্ষমতাগুলিকে দুই ভাগে ভাগ না করিয়া তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে এবং উভয় যুক্তরাষ্ট্রেই অনুল্লিখিত ক্ষমতা (Residuary Powers) কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিকতর ক্ষমতাশালী করা হইয়াছে। ভারতে শাসনক্ষমতাগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে; যথা, ১। যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকা (সর্বভারতীয়) (Federal or All-India List), ২। রাজ্য তালিকা (State List) ও ৩। যুগ্ম তালিকা (Concurrent List).

যুক্তরাষ্ট্রীয়-তালিকা—ভারতে ৯৭টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই তালিকার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি হইল—দেশরক্ষা, অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলা-বারুদ নির্মাণ, কূটনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্ক, রেলপথ ও বন্দর-পরিচালনা, ডাক, তার ও টেলিফোন, মুদ্রাব্যবস্থা, নাগরিকত্ব, আদমসুমারী, শিল্পনিয়ন্ত্রণ, ওজন স্থির করা, তামাক, আফিং, গাঁজা প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের উপর করস্থাপন, সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের গঠনতন্ত্র ও এলাকা বিস্তর, জাতীয় পাঠাগার, ভারতীয় যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রভৃতি জাতীয় প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ, উচ্চশিক্ষার মাননির্ণয়, আন্তঃসরকার ব্যবসায়-বাণিজ্য, ইউনিয়ন ও রাজ্য সরকারগুলির হিসাব-পরীক্ষা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালিকায় অনুল্লিখিত ক্ষমতাগুলি ইত্যাদি।

রাজ্য তালিকা—৬৬টি বিষয় লইয়া রাজ্য তালিকা গঠিত হইয়াছে। প্রধান প্রধান বিষয়গুলি হইল—শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা, সাধারণ ও রেল পুলিশ, জেলখানা, নিম্ন আদালতগুলির গঠন ও পরিচালনা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, জনস্বাস্থ্য, কৃষি, ভূমিব্যবস্থা, বনসম্পদ, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাব্যবস্থা, শিল্প, ভূমিরাজস্ব, কৃষির উপর আয়কর ইত্যাদি।

যুগ্ম তালিকা—৪৭টি বিষয় যুগ্ম তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। যুগ্ম তালিকার অর্থ হইল যে, এই বিষয়গুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার উভয়েই

আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে, কিন্তু এই উভয় সরকার-প্রণীত আইনের মধ্যে যদি বিরোধ ঘটে তাহা হইলে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইন বলবৎ হইবে। যুগ্ম তালিকাভুক্ত প্রধান প্রধান বিষয়গুলি হইল—ফৌজদারী আইন, বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ, দেউলিয়া, সম্পত্তি হস্তান্তর, খাদ্য ভেজাল, শ্রমিক-কল্যাণ, জন্মমৃত্যুর হিসাব, সংবাদপত্র, পুস্তক ও ছাপাখানা, বাস্তত্যাগীর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও বিলিব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ও সমাজ পরিকল্পনা, মূল্যনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য—Chief features of the Indian Constitution

১। ভারতের নূতন সংবিধান ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রের (Federal) ভিত্তিতে গঠিত করিয়াছে। সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

২। এই শাসনতন্ত্র বিস্তৃতভাবে লিখিত (written)। শাসনকার্য পরিচালনা করিবার প্রধান নীতি ও নিয়মগুলি ব্যতীত অন্যান্য বহু বিষয় এই শাসনতন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। আইনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতীয় শাসনতন্ত্রকে অনমনীয় (Rigid) বলা যায়, কিন্তু ইহা মার্কিন শাসনতন্ত্রের ন্যায় চূড়ান্তভাবে অনমনীয় নহে।

৪। এই শাসনতন্ত্র ভারতে মন্ত্রিসংসদ-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা (Cabinet Government) প্রবর্তন করিয়াছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী একজন শাসক-প্রধান থাকিলেও কার্যতঃ এই শাসনক্ষমতা একজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা কর্তৃক পরিচালিত হয়।

৫। ভারতে শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য (Supremacy of the Constitution) দেখা যায়। শাসনতন্ত্রই হইল সরকারের সমস্ত ক্ষমতার উৎস।

৬। নূতন শাসনতন্ত্র কর্তৃক ভারতীয়গণের এক-নাগরিকত্ব (One citizen-ship) স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতীয় নাগরিকত্ব ব্যতীত ভারতীয়গণের অন্য কোন প্রাদেশিক নাগরিকত্ব নাই।

৭। সংবিধানে ভারতীয় নাগরিকগণের কতকগুলি মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) স্বীকৃত হইয়াছে এবং বিচারালয়ের সাহায্যে এই অধিকারগুলি রক্ষা করিবার ব্যবস্থাও হইয়াছে। ইহা ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনার

ক্ষেত্রে কতকগুলি নির্দেশাত্মক নীতি (Directive Principles of State Policy) স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এই নীতিগুলি আদালতের সাহায্যে বলবৎ করা যায় না।

৮। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (Secular State) রূপে গঠিত হইয়াছে। জাতি-ধর্ম-নিরপেক্ষ এই রাষ্ট্রের সকল নাগরিকই সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকারী।

৯। এই শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারত একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্ররূপে গঠিত হইয়াছে। ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার একমাত্র উৎস হইল ভারতীয় জনগণ।

কেন্দ্রীয় সরকার—Union Government

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রি-সংসদ, পার্লামেণ্ট সভা ও সুপ্রিম কোর্ট লইয়া গঠিত।

রাষ্ট্রপতি—The President

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা একজন রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত আছে। রাষ্ট্রপতি স্বয়ং অথবা তাঁহার অধস্তন কর্মচারীর সাহায্যে শাসনক্ষমতা পরিচালিত হইবে।

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন—Election of the President

রাষ্ট্রপতি-পদে নিয়োগের জন্য পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতির ব্যবস্থা হইয়াছে।

(ক) ভারতীয় পার্লামেণ্ট সভার উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ ও (খ) রাজ্যসমূহের নিম্নপরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক একক হস্তান্তরযোগ্য গোপন ভোট দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যাহাতে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারে তদুদ্দেশ্যে এই জটিল নির্বাচন-পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে। ভারতে রাষ্ট্রপতি শাসনক্ষমতার উচ্চতম কর্তৃপক্ষ হইলেও কার্যতঃ তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুসারে শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হইবে। রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব কার্যতঃ মন্ত্রিপরিষদসহ প্রধানমন্ত্রীর উপর ন্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং জনগণ কর্তৃক রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই।

রাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন এবং তিনি পুনর্নির্বাচিত হইতে পারিবেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য শাসনতন্ত্র কর্তৃক নিম্নলিখিত যোগ্যতাগুলি স্থিরীকৃত হইয়াছে : (১) রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থীকে ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। (২) তাঁহার পঁয়ত্রিশ বৎসরাধিক বয়স হইবে। (৩) পার্লামেণ্টের নিম্নপরিষদের সদস্য হওয়ার তাঁহার যোগ্যতা থাকিবে। (৪) এরূপ ব্যক্তি কোনও লাভজনক কার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না। (৫) তিনি পার্লামেণ্ট সভা অথবা রাজ্য আইনসভার সদস্য থাকিতে পারিবেন না। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলে তিনি মাসিক দশ হাজার টাকা বেতন ও বিনা ভাড়ায় আবাসগৃহ এবং পার্লামেণ্ট দ্বারা নির্ধারিত অন্য রাহা খরচা ইত্যাদি পাইবেন। শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণের জন্য রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টের যে-কোনও কক্ষ অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে এবং অভিযোগের প্রস্তাব যদি সেই কক্ষের ⅔ সংখ্যক সদস্যের দ্বারা গৃহীত ও অন্য কক্ষের ⅔ সংখ্যক সদস্যের দ্বারা যথাযথভাবে পরীক্ষার পর গৃহীত হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা চলিবে। রাষ্ট্রপতি নিজে উপ-রাষ্ট্রপতির নিকট আবেদন দ্বারা পদত্যাগ করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তাঁহাকে সাধারণ বিচারালয়ের বিচারাধীন করা হয় নাই।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা—Powers of the President

শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর আরোপিত ক্ষমতাসমূহকে সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়, যথা—

(১) শাসন-পরিচালনার ক্ষমতা—Executive Powers

রাষ্ট্রপতি হইলেন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনকর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় অধিকর্তা এবং তাঁহার নামেই সমগ্র শাসনক্ষমতা প্রযুক্ত হয়। রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপালদের মনোনয়ন করা ব্যতীতও সুপ্রিম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণ, ভারতের অডিটর-জেনারেল ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিগণের নিয়োগ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত জরুরী অবস্থায় এবং শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হওয়ার সময় হইতে সাধারণ নির্বাচন সমাপ্তি পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালে বহুবিধ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি হইলেন সমগ্র সশস্ত্র বাহিনীর অধিকর্তা। তিনি যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তিস্থাপন করিতে পারেন।

(২) আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা—Legislative Powers

রাষ্ট্রপতি আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাষ্ট্রপতি ও আইনসভার উভয় পরিষদ লইয়া ভারতীয় পার্লামেন্ট সভা গঠিত। রাষ্ট্রপতি উভয় পরিষদ অথবা একটি পরিষদকে অধিবেশনের জন্য আহ্বান করিতে পারেন, উভয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারেন এবং লোকসভা অর্থাৎ নিম্নপরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। তিনি রাজ্যসভার ১২ জন সদস্য মনোনীত করেন। প্রত্যেক অধিবেশন আরম্ভের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতা করিতে পারেন এবং অধিবেশনে উহা আহ্বান করিবার কারণ ব্যাখ্যা করিবেন। তিনি কোন নির্দিষ্ট আইনের প্রস্তাব সম্পর্কে অথবা অন্য ব্যাপারে উভয় পরিষদের নিকট বাণী (Message) প্রেরণ করিতে পারেন।

উভয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত আইনের প্রস্তাবে রাষ্ট্রপতির সম্মতি একান্ত প্রয়োজন। অনুমোদিত আইনের প্রস্তাবে তিনি সম্মতি প্রদান করিতে পারেন অথবা সম্মতি প্রদানে বিরত থাকিতে পারেন। যে প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয় না, তাহা সংশোধিত আকারে অথবা বিনা সংশোধনে যদি উভয় পরিষদ কর্তৃক পুনরায় গৃহীত হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রস্তাব দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইলে তাঁহাকে উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিতেই হইবে। পার্লামেন্টের অবকাশকালে রাষ্ট্রপতি জরুরী আইন (Ordinance) প্রণয়ন করিতে পারেন এবং এই আইনগুলি পার্লামেন্ট-প্রণীত আইনের মত কার্যকরী হয়। কিন্তু রাষ্ট্রপতি-প্রবর্তিত জরুরী আইনগুলি পার্লামেন্ট সভার পরবর্তী অধিবেশনে উত্থাপন করিতে হইবে এবং পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হইলে পার্লামেন্টের অধিবেশনের প্রারম্ভ হইতে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই যদি পার্লামেন্ট এই জরুরী আইনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাহা হইলে জরুরী আইন আর কার্যকরী থাকিবে না।

(৩) অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা—Financial Powers

প্রত্যেক আর্থিক বৎসরে রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের নিকট যুক্ত-রাষ্ট্রীয় সরকারের সম্ভাব্য আয় এবং ব্যয়ের এক হিসাব উত্থাপন করাইবেন। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত অর্থমঞ্জুরীর কোন দাবী উত্থাপিত হইতে পারে না। নিম্নপরিষদে অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপিত করিতে গেলেও তাঁহার অনুমোদন

প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত পার্লামেণ্ট সভায় আয় এবং ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কিত কোন প্রস্তাবই গৃহীত হইতে পারে না। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে আদায়ীকৃত আয়কর বণ্টন করিয়া দেওয়া এবং পাটশুল্কের পরিবর্তে আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গকে সাহায্য প্রদান করিবার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।

(৪) বিচারবিষয়ক ক্ষমতা—Judicial Powers

সুপ্রিম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণকে নিয়োগ করা ব্যতীতও রাষ্ট্রপতির অন্য বিচারবিষয়ক ক্ষমতা আছে। দণ্ডিত ব্যক্তিকে দণ্ডপ্রাপ্তির সময়ে অথবা দণ্ডভোগকালে তিনি মার্জনা করিতে পারেন। শাস্তিভোগকালে কোন ব্যক্তিকে তিনি সাময়িকভাবে মুক্তির আদেশ দিতে পারেন। গুরুতর শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির শাস্তি লঘুতর করিবার ক্ষমতাও তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে।

(৫) জরুরী ক্ষমতা—Emergency Powers

শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর কতকগুলি জরুরী ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে। এই ক্ষমতাগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) জরুরী অবস্থার ঘোষণা—Proclamation of Emergency

শাসনতন্ত্রের ৩৫২ নং সূত্রে বলা হইয়াছে যে, কোন সময়ে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, দেশের নিরাপত্তা যুদ্ধ বা আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার জন্য বিঘ্নিত হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। উপরি-উক্ত কারণগুলি কার্যতঃ উপস্থিত না হইলেও যদি প্রত্যাসন্ন বলিয়া রাষ্ট্রপতি মনে করেন, তাহা হইলেও তিনি জরুরী অবস্থার ঘোষণা করিতে পারেন। এইরূপ ঘোষণা পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদ দ্বারা অনুমোদিত না হইলে দুই মাসের অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে না। উভয় পরিষদ কর্তৃক সমর্থিত হইলে এইরূপ জরুরী ঘোষণা দুই মাসের অধিক কাল বলবৎ থাকিতে পারে।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার ফলে শাসন-ব্যবস্থার সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধিত হয়। এই ঘোষণা বলবৎ থাকা কালে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় পর্যবসিত হয়। এই সময়ে পার্লামেণ্ট সভা রাজ্য তালিকাভুক্ত যে-কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। লোকসভার কার্যকাল একসময়ে একবৎসর বৃদ্ধি

করা যাইতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে রাজস্ব-বণ্টনের যে ব্যবস্থা আছে, জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি তাহা পরিবর্তন করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত এ অবস্থায় বাক্‌-স্বাধীনতা, সভাসমিতি করিবার স্বাধীনতা প্রভৃতি মৌলিক অধিকারগুলি হইতে নাগরিকগণকে বঞ্চিত করিবার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির উপর অর্পিত হইয়াছে। অধিকন্তু এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রপতির নির্দেশক্রমে মৌলিক অধিকারগুলিকে বিচারালয়ের সাহায্যে বলবৎ করিবার নাগরিক অধিকার স্থগিত থাকিতে পারে।

(খ) রাজ্যগুলির শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা-সংক্রান্ত ঘোষণা—Emergency arising out of the failure of the Constitutional Machinery in the State

দ্বিতীয়তঃ, যদি কোন সময়ে কোন রাজ্যের গভর্ণরের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া অথবা অন্য প্রকারে রাষ্ট্রপতি বুঝিতে পারেন যে, সেই রাজ্যে শাসন-ব্যবস্থায় অচল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়া শাসনতন্ত্র অনুযায়ী শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করা অসম্ভব হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি তদ্রূপ ঘোষণা করিতে পারেন। এইরূপ ঘোষণার দ্বারা রাষ্ট্রপতি উক্ত রাজ্যের সমুদয় শাসন-ক্ষমতা নিজহস্তে গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং সেই রাজ্যের আইন-পরিষদের ক্ষমতা পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত হইবে। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত রাজ্যের উচ্চ বিচারালয়ের ক্ষমতা কোনমতে ক্ষুণ্ণ হইবে না। এইরূপ ঘোষণা সাধারণতঃ দুই মাসের জন্য বলবৎ থাকিবে এবং পার্লামেন্টের উভয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে আরও ছয়মাস কাল বলবৎ থাকিতে পারে। কিন্তু পার্লামেন্টের অনুমোদনে ছয়মাস করিয়া ঘোষণাটির মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া তিন বৎসরের অধিক কাল পর্যন্ত ইহাকে বলবৎ রাখা চলিবে না।

(গ) অর্থ-সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা ঘোষণা—Proclamation of Financial Emergency

যদি কোন সময় রাষ্ট্রপতির ধারণা হয় যে, ভারত অথবা ভারতের কোন অংশে আর্থিক স্থায়িত্ব বা সুনাম নষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি অর্থ-সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। উপরি-উক্ত দুইটি ঘোষণার অনুরূপভাবেই এই ঘোষণাটিকেও পার্লামেন্টের উভয় পরিষদে উপস্থিত করিতে হইবে এবং এই

ঘোষণার স্থায়িত্ব প্রথমোক্ত ঘোষণার নিয়মানুযায়ী নির্ধারিত হইবে। এই ঘোষণা বলবৎ থাকা কালে রাজ্য সরকারের আয় ও ব্যয়বরাদ্দ প্রস্তাবসমূহ রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত থাকিবে ও রাজ্য সরকারগুলির সকল শ্রেণীর কর্মচারীর বেতন হ্রাস করা যাইবে।

উপ-রাষ্ট্রপতি—The Vice-President

শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী ভারত-রাষ্ট্রের একজন উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন। উপ-রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্ট সভার উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটপদ্ধতিতে গোপন ভোটে নির্বাচিত হইবেন। তাঁহার কার্যকালের স্থায়িত্ব পাঁচবৎসর কাল। উপ-রাষ্ট্রপতি-পদপ্রার্থীর প্রায় রাষ্ট্রপতি-পদপ্রার্থীর অনুরূপ যোগ্যতা থাকা চাই।

রাষ্ট্রপতির মৃত্যু ঘটিলে অথবা রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করিলে কিংবা অপসারিত হইলে, নূতন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির স্থলাভিষিক্ত হইবেন। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতির সাময়িক অবসর গ্রহণকালে অথবা অসুস্থতা-নিবন্ধন অথবা অন্য কারণে অনুপস্থিতিকালে উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির কার্য করিবেন। তিনি সাধারণতঃ রাজ্যসভার সভাপতিত্ব করেন।

মন্ত্রিপরিষদ—Council of Ministers

ভারতের রাষ্ট্রপতির হস্তে যে ব্যাপক ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে, শাসনতন্ত্র অনুসারে সে সমুদয় ক্ষমতাই প্রধানমন্ত্রিসহ মন্ত্রিপরিষদের উপদেশ ও পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত হইবে। রাষ্ট্রপতিকে শাসনকার্য-পরিচালনায় মন্ত্রিপরিষদ যে পরামর্শ বা উপদেশ দান করিবেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে কোন বিচারালয়ের নিকট দায়ী করা চলিবে না। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করিবেন। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণকে পার্লামেণ্ট সভার যে-কোন পরিষদের সদস্য হইতেই হইবে। মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইবার কালে যদি কোন মন্ত্রী পার্লামেণ্টের সদস্য না থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ছয়মাস কালের মধ্যে সদস্য নির্বাচিত হইতে হইবে; নতুবা তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে। মন্ত্রিগণের বেতন ও ভাতা পার্লামেণ্ট কর্তৃক নির্ধারিত হয়। মন্ত্রিগণ যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী।

শাসনকার্যে রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করা ও পরামর্শ দান করা হইল মন্ত্রিপরিষদের প্রধান কার্য। শাসন-সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করা এবং বিভিন্ন দপ্তরগুলির কার্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থাকে চালু রাখার দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদের হস্তে ন্যস্ত। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা কতকগুলি বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বৈদেশিক ব্যাপার ও অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যাপার-সংক্রান্ত দপ্তরের অধিকর্তা হইলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। এইরূপে প্রত্যেকটি দপ্তরের জন্য এক একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আছেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রী ব্যতীত ভারতে আরও দুই শ্রেণীর মন্ত্রী আছেন, যথা, **রাষ্ট্রমন্ত্রী** ও **উপ-মন্ত্রী**। রাষ্ট্রমন্ত্রিগণের উপর অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বসম্পন্ন দপ্তরের ভার দেওয়া হয়। কিন্তু উপ-মন্ত্রিগণ কোন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সহকারী হিসাবেই নিযুক্ত হইয়া থাকেন। বর্তমানে ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ১৫ জন কেবিনেট-মন্ত্রী, ১৭ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী ও ১৭ জন উপ-মন্ত্রী আছেন। রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণ কেবিনেট সদস্য নহেন।

মন্ত্রিগণ শুধু নির্দিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মাত্র নহেন, তাঁহারা আইন-সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং আইনসভার সদস্য হিসাবে তাঁহারা গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রস্তাবগুলি পার্লামেণ্ট সভায় উপস্থাপিত করিয়া সংখ্যাধিক্যের সমর্থনে সেগুলিকে আইনে পরিণত করেন। অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারেও মন্ত্রিপরিষদের প্রাধান্য দেখা যায়।

প্রধানমন্ত্রী—Prime Minister

ভারতের শাসনতন্ত্রে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও পরামর্শদান করিবার জন্য একজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকিবে। সুতরাং ভারতে প্রধানমন্ত্রীর পদ শাসনতান্ত্রিক আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। পার্লামেণ্ট সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাষ্ট্রপতির পক্ষে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

নূতন শাসনতন্ত্রের বিধানানুযায়ী কার্যতঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী হইলেন শাসক-প্রধান। তিনি মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি ও পরিচালক। অন্যান্য মন্ত্রিগণ প্রধান মন্ত্রীর সুপারিশক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তিনি শুধু মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি নহেন, মন্ত্রিপরিষদকে পরিচালিত করা তাঁহার অন্যতম দায়িত্ব। সহকর্মিগণকে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও যুক্তির প্রভাবে নিজের মতে আনয়ন করিতে হয়।

যদি কোন মন্ত্রী তাঁহার মত গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে পদত্যাগে বাধ্য করিতে পারেন। তিনি মন্ত্রিগণের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করিয়া থাকেন এবং বিভিন্ন দপ্তরগুলির কার্যের তদারক করা ছাড়াও তিনি নিজে একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী আইনসভারও নেতা। নেতা হিসাবে তাঁহাকে দলীয় ঐক্য ও মর্যাদা রক্ষা করিতে হয়। এজন্য তাঁহাকে জনসাধারণের সংস্পর্শে আসিয়া জনমতকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। তাঁহার প্রধানমন্ত্রিত্ব, দলীয় নেতৃত্ব প্রভৃতি তাঁহার জনপ্রিয়তার উপর নির্ভর করে। পার্লামেণ্ট সভায় তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নীতি সমর্থন করেন এবং বিরোধী দলগুলির সমালোচনার উত্তর প্রদান করেন।

রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা হইলেন প্রধানমন্ত্রী। ভারতের সংবিধান রাষ্ট্রপতির হস্তে যে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে, কার্যতঃ সে সমুদয় ক্ষমতাই প্রধানমন্ত্রীর আদর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। সুতরাং কি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-পরিচালনা, কি রাজ্যশাসন-পরিচালনা, সর্বক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রীর প্রাধান্য সূচিত হয়। এক কথায় বলা চলে যে, শিশুরাষ্ট্র ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে তাহার প্রধানমন্ত্রীর বিচারবুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা—Union Legislature

পার্লামেণ্ট—Parliament

রাষ্ট্রপতি ও দুইটি আইন পরিষদ লইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা অর্থাৎ পার্লামেণ্ট গঠিত। উচ্চ পরিষদকে রাজ্যসভা ও নিম্নপরিষদকে লোকসভা বলা হয়।

রাজ্যসভা—Council of States

রাজ্যসভা অনধিক ২৫০ জন সদস্য লইয়া গঠিত হয়। তন্মধ্যে ১২ জন সদস্যকে রাষ্ট্রপতি সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, সমাজসেবক বা বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মনোনীত করেন। রাজ্যসভার সদস্যগণ প্রত্যেক রাজ্যের নিম্নকক্ষের সদস্যগণ কর্তৃক একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব-পদ্ধতিতে পরোক্ষে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে ও ১৯৫১

সালের আদম স্থমারী অনুসারে লোকবৃদ্ধির ফলে রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যা ২০৬ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৩৮ হইয়াছে। রাজ্যসভার এই ২৩৮ জন নির্বাচিত সদস্য নিম্নলিখিত হারে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে বণ্টন করা হইয়াছে।

রাজ্য	রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যা	কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল	রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যা
১। অন্ধ্র প্রদেশ …	১৮	১। দিল্লী …	৩
২। আসাম …	৭	২। হিমাচল প্রদেশ …	২
৩। বিহার …	২২	৩। মণিপুর …	১
৪। গুজরাট …	১১	৪। ত্রিপুরা …	১
৫। মহারাষ্ট্র …	১৯	৫। পণ্ডিচেরি …	১
৬। কেরল …	৯		
৭। মধ্যপ্রদেশ …	১৬		৮
৮। মাদ্রাজ …	১৮		
৯। মহীশূর …	১২	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত	১২
১০। উড়িষ্যা …	১০		
১১। পাঞ্জাব …	১১	মোট সদস্য	২৩৮
১২। রাজস্থান …	১০		
১৩। উত্তরপ্রদেশ …	৩৪		
১৪। পশ্চিমবঙ্গ …	১৬		
১৫। জম্মু ও কাশ্মীর …	৪		
১৬। নাগাভূমি …	১		
	২১৮		

রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হইতে হইলে প্রার্থীকে অন্ততঃ ৩০ বৎসর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক হইতে হয়। রাজ্যসভা স্থায়ী পরিষদ। রাষ্ট্রপতি ইহাকে ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন না। প্রত্যেক দুই বৎসর অন্তর এই সভার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের অবসর গ্রহণ করিতে হয়। ভারতে উচ্চ পরিষদের সদস্যগণ জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উচ্চ পরিষদে ১২ জন সদস্য মনোনীত করিবার ব্যবস্থা আছে। উপ-রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার সভাপতিত্ব করেন।

লোকসভা—House of the People

অনধিক ৫০০ সংখ্যক সদস্য লইয়া নিম্নপরিষদ গঠিত হয়। রাজ্যগুলির ভোটদাতৃগণ প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সদস্য নির্বাচন করেন। প্রত্যেক ৫ লক্ষে অনূ্যন একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, ইংলণ্ডে প্রত্যেক সত্তর হাজার লোকের জন্য একজন প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা আছে, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি তিন লক্ষ আঠার হাজার লোকের জন্য একজন প্রতিনিধির ব্যবস্থা আছে।

লোকসভার প্রতিনিধির যোগ্যতা হইল যে, তাঁহাকে অন্ততঃপক্ষে ২৫ বৎসর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে বর্তমান লোকসভার সদস্যসংখ্যা হইল ৫১০। ইহার মধ্যে পার্লামেণ্ট সভা-নির্ধারিত পদ্ধতিতে কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল হইতে অনধিক ২৩ জন সদস্য নিযুক্ত হইবে।

রাজ্য নির্বাচিত	লোকসভার সদস্য সংখ্যা	রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সদস্য সংখ্যা	
১। অন্ধ্র প্রদেশ ...	৪৩	১। জম্মু ও কাশ্মীর ...	৬
২। আসাম ...	১২	২। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	১
৩। বিহার ...	৫৩	৩। লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ ...	১
৪। গুজরাট ...	২২	৪। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল ...	১
৫। মহারাষ্ট্র ...	৪৪	৫। নাগা তুয়েনসাং অঞ্চল ...	১
৬। কেরল ...	১৮	৬। ইঙ্গ-ভারতীয় ...	২
৭। মধ্যপ্রদেশ ...	৩৬	৭। দাদ্রা ও নগর হেভেলি ...	১
৮। মাদ্রাজ ...	৪১		
৯। মহীশূর ...	২৬		১৩
১০। উড়িষ্যা ...	২০		
১১। পাঞ্জাব ...	২২		
১২। রাজস্থান ...	২২		
১৩। উত্তরপ্রদেশ ...	৮৬		
১৪। পশ্চিমবঙ্গ ...	৩৬		

কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল

১। দিল্লী	...	৫	
২। হিমাচল প্রদেশ	...	৪	৪৯৭ (নির্বাচিত) + ১৩ (মনোনীত)
৩। মণিপুর	...	২	= মোট ৫১০
৪। ত্রিপুরা	...	২	
৫। গোয়া, দমন, দিউ	...	২	
৬। পণ্ডিচেরি	...	১	
মোট নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা		৪৯৭	

লোকসভার আসনসংখ্যা উপরিলিখিত হারে বিভিন্ন রাজ্যাগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৯৬২ সালে সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে ভারতের দ্বিতীয় বার যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি লোকসভায় নিম্নলিখিত আসনসংখ্যা লাভ করিয়াছে।

কংগ্রেস দল	—৩৬১ আসন
সাম্যবাদী দল	—২৯ „
পি. এস. পি. দল	—১২ „
সোসালিষ্ট দল	— ৬ „
জনসংঘ দল	—১৪ „
স্বতন্ত্র দল	—১৮ „
ফরওয়ার্ড ব্লক, হিন্দু মহাসভা, তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় প্রভৃতি অন্যান্য দল	— ২৭ „
নির্দলীয় (Independent)	—২৭ „
মোট	৪৯৪

তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় ও তপশীলভুক্ত উপজাতিদের জন্য এবং য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে। নিম্নপরিষদ সাধারণতঃ পাঁচ বৎসর স্থায়ী হইবে, তবে জরুরী অবস্থায় এই স্থিতিকাল পার্লামেণ্ট এক বৎসর বৃদ্ধি করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি পাঁচ বৎসরের পূর্বে এই সভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। লোকসভা কার্যপরিচালনার জন্য একজন সভাপতি নির্বাচন করে। ইনি **স্পীকার**

নামে পরিচিত। নির্বাচনের পর তাঁহাকে দলনিরপেক্ষ থাকিয়া সকল রাজনৈতিক দলকে আইনসভায় সমান অধিকার দিতে হয়। তিনি পার্লামেণ্ট সভার বিতর্ক পরিচালনা করেন এবং সভার নিয়ম-কানুন বলবৎ করেন। কোন বিষয়ে বৈধতার প্রশ্ন উঠিলে তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। বৃটিশ পার্লামেণ্ট সভার স্পীকারের মতই কোন প্রস্তাব অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব কিনা এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠিলে ভারতের স্পীকারও তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে পারেন।

পার্লামেণ্টের সদস্যগণের অধিকারসমূহ—Privileges of Members of Parliament

অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ভারতের পার্লামেণ্ট সভার সদস্যগণ যাহাতে যথাযথভাবে তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাদের কতকগুলি বিশেষ অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

প্রথমতঃ, তাঁহারা বাক্‌স্বাধীনতার অধিকারী। আইনসভায় বা সভার কোন কমিটিতে কোনপ্রকার মন্তব্য বা ভোটদানের জন্য তাঁহাদের কোন আদালতে অভিযুক্ত করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, সংবিধানে বলা হইয়াছে যে, পার্লামেণ্ট সভা আইন প্রণয়ন করিয়া যতদিন পর্যন্ত অধিকারসমূহ বিধিবদ্ধ না করিবে ততদিন পর্যন্ত ইংলণ্ডের কমন্স সভার সদস্যগণ যে সমস্ত অধিকার ভোগ করেন ভারতের পার্লামেণ্টের সদস্যগণও সেই সমুদয় অধিকার ভোগ করিবেন।

পার্লামেণ্ট সভার কার্য ও ক্ষমতা—Powers and Functions of Parliament

ভারতের পার্লামেণ্ট সভা যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকাভুক্ত এবং যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়ন করিতে পারে। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব ব্যতীত অন্য প্রস্তাবগুলি যে-কোন পরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে। কোন প্রস্তাব আইনে পরিণত হইতে হইলে উভয় পরিষদের সম্মতি অপরিহার্য। যদি কোন পরিষদ সম্মতিপ্রদানে বিরত থাকে এবং ছয় মাসের পরও যদি মতামত জ্ঞাপন না করে, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিবেন এবং যুক্ত অধিবেশনে অধিকাংশ ভোটে গৃহীত হইলে উহা আইনে পরিণত হইবে। উভয় পরিষদ কর্তৃক কোন প্রস্তাব গৃহীত হইলে ঐ গৃহীত প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট উপস্থাপিত হইবে। রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিলে

প্রস্তাবটি আইনে পরিণত হয়। রাষ্ট্রপতি যদি প্রস্তাবটিতে তাঁহার সম্মতি প্রদান না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সুপারিশসহ উক্ত প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার জন্য পার্লামেণ্ট সভায় প্রেরণ করিতে হয়। পার্লামেণ্ট সভা পুনর্বিবেচনা করিয়া প্রস্তাবটিকে যদি পুনরায় রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করে, তাহা হইলে এই দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি আর তাঁহার সম্মতি প্রত্যাহার করিতে পারেন না।

অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব ভিন্ন পদ্ধতিতে অনুমোদিত হয়। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব উচ্চপরিষদে উত্থাপিত হইতে পারে না। নিম্নপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে এই প্রস্তাবগুলি উচ্চপরিষদে প্রেরিত হয় এবং উচ্চপরিষদ যদি ১৪ দিনের মধ্যে তাহার মতামত জ্ঞাপন না করে, তাহা হইলে প্রস্তাবটি উচ্চপরিষদের সম্মতি ব্যতিরেকে আইনে পরিণত হইবে। এ বিষয়ে ভারতের সংবিধান বৃটেনের লর্ডসভার অনুরূপভাবেই অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলির উপর রাজ্যসভার ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কোন প্রস্তাব অর্থ-সংক্রান্ত কি না, সে সম্পর্কে স্পীকারই চূড়ান্ত মীমাংসা করিবার অধিকারী।

এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থার ঘোষণা পার্লামেণ্ট সভার অনুমোদনসাপেক্ষ। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে অথবা রাজ্যসভা কর্তৃক অথবা এক বা একাধিক রাজ্য আইনসভা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পার্লামেণ্ট সভা রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিতে পারে।

ইহা ছাড়া, পার্লামেণ্ট সভার নির্বাচিত সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতার অধিকারী। পার্লামেণ্ট সভার উভয় কক্ষের সদস্যগণ কর্তৃক উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণের জন্য পার্লামেণ্টের যে কোন কক্ষ রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিতে পারে এবং উভয় কক্ষের বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত প্রস্তাব পাস করিয়া রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করিতে পারে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা লোকসভার নিকট যৌথভাবে দায়ী। লোকসভা মন্ত্রীদের বেতন মঞ্জুর করে এবং সরকারী আয়-ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব প্রত্যাখ্যান দ্বারা অথবা মন্ত্রিসভা কর্তৃক প্রস্তাবিত খসড়া আইন না-মঞ্জুর করিয়া বা মন্ত্রিসভা-অনুসৃত নীতি প্রত্যাখ্যান করিয়া বা সরাসরি মন্ত্রিসভার উপর অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়া মন্ত্রিসভার পতন ঘটাইতে পারে।

শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্ট সভার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।

গ্রহণ করিতে হয়। নির্ধারিত দিনে বিলটি উত্থাপিত হয় এবং প্রস্তাবক আইন-সভায় নিম্নলিখিত তিনটির মধ্যে একটি প্রস্তাব করিতে পারেন: (১) পরিষদে সরাসরি বিলটির বিচার-বিবেচনা করা হউক; (২) বিলটিকে বিচার-বিবেচনার জন্য নির্দিষ্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হউক; (৩) বিলটি সম্পর্কে জনমত জানিবার জন্য উহাকে গেজেটে প্রেরণ করা হউক; যদি কোন মন্ত্রী কোন বিল উত্থাপন করেন তাহা হইলে উক্ত বিল উত্থাপনের জন্য অনুমতির প্রয়োজন হয় না। সরকারী বিল সরাসরি গেজেটে প্রকাশ করা যাইতে পারে। এই পদ্ধতিকে বিলের উত্থাপন ও প্রথম পাঠ (Introduction and First Reading) বলা হয়।

এই পর্যায়ে বিলটির নীতি-সম্পর্কে আলোচনা চলে, কিন্তু বিলটি সম্পর্কে কোন বিশদ আলোচনা চলিতে পারে না। জনমত জানিবার উদ্দেশ্যে বিলটি প্রচার করিবার সময় অতিবাহিত হইলে প্রস্তাবক পুনরায় বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করিবার জন্য প্রস্তাব করিতে পারেন।

বিলটি যদি সভার অনুমোদনক্রমে বিবেচনার্থ সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয়, তাহা হইলে এই কমিটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিলটি পরীক্ষা করে এবং বিলটিকে তাহাদের সুপারিশসহ আইনপরিষদে প্রেরণ করে। কমিটি যদি বিলটির কোন পরিবর্তন না করে, তাহা হইলে কমিটি শুধু বিলটিকে ফেরৎ পাঠায়। আইনসভায় কমিটির কোন বিবরণী পেশ করিতে হয় না। এই পর্যায়কে কমিটি পর্যায় (Committee Stage) বলা হয়।

ইহার পর বিলের উত্থাপক বিলটির দ্বিতীয় পাঠের (Second Reading) প্রস্তাব করেন। এই পর্যায়ে বিলটি সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা চলে। সদস্যগণ বিলটি সম্পর্কে সংশোধন প্রস্তাব আনিতে পারেন। অতঃপর বিলটির সম্পর্কে ভোট গ্রহণ করা হয়।

বিলটি যদি সংখ্যাধিক্যের ভোটে অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে বিলের উত্থাপক বিলটির তৃতীয় পাঠের (Third Reading) প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই পর্যায়ে মৌখিক সংশোধন প্রস্তাব ব্যতীত বিল-সম্পর্কে অন্য কোনরূপ সংশোধন প্রস্তাব করা যায় না। বিলটিকে হয় সমগ্রভাবে গ্রহণ বা সমগ্রভাবে বর্জন করা চলে।

এইরূপে একটি পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হইলে বিলটি অপর পরিষদে প্রেরিত হয়। শাসনতান্ত্রিক আইন অনুযায়ী উভয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়া আইনে পরিণত হয়।

অর্থ-সংক্রান্ত বিল—Financial Legislation

প্রতি আর্থিক বৎসরে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে অর্থমন্ত্রী পার্লামেণ্ট সভায় সরকারের বাৎসরিক আয়ব্যয়-বরাদ্দের বিবরণী (Budget) পেশ করেন। রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত করধার্য করা বা অর্থমঞ্জুরী দাবী করা যায় না। অর্থমন্ত্রী লোকসভায় বাৎসরিক আয়ব্যয়-বরাদ্দের বিবরণী পেশ করিয়া এই বিবরণী-সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। আনুমানিক ব্যয়-বরাদ্দকে বিবরণীতে দুই ভাগে ভাগ করিয়া দেখাইতে হয়। কয়েকটি নির্দিষ্ট ব্যয়ের দাবী (রাষ্ট্রপতির জন্য খরচ, লোকসভায় স্পীকার ও সহকারী স্পীকার, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণের বেতন ইত্যাদি) ব্যতীত অন্য সাধারণ দাবীও এই বিবরণীতে থাকে। নির্দিষ্ট ব্যয়ের দাবীসম্পর্কে পার্লামেণ্ট সভায় আলোচনা চলিতে পারে, কিন্তু সেগুলি সম্পর্কে সদস্যগণ ভোট প্রদান করিতে পারেন না। অন্যান্য দাবীগুলি লোকসভার অনুমোদনসাপেক্ষ। লোকসভা অনুমোদনসাপেক্ষ ব্যয়-বরাদ্দগুলিকে প্রত্যাখ্যান বা হ্রাস করিতে পারে, কিন্তু কোন ব্যয়-বরাদ্দ বৃদ্ধি করিতে পারে না বা নূতন ব্যয়ের প্রস্তাব করিতে পারে না। ব্যয়-বরাদ্দের দাবী অনুমোদিত হইলে বৃটিশ পার্লামেণ্ট-প্রচলিত প্রথানুযায়ী আর একটি বিশেষ আইন পাস করিয়া ভারতের পার্লামেণ্ট সভা শাসনকর্তৃপক্ষকে সঞ্চিত তহবিল হইতে অর্থ তুলিবার ক্ষমতা প্রদান করে।

করধার্য বা কর সংগ্রহের জন্য আইন পাশ করিতে হয়। এই প্রস্তাবগুলি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে রাজস্ব বিল (Finance Bill) আকারে আইনসভায় উত্থাপিত হয়।

শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দ বিল পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করাইতে পারেন। লোকসভার অগ্রিম এবং বিশেষ ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব পাস করিবার ক্ষমতা আছে।

আইনসভার নিকট মন্ত্রিগণের দায়িত্ব—Control of the Council of Ministers by the Legislature

বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থার মতই ভারতের মন্ত্রিপরিষদ তাঁহাদের নীতি ও কার্যের জন্য যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী। যৌথ দায়িত্বের তাৎপর্য হইল যে, পরিষদের সদস্যগণকে অকুণ্ঠভাবে সমগ্র পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত নীতি ও কার্যসূচী সমর্থন করিতে হইবে। মন্ত্রিপরিষদের অভ্যন্তরে ব্যক্তিগতভাবে হয়ত একজন

সদস্য মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের সহিত একমত না হইতে পারেন, কিন্তু পার্লামেন্টের সহিত বা জনমতের সহিত সম্পর্কে বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী মন্ত্রী তাঁহার বক্তৃতা বা ভোট দ্বারা কখনই সমগ্র মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতে পারিবেন না। আইনসভার সহিত সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদ একটি একক ও অবিভাজ্য সংস্থা হিসাবে কার্য পরিচালনা করে। আইনসভা যদি কোন একজন মন্ত্রীর কার্যে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করে অথবা কোন মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব আইনসভায় সংখ্যাধিক্যের ভোটে অনুমোদিত না হয়, তাহা হইলে এই একজন মন্ত্রীর পরাজয় সমগ্র মন্ত্রিপরিষদের পরাজয় বলিয়া বিবেচিত হয় ও মন্ত্রিপরিষদ একসঙ্গে পদত্যাগ করে।

ভারতে লোকসভার নিকট মন্ত্রিপরিষদের এই দায়িত্ব সংবিধান কর্তৃক বলবৎ করা হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদি কোন মন্ত্রী তাঁহার ব্যক্তিগত অযোগ্যতা, অসদাচরণ বা কু-শাসনের ফলে অপ্রিয় হন, তাহা হইলে এই মন্ত্রিবিশেষের ব্যক্তিগত ত্রুটির জন্য সমগ্র মন্ত্রিসভা দায়ী হইতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিমহাশয়কেই এককভাবে পদত্যাগ করিতে হয়। সংবিধান কর্তৃক দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেও গ্রেট বৃটেনের অনুরূপভাবেই ভারতেও মন্ত্রিপরিষদের প্রাধান্য দেখা যায়। কি সাধারণ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে, কি অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণের উদ্যোগেই শাসনকার্য পরিচালিত হয়। সত্য বটে যে, পার্লামেণ্ট সভার বে-সরকারী সদস্যগণও আইন-প্রণয়নের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন, কিন্তু মন্ত্রিপরিষদের সমর্থন না থাকিলে, বে-সরকারী সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব আইনে পরিণত হওয়া একান্ত দুরূহ ব্যাপার। আয়ব্যয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে আইনসভা বিশেষ করিয়া লোকসভা মন্ত্রি-পারষদের সিদ্ধান্তগুলি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু একটু প্রণিধান-পূর্বক দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, আয়-ব্যয়ের উপর লোকসভার এই নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাও নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ।

শাসন-ব্যবস্থার উপর মন্ত্রিপরিষদের এই অখণ্ড ও অবিমিশ্র আধিপত্যের মূল কারণ হইল দলীয় শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধানগণ মন্ত্রিপরিষদ গঠন করিয়া তাঁহাদের নির্ধারিত-নীতি ও কার্যসূচী আইন-সভায় তাঁহাদের সমর্থকগণের দ্বারা অনুমোদিত করিয়া লইয়া থাকেন। দলের সমর্থকগণ অধিকাংশক্ষেত্রে বিশেষ বিচার-বিবেচনা না করিয়া একরূপ অন্ধভাবেই

দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের নির্দেশ পালন করেন। ভারতে মন্ত্রিপরিষদের এ-বিষয়ে একটি বিশেষ সুবিধা আছে। আইনসভার উভয় কক্ষেই সরকারী দলের আপেক্ষিক সংখ্যাধিক্য এত অধিক যে, আইনসভায় পরাজয় বরণ করা দূরের কথা—একমাত্র মৌখিক বিরোধিতা ব্যতীত মন্ত্রিপরিষদের কোন সক্রিয় বিরোধিতার সম্মুখীন হইবার আশঙ্কাও নাই। এরূপ অবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ অনায়াসেই দলীয় সমর্থন-পুষ্ট হইয়া অবাধে তাঁহাদের কার্যসূচীকে রূপদান করিতে পারেন। দলীয় সমর্থন পাইতেও মন্ত্রিপরিষদের কোন অসুবিধা হয় না। দলীয় নিয়ম অনুযায়ী দলের কোন সমর্থক যদি দলীয় নীতি ও কার্যসূচীর বিরোধিতা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দল হইতে বহিষ্কৃত হইতে হয়। দল হইতে বহিষ্কৃত হইবার ফলে তাঁহার সদস্যপদ-চ্যুতির সম্ভাবনা থাকে। সেই সঙ্গে সদস্যপদের বেতন ও ভাতা হইতে তিনি বঞ্চিত হন। দলীয় নীতির বিরোধিতা করিলে প্রধানমন্ত্রী আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করিতে পারেন।

রাজ্য সরকার—Administration of States

বর্তমানে ১৬টি রাজ্যে একই ধরণের গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। পূর্বতন ক, খ ও গ শ্রেণীর রাজ্যগুলি বর্তমানে সমপর্যায়ভুক্ত এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত সম্পর্কেও প্রত্যেকটি রাজ্য সমান ক্ষমতার অধিকারী। প্রত্যেক রাজ্যে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শাসন-ব্যবস্থার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হইলেন একজন গভর্ণর বা নিয়মতান্ত্রিক রাজ্যপাল। রাজ্যপালকে সাহায্য ও পরাদর্শ দান করিবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে একটি মন্ত্রিপরিষদ আছে। মন্ত্রিপরিষদ তাহার কার্যের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী। প্রত্যেক রাজ্যে একটি আইনসভা আছে এবং নূতন আইন অনুসারে প্রত্যেক রাজ্যে একটি উচ্চ বিচারালয় (High Court) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শাসন কর্তৃপক্ষ—রাজ্যপাল—The Executive—The Governor

প্রত্যেক রাজ্যে একজন করিয়া রাজ্যপাল থাকেন ও তাঁহার নামে শাসনকার্য পরিচালিত হয়। রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন ও রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুযায়ী কার্যে বহাল থাকেন। তাঁহার কার্যকাল পাঁচবৎসর। রাজ্যপালকে

ভারতের নাগরিক হইতে হইবে ও অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক হওয়া চাই। তিনি আইনসভার কোন পরিষদেরই সদস্য হইতে পারেন না। তিনি বিনা খরচায় আবাসগৃহ পাইয়া থাকেন এবং তাঁহার মাসিক বেতন ৫,০০০ টাকা। এতদ্ব্যতীত তিনি অন্যান্য ভাতা পান। নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান হিসাবে রাজ্যপাল-নিয়োগ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ ও রাজ্য মন্ত্রিপরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজ্যপাল নিয়োগ করেন। এই নিয়োগ ব্যাপারে তাঁহার ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিশেষ স্থান নাই।

রাজ্যপালের নিয়োগ-পদ্ধতি—Mode of Appointment of the Governor

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যপালের নিয়োগ-সম্পর্কে অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে। প্রথমতঃ বলা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার মূলনীতি হইল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। যে স্থলে প্রাদেশিক শাসনকর্তা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন, সে স্থলে প্রাদেশিক শাসনকর্তার স্বাধীনতা অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রাদেশিক শাসনকর্তা শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি-পর্যায়ে পরিণত হন। ফলে প্রাদেশিক ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী প্রত্যেক প্রদেশের ভোটদাতৃগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ভারতের রাজ্যপালসমূহের নিয়োগ ব্যাপারে গণতান্ত্রিক আদর্শ যে অনুসৃত হয় নাই, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

উপরি-উক্ত সমালোচনার প্রত্যুত্তরে বলা হয় যে, ভারতের রাজ্যপালগণ নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণের ক্ষমতার ন্যায় ইহাদের কোন প্রকৃত ক্ষমতা নাই। ভারতের রাজ্যপালগণের শাসনতন্ত্র-প্রদত্ত ক্ষমতাগুলি রাজ্য মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারেই পরিচালিত হয় এবং এই ক্ষমতা পরিচালনার জন্য মন্ত্রিসভা আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। রাজ্যপাল-গণের আইনসভার নিকট কোন প্রকার দায়িত্ব নাই। প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ও প্রয়োগ-কর্তা হইলেন মন্ত্রিমণ্ডলী এবং মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্যবর্গ সাধারণতঃ আইন-সভার নির্বাচিত সদস্য। এরূপ ক্ষেত্রে রাজ্যপালগণের ভোটদাতৃগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবার বিশেষ কোন সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না।

রাজ্যপালের ক্ষমতা—Powers of the Governor

প্রত্যেক রাজ্যের শাসনক্ষমতা রাজ্যপালের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে এবং তাঁহার নামেই সমগ্র শাসনক্ষমতা পরিচালিত হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের মত রাজ্যশাসন ব্যাপারে পরামর্শ দিবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীসহ একটি মন্ত্রি পরিষদ আছে। রাজ্যপাল তাঁহার নিজ ইচ্ছামত যে সমস্ত কার্য করিবার অধিকার শাসনতন্ত্র হইতে পাইয়াছেন, সে সমস্ত ব্যাপারে মন্ত্রিপরিষদ তাঁহাকে কোন পরামর্শ দান করিতে পারে না। একমাত্র আসামের রাজ্যপালের উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকাগুলি সম্পর্কে দুইটি বিশেষ ক্ষমতা আছে—যাহা তিনি মন্ত্রি-পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া নিজ ইচ্ছায় প্রয়োগ করিতে পারেন। আসাম ব্যতীত অন্য কোন রাজ্যের রাজ্যপালের এরূপ নিজ ইচ্ছামত ক্ষমতাপ্রয়োগের কথা শাসনতন্ত্রের কোথাও উল্লেখ নাই।

শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা—Executive Powers

রাজ্যপাল রাজ্য-সংক্রান্ত শাসনবিভাগীয় সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী এবং এই ক্ষমতা তিনি স্বয়ং অথবা তাঁহার অধস্তন কর্মচারিবৃন্দের সাহায্যে পরিচালনা করেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ও মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রিগণকে নিযুক্ত করেন এবং মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। তিনি উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতির যোগ্যতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তিকে য়্যাড্‌ভোকেট জেনারেল পদে নিযুক্ত করেন। রাষ্ট্রপতি তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া রাজ্যের উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করেন। যে সমস্ত রাজ্যে তপশীলভুক্ত জাতি ও অনুন্নত শ্রেণী আছে, সে সমস্ত রাজ্যে এই সমস্ত অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণসাধনের বিশেষ ভার রাজ্যপালের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে এবং এইজন্য রাজ্যপাল একজন পৃথক মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে পারেন। রাজ্য-তালিকাভুক্ত সমুদয় ক্ষমতাই রাজ্যপাল পরিচালনা করেন। তবে যুগ্ম-তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর তাঁহার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে।

আইনবিষয়ক ক্ষমতা—Legislative Powers

রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ। যে সমস্ত রাজ্যের আইন-সভা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট, সেখানে উচ্চপরিষদে রাজ্যপাল কতিপয় সদস্য মনোনীত করিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ইচ্ছা করিলে য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়কে

উপযুক্ত পরিমাণ প্রতিনিধিত্ব দিবার জন্য উক্ত সম্প্রদায় হইতে কয়েকজন সদস্য বিধানসভায় মনোনীত করিতে পারেন।

রাজ্যপাল আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন, স্থগিত রাখিতে পারেন ও নিম্নপরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন, কিন্তু ইহার কার্যকাল বৃদ্ধি করিতে পারেন না। তিনি আইনসভার যে-কোন পরিষদে বা উভয় পরিষদে বক্তৃতা করিতে পারেন এবং বাণী প্রেরণ করিতে পারেন। কোন বিল আইনে পরিণত করিতে হইলে রাজ্যপালের সম্মতি অপরিহার্য। তিনি সম্মতি দান করিতে পারেন, প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন অথবা রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য তাঁহার নিকট উহা প্রেরণ করিতে পারেন। অর্থ-সংক্রান্ত বিল ব্যতীত অন্য বিলগুলিকে তিনি পুনর্বিবেচনার জন্য আইনসভায় ফেরত পাঠাইতে পারেন। রাজ্যপাল কর্তৃক পুনর্বিবেচনার জন্য প্রেরিত বিল যদি আইনসভা কর্তৃক দ্বিতীয়বার গৃহীত হয়, তাহা হইলে রাজ্যপাল উক্ত বিলে সম্মতি দিতে অস্বীকার করিতে পারেন না। আইনসভার অধিবেশন স্থগিত থাকা কালে রাজ্যপাল জরুরী আইন (Ordinance) জারী করিতে পারেন, কিন্তু যে সমস্ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রয়োজন, সে সকল ক্ষেত্রে জরুরী আইন জারী করিবার পূর্বে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করিতে হইবে। প্রত্যেকটি জরুরী আইন আইনসভায় পেশ করিতে হইবে এবং অধিবেশন আরম্ভ হইবার পর ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে তৎপূর্বেই উহা বাতিল হইবে।

রাজস্ববিষয়ক ক্ষমতা—Financial Powers

কোন অর্থবিষয়ক প্রস্তাব আইনসভায় উত্থাপন করিতে হইলে রাজ্যপালের অনুমতি প্রয়োজন। তাঁহার অনুমোদন ব্যতীত কোন ব্যয়-বরাদ্দের দাবী আইন-সভায় উত্থাপিত হইতে পারে না। রাজ্যপালের উদ্যোগেই অর্থমন্ত্রী আইনসভায় বাৎসরিক আয়ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন।

বিচারবিষয়ক ক্ষমতা—Judicial Powers

রাজ্যপাল দণ্ডদানের আদেশ সংশোধন করিতে পারেন। রাজ্য সরকারের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত ব্যাপারে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে রাজ্যপাল মার্জনা করিতে পারেন। দণ্ডকাল তিনি হ্রাস করিতে পারেন এবং দণ্ডপ্রদান স্থগিত রাখিতে পারেন। একজাতীয় দণ্ডকে অন্যজাতীয় দণ্ডে পরিবর্তিত করিবার ক্ষমতাও রাজ্যপালের আছে।

রাজ্যপালের ক্ষমতা পর্যালোচনা করিলে আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাকে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া মনে হয় এবং অনেক বিষয়ে তাঁহাকে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাজ্যপালের মত স্বৈরাচারী শাসক বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু কার্যতঃ বর্তমান রাজ্যপালগণ নিয়মতান্ত্রিক শাসক-প্রধান ব্যতীত অন্য কিছু নহেন। একমাত্র আসামের উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকা সম্পর্কিত দুইটি বিষয় ব্যতীত অন্য কোন রাজ্যের রাজ্যপালই মন্ত্রিপরিষদের সাহায্য ও পরামর্শ ব্যতীত শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারেন না। রাজ্যপালকে একদিকে মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শক্রমে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হয়, অপরদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদসহ রাষ্ট্রপতির আদেশ ও নির্দেশ অনুসারে চলিতে হয়। সুতরাং রাজ্যপালের পক্ষে স্বৈরাচারী হইবার সম্ভাবনা আদৌ নাই।

মন্ত্রিপরিষদ—Council of Ministers

রাজ্যপালকে সাহায্য ও পরামর্শ দান করিবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে মুখ্য-মন্ত্রীসহ একটি মন্ত্রিপরিষদ আছে। রাজ্যপালকে পরামর্শদান-সম্পর্কে কোন বিচারালয়ে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনীত হইতে পারে না। রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে (Chief Minister) নিযুক্ত করেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রিগণকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। মন্ত্রিগণ তাঁহার খুশীমত কার্যে বহাল থাকেন। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণকে আইনসভার সদস্য হইতে হইবে। যদি কোন মন্ত্রী আইনসভার সদস্য না হন, তাহা হইলে তাঁহার নিয়োগকাল হইতে ছয়মাসের মধ্যে তাঁহাকে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হইতে হইবে, নতুবা তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে। প্রত্যেক মন্ত্রী একটি বা একাধিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত থাকেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া ও তাঁহার নির্দেশ-ক্রমেই দপ্তরের কার্য পরিচালনা করেন। মন্ত্রিগণ তাঁহাদের নীতি ও কার্যের জন্য যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী।

কেন্দ্রীয় শাসনক্ষেত্রের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গে ও উত্তরপ্রদেশে কেবিনেট মন্ত্রী ছাড়া কয়েকজন রাষ্ট্র-মন্ত্রী ও কয়েকজন উপ-মন্ত্রী আছেন। উড়িষ্যা, বোম্বাই, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে কেবিনেট মন্ত্রী ছাড়া উপ-মন্ত্রী আছেন, কোন রাষ্ট্র-মন্ত্রী নাই।

রাজ্য আইনসভা—State Legislature

রাজ্য পুনর্গঠন আইনের ভিত্তিতে ভারতের ১৫টি রাজ্যে (জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত) একজন রাজ্যপাল এবং একটি অথবা দুইটি পরিষদ লইয়া রাজ্য আইন-সভা গঠিত হইয়াছে। বোম্বাই, মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর ও জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে দুইটি কক্ষ ও অন্যান্য রাজ্যে এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা গঠিত হইয়াছে। উচ্চপরিষদ, বিধান পরিষদ (Legislative Council) ও নিম্নপরিষদ, বিধান সভা (Legislative Assembly) নামে অভিহিত হয়। কোন রাজ্যে অবস্থিত উচ্চপরিষদ বিলোপ করা হইবে বা গঠিত হইবে তাহা স্থির করিতে হইলে সেই রাজ্যের নিম্নপরিষদের ⅔ ভোটাধিক্যে ও সমগ্র সদস্যগণের সংখ্যাধিক্যে প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হয় এবং উক্ত প্রস্তাব পার্লামেণ্ট সভা কর্তৃক ভোটাধিক্যে গৃহীত হওয়া চাই।

বিধান পরিষদ—Legislative Council

উচ্চকক্ষ অর্থাৎ বিধান পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যা নিম্নকক্ষের সদস্য সংখ্যার ¼ এর অধিক এবং ৪০ এর কম হইতে পারিবে না। পার্লামেণ্ট অন্য ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত বিধান পরিষদগুলি নিম্নলিখিতভাবে গঠিত হইবে :

১। এক-তৃতীয়াংশ সদস্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্বাচিত হইবে।

২। এক-দ্বাদশাংশ সদস্য অন্যূন তিন বৎসরের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইয়াছেন এমন ব্যক্তিদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন।

৩। এক-দ্বাদশাংশ কমপক্ষে তিন বৎসর শিক্ষকতা করিয়াছেন এমন ব্যক্তিদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন।

৪। এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নিম্নপরিষদ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন।

৫। অবশিষ্ট সদস্যগণ সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজসেবা প্রভৃতি বিষয়ে কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন।

বিধান পরিষদ স্থায়ী, তবে প্রত্যেক দুই বৎসর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য বিদায় গ্রহণ করেন। সদস্যগণ ভারতীয় নাগরিক হইবেন এবং তাঁহাদের অন্ততঃ

তিরিশ বৎসর বয়স হওয়া চাই। বিধান পরিষদের কার্য পরিচালনা করিবার জন্য সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি (Chairman) ও একজন সহ-সভাপতি (Deputy Chairman) নির্বাচন করেন।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদ ৭৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত। তন্মধ্যে ৯ জন রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত ; ৬ জন করিয়া যথাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-প্রাপ্ত ভোটদাতা ও শিক্ষকগণ কর্তৃক নির্বাচিত এবং ২৭ জন করিয়া যথাক্রমে বিধান সভা ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্বাচিত।

রাজ্য পুনর্গঠন আইন বলবৎ হওয়ার ফলে দ্বিকক্ষ-সমন্বিত রাজ্যগুলির উচ্চ-কক্ষের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে অচিরেই পার্লামেণ্ট সভায় একটি বিল উত্থাপিত হইবে। এই নূতন আইন অনুসারে রাজ্য-গুলির উচ্চকক্ষের সদস্যসংখ্যা নিম্নকক্ষের সদস্যসংখ্যা ¼ অংশের পরিবর্তে ⅓ অংশ হইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই বিলে অন্ধ্র রাজ্যের এবং জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য একটি উচ্চকক্ষ গঠন করিবার প্রস্তাবও করা হইয়াছিল।

বিধান সভা—Legislative Assembly

বিধান সভা ২১ বৎসর বয়স্ক ভোটদাতৃগণের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত সদস্য লইয়া গঠিত হয়। প্রত্যেক রাজ্যের বিধান সভার সদস্যসংখ্যা স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোন বিধান সভার সদস্যসংখ্যা ৬০এর কম বা ৫০০র অধিক হইতে পারে না। ২৫৬ জন সদস্য লইয়া পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভা গঠিত। শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হওয়ার পর দশ বৎসর পর্যন্ত তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় ও আসামের উপজাতিদের জন্য আসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে। রাজ্যপাল প্রয়োজনবোধ করিলে য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে সদস্য মনোনীত করিতে পারিবেন। এই সভার কার্যকাল ৫ বৎসর। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইলে পার্লামেণ্ট এক বৎসর পর্যন্ত ইহার কার্যকাল বৃদ্ধি করিতে পারে। অপরপক্ষে আবার ইহার কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বে ইহাকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিধান সভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন করেন।

১৯৬২ সালের আইন অনুসারে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলির আইনসভা নিম্নলিখিতভাবে গঠিত হইয়াছে।

বিভিন্ন রাজ্যের আইনসভা

রাজ্য	বিধান পরিষদ	বিধান সভা
১। অন্ধ্র প্রদেশ	৯০	৩০০
২। আসাম	×	১০৫
৩। বিহার	৯৬	৩১৮
৪। গুজরাত	×	১৫৪
৫। মহারাষ্ট্র	৭৮	২৬৪
৬। কেরল	×	১২৬
৭। মধ্যপ্রদেশ	৯০	২৮৮
৮। মাদ্রাজ	৬৩	২০৭
৯। মহীশূর	৬৩	২০৮
১০। উড়িষ্যা	×	১৪০
১১। পাঞ্জাব	৫১	১৫৪
১২। রাজস্থান	×	১৭৬
১৩। উত্তরপ্রদেশ	১০৮	৪৩০
১৪। পশ্চিমবঙ্গ	৭৫	২৫২
১৫। জম্মু ও কাশ্মীর	৩৬	৭৫
১৬। নাগাভূমি	×	৪৬

কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের স্থানীয় সভা—Territorial Councils

১। হিমাচল প্রদেশ—৪১
২। মণিপুর— ৩০
৩। ত্রিপুরা— ৩০
৪। গোয়া, দমন, দিউ—৩০
৫। পণ্ডিচেরী—৩৯

রাজ্য আইনসভার ক্ষমতা ও কার্য—Powers and Functions of the State Legislatures

রাজ্যের আইনসভা রাজ্য তালিকাভুক্ত ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রাজ্য আইনসভাগুলির এই আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা পার্লামেন্টের বিশেষ ক্ষমতার দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে রাজ্য আইনসভা কর্তৃক প্রণীত

আইন যদি পার্লামেন্ট-প্রণীত আইনের বিরোধী হয়, তাহা হইলে রাজ্য আইন বাতিল হইবে।

কোন বিল আইনে পরিণত হইতে হইলে উভয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। তবে উচ্চপরিষদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উচ্চ পরিষদ তিনমাস পর্যন্ত নিম্নপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত বিলে সম্মতিজ্ঞাপন না করিতে পারে। উক্ত বিল যদি দ্বিতীয়বার নিম্নপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়, তাহা হইলে উচ্চ পরিষদ উক্ত বিলে একমাস পর্যন্ত সম্মতি না দিতে পারে। কিন্তু একমাস অতীত হইলে উক্ত বিল নিম্নপরিষদ কর্তৃক যে আকারে গৃহীত হয়, ঠিক সেই আকারে আইনে পরিণত হয়।

অর্থ-সংক্রান্ত বিল সম্পর্কেও নিম্নপরিষদের প্রাধান্য সূচিত হয়। অর্থ-সংক্রান্ত বিলে উচ্চপরিষদ তাহার অভিমত জ্ঞাপন করিতে পারে, কিন্তু নিম্নপরিষদ তাহা গ্রহণ বা বর্জন করিতে পারে। উচ্চপরিষদ যদি ১৪ দিনের মধ্যে অর্থ-সংক্রান্ত বিল প্রেরণ না করে, তাহা হইলে নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইবার পর উহা আইনে পরিণত হয়। মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে নিম্নপরিষদের নিকট দায়ী।

রাজ্য আইনসভা-সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের ক্ষমতার কথা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতির ন্যায় রাজ্যপালও আইন-প্রণয়নে সম্মতি দিতে পারেন, অথবা প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, অথবা পুনর্বিবেচনার জন্য আইন-সভায় ফেরত পাঠাইতে পারেন কিংবা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য পাঠাইতে পারেন। কিন্তু রাজ্যপাল কর্তৃক পুনর্বিবেচনার জন্য প্রেরিত বিল যদি আইনসভা কর্তৃক বিনা সংশোধনে অথবা সংশোধিত আকারে গৃহীত হইয়া রাজ্যপালের নিকট দ্বিতীয়বার উপস্থাপিত হয়, তাহা হইলে উক্ত বিল হইতে তিনি সম্মতি প্রত্যাহার করিতে পারেন না।

জম্মু ও কাশ্মীরের অবস্থা—Status of Jammu and Kashmir

জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের একটি রাজ্য হইলেও অন্যান্য রাজ্যগুলি হইতে এই রাজ্যের কিছু পার্থক্য দেখা যায়। শুধু জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে শাসক-প্রধানকে 'সদর-ই-রিয়াসত' বলা হয়। তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের গণপরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হন। এইরূপ নির্বাচিত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি 'সদর-ই-রিয়াসৎ' বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবেন। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের পৃথক জাতীয় পতাকা থাকিবে, তবে

ভারতীয় জাতীয় পতাকাও সমান সম্মান পাইবে। রাষ্ট্রপতির জরুরী ঘোষণা যদি জম্মু ও কাশ্মীরে প্রযোজ্য হয়, তাহা হইলে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিবার পূর্বে উক্ত রাজ্যের সম্মতির প্রয়োজন হইবে। ভারতীয় নাগরিকত্বের নিয়ম-কানুন উক্ত রাজ্যে প্রযোজ্য হইলেও সেখানকার রাজ্যসরকার ঐ বিষয়ে নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করিতে পারিবেন।

কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থা—Administration of Union Territories

কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের জন্য কোনরূপ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় নাই। এই অঞ্চলগুলি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্তা দ্বারা শাসিত হইবে এবং এই অঞ্চলগুলির জন্য একমাত্র পার্লামেণ্ট সভা আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। ১৯৫৬ সালের শেষভাগে একটি নূতন আইন পাস করিয়া হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা এই তিনটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের জন্য স্থানীয় সভা (Territorial Council) গঠন করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে জনগণ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া এই সভাগুলি গঠিত হইবে। হিমাচল অঞ্চলের সভা ৪১ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে এবং ইহার মধ্যে বারোটি আসন তপশীলী শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। মণিপুর ও ত্রিপুরার স্থানীয় সভাগুলিতে ৩০ জন সদস্য থাকিবে। কেন্দ্রীয় সরকার এই সভাগুলিতে ৪ জন পর্যন্ত সদস্য মনোনীত করিতে পারিবেন। এই সভাগুলি স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে ব্যবস্থা করিতে পারিবে। স্থানীয় সমস্যা সমাধান করিবার উদ্দেশ্যে দিল্লীতে একটি কর্পোরেশন গঠন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে বিভিন্ন রাজ্যের আইনসভার গঠনেও কেন্দ্রীয় আইনসভায় এই রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্বের বিষয় যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা ও রাজ্য আইনসভার অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করা হইয়াছে।

আঞ্চলিক পরামর্শ-সভা—Zonal Councils

রাজ্য পুনর্গঠন আইন অনুসারে সমগ্র ভারতকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটি অঞ্চলের জন্য একটি আঞ্চলিক পরামর্শ-সভা গঠন করা হইয়াছে। অঞ্চলগুলি হইল :—

১। উত্তর অঞ্চল—পাঞ্জাব, রাজস্থান, জম্মু ও কাশ্মীর, দিল্লী ও হিমাচল প্রদেশ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত।

২। মধ্য-অঞ্চল—উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত।

৩। পূর্ব-অঞ্চল—এই অঞ্চল বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, আসাম ও কেন্দ্র-শাসিত মণিপুর ও ত্রিপুরা লইয়া গঠিত।

৪। পশ্চিম অঞ্চল—বোম্বাই ও মহীশূর হইল এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

৫। দক্ষিণ অঞ্চল—অন্ধ্র, কেরল ও মাদ্রাজ লইয়া এই অঞ্চল গঠিত।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একজন সদস্য, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রত্যেকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও আরও কতিপয় সদস্য লইয়া পরামর্শ-সভা গঠিত হইয়াছে। রাজ্যগুলির সাধারণ স্বার্থ-সম্পর্কিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা ও সুপারিশ করা হইল পরামর্শ-সভাগুলির প্রধান কার্য।

শাসনতন্ত্র সংশোধনের পদ্ধতি—Methods of Amendment of the Constitution

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় লিখিত ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হয়। ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার আধিক্য থাকিলেও শাসন-ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শে গঠিত হইয়াছে। সুতরাং ভারতের শাসনতন্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের মত অত্যধিক অনমনীয় না হইলেও ইহাকে অনমনীয় পর্যায়ভুক্ত করা যায়।

১। সাধারণতঃ, শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিতে হইলে একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। প্রত্যেক সংশোধন প্রস্তাব একটি বিলের আকারে পার্লামেন্টের যে-কোন পরিষদে উত্থাপন করিতে হইবে। এইরূপ উত্থাপিত সংশোধন বিল প্রত্যেক পরিষদে উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটাধিক্যে এবং সমগ্র সদস্যের সংখ্যাধিক্যের ভোটে গৃহীত হওয়া চাই। আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত সংশোধন বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়া সংশোধিত আইনে পরিণত হয়।

২। কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ে সংশোধন বিল আইনে পরিণত করিতে হইলে পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত প্রথম তপশীলভুক্ত 'ক' ও 'খ' ভাগে বর্ণিত রাজ্য আইনসভাগুলির অর্ধেক কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। এই বিষয়গুলি

হইল: (১) রাষ্ট্রপতি নির্বাচনব্যবস্থা; (২) কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার পরিধি; (৩) রাজ্য সরকারের ক্ষমতার পরিধি; (৪) গ-শ্রেণীর রাজ্যের উচ্চ বিচারালয়; (৫) শাসনতন্ত্রের সংশোধন ব্যবস্থা; (৬) সুপ্রিম কোর্ট-সংক্রান্ত বিষয়; (৭) উচ্চ বিচারালয়-সংক্রান্ত বিষয়; (৮) আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা ও এই ক্ষমতার বন্টন; (৯) পার্লামেণ্টে রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব।

উপরি-উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কিত সংশোধন বিল অর্ধেক রাজ্য আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত হইলে, রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করা হয় এবং তাঁহার সম্মতি পাইলে বৈধ বলিয়া বিবেচিত হয়।

৩। তৃতীয়তঃ, এমন অনেকগুলি বিষয় আছে, যে বিষয়গুলি সম্পর্কে কোন সংশোধন করিতে হইলে আদৌ কোন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয় না। পার্লামেণ্ট সভা সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে ঐ বিষয়গুলির সংশোধন করিতে পারে। নূতন রাজ্যগঠন বা বর্তমান রাজ্যগুলির পুনর্গঠন, প্রথম তপশীলভুক্ত 'গ'-শ্রেণীর রাজ্যগুলির শাসনতন্ত্র-প্রণয়ন, কোন রাজ্যে উচ্চপরিষদ গঠন করা বা বাতিল করা ইত্যাদি ব্যাপার পার্লামেণ্ট সভা সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন করিতে পারে। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে ভারতীয় শাসনতন্ত্রকে আংশিকভাবে নমনীয় বলা যাইতে পারে।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সম্পর্ক—Relation between the Centre and the States

নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। উভয় সরকারের সম্পর্ক নিম্নলিখিত দুই দিক দিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে।

১। আইন-প্রণয়ন-সম্পর্ক—Legislative Relation

সংবিধানে ব্যবস্থা আছে যে, এক বা একাধিক রাজ্য-তালিকাভুক্ত যে-কোন বিষয়ে আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা স্বেচ্ছায় পার্লামেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, সংবিধানে লিখিত আছে যে, পার্লামেণ্ট যদি মনে করে যে, কোন রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয় জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে তাহা হইলে ঐ বিষয়টি রাজ্য-তালিকাভূক্ত হওয়া সত্ত্বেও ঐ বিষয়ে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, পার্লামেণ্টের উচ্চ পরিষদ অর্থাৎ রাজ্য-সভা যদি দুই-তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্যে প্রস্তাব পাস করিয়া পার্লামেণ্ট সভাকে কোন

রাজ্য-তলিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করে, তাহা হইলেও পার্লামেণ্ট সভা ঐ রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে পার্লামেণ্ট যে-কোনও বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে এবং কোন রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হইলে পার্লামেণ্ট রাজ্য আইনসভার স্থান অধিকার করিতে পারে। কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের উপর আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে পার্লামেণ্টের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে।

উপরি-উক্ত বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য সময়ে উভয় সরকারই স্ব স্ব এলাকায় স্বাধীনভাবে আইন-প্রণয়নের অধিকারী। একের অধিকারভুক্ত এলাকায় অন্যে হস্তক্ষেপ করিলে সুপ্রিম কোর্ট এই অন্যায় হস্তক্ষেপ নিরোধ করিবে।

২। শাসন-সম্পর্ক—Administrative Relation

সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাজ্য সরকারগুলির আইন প্রণয়নের ক্ষমতা পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইনগুলির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে এবং রাজ্য সরকারগুলির শাসনক্ষমতা এরূপভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনক্ষমতা ব্যাহত না হয় বা কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনক্ষমতার বিরোধী না হয়। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় শাসনকর্তৃপক্ষ প্রয়োজন-ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দান করিতে পারিবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে রাজ্য সরকারকে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রপ্রদত্ত ক্ষমতাবলে কেন্দ্রীয় সরকার, জাতীয় স্বার্থ-সম্পর্কিত বা সামরিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইলে যে-কোন স্থলপথ, জলপথ, রেলপথ প্রভৃতি নির্মাণ ও রক্ষা সম্পর্কে রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দান করিতে পারে। চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সম্মতিক্রমে যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকাভুক্ত যে-কোন বিষয়ের কার্যভার রাজ্য সরকারের অধীন কর্মচারিগণের হস্তে ন্যস্ত করিতে পারেন। পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া উপরি-উক্ত কার্যভার রাজ্য সরকারের অধীন কর্মচারিগণের হস্তে ন্যস্ত করিতে পারে। পঞ্চমতঃ, দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবহমান নদীর জল অথবা নদী-উপত্যকাগুলি সম্পর্কে যদি রাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধ ঘটে, তাহা হইলে পার্লামেণ্টকে আইন প্রণয়ন করিয়া উক্ত বিরোধের মীমাংসা করিবার অধিকার

দেওয়া হইয়াছে। ষষ্ঠতঃ, শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর একটি আন্তঃ-প্রাদেশিক-পরিষদ গঠন করিবার ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে। আন্তঃপ্রাদেশিক বিরোধ অথবা কেন্দ্রীয় সরকার ও কোন রাজ্য সরকার বা একাধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে বিরোধ ঘটিলে, তাহার মীমাংসা করা হইল এই পরিষদের অন্যতম কর্তব্য। পরিশেষে সংবিধানে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যদি কোন রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আইনসম্মতভাবে প্রদত্ত কোন নির্দেশ উপেক্ষা করে, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি এই উপেক্ষাকে শাসনতন্ত্রে অচলাবস্থার উদ্ভব মনে করিতে পারেন এবং সেজন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

বিচার-ব্যবস্থা—The Judiciary

বিচার-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য—Features of the Judicial System

ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র হইলেও সমগ্র ভারতের জন্য একটি সর্বোচ্চ বিচারালয় (সুপ্রিম কোর্ট) আছে। প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া উচ্চ আদালত (হাই কোর্ট) আছে। এই উভয় আদালতই দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ মামলার বিচার করে। অন্যান্য নিম্ন বিচারালয়গুলি ফৌজদারী ও দেওয়ানী এই দুই ভাগে বিভক্ত। গুরুতর ফৌজদারী মামলাগুলি জুরীর সাহায্যে বিচার করা হয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের আদালত গঠিত হয়। ইহা ছাড়া, শ্রমিক-মালিক বিরোধ প্রভৃতির নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ আদালত আছে। আইনের চক্ষে সব নাগরিকই সমান। নিম্নে আদালতগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

দেওয়ানী আদালত—Civil Courts

(১) গ্রামের পঞ্চায়েৎ আদালতই হইল দেওয়ানী সর্বনিম্ন আদালত। এখানে ছোট-খাট মামলার বিচার হয়। ইহার উপর হইল (২) মুনসেফের আদালত। প্রত্যেক চৌকি, মহকুমা ও জেলার সদরে মুনসেফী আদালত থাকে। মুনসেফগণ সরকার কর্তৃক যোগ্যতার ভিত্তিতে নিযুক্ত কর্মচারী। সাধারণতঃ ইঁহারা দুই হাজার বা বিশেষ ক্ষেত্রে তিন হাজার টাকা সম্পর্কিত দেওয়ানী মামলা পরিচালনা করিতে পারেন। ইহার উপর হইল (৩) জেলা জজের (District Judge)

আদালত। ইনি হইলেন জেলার দেওয়ানী মামলা-সংক্রান্ত সর্বোচ্চ বিচারক। জেলা জজ তাঁহার সহকারী সব্‌জজের সাহায্যে বিচারকার্য পরিচালনা করেন। মুনসেফের আদালত হইতে জেলা জজের আদালতে আপীল করা যায় এবং যে সমস্ত মামলার বিষয় দুই হাজার টাকার অধিক তাহাদের সরাসরি প্রথমেই জেলা জজ বা সব্‌জজের আদালতে শুনানী হয়। জেলা জজের রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্যের (৪) উচ্চ আদালতে আপীল করা যায়। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ সহরে দেওয়ানী মামলার জন্য ছোট আদালত (Small Causes Court) আছে। দেওয়ানী মামলার দাবীর পরিমাণ ২০ হাজার টাকার বেশী হইলে উচ্চ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে (৫) সুপ্রিম কোর্টে আপীল করা যায়।

ফৌজদারী আদালত—Criminal Courts

ফৌজদারী মামলার জন্য সর্বনিম্ন আদালত হইল (১) গ্রামের পঞ্চায়েৎ আদালত। পঞ্চায়েতী আদালত ছোট-খাট মামলার বিচার করে ও অল্প-পরিমাণ জরিমানা করিতে পারে। অপেক্ষাকৃত গুরুতর অপরাধের জন্য প্রত্যেক মহকুমা ও জেলা-সহরে (২) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বিচারক (Magistrate) থাকেন। খুন, গৃহদাহ প্রভৃতি গুরুতর অপরাধের বিচার সরাসরি (৩) জেলার দায়রা জজের (Sessions Judge) আদালতে হয়। প্রত্যেক জেলায় একজন দায়রা জজ থাকেন। ইনি জেলা জজ ও দায়রা জজ উভয়রূপেই কাজ করেন। দায়রা জজও তাঁহার সহকারী দায়রা জজের (Assistant Sessions Judge) সাহায্যে ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট হইতে আনীত গুরুতর ফৌজদারী মামলার বিচার করেন। সাধারণ ম্যাজিস্ট্রেটগণ গুরুতর ফৌজদারী মামলার বিবরণ শুনিয়া এই মামলাগুলি দায়রা আদালতে সোপর্দ করেন। কারণ, তাঁহাদের এই মামলা-গুলি বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। দায়রা জজ অপরাধীকে প্রাণদণ্ড দিতে পারেন, কিন্তু এই দণ্ডাদেশ উচ্চ বিচারালয় কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। দায়রা জজ নিম্ন আদালতগুলি হইতে আনীত আপীলগুলিও বিচার করেন। গুরুতর মামলার বিচারকালে দায়রা জজকে জুরীর সাহায্য লইতে হয়। জুরীগণ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী বা নির্দোষ সাব্যস্ত করেন, কিন্তু দণ্ড সম্পর্কে তাঁহাদের কোন হাত নাই। জজ ও জুরীগণের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে এই মামলা উচ্চ আদালতে পাঠাইতে হয় এবং বিশেষ ক্ষেত্রে জজ নূতন জুরী নিযুক্ত করিয়া মামলার পুনর্বিচার করিতে পারেন। দায়রা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে (৪) উচ্চ আদালতে আপীল করা

যায়। উচ্চ আদালত হইতে মাত্র নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে (৫) সুপ্রিম কোর্টে আপীল করা যায়।

কলিকাতা প্রভৃতি বড় শহরে ফৌজদারী মামলার জন্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত আছে। ইহা ছাড়া, কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় শহরে নগর আদালত (City Court) সৃষ্টি হইয়াছে।

উচ্চ আদালত—High Court

প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া উচ্চ আদালত আছে। এই আদালতই হইল রাজ্যের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার সর্বোচ্চ আদালত। একজন প্রধান বিচারপতি ও অন্য কয়েকজন বিচারপতি লইয়া এই আদালত গঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, রাজ্যের রাজ্যপাল ও উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া অন্য বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করেন। বিচারপতিগণ ৬০ বৎসর পর্যন্ত কাজ করিতে পারেন এবং অবসর গ্রহণ করিবার পর ভারতের কোন বিচারালয়ে আইনজীবী হিসাবে কাজ করিতে পারেন না। একমাত্র অসদাচরণ ও অকর্মণ্যতাহেতু আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশের অভিযোগে রাষ্ট্রপতি কোন বিচারপতিকে পদচ্যুত করিতে পারেন। উচ্চ আদালতের বিচারপতি হইতে হইলে কোন নিম্ন আদালতে অন্ততঃপক্ষে ১০ বৎসর কাল জজ হিসাবে কাজ করিতে হইবে অথবা কোন উচ্চ আদালতে অন্ততঃপক্ষে ১০ বৎসর ওকালতি বা ব্যারিস্টারি করিতে হইবে।

উচ্চ আদালত নিম্ন আদালতগুলি হইতে আনীত আপীল মামলাগুলি পরিচালনা করে। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটি প্রেসিডেন্সির উচ্চ আদালতের আদিম ক্ষমতাও (Original Jurisdiction) আছে। প্রেসিডেন্সি এলাকাস্থিত গুরুতর ফৌজদারী মামলাগুলির বিচার সরাসরি এখানে হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে দেওয়ানী মামলার প্রথম বিচারও এই আদালতে হয়।

সুপ্রিম কোর্ট—Supreme Court

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় একটি সর্বোচ্চ আদালত একান্ত অপরিহার্য। ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একটি সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। একজন প্রধান বিচারপতি ও অনধিক সাতজন বিচারপতি লইয়া এই আদালত

প্রথম গঠিত ছিল। ১৯৫৬ সালে একটি সংশোধনী আইন পাস করিয়া বিচারপতির সংখ্যা ৭ হইতে ১০ করা হয়। বিচারকার্য যাহাতে দ্রুত সম্পন্ন হয় সেই উদ্দেশ্যে ১৯৬০ সালে দ্বিতীয় সংশোধনী আইন পাস করিয়া বিচারপতির সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে প্রধান বিচারপতি ছাড়া আরও ১৩ জন বিচারপতি লইয়া এই আদালত গঠিত।

রাষ্ট্রপতি ইঁহাদিগকে নিযুক্ত করেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইতে হইলে অন্ততঃ পাঁচ বৎসর উচ্চ আদালতে বিচারপতি হিসাবে কাজ করিতে হয় অথবা দশ বৎসর উচ্চ আদালতে ওকালতি করিতে হয় অথবা প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ হইতে হয়। বিচারপতিগণ পঁয়ষট্টি বৎসর পর্যন্ত কাজ করিতে পারেন এবং অবসর গ্রহণের পর ভারতের কোন আদালতে আর ওকালতি করিতে পারেন না। পার্লামেণ্ট সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অভিযোগে রাষ্ট্রপতি ইঁহাদিগকে অপসারিত করিতে পারেন।

সুপ্রিম কোর্টের কার্য চারিভাগে ভাগ করা যায়; যথা, আদিম বিভাগীয়, আপীল বিভাগীয়, পরামর্শ বিভাগীয় ও মৌলিক অধিকার-সম্পর্কিত কার্য।

প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে, অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে শাসনতন্ত্রের কোন বিষয়ের অর্থ লইয়া বিরোধ ঘটিলে তাহার বিচার করা।

দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন রাজ্যের উচ্চ আদালতের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার রায়ের বিরুদ্ধে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে আপীল শুনা।

তৃতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোন বিষয়ে জানিবার জন্য রাষ্ট্রপতি যদি অনুরোধ করেন, তাহা হইলে কোর্টের নিজ মতামত জ্ঞাপন করা।

চতুর্থতঃ, নাগরিকগণের শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত মৌলিক অধিকার রক্ষা করা। যদি কোন ব্যক্তি মনে করে যে, সরকার বা অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা তাহার নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন হইয়াছে তাহা হইলে সে সুপ্রিম কোর্টে ইহার প্রতিকারের প্রার্থনা করিতে পারে। উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া সুপ্রিম কোর্ট ইহার নির্দেশ দিতে পারে।

স্থানীয় শাসন

(Local Government)

স্থানীয় শাসন কাহাকে বলে—What is Local Government

একটি দেশকে যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করিয়া প্রত্যেক অংশ শাসন করিবার জন্য পৃথক শাসন-ব্যবস্থা থাকে, তখন ইহাকে স্থানীয় শাসন বলা হয়। সমগ্র ভারত কতকগুলি রাজ্যে বিভক্ত। রাজ্যগুলিকে আবার কতকগুলি বিভাগে (Division) ভাগ করা হইয়াছে। আবার বিভাগগুলি কতকগুলি জেলা (District) লইয়া গঠিত। জেলাগুলি আবার কতকগুলি মহকুমা (Sub-division) লইয়া গঠিত। মহকুমায় কতকগুলি থানা (Police Station) থাকে এবং থানার অধীনে ছোট-বড় অনেক গ্রাম (Village) থাকে। রাজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রাম পর্যন্ত প্রত্যেকটি অঞ্চলের নিজস্ব কতকগুলি সমস্যা থাকে এবং ঐ সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য প্রত্যেকটি অঞ্চলে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

বিভাগ ও বিভাগীয় শাসনকর্তা—Division and Divisional Commissioner.

কতকগুলি জেলা লইয়া একটি বিভাগ গঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে দুইটি বিভাগ আছে ; যথা, ১। প্রেসিডেন্সি বিভাগ, ও ২। বর্ধমান বিভাগ। প্রেসিডেন্সি বিভাগ—কলিকাতা, ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম-দিনাজপুর, মালদহ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও দার্জিলিং এই ৯টি জেলা লইয়া গঠিত। হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও বীরভূম এই ৬টি জেলা বর্ধমান বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। রাজ্য পুনর্গঠন আইন বলবৎ হওয়ার ফলে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর হইতে পুরুলিয়া ও পূর্ণিয়া জেলার কিয়দংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় জেলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রত্যেক বিভাগে একজন বিভাগীয় কমিশনার থাকেন। ইনি ভারতীয় শাসন বিভাগের (I. A. S.) অভিজ্ঞ কর্মচারী। তাঁহার বিভাগের অন্তর্ভুক্ত জেলাগুলির

শাসনকার্যের তদারক করা ছাড়াও তিনি বিভাগীয় ভূমি-রাজস্ব ও নাবালকের সম্পত্তিরক্ষা বিষয়ের অধিকর্তা। তিনি জেলাশাসক ও রাজ্য-সরকারের মধ্যে যোগসূত্র।

জেলাশাসক—The District Magistrate and Collector

জেলাগুলিই হইল ভারতের শাসন-ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ এবং জেলার শাসকই হইলেন শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃত মেরুদণ্ড। প্রত্যেক জেলায় একজন জেলাশাসক থাকেন। তিনি একদিকে জেলাশাসনের সর্বময় কর্তা, অপর দিকে জেলার রাজস্ব আদায় করিবার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকে। ইহা ছাড়া, তিনি আবার ফৌজদারী মামলার বিচারও করিয়া থাকেন। উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকায় তাঁহাকে ডেপুটি কমিশনার বলা হয়। জেলাশাসক পূর্বে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্য ছিলেন। বর্তমানে তিনি ভারতীয় শাসন-বিভাগীয় কৃত্যকের (I. A. S.) কর্মচারী। কখনও কখনও প্রাদেশিক শাসন-বিভাগীয় কৃত্যকের অভিজ্ঞ কর্মচারীকে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত করা হয়।

জেলাশাসকের প্রধানতঃ তিন রকমের কাজ করিতে হয়। জেলার প্রধান শাসনকর্তা হিসাবে তাঁহাকে জেলার শান্তি-শৃঙ্খলা বিধান করিতে হয়। এইজন্য তাঁহাকে পুলিশের কার্য নিয়ন্ত্রণ বিধান করিতে হয়। জেলাশাসনের অন্যান্য বিষয়গুলি তাঁহাকে তদারক ও পরিদর্শন করিতে হয়। কৃষি, চিকিৎসা, জেল, সেচ, বন ও জেলার শিক্ষাব্যবস্থা তাঁহাকে তদারক করিতে হয়। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির ফলে দুর্ভিক্ষ হইলে ইহার প্রতিকারের দায়িত্ব জেলাশাসকের উপর ন্যস্ত। তাঁহাকেই কৃষি ঋণদানের ব্যবস্থা করিতে হয়। মিউনিসিপালিটি, জেলাবোর্ড ও গ্রাম পঞ্চায়েৎগুলির কার্যের উপর দৃষ্টি রাখাও তাঁহার অন্যতম দায়িত্ব। তাঁহাকেই জেলাশাসন সম্পর্কে রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় সংবাদ ও তথ্য সরবরাহ করিতে হয়। জেলার কোন অংশে কোন অশান্তি ঘটিলে তাঁহাকেই পুলিশের সাহায্যে অশান্তি দূর করিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, ম্যাজিস্ট্রেট হইলেন আবার কলেক্টর অর্থাৎ জেলার ভূমি-রাজস্ব ও অন্যান্য রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত। প্রত্যেক জেলায় যে সরকারী কোষাগার (Treasury) থাকে, তাহার ভারও জেলাশাসকের উপর

ন্যস্ত থাকে। সরকারী খাসমহল ও নাবালকের সম্পত্তি পরিচালনা তাঁহাকেই করিতে হয়। ইহা ছাড়া, জেলার অধিকর্তা হিসাবে তাঁহাকে অনেক সামাজিক অনুষ্ঠানেও যোগদান করিতে হয়।

তৃতীয়তঃ, তিনি ফৌজদারী মামলার বিচার করেন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত হইতে আনীত আপীল মামলাগুলির বিচার করিতে পারেন।

উপরে জেলাশাসকের কার্যের যে তালিকা দেওয়া হইল তাহা হইতে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, অসাধারণ কর্মশক্তি না থাকিলে জেলাশাসকের কার্য সুষ্ঠুভাবে করা দুঃসাধ্য। এইজন্য প্রতিযোগিতামূলক লিখিত, মৌখিক ও স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত যোগ্যতা-সম্পন্ন যুবকগণকে এই পদে নিযুক্ত করা হয়। জেলাশাসককে শুধু সু-শাসক হইলে চলিবে না, তাঁহার উপর জেলার হাজার হাজার লোকের সুখ-দুঃখ নির্ভর করে। এজন্য তাঁহার মধ্যে জনপ্রিয় নেতার গুণ থাকা চাই। শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন হইল জেলাশাসকের প্রধান কর্তব্য। এজন্য একদিকে যেরূপ তাঁহাকে কঠোর হইতে হয়, অপর দিকে সেইরূপ কোমল-স্বভাব ও সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে হয়। জনসাধারণের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া তাহাদের অসুবিধা দূর করিয়া সুবিধা সৃষ্টি করাই হইল জেলাশাসকের পবিত্র কর্তব্য।

ভারতে জেলাশাসকের বিভিন্ন কাজসম্পর্কে একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। জেলাশাসক একদিকে জেলার শাসক, আবার অপর দিকে বিচারক। ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি অনুযায়ী একই ব্যক্তির হস্তে শাসনক্ষমতা ও বিচার-ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকা সমীচীন নহে, কারণ জেলাশাসক পুলিশের কর্তা হিসাবে যাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন আবার বিচারক হিসাবে তাহাকে শাস্তি দিতে পারেন। একই ব্যক্তির হস্তে উভয়বিধ ক্ষমতা থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তি সুবিচার পাইতে পারে না এবং এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। এই কারণে ম্যাজিস্ট্রেটের হাত হইতে বিচার-ক্ষমতা সরাইয়া লওয়া উচিত। নূতন শাসনতন্ত্রের নির্দেশাত্মক নীতিতে শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগের পৃথকীকরণ নীতি স্বীকৃত হইয়াছে এবং ভারতের কয়েকটি রাজ্যসরকার ইতিমধ্যে কার্যক্ষেত্রে এই নীতি বলবৎ করিতেছেন।

মহকুমা শাসন—Administration of Sub-division

প্রত্যেক জেলা কতকগুলি মহকুমা লইয়া গঠিত। প্রত্যেক মহকুমায় একজন মহকুমা-শাসক থাকেন। তিনি মহকুমার সর্ববিষয়ের শাসনকর্তা হইলেও জেলার ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার কার্যের তদারক করেন।

থানা—Police Station

পল্লী অঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য এক বা একাধিক গ্রাম লইয়া একটি থানা গঠিত হয়। থানায় পুলিশের একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী (Officer-in-charge—O.C.) থাকেন। তাঁহার দুই-একজন সহকারী থাকেন। ইহা ছাড়া, কয়েকজন কনেস্টবল থাকে। গ্রামে গ্রামে চৌকিদার ও দফাদার থাকে। থানার মধ্যে কোথাও শান্তিভঙ্গ হইলে বা অপরাধ অনুষ্ঠিত হইলে চৌকিদার থানায় সংবাদ দেয়। প্রত্যেক জেলায় পুলিশের একজন পদস্থ কর্মচারী (Superintendent of Police) থাকেন। তিনি জেলার সমস্ত পুলিশের কার্য পরিদর্শন করেন।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন—Local Self-Government

গ্রাম, নগর প্রভৃতি প্রত্যেক স্থানীয় অঞ্চলের কতকগুলি স্থানীয় সমস্যা থাকে। যদি স্থানীয় লোকের দ্বারা এই স্থানীয় সমস্যাগুলির সমাধান হয়, তাহা হইলে স্থানীয় লোকে সাধারণ-সম্পর্কিত কাজে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। ইহাতে তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা সহযোগিতার ভিত্তিতে তাহাদের সাধারণ-সম্পর্কিত স্বার্থগুলি রক্ষা করিবার শিক্ষা পায়। দূরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষা স্থানীয় লোকে স্থানীয় সমস্যাগুলির দ্রুত ও অপেক্ষাকৃত ভালভাবে সমাধান করিতে পারে। সুতরাং স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার সাহায্যেই গণতান্ত্রিক আদর্শ কার্যকরী করা সম্ভব হয়। এই উদ্দেশ্যে ইংরাজ শাসনকাল হইতেই ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন করা হয়। ১৯১৯ সালের সংস্কার আইনের সাহায্যে ভারতে শহরাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি শহরে বিশেষ আইনের বলে কর্পোরেশন ও অন্যান্য শহরে মিউনিসিপালিটি গঠিত হয়। যেখানে সেনানিবাস থাকে সেখানে ক্যাণ্টনমেণ্ট বোর্ড সৃষ্টি হয়। গ্রামাঞ্চলের জন্য জেলায় জেলায় জেলা

বোর্ড, মহকুমায় লোকাল বোর্ড অথবা তালুক বোর্ড এবং গ্রামে ইউনিয়ন বোর্ড বা গ্রাম পঞ্চায়েতের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় শাসন-প্রতিষ্ঠানের গঠন, কার্য ও আয়-ব্যয়ের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

পৌরপ্রতিষ্ঠান

কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠান—Calcutta Corporation

কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠান পরলোকগত দেশনেতা সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিত্বকালে সৃষ্টি হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ইহার প্রথম মেয়র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ইহার প্রধান কর্মসচিব ছিলেন। ১৯৫১ সালের কলিকাতা মিউনিসিপাল আইন অনুসারে এই প্রতিষ্ঠানের পুরাতন গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করিয়া নূতন গঠনতন্ত্রের সৃষ্টি হয়। ১৯৫২ ও ১৯৫৫ সালে এই নূতন আইনটির কিছু পরিবর্তন করা হয়।

গঠনতন্ত্র—নূতন সংশোধিত আইন অনুসারে ১০০ জন সদস্য লইয়া কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠান গঠিত। সাধারণ ভোটদাতৃগণ প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে ১০০ জন সদস্য নির্বাচন করে এবং এই ১০০ জন সদস্য ভোট দিয়া ৫ জন অল্ডারম্যান নির্বাচন করে। ইহা ছাড়া, কলিকাতা নগরোন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের (Cacutta Improvement Trust) সভাপতি পদাধিকার বলে (Ex-officio) পৌরপ্রতিষ্ঠানের একজন সদস্য হইয়া থাকেন। কর্পোরেশনের সদস্যগণকে কাউন-সিলার বলা হয়। কাউনসিলার ও অল্ডারম্যানগণ ৪ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। রাজ্যসরকার ইহাদের কার্যকাল একবৎসর বাড়াইয়া দিতে পারেন। বাৎসরিক প্রথম অধিবেশনের সময় কাউনসিলার ও অল্ডারম্যানগণ সদস্যগণের মধ্য হইতে এক বৎসরের জন্য একজন মেয়র ও একজন ডেপুটি মেয়র নির্বাচন করেন। মেয়র কর্পোরেশনের সভায় সভাপতিত্ব করেন। তাঁহার কোন বেতন না থাকিলেও তিনি যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী। তিনিই নগরের প্রথম ও প্রধান নাগরিক (First citizen) বলিয়া গণ্য হন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে ডেপুটি মেয়র কর্পোরেশনের সভার সভাপতিত্ব করেন।

কতকগুলি ওয়ার্ড বা পল্লী লইয়া একটি অঞ্চল গঠিত হয় এবং এই পল্লীগুলির সদস্যগণকে লইয়া আঞ্চলিক কমিটি (Borough Committee) গঠিত হয়।

কর্পোরেশনের বিভিন্ন কাজের জন্য ১০ জন সদস্য লইয়া এক একটি স্থায়ী কমিটি (Standing Committee) গঠিত হয়, কিন্তু কোন সদস্যই একটির অধিক কমিটির সদস্য হইতে পারেন না। সর্বসমেত ৯টি বিভাগীয় কমিটি আছে, যথা—

১। শিক্ষা কমিটি
২। জনস্বাস্থ্য কমিটি
৩। গৃহ-নির্মাণ কমিটি
৪। জল-সরবরাহ কমিটি
৫। নগর পরিকল্পনা ও উন্নতি কমিটি
৬। অর্থ-সংক্রান্ত কমিটি
৭। জনকল্যাণ ও বাজার কমিটি
৮। ওয়ার্কস্ কমিটি
৯। হিসাব রক্ষক কমিটি

কর্পোরেশনের সভায় সমস্ত সদস্য মিলিত হইয়া কাজের নীতি ও তালিকা স্থির করেন। সভায় যে সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করা হয়, তাহা স্থায়ী কর্মচারিগণ কার্যে রূপদান করেন। এজন্য কর্পোরেশনে একজন মুখ্য কর্মসচিব (Chief Commissioner), একাধিক উপ-কর্মসচিব, মুখ্য এঞ্জিনিয়ার, মুখ্য স্বাস্থ্যাধিকার ও আরও অসংখ্য কর্মচারী আছেন। মুখ্য কর্মসচিব হইলেন কর্পোরেশনের স্থায়ী কর্মচারিগণের প্রধান। ইনি রাজ্যসরকার কর্তৃক রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদের সুপারিশক্রমে নিযুক্ত হন। অন্যান্য কর্মচারিগণ কর্পোরেশন কর্তৃক নিযুক্ত হইলেও মুখ্য এঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি উচ্চপদের নিয়োগগুলি রাজ্যসরকারের অনুমোদনসাপেক্ষ।

পৌরপ্রতিষ্ঠানের কাজ—Functions of the Corporation

কলিকাতা কর্পোরেশনের বহুবিধ কাজ করিতে হয়। কাজগুলিকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায় ; জনস্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা, জন-সুবিধা এবং জন-শিক্ষা (প্রাথমিক)। এই উদ্দেশ্যে কর্পোরেশন শহরের রাস্তাঘাট, পার্ক প্রভৃতি নির্মাণ করে। রাস্তাগুলির নামকরণ করা, পরিষ্কার করা, জল দেওয়া ও রাত্রিকালে আলো দেওয়া এবং শহরে পরিস্রুত ও অপরিস্রুত জল সরবরাহ করা কর্পোরেশনের কাজ। কলের জল ছাড়াও এজন্য কর্পোরেশন শহরের মধ্যে বহু নলকূপ খনন করিয়াছে। কর্পোরেশন শহরে বাড়ী-ঘর-দুয়ার নির্মাণ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। ইহার অনুমতি ব্যতীত কেহ গৃহাদি নির্মাণ করিতে পারে না। জননিরাপত্তা রক্ষার জন্য কর্পোরেশন জীর্ণ বাড়ী, ঘর-দুয়ার ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে। জনস্বাস্থ্য রক্ষাকল্পে হাসপাতাল, চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করে এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থ সাহায্য করে। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে টিকা দিবার ব্যবস্থা করে এবং শহরের ময়লা ও আবর্জনা পরিষ্কারের ব্যবস্থা

করে। কর্পোরেশন বাজার প্রতিষ্ঠা করে এবং পশুহত্যা-শালা স্থাপন করে। হিন্দুদের জন্য শ্মশান এবং মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের জন্য গোরস্থান স্থাপন ও সংরক্ষণও কর্পোরেশনের কাজ। কলিকাতা কর্পোরেশনের আর একটি কাজ হইল শহর এলাকায় অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্যে কর্পোরেশন অগ্নিনির্বাপক-বাহিনী (Fire Brigade) গঠন করিয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের আর একটি কৃতিত্ব হইল যে, ইহা শহর এলাকায় বহু অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ইহাদের সাহায্যে বিশেষ করিয়া দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করিতেছে। শহরের বহু গ্রন্থাগারকে কর্পোরেশন অর্থসাহায্য করে। শহরের লোকের জন্ম ও মৃত্যুর হিসাব রাখে। কর্পোরেশনের নিজস্ব একটি প্রদর্শনী আছে। দেশীয় শিল্পগুলিকে উৎসাহ দিবার উদ্দেশ্যেই নিছক দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য এই প্রদর্শনীতে রাখা হয়।

পৌরপ্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস—Sources of Income

উপরে কর্পোরেশনের কাজের যে দীর্ঘ তালিকা দেওয়া হইল তাহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই নানাবিধ কার্যের জন্য বহু অর্থ ব্যয় হয়। ব্যয় সংকুলান করিবার জন্য কর্পোরেশন নিম্নলিখিত উৎসগুলি হইতে অর্থ সংগ্রহ করে :—

১। বাড়ী ও জমির মূল্যের উপর কর (Rate), ২। ব্যবসায় ও বাণিজ্যের উপর কর, ৩। গরু, কুকুর প্রভৃতি পশুর উপর ও শকটাদি যান-বাহনের উপর কর, ৪। রাজ্যসরকার কর্তৃক আদায়ীকৃত মোটর গাড়ীর উপর ধার্য করের একটি অংশ, ৫। কর্পোরেশনের নিজস্ব বাজার ও অন্যান্য সম্পত্তি হইতে আয়, ৬। রাজ্যসরকার কর্তৃক অর্থসাহায্য, ৭। রাজ্যসরকারের অনুমতি লইয়া ঋণগ্রহণ।

কলিকাতা কর্পোরেশনের বাৎসরিক আয় আড়াই কোটি টাকারও অধিক। এই বিপুল আয় জনস্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা, জন-সুবিধা ও প্রাথমিক শিক্ষামূলক কার্যে ব্যয় হয়। ইদানীং কর্পোরেশনের কার্যে নানাবিধ দুর্নীতি ও অযোগ্যতা দেখা যায়। এইজন্য কয়েক বৎসর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রতিষ্ঠানকে বাতিল করিয়া ইহার পরিচালনা-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নাগরিকগণ যতদিন পর্যন্ত তাঁহাদের পৌর অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত না হইবেন ততদিন পর্যন্ত পৌরপ্রতিষ্ঠানের কাজ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতে পারিবে না।

সাধারণ পৌরপ্রতিষ্ঠান—Municipalities

কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেক জেলা, মহকুমা বা অনেক সময়ে বর্ধিষ্ণু গ্রামেও সাধারণ পৌরপ্রতিষ্ঠান থাকে। কোন পৌরপ্রতিষ্ঠানের সদস্যসংখ্যা ৯এর কম বা ৩০এর অধিক হইতে পারিবে না। শহরের করদাতাগণ প্রত্যক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতিতে এই সদস্যগণকে (Commissioners) নির্বাচিত করেন। পৌরপ্রতিষ্ঠানের কার্যকাল ৪ বৎসর কিন্তু সরকার ইচ্ছা করিলে ইহা এক বৎসর বাড়াইতে পারেন। সদস্যগণ একজন সভাপতি (Chairman) ও এক বা একাধিক সহ-সভাপতি (Vice-Chairman) নির্বাচন করেন। কর্পোরেশনের ন্যায় সাধারণ পৌরপ্রতিষ্ঠানেও একজন প্রধান কর্মসচিব, স্বাস্থ্যাধিকার ও এঞ্জিনিয়ার থাকেন। পৌরপ্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করিলে বিশেষ কাজের জন্য স্থায়ী কমিটিও নিযুক্ত করিতে পারে। যে সমস্ত পৌরপ্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক আয় একলক্ষ টাকার অধিক তাহারা একজন প্রধান কর্মকর্তা (Chief Executive Officer) নিয়োগ করিতে পারে।

সাধারণ পৌরপ্রতিষ্ঠানের কার্য—Functions

কর্পোরেশনের ন্যায় এই প্রতিষ্ঠানগুলিরও জনস্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা, জন-সুবিধা ও শিক্ষাবিষয়ক কার্য সম্পাদন করিতে হয়। রাস্তাঘাট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, জল ও আলো সরবরাহ, ময়লা জল ও আবর্জনা দূর করা, চিকিৎসালয় ও প্রসূতি আগার স্থাপন করা, অগ্নিনির্বাপন, সংক্রামক ব্যাধিনিরোধ, প্রাথমিক শিক্ষাদান, জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখা প্রভৃতি সাধারণ পৌরপ্রতিষ্ঠানের কার্য।

আয়—Income

পৌরপ্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস হইল :

১। জল ও আলো সরবরাহ ও ময়লা নিষ্কাশনের জন্য বাড়ী ও জমির উপর ধার্য কর, ২। ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী, রিক্সা, ঠেলাগাড়ী প্রভৃতি যানবাহনের উপর ধার্য কর, ৩। ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত ব্যক্তিগণের উপর কর, ৪। খেয়া পারাপার ও সেতু পারাপার হইবার সময় লোকজন ও যানবাহনের উপর ধার্য কর, ৫। বাজার ও অন্যান্য সম্পত্তি হইতে আয়, ৬। সরকারী অর্থসাহায্য ও ৭। সরকারের অনুমতি লইয়া ঋণগ্রহণ।

ভারতের কয়েকটি রাজ্য শহরে আনীত দ্রব্য ও শহর হইতে রপ্তানীকৃত দ্রব্যের উপর কর (Octroi duty) ধার্য করিয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গের কোন পৌর-প্রতিষ্ঠান এই কর ধার্য করে নাই।

সেনানিবাস প্রতিষ্ঠান—Cantonment Board

যেখানে সৈন্যগণ বাস করে সেখানে সেনানিবাস প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন। কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা-বিভাগের কয়েকজন সদস্য লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানের সভাপতি সরকার কর্তৃক মনোনীত হন।

গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান—Rural Self-Government

শহরাঞ্চলের ন্যায় পল্লী অঞ্চলেও কতকগুলি স্থানীয় সমস্যা দেখা যায়। ভারতের অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে। সুতরাং গ্রামগুলির স্থানীয় সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধান না হইলে শুধু শহরের উন্নতি করিয়া সমগ্র দেশের উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। এই উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলেও তিন শ্রেণীর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া জেলা বোর্ড, ও প্রত্যেক মহকুমায় বা তালুকে একটি করিয়া স্থানীয় বোর্ড বা তালুক বোর্ড এবং এক বা একাধিক গ্রাম লইয়া একটি ইউনিয়ন বোর্ড বা গ্রামপঞ্চায়েৎ গঠিত হইয়াছে। বাংলাদেশ ও বোম্বাই রাজ্যে লোকাল বোর্ড তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, আবার আসামে জেলা বোর্ডের স্থানে লোকাল বোর্ড কাজ করে।

জেলা বোর্ড—District Board

অন্ততঃপক্ষে ৯ জন নির্বাচিত সদস্য লইয়া জেলা বোর্ড গঠিত হয়। জেলা বোর্ডে কতজন সদস্য থাকিবে তাহা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়। যেখানে স্থানীয় বোর্ড আছে সেখানে স্থানীয় বোর্ডের সদস্যগণ জেলা বোর্ডের সদস্যগণকে নির্বাচন করেন এবং স্থানীয় বোর্ড না থাকিলে ইউনিয়ন বোর্ডের ভোটদাতাগণ কর্তৃক জেলা বোর্ডের সদস্যগণ নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সদস্যগণের কার্যকাল ৪ বৎসর। বোর্ডের সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচন করেন। বোর্ডের দৈনন্দিন কার্যের জন্য একজন কর্মসচিব, এঞ্জিনিয়ার ও স্বাস্থ্যাধিকার থাকেন।

কার্য—Functions

জেলা বোর্ডও জেলার শহর ব্যতীত মফঃস্বল অঞ্চলের বহুবিধ কার্য করিয়া থাকে। জনস্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা, জন-সুবিধা ও শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়গুলির তত্ত্বাবধান করাই হইল ইহার প্রধান কর্তব্য। যাতায়াত ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য বড় বড় রাস্তাঘাট, সেতু, খেয়া-পারাবার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা, হাসপাতাল, চিকিৎসালয় ও প্রসূতি-আগার স্থাপন করা, পুষ্করিণী, কূপ ও নলকূপ খনন করিয়া জল সরবরাহ করা, ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগ নিবারণ করা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য দান করা, পশুরোগ নিবারণ করা, হাট-বাজার, ডাকবাংলো ও খোঁয়াড় স্থাপন করা প্রভৃতি হইল ইহার কার্য।

জেলা বোর্ডের আয়—Income of the District Board

উপরি-উক্ত বিভিন্ন ধরণের কাজ করিবার জন্য বোর্ড নিম্নলিখিত উৎসগুলি হইতে অর্থ সংগ্রহ করে: ১। ভূমি-রাজস্বের সহিত আদায়ীকৃত টাকার তিন পয়সা হারে অতিরিক্ত কর (সেস—cess)। ২। হাট-বাজার, খেয়া-পারাপার ও গবাদি পশু আটক রাখিবার খোঁয়াড় হইতে আয়। ৩। রাজ্যসরকার কর্তৃক অর্থসাহায্য ও ৪। রাজ্যসরকারের অনুমতি লইয়া ঋণগ্রহণ।

স্থানীয় বোর্ড—Local Board

স্থানীয় বোর্ডগুলি কমপক্ষে ৬ জন সদস্য লইয়া গঠিত হয় এবং বোর্ডের সদস্য-সংখ্যার ⅔ অংশ নির্বাচিত হন এবং ⅓ মনোনীত হন। সদস্যসংখ্যা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়। সদস্যগণ একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচন করে। স্থানীয় বোর্ডগুলির নিজস্ব কোন কাজও নাই বা আয়ের কোন উৎসও নাই। সাধারণতঃ জেলা বোর্ডগুলির নির্দেশমত ইহারা কাজ করে এবং জেলা বোর্ডের সব কাজই স্থানীয় বোর্ডগুলি কর্তৃক নিষ্পন্ন হয়।

ইউনিয়ন বোর্ড—Union Board

প্রত্যেক গ্রাম বা কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়। বোর্ডের সদস্য-সংখ্যা ৬-এর কম ও ৯-এর বেশী হইতে পারে না। বোর্ডের সদস্যগণ ৪ বৎসর কালের জন্য নির্বাচিত হন। গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাগণের মধ্যে যাঁহারা ৩৭ পয়সা-হারে চৌকিদারী ট্যাক্স দেন অথবা—৫০ পয়সা সেস্ দেন এরূপ ২১ বৎসর

বয়স্ক লোক ভোটদাতা হইতে পারেন। উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে ইউনিয়ন বোর্ডের পরিবর্তে গ্রাম পঞ্চায়েৎ কাজ করে। বোর্ডের সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি (President) নির্বাচন করেন। সভাপতিই হইলেন বোর্ডের প্রধান কর্মকর্তা।

কার্য—Functions

ইউনিয়ন বোর্ডও গ্রামের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা সুবিধা ও প্রাথমিক শিক্ষা-সম্পর্কে নানাবিধ কাজ করিয়া থাকে। গ্রামের রাস্তাঘাট ও পুল নির্মাণ করা, পুষ্করিণী, কূপ ও নলকূপ খনন করিয়া জল সরবরাহ করা, টিকা দেওয়া ও ছোট ছোট চিকিৎসালয় স্থাপন করা, নালা-নর্দমা পরিষ্কার রাখা ইহার কার্য। প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য ইহা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে বা অর্থ সাহায্য করে। গবাদি পশু আটক রাখিবার খোঁয়াড় রাখে, ছোটখাট ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচারকার্যও অনেক সময় এই বোর্ডগুলি করে। ইহা ছাড়া, ইহার আর একটি প্রধান কাজ হইল চৌকিদার ও দফাদার সাহায্যে গ্রামের শান্তি রক্ষা করা।

আয়—Income

ইহার আয়ের প্রধান উৎস হইল ইউনিয়ন রেট বা চৌকিদারী ট্যাক্স, দ্বিতীয়তঃ, লাইসেন্স ফি, জরিমানা ও খেয়াঘাট ও খোঁয়াড় হইতে আয় আদায় হয়। তৃতীয়তঃ, সরকার ও জেলা বোর্ডের নিকট হইতেও ইহা কিছু কিছু অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকে।

ইহার ব্যয়ের প্রায় অর্ধেক গ্রামের শান্তিরক্ষার জন্য চৌকিদার ও দফাদারের বেতন দিতে হয়। সরকার নিযুক্ত সার্কেল অফিসার ইউনিয়ন বোর্ডের কার্য পরিদর্শন ও তদারক করেন।

গ্রাম পঞ্চায়েৎ—Village Panchayet

১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইনসভা একটি আইন পাস করিয়া নূতন একধরণের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা কার্যকরী হইলে স্বায়ত্তশাসন ব্যাপারে আমূল-পরিবর্তন ঘটিবে।

একটি গ্রামে বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত একটি অঞ্চলে যতজন ভোটদাতা বাস

করেন, তাঁহাদের লইয়া একটি **গ্রাম পঞ্চায়েৎ** গঠিত হইবে। গ্রাম সভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে ৯ হইতে ১৫ জন সদস্য নির্বাচন করিয়া একটি গ্রাম পঞ্চায়েৎ গঠন করিবে। সরকার ইচ্ছা করিলে গ্রাম পঞ্চায়েতের ⅓ সদস্য মনোনীত করিতে পারিবেন, কিন্তু এই মনোনীত সদস্যগণের ভোট দিবার ক্ষমতা থাকিবে না। গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ ইউনিয়ন বোর্ডের কাজের অনুরূপ হইবে। গ্রামের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা সুবিধা ও শিক্ষামূলক কার্য পরিচালনার ভার ইহার উপর ন্যস্ত থাকিবে।

কতকগুলি গ্রাম পঞ্চায়েৎ মিলিয়া একটি **অঞ্চল পঞ্চায়েৎ** গঠিত হইবে। প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েৎ হইতে একজন সদস্য নির্বাচিত হইবে। অঞ্চল পঞ্চায়েতের একজন কর্মসচিব থাকিবে। ইহাদের করধার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং চৌকিদার ও দফাদার সাহায্যে অঞ্চল পঞ্চায়েৎ ইহার এলাকায় শান্তিরক্ষা করিবে।

প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়েৎ ৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি **ন্যায় পঞ্চায়েৎ** গঠন করিতে পারিবে। এই ন্যায় পঞ্চায়েৎ ছোটখাট ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচার করিতে পারিবে।

অন্যান্য আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান—Other Self-governing Institutions

শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চল প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যতীতও অন্য আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বিশেষ ধরণের কাজ করিবার জন্য গঠিত হইয়াছে।

কলিকাতা নগরোন্নয়ন প্রতিষ্ঠান—Calcutta Improvement Trust

একজন সভাপতি ও ১০ জন সদস্য লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত। সভাপতি ও অন্য ৪ জন সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠান ৪ জন সদস্য মনোনীত করে এবং অপর দুই জন বিভিন্ন বণিকসভা কর্তৃক মনোনীত হন।

বড় বড় শহরগুলিতে বিশেষ করিয়া কলিকাতার মত বড় শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে গৃহসমস্যা একটি প্রধান সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে। শহরে অভিজাত অঞ্চল ছাড়াও যে অসংখ্য বস্তি-অঞ্চল আছে তাহার অবস্থা অতি শোচনীয়। নগরোন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্য হইল বস্তি অঞ্চলগুলি পরিষ্কার করিয়া আলো ও হাওয়ার ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতা নগরোন্নয়ন প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট

কাজ করিতেছে। এই প্রতিষ্ঠান অনেক বস্তি বিলোপ করিয়া নূতন সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছে। প্রচুর মুক্ত বায়ু ও আলোর জন্য বড় বড় রাস্তা করিয়াছে। কলিকাতা উত্তর, পূর্ব ও বিশেষ করিয়া দক্ষিণ অঞ্চলে ইহা বহু অব্যবহার্য জমির উন্নতি সাধন করিয়া ব্যবহারযোগ্য করিয়াছে। ইহাতে শহরবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতি ও সৌন্দর্য-বোধ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঢাকুরিয়া লেক খনন এই প্রতিষ্ঠানের এক বিরাট কৃতিত্ব।

কলিকাতা ছাড়া বোম্বাই, কানপুর প্রভৃতি স্থানেও এইরূপ প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হইয়াছে। কলিকাতার পশ্চিম উপকণ্ঠে হাওড়া শহরের উন্নতির জন্য এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

কলিকাতা বন্দর রক্ষক প্রতিষ্ঠান—Calcutta Port Trust

কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর বন্দরগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রসারের জন্য বন্দর-রক্ষক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। ২৪ জন সদস্য লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত। কলিকাতা কর্পোরেশন ও হাওড়া মিউনিসিপালিটি একজন করিয়া সদস্য নির্বাচিত করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১ জন সদস্য মনোনীত করে এবং বিভিন্ন বণিকসভা কর্তৃক ১১ জন নির্বাচিত হয়। অবশিষ্ট সদস্যগণ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়।

বন্দর রক্ষা ও বন্দরের উন্নতি করাই হইল এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্য। এই উদ্দেশ্যে জেটি, ডক্ ও পোতাশ্রয় নির্মাণ করা ও মেরামত করা ইহার কর্তব্য। যে সমস্ত জাহাজ বন্দরে আসে তাহাদের পথ নির্দেশ করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। গুদামঘর ও পণ্যাগার নির্মাণ ও ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়। জলপথে জাহাজ ও স্টীমারগুলি নিরাপদে যাতায়াত করিতে পারে, সেজন্য ইহার এলাকাস্থিত জলপথ পরিষ্কার রাখিতে হয়।

এই প্রতিষ্ঠানের আয়ের প্রধান উৎস হইল জাহাজগুলির উপর বন্দরে আগম ও নিগম শুল্ক। ইহা ছাড়া, পণ্যাগার ও গুদামঘরের ভাড়া হইতেও অর্থ সংগৃহীত হয়।

সংক্ষিপ্তসার

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা ঃ রাষ্ট্রপতি

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে এবং এই ক্ষমতা তিনি স্বয়ং অথবা অধস্তন কর্মচারীর দ্বারা পরিচালনা করিবেন। পার্লামেন্ট

সভার উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক এবং রাজ্যগুলির নিম্নপরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক রাষ্ট্রপতি গোপন ও আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটপদ্ধতিতে নির্বাচিত হইবেন। তাঁহাকে ভারতীয় নাগরিক ও অন্ততঃ ৩৫ বৎসর বয়স্ক হওয়া চাই। তাঁহার কার্যকাল ৫ বৎসর, তবে তিনি পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন। শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করিলে পার্লামেণ্টের যে-কোন কক্ষের অভিযোগক্রমে উহার ⅔ অংশ সংখ্যক সদস্যের সমর্থনে ও অন্য কক্ষের ⅔ অংশ সংখ্যক সদস্য কর্তৃক ঐ অভিযোগ গৃহীত হইলে, তাঁহাকে পদচ্যুত করা যাইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের একজন উপ-রাষ্ট্রপতিও পার্লামেণ্ট কর্তৃক নির্বাচিত হন। তিনি সাধারণতঃ রাজ্যপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং রাষ্ট্রপতির সাময়িক অনুপস্থিতিকালে তাঁহার কার্য পরিচালনা করেন।

শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর ব্যাপক ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে। শাসন-বিষয়ক ক্ষমতা ব্যতীত আইন-প্রণয়নে ও অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা আছে। তিনি কিছু বিচারবিষয়ক ক্ষমতার অধিকারী। এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তিনটি কারণে বিশেষ জরুরী অবস্থার ঘোষণা করিতে পারেন এবং জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে তিনি মৌলিক অধিকারগুলিকে স্থগিত রাখিতে পারেন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে এককেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় পরিণত করিতে পারেন।

মন্ত্রিপরিষদ

রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও পরামর্শ দান করিবার জন্য পার্লামেণ্ট সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কতিপয় সদস্য লইয়া মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ হইল প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী এবং শাসনকার্য পরিচালনার জন্য এই পরিষদ আইনসভার নিকট যৌথভাবে দায়ী থাকিবে। একজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিষদের কার্য পরিচালিত হইবে। রাষ্ট্রপতির হস্তে শাসনতন্ত্র কর্তৃক যে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা কার্যতঃ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রযুক্ত হয়, সুতরাং শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত এই ব্যাপক ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর প্রভাব ও পদমর্যাদা সূচিত করে। নীতিগত-ভাবে মন্ত্রিপরিষদ আইনসভার নিকট দায়ী হইলেও, কার্যতঃ মন্ত্রিপরিষদই সংখ্যা-গরিষ্ঠ দলের দ্বারা গঠিত বলিয়া কি আইন প্রণয়নে, কি অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে, কি নীতি-নির্ধারণে, সর্ববিষয়ে আইনসভার কার্য নিয়ন্ত্রণ করে।

আইনসভা : পার্লামেণ্ট

রাষ্ট্রপতিসহ রাজ্যসভা ও লোকসভা লইয়া ভারতের পার্লামেণ্ট সভা গঠিত।

অনধিক ২৫০ জন সদস্য লইয়া রাজ্যসভা গঠিত এবং অনধিক ৫০০ জন সদস্য লইয়া লোকসভা গঠিত হয়। উচ্চপরিষদের ১২ জন সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন এবং নিম্নকক্ষেও বিশেষ শ্রেণীর জন্য আসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। নিম্নকক্ষের কার্যকাল ৫ বৎসর। উচ্চকক্ষের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য প্রত্যেক দুই বৎসর পর অবসর গ্রহণ করেন।

আইন পাস করিতে গেলে উভয় পরিষদের সম্মতি প্রয়োজন। মতবিরোধ ঘটিলে যুক্ত অধিবেশনের ব্যবস্থা আছে এবং যুক্ত অধিবেশনে সংখ্যাধিক্যের ভোটে পাস হইলে বিল আইনে পরিণত হয়। কি সাধারণ আইন-প্রণয়নে, কি অর্থ-সংক্রান্ত আইন-প্রণয়নে, ভারতে নিম্নপরিষদই হইল অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী।

সুপ্রিম কোর্ট—একজন প্রধান বিচারপতি ও বর্তমানে ১৩ জন বিচারপতি লইয়া ভারতের সুপ্রিম কোর্ট গঠিত। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া ও প্রয়োজনক্ষেত্রে অন্যান্য প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতিদের সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত করেন। বিচারপতিগণের নির্দিষ্ট যোগ্যতা থাকা চাই এবং শাসনতন্ত্র-নির্ধারিত বিশেষ পদ্ধতি ব্যতীত তাঁহাদিগকে অপসারিত করা যায় না।

শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বজায় রাখা এবং মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা করা ব্যতীতও সুপ্রিম কোর্টের তিন প্রকার কার্য করিতে হয় :—

১। আদিম বিচারকার্য, ২। আপীল বিচারকার্য—দেওয়ানী ও ফৌজদারী এবং ৩। আইনবিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদান।

রাজ্যসরকার : রাজ্যপাল—প্রত্যেক রাজ্যে বর্তমানে একজন রাজ্যপাল আছেন। তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তিনি নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হিসাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁহার প্রকৃত কোন ক্ষমতা নাই।

মন্ত্রিপরিষদ—কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের অনুরূপভাবে প্রত্যেক রাজ্যে রাজ্যপালকে সাহায্য ও পরামর্শ দান করিবার জন্য মুখ্যমন্ত্রিসহ একটি মন্ত্রিপরিষদ আছে। কেন্দ্রীয় পরিষদের অনুরূপভাবেই ইঁহারা শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং এইজন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন।

রাজ্য আইনসভা—বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, মধ্য প্রদেশ, মহীশূর, কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা রাজ্যপালসহ দুইটি

পরিষদ ও অন্য রাজ্যসমূহের আইনসভা রাজ্যপালসহ একটি পরিষদ লইয়া গঠিত। উচ্চকক্ষের মোট সদস্যসংখ্যা নিম্নকক্ষের সদস্যসংখ্যার এক-চতুর্থাংশের অধিক বা ৪০-এর কম হইতে পারে না। নিম্নকক্ষের সদস্যগণের সর্বোচ্চ সংখ্যা ৫০০ এবং সর্বনিম্ন সংখ্যা ৬০ জন। উচ্চকক্ষের সদস্যগণ বিভিন্ন নির্বাচনকেন্দ্রের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন ও কিছুসংখ্যক সদস্য রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। নিম্নকক্ষের সদস্যগণ প্রত্যক্ষ ভোটদান পদ্ধতিতে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

রাজ্য আইনসভাগুলির কার্য সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট সভার অনুরূপ পদ্ধতিতেই পরিচালিত হয়।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল—হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ও লাক্ষাদ্বীপের শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন শাসকের মাধ্যমে এগুলির শাসনকার্য পরিচালিত হয়। ইহা কার্যতঃ কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত।

শাসনতন্ত্রের সংশোধন পদ্ধতি—সাধারণভাবে বলিতে গেলে ভারতের শাসনতন্ত্রকে অনমনীয় আখ্যা দেওয়া হয়। পার্লামেন্ট সভা সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে এই শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না। ১। শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে হইলে পার্লামেন্টের যে-কোন কক্ষে সংশোধন-প্রস্তাব একটি বিলের আকারে উত্থাপন করিতে হইবে। সংশোধন-প্রস্তাব বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইতে হইলে প্রত্যেক কক্ষে উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সংখ্যাধিক্য ভোটে ও সমগ্র সদস্যবৃন্দের সংখ্যাধিক্যে অনুমোদিত হওয়া এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করা চাই। ২। কতিপয় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যথা, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন-ব্যবস্থা, সুপ্রিম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়-সংক্রান্ত বিষয়, আইন-প্রণয়ন ক্ষমতার বণ্টনপদ্ধতি প্রভৃতি পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত সংশোধন-প্রস্তাব রাজ্য আইনসভাগুলির অর্ধেক কর্তৃক গৃহীত হওয়া চাই। ৩। নূতন রাষ্ট্রগঠন বা বর্তমান রাষ্ট্রগুলির পুনর্গঠন প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় আবার পার্লামেন্ট সভা সাধারণ অধিবেশনে সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতিতে সংশোধন করিতে পারে।

স্থানীয় শাসন

একটি দেশ ছোট ছোট এলাকায় বিভক্ত হইয়া যখন প্রত্যেকটি এলাকার স্থানীয় শাসনের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হয়, তখন এই স্বতন্ত্র শাসন-ব্যবস্থাকে স্থানীয় শাসন বলা হয়।

বিভাগ ও বিভাগীয় শাসন

একটি রাজ্যকে কতকগুলি বিভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক বিভাগে একজন কমিশনার থাকেন।

জেলাশাসক

কতকগুলি জেলা লইয়া বিভাগ গঠিত। জেলাগুলিই হইল শাসন-ব্যবস্থার প্রাথমিক উপাদান। জেলায় একজন ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টর থাকেন। তিনি সাধারণতঃ ভারতীয় শাসন পরিচালনা কৃত্যকের কর্মচারী। তিনি জেলার সর্বময় কর্তা। তাঁহার বিচার-ক্ষমতাও আছে।

মহকুমা শাসক

জেলাগুলি কতকগুলি মহকুমা লইয়া গঠিত হয়। প্রত্যেক মহকুমায় একজন মহকুমা শাসক থাকেন। মহকুমার অধীনে কতকগুলি থানা থাকে।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

স্থানীয় সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে স্থানীয় লোকের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত শাসন-ব্যবস্থাকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বলা হয়।

কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠান

১০০ জন সদস্য লইয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত। সদস্যগণের মধ্যে ৫ জন অল্ডারম্যান থাকেন। সকল সদস্য মিলিয়া একবৎসরের জন্য একজন মেয়র ও একজন ডেপুটি মেয়র নির্বাচন করেন। সদস্যগণ ৪ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন।

জনস্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা, জন-সুবিধা ও প্রাথমিক শিক্ষা হইল পৌরপ্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। এই কাজের জন্য যে ব্যয় হয় তাহা বাড়ী ও জমির মূল্যের উপর কর, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর কর, সরকারী সাহায্য ইত্যাদি উপায়ে সংগৃহীত হয়।

সাধারণ পৌরপ্রতিষ্ঠান

অন্যান্য শহরে ৯ হইতে ৩০ যে-কোন সংখ্যক নির্বাচিত সদস্য লইয়া এই প্রতিষ্ঠানগুলি গঠিত হয়। সদস্যগণ একজন সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচন করেন। ইহাদের আয় ও ব্যয় কর্পোরেশনের আয়-ব্যয়ের অনুরূপ।

জেলা বোর্ড

গ্রামাঞ্চলে জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি থাকে। কমপক্ষে ৯ জন নির্বাচিত সদস্য লইয়া জেলা বোর্ড গঠিত হয়। একজন নির্বাচিত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও কয়েকজন স্থায়ী কর্মচারী থাকে। জেলার মধ্যে পানীয় জল সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করা, রোগ নিবারণ করা, রাস্তাঘাট ও হাট-বাজার প্রভৃতি তৈয়ারী করা হইল ইহার কার্য। সেস্ ও সরকারী সাহায্য হইল ইহার প্রধান আয়।

স্থানীয় বোর্ড

মহকুমায় বা তালুকে এই বোর্ড গঠিত হয়। কমপক্ষে ৬ জন সদস্য থাকে। ইহার নিজস্ব কোন আয়-ব্যয় নাই। জেলা বোর্ডের প্রতিনিধি হিসাবে জেলা বোর্ডের নির্দেশমত ইহা কাজ করে।

ইউনিয়ন বোর্ড ও গ্রাম পঞ্চায়েৎ

৬ হইতে ৯ জন সংখ্যক সদস্য লইয়া প্রতি গ্রামের বা কয়েকটি গ্রামের জন্য একটি বোর্ড গঠিত হয়। গ্রামের শান্তিরক্ষা এবং স্বাস্থ্য, প্রাথমিক শিক্ষা, জলসরবরাহ প্রভৃতি কার্যের ব্যবস্থা করে। শান্তিরক্ষার জন্য বোর্ড চৌকিদার রাখে। চৌকিদারী ট্যাক্স হইল ইহার প্রধান আয়। অনেক জায়গায় বোর্ডের পরিবর্তে গ্রাম পঞ্চায়েৎ আছে। ১৯৫৬ সালের নূতন আইন অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে নূতন ধরণের পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা গঠন করা হইয়াছে।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. State the relation between the Centre and the States of the Indian Union on legislative and executive matters. [H. S. (Hu.,) Comp, 1960]
2. Discuss the distribution of legislative powers between the Centre and the States in the constitution of India. [H. S. (Hu.) Comp., 1961]
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে (১) আইন-প্রণয়ন সম্পর্ক ও (২) শাসনসম্পর্ক আলোচনা কর।

উঃ—আইন-প্রণয়ন সম্পর্কে প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির কর্মক্ষেত্র পৃথক করিয়া দেওয়া হয় এবং শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনা করে। অপর দিকে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির উপর রাজ্য সরকারগুলি কর্তৃত্ব করে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির কর্মক্ষেত্র পৃথক

হইলেও সরকারী কাজের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য উভয় সরকারের মধ্যে যাহাতে সহযোগিতা থাকে তাহারও ব্যবস্থা করা হয়।

যদিও আইন-প্রণয়ন বিষয়ে রাজ্য সরকারগুলির কর্মক্ষেত্র শাসনতন্ত্র কর্তৃক পৃথক করা হইয়াছে তথাপি নিম্নলিখিত তিনটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনসভা রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। প্রথমতঃ, যদি দুই বা ততোধিক রাজ্যের আইনসভা কেন্দ্রীয় আইনসভাকে কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করে তবে কেন্দ্রীয় আইনসভা ঐ বিষয়টি রাজ্য তালিকাভুক্ত হইলেও ঐ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট সভার উচ্চ পরিষদ অর্থাৎ রাজ্যসভা দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে যদি এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, কোন রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় সম্বন্ধে জাতীয় কল্যাণের জন্য কেন্দ্রীয় আইনসভার আইন প্রণয়ন করা উচিত তাহা হইলে ঐ বিষয়টি সম্পর্কে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট সভা যে-কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে এবং কোন রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হইলে পার্লামেণ্ট রাজ্য আইন সভার স্থান অধিকার করিতে পারে।

যুগ্ম বিষয়গুলির উপর উভয় সরকারই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য—আইন প্রণয়ন করিতে পারে। কিন্তু যুগ্মতালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে রাজ্য আইনসভা দ্বারা প্রণীত যে-কোন আইনের সহিত যদি পার্লামেণ্ট প্রণীত কোন আইনের বিরোধ হয়, তাহা হইলে পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনই বলবৎ হইবে।

শাসন সম্পর্ক—শাসন পরিচালনা সম্পর্কে উভয় সরকারই নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন থাকিবে। কিন্তু সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাজ্য সরকারগুলির শাসনক্ষমতা এরূপভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনক্ষমতা ব্যাহত না হয়। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় শাসনকর্তৃপক্ষ প্রয়োজনক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দান করিতে পারিবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে রাজ্য সরকারকে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, সামরিক অথবা জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত কারণে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইলে যানবাহন চলাচল ব্যবস্থা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে প্রয়োজনক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দান করিতে পারিবে এবং এই নির্দেশ অনুসারে রাজ্য সরকারগুলির কাজ করিতে হইবে। যদি কোন রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কোন নির্দেশ উপেক্ষা করে, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি এই উপেক্ষাকে শাসনতন্ত্রে অচলাবস্থার উদ্ভব মনে করিতে পারেন এবং সেজন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত রাজ্য সরকারগুলির সম্পর্ক বিচার করিয়া রাজ্য সরকারগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের অধস্তন প্রতিনিধিমাত্র বলিতে পারা না গেলেও এ কথা সত্য যে, কেন্দ্রীয় সরকার নানাভাবে রাজ্য সরকারগুলির উপর তাহার কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে পারে।

8. **Discuss the relation between the two houses of Parliament.**

[H. S. (H.u.), Com., 1961]

ভারতে পার্লামেণ্ট সভার উভয় কক্ষের সম্পর্ক আলোচনা কর।

উঃ—রাষ্ট্রপতি, রাজ্যসভা ও লোকসভা লইয়া কেন্দ্রীয় আইনসভা গঠিত। ক্ষমতার দিক দিয়া দেখিতে গেলে রাজ্যসভা অপেক্ষা লোকসভার ক্ষমতা অনেক বেশী।

১। সাধারণ আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে উভয় কক্ষই সম-ক্ষমতার অধিকারী। আইনের প্রস্তাব যে-কোন কক্ষে উত্থাপন করা যায় এবং একটি কক্ষ কর্তৃক পাস হইলে অপর কক্ষে উপস্থিত করা হয়। উভয় কক্ষের মধ্যে মতান্তর ঘটিলে এবং ছয় মাসের মধ্যে মীমাংসা না হইলে রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের যুগ্ম অধিবেশন আহ্বান করিয়া সংখ্যাধিক্যের ভোটে প্রস্তাবটিকে পাস করাইতে পারেন। লোকসভার সদস্য সংখ্যা রাজ্যসভার সদস্য সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ। সুতরাং যুগ্ম অধিবেশনে লোকসভার মত সাধারণতঃ প্রাধান্য লাভ করে।

২। দ্বিতীয়তঃ, আয়-ব্যয়-সম্পর্কিত ব্যাপার একমাত্র লোকসভাই নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, ব্যয়ের দাবির প্রস্তাব রাজ্যসভা কেবলমাত্র আলোচনা করিতে পারে, কিন্তু ভোট দিতে পারে না। রাজস্ব বিল লোকসভায় প্রথম পেশ করিতে হয় এবং এই সভা কর্তৃক অনুমোদিত হইলে রাজ্যসভায় প্রেরিত হয়। রাজ্যসভা যদি কোন পরিবর্তনের প্রস্তাব করে তবে লোকসভা তাহা গ্রহণ বা বর্জন করিতে পারে। লোকসভা কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব রাজ্যসভায় প্রেরিত হইবার ১৪ দিন পর পর্যন্ত যদি রাজ্যসভার সুপারিশ সহ অথবা বিনা সুপারিশে লোকসভায় প্রেরিত না হয়, তবে উক্ত প্রস্তাব লোকসভার মতানুযায়ী আইনে পরিণত হইবে।

৩। ভারতের মন্ত্রিপরিষদও লোকসভার নিকট দায়ী। রাজ্যসভা অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়াও মন্ত্রিপরিষদকে অপসারিত করিতে পারে না।

৪। তবে একটিমাত্র ক্ষেত্রে রাজ্যসভার বিশেষ একটি ক্ষমতা আছে। রাজ্যপরিষদ যদি দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় আইনপরিষদের রাজ্য তালিকাভুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করা যুক্তিযুক্ত তাহা হইলে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ এ বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে পারে।

4. Describe the position and powers of the President in the Indian Constitution. [H. S. (Com.), 1961 (Comp.)]

ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা কর।

5. Indicate the powers of the President of the Indian Union. How is he elected? [H. S. (Hu.) 1960.]

ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা আলোচনা কর। তিনি কি পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন?

উত্তরের ইঙ্গিত—নির্বাচন—রাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ ৫ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন এবং পুনর্নির্বাচিত হইতে পারেন। রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থিকে ৩৫ বৎসর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। ভারতীয় পার্লামেণ্ট সভার উভয় কক্ষের সদস্যগণ ও রাজ্যসমূহের নিম্ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ কর্তৃক একক হস্তান্তরযোগ্য গোপন ভোট দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

পদমর্যাদা—রাষ্ট্রপতি হইলেন ভারতের সর্বপ্রথম ও সর্বসম্মানিত নাগরিক। তিনিই কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিনায়ক ও তাঁহার নামেই কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য পরিচালিত হয়। কিন্তু ভারতে রাষ্ট্রপতি শাসনক্ষমতার উচ্চতম কর্তৃপক্ষ হইলেও কার্যতঃ তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুসারে শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব কার্যতঃ মন্ত্রিপরিষদ সহ প্রধানমন্ত্রীর উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

ক্ষমতা—শাসনতন্ত্র কর্তৃক রাষ্ট্রপতির উপর প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহকে সাধারণতঃ পাঁচভাগে ভাগ করা হয়, যথা,

১। শাসন পরিচালনার ক্ষমতা (Executive Powers)

২। আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা (Legislative Powers)

৩। অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা (Financial Powers)

৪। বিচার-বিষয়ক ক্ষমতা (Judicial Powers)

৫। জরুরী ক্ষমতা (Emergency Powers)

(ক) জরুরী অবস্থার ঘোষণা, (খ) রাজ্যগুলির শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার ঘোষণা, (গ) অর্থ-সংক্রান্ত জরুরী অবস্থা ঘোষণা।

6. State the composition and functions of the Supreme Court of India.
[H. S. (Hu.), 1960]

ভারতের সুপ্রিম কোর্টের গঠন ও ক্ষমতার বিবরণ দাও।

উত্তরের ইঙ্গিত—গঠন—একজন প্রধান বিচারপতি ও অনধিক সাতজন বিচারপতি লইয়া এই আদালত প্রথম গঠিত হয়। বর্তমানে প্রধান বিচারপতি ব্যতীত আরও ১৩ জন বিচারপতি লইয়া এই আদালত গঠিত হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি ইঁহাদিগকে নিযুক্ত করেন এবং বিচারপতিগণ পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স পর্যন্ত কাজ করিতে পারেন।

ক্ষমতা—১। আদিম—কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক বিষয় সম্পর্কে বিরোধের মীমাংসা করা।

২। আপীল—বিভিন্ন রাজ্যের উচ্চ আদালতের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার রায়ের বিরুদ্ধে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে আপীল শোনা।

৩। পরামর্শ—রাষ্ট্রপতির অনুরোধক্রমে শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা সম্পর্কে মতামত দেওয়া।

৪। মৌলিক অধিকার—নাগরিকগণের শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত মৌলিক অধিকার রক্ষা করা।

7. How does the Union Legislature exercise its control over the Union Executive?
[H. S. (Hu.), Comp., 1960]

কেন্দ্রীয় আইনসভা কি প্রকারে কেন্দ্রীয় শাসনকর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করে?

উত্তরের ইঙ্গিত—নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ভারতে দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। দায়িত্বশীল সরকারের তাৎপর্য হইল যে, যাঁহারা শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাঁহারা আইনসভার নিকট তাঁহাদের শাসন পরিচালনা নীতি ও কার্যক্রমের জন্য দায়ী থাকেন। ভারতে সরকারের কার্য নিম্নলিখিত উপায়ে আইনসভা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

১। আইনসভার সদস্যগণ অধিবেশনের সময় বিভিন্ন বিষয়ে মন্ত্রীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এবং মন্ত্রিগণের প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়।

২। সদস্যগণ কোন মন্ত্রীর অন্যায় কাজের প্রতিবাদ স্বরূপ অধিবেশনের সময় "মুলতুবী প্রস্তাব" (Adjournment motion) আনয়ন করিয়া বিষয়টির তৎক্ষণাৎ আলোচনা করিয়া ভোট লইবার দাবী করিতে পারেন।

৩। মন্ত্রিসভার বা কোন মন্ত্রীর কাজ অপছন্দ হইলে ভারতের আইনসভার নিম্ন পরিষদের অর্থাৎ

লোকসভার যে-কোন সদস্য মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পেশ করিতে পারেন। এই প্রস্তাব পাস হইলে মন্ত্রিগণের পদত্যাগ করিতে হয়।

৪। সরকার কর্তৃক উত্থাপিত আয়-ব্যয়ের প্রস্তাব অনুমোদন না করিয়াও লোকসভা মন্ত্রি-পরিষদের কার্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

8. Describe the relations between the Union Executive and the Union Legislature in the present constitution. [H. S. (Com.) 1961]

ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্র অনুসারে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ ও কেন্দ্রীয় আইনসভার মধ্যে সম্বন্ধ ব্যাখ্যা কর।

উত্তরের ইঙ্গিত—ভারতের নূতন সংবিধান ভারতে পার্লামেন্টারী শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে। এই ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত থাকে। ভারতের শাসন-ব্যবস্থায়ও এই উভয় বিভাগের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা দেখা যায়।

শাসকপ্রধান রাষ্ট্রপতি আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি আইনসভা আহ্বান করিতে পারেন বা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। আইন প্রণয়নে তাঁহার সম্মতি প্রয়োজন। ভারতের মন্ত্রিসভা হইল প্রকৃত শাসকবর্গ। মন্ত্রিগণ সকলেই পার্লামেন্টের সদস্য এবং লোকসভার নিকট দায়ী। অন্যদিকে লোকসভা অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়া মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিতে পারে। ইহা ছাড়াও লোকসভা প্রশ্নোত্তর ও সমালোচনা দ্বারা মন্ত্রিপরিষদের কার্য নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

(৭নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য)

9. Discuss the position and powers of the Governor of a state in the Indian Union. [H. S. (Hu.), Comp. 1960]

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যপালদের পদমর্যাদা ও ক্ষমতা আলোচনা কর।

উত্তরের ইঙ্গিত—পদমর্যাদা—পাঁচ বৎসরের জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন রাজ্যপাল প্রত্যেক রাজ্যে আছেন। তিনিই রাজ্যের প্রধান শাসনকর্তা এবং তাঁহার নামেই রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রপতির ন্যায় রাজ্যপালও মন্ত্রিসভার পরামর্শানুসারে নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে কাজ করেন। রাজ্যপাল যদি কোন সময়ে মনে করেন যে, রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা শাসনতান্ত্রিক আইনানুসারে পরিচালনা করা সম্ভব নয়, তবে তিনি এই মর্মে রাষ্ট্রপতিকে বিবরণ পেশ করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে রাজ্যপাল কর্তৃক প্রেরিত বিবরণীর ভিত্তিতে একটি ঘোষণা করিয়া রাজ্যের শাসনভার স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারেন। এরূপ ঘোষণার পর সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুসারে রাজ্যপাল রাজ্যটির শাসনকার্য পরিচালনা করেন। একমাত্র আসামের রাজ্যপালের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলি সম্পর্কে দুইটি বিশেষ ক্ষমতা আছে, যাহা তিনি মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া নিজের ইচ্ছায় প্রয়োগ করিতে পারেন।

ক্ষমতা—১। শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা

২। আইনবিষয়ক ক্ষমতা

৩। অর্থবিষয়ক ক্ষমতা

৪। বিচারবিষয়ক ক্ষমতা

10. What are the powers and functions of the Legislature in West Bengal.
[H. S. (Hu.), 1960]

পশ্চিমবঙ্গের আইনসভার ক্ষমতা ও কাজ সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তরের ইঙ্গিত—পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট। রাজ্যপাল, বিধান পরিষদ ও বিধানসভা লইয়া এই আইনসভা গঠিত।

কাজ :—

১। রাজ্য তালিকাভুক্ত ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করা ও পুরাতন আইন সংশোধন করা।

২। রাজ্যের বাৎসরিক আয়-ব্যয় মঞ্জুর করা। যে-কোন কর ধার্যের প্রস্তাব ও সরকারী অর্থব্যয় আইনসভার অনুমোদনসাপেক্ষ।

৩। প্রশ্নোত্তর, সমালোচনা ও পরিশেষে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব দ্বারা আইনসভা মন্ত্রিসভার কার্য নিয়ন্ত্রণ করে।

৪। আইনসভা ইহার আলাপ-আলোচনা দ্বারা দেশে জনমত সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

11. Describe the organisation of the Judiciary in India. [H. S. (Hu.), 1961]
ভারতের বিচার-ব্যবস্থার বর্ণনা কর।

উত্তরের ইঙ্গিত—১। সুপ্রিম কোর্ট—সর্বভারতীয় সর্বোচ্চ বিচারালয়। ইহার আদিম, আপীল, পরামর্শ ও মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত ক্ষমতা আছে। ইহা একাধারে সর্বভারতীয় ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা সম্পর্কে উচ্চতম আদালত ও যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন প্রধান বিচারপতি ও ১০ জন বিচারপতি লইয়া এই আদালত গঠিত।

২। উচ্চ আদালত—প্রত্যেক রাজ্যে এইরূপ একটি আদালত আছে। একজন প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি লইয়া উচ্চ আদালত গঠিত হয়। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ ব্যতীত অন্যান্য রাজ্যের উচ্চ আদালতগুলি নিম্ন আদালত হইতে আনীত ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয়বিধ মামলার আপীল শুনে। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের উচ্চ আদালতগুলির আদিম ও আপীল উভয়বিধ ক্ষমতা আছে।

উচ্চ আদালতের নিম্নে প্রত্যেক রাজ্যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার জন্য দুই শ্রেণীর আদালত আছে, যথা,

দেওয়ানী	ফৌজদারী
৩। জেলাজজের আদালত সাবজজের "	৩। সেসন্স্ জজের আদালত সহকারী সেসন্স্ জজের আদালত
৪। মুনসেফ "	৪। ম্যাজিষ্ট্রেটের (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর) ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত
৫। ইউনিয়ন "	৫। বেঞ্চ কোর্ট

জেলা ও সেসন্স্ জজেরও আদিম ও আপীল ক্ষমতা আছে। মুনসেফের আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে জেলা জজের আদালতে ও সাধারণ ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে সেসন্স্ জজের আদালতে

আপীল করা যায়। কলিকাতা প্রভৃতি প্রেসিডেন্সি শহরে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার জন্ম নগর আদালত (City Court), প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত ও ছোট আদালত আছে। গুরুতর ফৌজদারী মামলার বিচার জুরীর সাহায্যে পরিচালিত হয়।

12. What are the functions of Municipalities in India? What are their principal sources of revenue. [H. S. (Hu.), 1961]

ভারতের মিউনিসিপ্যালিটিগুলি কি কি কার্য সম্পাদন করে? তাহাদের আয়ের প্রধান প্রধান উৎসগুলি কি?

উত্তরের ইঙ্গিত—প্রত্যেক শহরে একটি করিয়া পৌরপ্রতিষ্ঠান থাকে। করদাতাদের ভোটে চার বৎসরের জন্ম নির্বাচিত রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য লইয়া পৌরপ্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। সদস্যগণ দ্বারা নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান হইলেন পৌরপ্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা।

কার্য—পৌরপ্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান গ্রামাঞ্চলে বা শহরাঞ্চলে কাজ করে, তাহাদের কাজ প্রধানতঃ চারভাগে ভাগ করা হয়। যথা,

১। জনস্বাস্থ্য রক্ষামূলক কাজ ২। জননিরাপত্তামূলক কাজ

৩। জনসুবিধা সৃষ্টিমূলক কাজ ৪। জনশিক্ষা (প্রাথমিক) বিস্তারমূলক কাজ।

আয়—জমি ও বাড়ীর উপর ধার্য কর, জল, আলো ও ময়লা নিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্ম কর, যানবাহনের উপর কর, হাট, বাজার, সেতু, পশুহত্যার উপর শুল্ক, বিভিন্ন পেশাদারী, যথা, উকিল, ডাক্তার, ব্যবসায়ী প্রভৃতির উপর কর, রাজ্য সরকারের নিকট হইতে সময় সময় প্রাপ্ত সাহায্য, ঋণ গ্রহণ প্রভৃতি।

13. Describe the constitution and functions of the District Boards in India. [H. S. (Hu.). 1960]

ভারতের জেলাবোর্ডসমূহের গঠন ও কার্যের বিবরণ লিখ।

উত্তরের ইঙ্গিত—গঠন—এক আসাম ব্যতীত ভারতের সর্বত্র প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া জেলাবোর্ড আছে। রাজ্য সরকার নির্ধারিত কম পক্ষে নয়জন চার বৎসরের জন্ম নির্বাচিত সদস্য লইয়া বোর্ড গঠিত হয়। বোর্ডের সদস্যগণ একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইস্-চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে।

কাজ—১২ নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য। স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির কাজগুলি উদাহরণসহ লিখ, যেমন, পানীয় জল সরবরাহ করা। গ্রামাঞ্চলে এই কাজ পুকুর, কূপ বা নলকূপ খনন করিয়া করা হয়, কিন্তু বড় বড় শহরে কলের জল সরবরাহ করা হয়।

14. Describe the organisation and functions of the Village Union Boards in West Bengal. [H. S. (Com), 1961]

পশ্চিমবঙ্গের ইউনিয়ন বোর্ডগুলির গঠন ও কার্যাবলীর বিবরণ দাও।

উত্তরের ইঙ্গিত—কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়। সদস্যসংখ্যা ৬ হইতে ৯-এর বেশী হইবে না। তাঁহারা ৪ বৎসরের জন্ম গ্রামের বাসিন্দাগণের মধ্যে যাহারা

৩৭ পয়সা চৌকিদারী ট্যাক্স অথবা ৫০ পয়সা সেস্ দেন, তাহাদের দ্বারা নির্বাচিত হন। বোর্ডের প্রধান কর্মকর্তা সভাপতি, সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন।

ইউনিয়ন বোর্ডও গ্রামের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সুবিধা ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে নানাবিধ কাজ করে।

ইহাদের আয়ের প্রধান উৎস হইল চৌকিদারী ট্যাক্স। ইহা ছাড়া, খেয়াঘাট, খোঁয়াড়, জরিমানা প্রভৃতি হইতেও আয় হয়। চৌকিদার ও দফাদারের বেতন বাবদ ইহার আয়ের অর্ধেক ব্যয় হয়। সরকার নিযুক্ত সারকেল্ অফিসার বোর্ডের কার্য পরিদর্শন ও তদারক করে।

15. Write a short note on the Union Executive. [H. S. (Comp.) 1964

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-বিভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ।

উঃ—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-বিভাগীয় ক্ষমতা একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত আছে। রাষ্ট্রপতি স্বয়ং অথবা তাঁহার অধস্তন কর্মচারিবৃন্দের সাহায্যে শাসন ক্ষমতা পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রপতি শাসন ক্ষমতার আধার হইলেও তিনি তাঁহার অধস্তন কর্মচারী অর্থাৎ মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সুতরাং রাষ্ট্রপতি অনেকাংশে ইংলণ্ডের রাজার ন্যায় নামসর্বস্ব শাসনতান্ত্রিক শাসক প্রধান। প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হইলেন প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিমণ্ডলী। ইঁহারাই শাসননীতি নির্ধারণ করেন এবং ইঁহাদের কার্যকলাপের জন্য আইনসভার নিম্ন কক্ষের নিকট দায়ী থাকেন। মন্ত্রিমণ্ডলী নির্ধারিত নীতির কার্যক্রম রূপায়িত করেন একদল স্থায়ী কর্মচারী। সুতরাং ভারতের শাসন বিভাগকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম হইলেন শাসক প্রধান রাষ্ট্রপতি। তাঁহার হস্তে শাসন বিভাগীয়, আইন-প্রণয়ন বিষয়ক, বিচার বিভাগীয় ও জরুরী-ক্ষমতা ন্যস্ত আছে। কিন্তু এই ক্ষমতাগুলি তিনি মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে প্রয়োগ করেন অর্থাৎ মন্ত্রিগণই হইলেন প্রকৃত শাসক। তাঁহারা আইনসভার নির্বাচিত সদস্য এবং আইনসভার নিকট দায়ী। প্রত্যেক সরকারী বিভাগের জন্য একজন মন্ত্রী আছেন এবং বিভাগীয় গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও কার্যক্রম মন্ত্রিসভার অনুমোদনে বিভাগীয় মন্ত্রী সম্পাদন করেন। দৈনন্দিন শাসনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য প্রত্যেক বিভাগে সেক্রেটারী, ডেপুটি সেক্রেটারী, আণ্ডার সেক্রেটারী প্রভৃতি বহু কর্মচারী থাকেন। ইঁহারা স্থায়ী কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট-বিভাগ সম্পর্কিত কাজে বিশেষ অভিজ্ঞ। ইঁহারা মন্ত্রিগণকে তথ্য ও পরামর্শ দান করেন, মন্ত্রিগণ নির্ধারিত নীতি কার্যে বলবৎ করেন। সুতরাং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসন বিভাগ রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিসভা ও স্থায়ী কর্মচারী লইয়া গঠিত।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু (Definition and Scope of Economics)

সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু—Definition and Scope

অনেক সময় অর্থকে অনর্থের মূল বলা হয়। কিন্তু এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, অর্থ বা ধন ধর্মসাধনের একটি উপায় এবং এই ধর্ম হইতেই স্থায়ী সুখ লাভ হয়—"ধনাদ্ধর্মস্ততঃ সুখম্"। অর্থের অপব্যবহার অনর্থের কারণ হইলেও বর্তমানে অর্থ মানুষের সুখসমৃদ্ধির একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান বলিয়া পরিগণিত হয়।

অর্থতত্ত্বের সংজ্ঞা সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। পাশ্চাত্ত্য ধনবিজ্ঞানিগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনবিজ্ঞানী অধ্যাপক মার্শালের মতে ধনবিজ্ঞানে আলোচিত হয় মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-প্রণালী—মানুষ কিভাবে অর্থ উপার্জন করে ও কি ভাবে সেই উপার্জিত অর্থ তাহার বিবিধ অভাব মোচনের জন্য ব্যয় করে। মানুষমাত্রই অভাবের দাস। সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই অভাবের সংখ্যা, বৈচিত্র্য ও তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু অভাবমোচনের সকল উপাদান সহজে বা বিনা আয়াসে পাওয়া সম্ভব নয়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বাতাস সহজপ্রাপ্য হইলেও খাদ্য, বস্ত্র ও বাসগৃহ অনায়াসলভ্য নহে। এই জাতীয় অভাব মোচনের জন্য মানুষকে একক বা সম্মিলিতভাবে পরিশ্রম করিতে হয় এবং একমাত্র পরিশ্রমলব্ধ ফলের দ্বারাই তাহার অভাব মোচন হইতে পারে। আদিম মানুষের অভাব ছিল স্বল্প—তাই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষভাবে তাহার অভাব মোচন করিত। সভ্যতাবৃদ্ধির ফলে মানুষ শুধু নিজ চেষ্টা দ্বারা আর তাহার সমুদয় অভাব মোচন করিতে পারে না। তাই তাহারা সংঘবদ্ধভাবে তাহাদের অপরিসীম ও বৈচিত্র্যময় অভাব মোচনের উপাদান উৎপাদন করিয়া অর্থের বিনিময়ে স্বেচ্ছামত সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া অভাব দূর করে। সুতরাং বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য হইল অর্থ উপার্জন করা—কেননা অর্থ ব্যতীত কেহই তাহার

বৈচিত্র্যময় অভাব মোচনের উপাদান আহরণ করিতে পারে না। কোন মানুষই তাহার নিজের পরিশ্রম দ্বারা তাহার অসংখ্য অভাবমোচনের উপাদান উৎপাদন করিতে পারে না। এইজন্যই একজনের পরিশ্রমলব্ধ ফল অন্যের পরিশ্রমলব্ধ ফলের সহিত বিনিময়ের প্রয়োজন হয়। নতুবা অভাবের সম্পূর্ণ মোচন বা তৃপ্তি হইতে পারে না। আর এই বিভিন্ন দ্রব্যের বিনিময়ের বাহন হইল অর্থ। কৃষক তাহার পরিশ্রম দ্বারা উৎপাদিত ধান্য-বিক্রয়লব্ধ অর্থের দ্বারা তন্তুবায়-নির্মিত বস্ত্র সংগ্রহ করে এবং এইরূপে অর্থের সাহায্যে পারস্পরিক বিনিময় দ্বারা প্রত্যেকের অভাব পূরণ হয়। এইজন্য অর্থতত্ত্ব বা ধনবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয়বস্তু হইল অর্থ বা ধন। ধনবিজ্ঞানে মানুষের শুধুমাত্র সেই কর্মপ্রচেষ্টাগুলি আলোচিত হয়, যে প্রচেষ্টাগুলি একমাত্র অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়। নৈতিক বা সামাজিক হিতবোধ দ্বারা পরিচালিত প্রচেষ্টাগুলির উপযোগিতা অস্বীকার না করিলেও সেগুলিকে ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। এইজন্য অনেক লেখক অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় সংক্রান্ত কাজকর্মগুলিকে ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে অর্থ ধনবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইলেও অর্থের আলোচনা ধনবিজ্ঞানের একমাত্র বা মুখ্য লক্ষ্য নহে।

একটু প্রণিধানপূর্বক আলোচনা করিলে দেখা যায় বিনিময় করিবার জন্যই মানুষের অর্থের প্রয়োজন হয় আর এই বিনিময়ের সাহায্যে লোক দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য (scarce goods) সংগ্রহ করে। চাহিদার তুলনায় এই অভাবমোচনের দ্রব্যগুলি এত স্বল্প যে, কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি লইয়া গঠিত কোন জাতি তাহার ইচ্ছামত সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারে না। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিকে—প্রত্যেক জাতিকে—এরূপভাবে এই অভাবমোচনের দ্রব্যগুলির ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিতে হয় যাহাতে ব্যক্তির—জাতির সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হয়। অভাবমোচনের সামগ্রী ব্যবহারের এই নিয়ন্ত্রণের অর্থ হইল নির্বাচন করা বা বাছাই করা। একই ব্যক্তির একই সময়ে কাপড় ও ছাতার প্রয়োজন হইলে তাহাকে বিবেচনা করিতে হয় যে, কোন্‌টি অধিক প্রয়োজনীয়। ব্যক্তির পক্ষে কাপড় ও ছাতার মধ্যে যেরূপ নির্বাচন করিতে হয়, জাতির পক্ষেও সেইরূপ বিচার করিতে হয় যে, যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ করা হইবে, না বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ধনবিজ্ঞান মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অর্থের ভূমিকা লইয়া আলোচনা করে না।

মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্মের মূলে রহিয়াছে **বিনিময় (Exchange), অপ্রাচুর্য (Scarcity)** ও **নির্বাচন (Choice)**।

ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে ইহার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রথমতঃ, ধনবিজ্ঞান একটি সমাজবিজ্ঞান। ইহা মানুষের আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে, কিন্তু এই আচরণ কোন সমাজ-বিচ্ছিন্ন মানুষের আচরণ নহে—ইহা সমাজ দ্বারা প্রভাবিত ও সমাজের অঙ্গীভূত মানুষের আচরণ। দ্বিতীয়তঃ, মানুষের এই আচরণের একটা সীমা নির্ধারিত হইয়াছে। এই আচরণ শুধু স্বল্প উপাদান দ্বারা মানুষ কি প্রকারে তাহার অপরিসীম অভাব মোচন করে—ইহাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, স্বল্প উপাদান দ্বারা অসংখ্য অভাবমোচনের জন্য ব্যক্তির পক্ষে সামগ্রীর বৈকল্পিক ব্যবহার অর্থাৎ সামগ্রী বাছাই করিবার প্রয়োজন হয়। এইজন্য চাউলের অপ্রাচুর্য হইলে গমের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এই বাছাই বা পছন্দ উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ-ব্যবস্থা সব ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করিতে হয়, নতুবা স্বল্প উপকরণ দ্বারা অফুরন্ত অভাব মিটিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, ধনবিজ্ঞানে ব্যক্তিগত পছন্দের কোন স্থান নাই। কারণ, মানুষ সামাজিক জীব। সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা উৎপাদন-কার্য পরিচালিত হয়। এইজন্যই সমাজে শ্রমবিভাগ সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেইজন্য বিনিময়ের প্রয়োজন হয়। সুতরাং মানুষের অভাবমোচনের সর্ববিধ প্রচেষ্টার ফল এই বিনিময়কার্যের উপর নির্ভরশীল বলিয়া ধনবিজ্ঞানে বিনিময়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ধনবিজ্ঞান কি ধনেরই বিজ্ঞান—Is Economics the Science of Wealth ?

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, অর্থের উপার্জন ও অর্থের ব্যয় ধনবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু হইলেও অর্থই ধনবিজ্ঞানের আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অর্থ বিনিময়ের বাহন মাত্র—ইহা প্রত্যক্ষভাবে মানুষের অভাব মোচন করিতে পারে না। অর্থ উপকরণমাত্র, ভোগ্যবস্তু নহে। অর্থের বিনিময়ে মানুষ তাহার অভাবমোচনের দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া সেই দ্রব্য দ্বারা তৃপ্তিলাভ করে। এইরূপে অভাব দূরীভূত হইলে মানুষ উন্নততর জীবন-যাপন করিতে পারে। সুতরাং ধনবিজ্ঞান আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য হইল মানব-জীবনের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন করা।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে কেহ যদি এ-কথা মনে করেন যে, অর্থ বা ধন বৃদ্ধি পাইলেই মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, তাহা হইলে মারাত্মক ভুল হইবে। অর্থ বা সম্পদ মানুষের কল্যাণসাধনে সাহায্য করে মাত্র, কিন্তু অর্থ ও কল্যাণ সমার্থক নহে। অর্থ বৃদ্ধি পাইলেই যে কল্যাণ বৃদ্ধি পাইবে ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই—আবার যাহার দ্বারা কল্যাণ বৃদ্ধি পায় তাহা অর্থ দ্বারা আহরণ করা সম্ভব নাও হইতে পারে। অনেকের মাদক দ্রব্যের চাহিদা আছে এবং প্রচুর অর্থের অধিকারী অর্থের বিনিময়ে মাদক দ্রব্য ক্রয় করিয়া তাহার অভাব মোচন করিতে পারে, কিন্তু মাদক দ্রব্যের অত্যধিক ব্যবহারের ফলে কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ ঘটে। অপর পক্ষে প্রচুর মুক্ত বায়ু, জল ও সূর্যালোক প্রভৃতি প্রকৃতির দান মানব-কল্যাণের অপরিহার্য উপাদান হইলেও ইহারা অনায়াসলভ্য বলিয়া ইহাদের কোন অর্থমূল্য নাই। পূর্ণাঙ্গ জীবন-যাপনের জন্য পিতা-মাতার স্নেহ, বন্ধুর প্রীতি, উন্নততর সামাজিক পরিবেশ একান্ত অপরিহার্য, কিন্তু এইগুলিও অর্থ দ্বারা বিনিময়যোগ্য নহে। অর্থশালী হইলেই যে মানুষের মানসিক অবস্থা উন্নততর হইয়া কল্যাণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, ইহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। শান্তিময়, সরল ও উচ্চস্তরের জীবন-যাপন অর্থের উপর নির্ভরশীল নহে।

আসল কথা হইল যে, দারিদ্র্য মানবজীবনের অগ্রগতির প্রধান অন্তরায়। দারিদ্র্য দূর করিয়া মানুষকে অবনতির হস্ত হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় হইল প্রচুর অভাবমোচনের সামগ্রীর উৎপাদন। সম্পদের অপব্যবহার নানাবিধ কুফল সৃষ্টি করে—ইহা সত্য। কিন্তু উৎপাদিত সম্পদের যদি যথাযথ সদ্ব্যবহার হয়, তাহা হইলে ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হয়। সম্পদের অভাবে মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গল বাধাপ্রাপ্ত হয়। ক্ষুধার্ত ও নিরাশ্রয় ব্যক্তির আহার, বাসস্থান ও শিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া শুধু নীতি-বাক্য দান করিয়া তাহার কল্যাণসাধন করা সম্ভব নয়। সুতরাং সম্পদ ব্যতীত প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। এ সম্পর্কে আরও একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, মানুষের কল্যাণ শুধু সম্পদ-উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না—উৎপাদিত সম্পদ যদি অল্পসংখ্যক লোকের আয়ত্তে থাকে তাহা হইলে সমাজের অধিকাংশ লোকের অভাবমোচন হইতে পারে না। এইজন্য বর্তমানে সম্পদ-উৎপাদন অপেক্ষা সম্পদ বণ্টন-ব্যবস্থার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়।

আধুনিক রাষ্ট্রগুলি ক্রমশঃই কল্যাণ-রাষ্ট্রে পরিণত হইতেছে। জনকল্যাণ সাধন করাই হইল আধুনিক রাষ্ট্রগুলির প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে বর্তমান রাষ্ট্রীয় সরকারগুলি একদিকে যেরূপ নানাভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে, অপরদিকে সেইরূপ ক্রমবর্ধমানহারে কর, উত্তরাধিকার কর প্রভৃতি ধার্য করিয়া আয়ের পার্থক্য দূর করিবার চেষ্টা করিতেছে। সাধারণের হিতার্থে রাষ্ট্র রাস্তাঘাট, পার্ক প্রভৃতি নির্মাণ, জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে চিকিৎসালয়-স্থাপন এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির উন্য শিক্ষাবিস্তার করিতেছে। এই সমস্ত কল্যাণকর কার্য সম্পদ তথা অর্থ ব্যতীত সম্ভব নহে। সুতরাং অর্থ ও কল্যাণ একেবারে সম্পর্কহীন নহে।

ধনবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান—Is Economics a Science ?

ধনবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে কিনা এ-সম্পর্কে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই 'বিজ্ঞান' কাহাকে বলে তাহা জানা প্রয়োজন। বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে পারিলেই ধনবিজ্ঞান প্রকৃত বিজ্ঞান কিনা তাহা নির্ণয় করা সহজ হইবে। বিজ্ঞান শব্দটির সাধারণ অর্থ হইল বিশেষরূপে বিদ্যা বা জ্ঞান। এই জ্ঞান পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা বা গবেষণা দ্বারা আহরণ করা হয় এবং সেইজন্য এই শাস্ত্রকে বিশেষ বিষয়সমূহ-সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ জ্ঞান বলা হয়। এই সুসংবদ্ধ বা শৃঙ্খলিত জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা হইতে কতকগুলি সাধারণ সূত্র বা নিয়ম সংকলন করা যায় ও সেই সংকলিত সূত্র প্রয়োগ করিয়া বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর সত্যাসত্য নির্ণয় করা সম্ভব হয়। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতিকে বিজ্ঞান-পর্যায়ভুক্ত করা হয়, কেননা, তাহাদের বিষয়বস্তুগুলির শ্রেণীবিভাগ, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করিয়া শৃঙ্খলিত জ্ঞান আহরণ করা যায় এবং এইরূপে নির্ণীত জ্ঞান হইতে কতকগুলি কার্যোপযোগী সাধারণ সূত্রও নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

ধনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও উপরি-উক্ত পদ্ধতি প্রযোজ্য। ধনবিজ্ঞানীও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের মত তাঁহার বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাগ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করিয়া অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ-সম্পর্কে শৃঙ্খলিত জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ দেশ-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন হইলেও মানুষ বুদ্ধিজীবী বলিয়া সাধারণতঃ যুক্তি মানিয়া চলে। এইজন্য মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ মূলতঃ

কতকগুলি সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যকে ভিত্তি করিয়া ধনবিজ্ঞানী তাঁহার পরীক্ষাকার্য করিতে পারেন। সুতরাং ধনবিজ্ঞানীর পক্ষে তাঁহার বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাগ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব এবং এই শ্রেণী-বিভক্ত ও পরীক্ষিত জ্ঞান হইতে সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করিয়া বাস্তব অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে উহা প্রয়োগ করাও সম্ভবপর। অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় ধনবিজ্ঞানেরও কতকগুলি সাধারণ সূত্র আছে। সুতরাং ধনবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত না-করিবার কোন সংগত কারণ নাই।

এস্থলে একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধনবিজ্ঞান বিজ্ঞান-পদবাচ্য হইলেও ইহা রসায়ন বা পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি প্রাকৃত বিজ্ঞানগোষ্ঠীর সমপর্যায়ভুক্ত নহে। তাহার কারণ হইল যে, ধনবিজ্ঞানে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার ক্ষেত্র স্বল্প-পরিসর। যে বিষয়বস্তু লইয়া ধনবিজ্ঞানী আলোচনা করেন, তাহা বহুল পরিমাণে বাহ্যিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে। আর এই বাহ্যিক পরিবেশ এত দ্রুত পরিবর্তনশীল যে, ইহা পর্যবেক্ষণ করিয়া যে-কোন সিদ্ধান্ত করা হউক না কেন তাহা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত রাসায়নিক দ্রব্যগুলির নির্দিষ্ট অবস্থায় নির্দিষ্ট কারণে একই প্রকার প্রতিক্রিয়া হয়। কিন্তু ধনবিজ্ঞানী যদি মানুষের উপর দ্রব্যমূল্যের প্রতিক্রিয়া-সম্পর্কে কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিবার প্রয়াস পান তাহা হইলে তাঁহার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ নির্ভুল হইতে পারে না। তাহার কারণ মানবচরিত্র রাসায়নিক দ্রব্যের মত অপরিবর্তনীয় বা সর্বত্র সমান নহে। ধনবিজ্ঞান একটি সমাজবিজ্ঞান। কোন সমাজবিজ্ঞানই প্রাকৃত বিজ্ঞানগুলির মত সম্পূর্ণ নহে। এইজন্য ধনবিজ্ঞানকে আবহবিদ্যার ন্যায় অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

অর্থনৈতিক সূত্র ও ইহার প্রকৃতি--Nature of Economic Laws

সকল বিজ্ঞানেরই কতকগুলি সাধারণ সূত্র থাকে। ধনবিজ্ঞানেরও কতক-গুলি সূত্র আছে। এই সূত্রগুলি ধনবিজ্ঞানী তাঁহার বিষয়বস্তুর পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষাকার্য দ্বারা আহরণ করেন। তবে অর্থনৈতিক সূত্রগুলির প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, এই সূত্রগুলি অনুমানসিদ্ধ বা শর্তাধীন (hypothetical)। অর্থনৈতিক সূত্রগুলি কার্যকারণের ফলাফল প্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি অবস্থার পরিবর্তন না ঘটে তাহা হইলে মূল্যবৃদ্ধির

ফলে সাধারণতঃ চাহিদা হ্রাস পায় ও মূল্যহ্রাসের ফলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ধনবিজ্ঞানী তাঁহার বিষয়বস্তুর পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা মূল্যের সহিত চাহিদার সম্পর্কের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নির্দিষ্ট অবস্থায় সত্য অর্থাৎ ইহা শর্তাধীন। যদি অবস্থার পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ যদি লোকের রুচি বা অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটে, অথবা আয় বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়, তাহা হইলে মূল্যের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন নাও হইতে পারে। সুতরাং অর্থনৈতিক এই সূত্রটি অনুমানসিদ্ধ মাত্র—সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। অর্থ-নৈতিক সূত্রগুলি অনুমানসিদ্ধ বা শর্তাধীন—একথা অনস্বীকার্য। একটু প্রণি-ধানপূর্বক দেখিলেই বুঝা যায় যে, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি প্রাকৃত বিজ্ঞানগুলির সূত্রসমূহও অর্থনৈতিক সূত্রগুলির ন্যায় অনুমানসিদ্ধ বা শর্তাধীন। রাসায়নিক দুই-অণু উদজান ও এক-অণু অম্লজানের সংমিশ্রণে জল উৎপাদন করিতে পারেন। কিন্তু এই দুইটি মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণ একটি অপরিবর্তিত অবস্থায় হওয়া চাই অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও চাপ বর্তমান থাকিলেই দুই-অণু উদজান ও এক-অণু অম্লজান জলে পরিণত হয়। তাপ ও চাপের পরিবর্তন ঘটিলে রাসায়নিকের সিদ্ধান্তও ধনবিজ্ঞানীর সিদ্ধান্তের ন্যায় নির্ভুল হয় না। সুতরাং এদিক দিয়া দেখিতে গেলে ধনবিজ্ঞানের সূত্র ও রসায়নের সূত্র সমপর্যায়ভুক্ত বলিতে হয় এবং ধনবিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলা চলে।

ধনবিজ্ঞানের সূত্রগুলির সহিত প্রাকৃত বিজ্ঞানের সূত্রগুলির প্রধান পার্থক্য হইল যে, ধনবিজ্ঞানের সূত্রগুলি প্রাকৃত বিজ্ঞানের সূত্রগুলির ন্যায় সঠিক (exact) নহে। নির্দিষ্ট অবস্থায় দুই-অণু উদজান ও এক-অণু অম্লজান জলে পরিণত হইবেই, কিন্তু ধনবিজ্ঞানীর সব সিদ্ধান্ত এরূপ অভ্রান্ত নহে বা হইতে পারে না। অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলির এই অনিশ্চয়তার প্রথম কারণ হইল যে, ধনবিজ্ঞানী অর্থের দ্বারা মানুষের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের পরিমাপ করিয়া থাকেন। কিন্তু অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যতীতও অন্য নানা উদ্দেশ্য দ্বারা মানুষ কার্যে প্রণোদিত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত বলা যাইতে পারে যে, মানব-চরিত্র রাসায়নিক দ্রব্যের মত অপরিবর্তনীয় বা সর্বত্র সমান নহে। অবস্থা-পরিবর্তনের সহিত মানব-চরিত্রেও পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি গণিতশাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলির মত ধ্রুবসত্য হইতে পারে না।

ধনবিজ্ঞান ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান—Economics and other Social Sciences

ধনবিজ্ঞানে ধন বা সম্পদকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের কার্যকলাপ আলোচিত হয়। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, তাই এই সমাজবদ্ধ মানুষের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাগুলির আলোচনা করাই ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। কিন্তু সমাজের বাহিরে নির্জন স্থানে বসবাসকারী লোকেরও অভাব মিটাইবার জন্য খাদ্য, বাসস্থান প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হয়। জনমানবহীন দ্বীপে নির্বাসিত রবিনসন্ ক্রুসোরও খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়স্থল সংগ্রহ করিবার জন্য পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সমাজের সহিত সম্পর্ক-রহিত কোন মানুষের কার্যকলাপই ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় বলিয়া পরিগণিত হয় না। যে সমস্ত মানুষ শৃঙ্খলার সহিত পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হইয়া সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করে, ধনবিজ্ঞানে শুধু সেই সমস্ত মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার আলোচনা করা হয়। এইজন্য ধনবিজ্ঞানকে একটি সমাজবিজ্ঞান বলা হয়।

ধনবিজ্ঞান একটি সমাজবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান হিসাবে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়।

ধনবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান—Economics and Sociology

ধনবিজ্ঞান সমাজবদ্ধ মানুষের কার্যকলাপের একটা বিশেষ দিক অর্থাৎ অর্থনৈতিক কার্যকলাপ লইয়া আলোচনা করে, আর সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হইল মানুষের সমগ্র সামাজিক জীবনের আলোচনা করা। মানুষ কি করিয়া প্রকৃতিদত্ত স্বল্প উপাদানে তাহার অসংখ্য অভাব পূরণ করে, ইহাই ধনবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানে মানবজীবনের সব দিকই আলোচিত হয়। পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি, রাষ্ট্র, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সমাজের ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিষ্ঠান ও মানবজাতির আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতি জীবনযাত্রা-প্রণালী সর্ববিষয়ে আলোচনা হয় সমাজবিজ্ঞানে। এইজন্য ধনবিজ্ঞানকে সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা বলা যাইতে পারে।

ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান—Economics and Politics

ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র পৃথক হইলেও উভয় শাস্ত্রই

ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। উভয় শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এক—সমাজের হিতসাধন করা। বেকার-সমস্যা দূর করা, দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান করা ও কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিয়া দেশে যথেষ্ট ধনাগমের ব্যবস্থা করা এবং ধন দ্বারা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন করা ধনবিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য। ধনবিজ্ঞানের সম্পর্ক-রহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞান কোন সুফল দিতে পারে না। দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা, এমন কি রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব অনেকাংশে অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। আবার দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, ইহার ধনোৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টন-ব্যবস্থা বর্তমান যুগে রাষ্ট্রদ্বারা অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। বহু অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান রাষ্ট্র ব্যতীত কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কোন প্রতিষ্ঠান করিতে পারে না। বর্তমান যুগে বহু অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য রাষ্ট্র বহু জনহিতকর কার্য স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে।

ধনবিজ্ঞান ও ইতিহাস—Economics and History

ইতিহাসে মানবজীবনের সর্ববিধ কার্যের আলোচনা হয়। মানুষের অর্থ-নৈতিক জীবনের কার্যাবলীর বিবরণও ইতিহাসে পাওয়া যায়। সুতরাং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উপর লক্ষ্য রাখিয়া ধনবিজ্ঞানের আলোচনা না করিলে সে আলোচনা কখনও সার্থক হয় না। আবার, অর্থনৈতিক কার্যাবলীর বিবরণ ব্যতীত কোন দেশের সম্পূর্ণ ইতিহাস গঠিত হইতে পারে না। অতীতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বর্তমান অর্থনৈতিক জীবন সময়োপযোগী করিয়া গঠন করিতে পারিলে মানুষের অর্থনৈতিক জীবন সার্থক হয়।

ধনবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র—Economics and Ethics

সামাজিক আদর্শ অনুযায়ী কোন্ কাজ করা উচিত, আর কোন্ কাজ করা উচিত নয়, নীতিশাস্ত্রে ইহার আলোচনা হয়। নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারেই মানুষের কাজের একটা আদর্শমান স্থির করা হয়; ধনবিজ্ঞানে মানুষের চলিত অর্থ-নৈতিক আচরণ আলোচিত হয় বটে, কিন্তু কিরূপে চলিত আচরণগুলিকে একটি আদর্শ মানে উন্নীত করিয়া মানুষের অর্থনৈতিক জীবন তথা সমগ্র জীবনকে মঙ্গলময় করা যায়, ইহাই হইল ধনবিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য। আর অর্থনৈতিক জীবনের এই আদর্শ মান স্থির হয় নীতিশাস্ত্রের নির্দেশ দ্বারা। সুতরাং ধনবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর বিভাগ—Divisions of Economics

বর্তমানে ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এত বিস্তৃত ও জটিল হইয়াছে যে, এই শাস্ত্রকে কতিপয় সুসংবদ্ধ বিভাগে ভাগ না করিয়া ইহার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নহে। এইজন্য ধনবিজ্ঞানিগণ এই শাস্ত্রকে পাঁচটি অংশে ভাগ করিয়াছেন, যথা,

১। ভোগব্যবহার—Consumption

অভাব মোচন করাই হইল মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং ভোগব্যবহার দ্বারা মানুষ স্বল্প উপাদান সাহায্যে কিভাবে তাহার অসংখ্য অভাব পরিতৃপ্ত করে, এই অংশে তাহাই আলোচিত হয়। অভাবের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিশেষ করিয়া এই অংশে আলোচিত হয়।

২। উৎপাদন—Production

মানুষের অভাব অসংখ্য ও বৈচিত্র্যময় হইলেও অভাব মিটাইবার উপাদান স্বল্প, এই কারণে মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নানা যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাহার বুদ্ধি ও কায়িক শ্রম প্রযোগ করিয়া অভাবপূরণের জন্য নানাবিধ সামগ্রী উৎপাদন করে। সুতরাং উৎপাদন ব্যতীত ভোগব্যবহার সম্ভব নহে। মানুষ যত বেশী পরিমাণ ও উৎকৃষ্ট ধরণের দ্রব্য উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে ততই তাহার অভাবের তৃপ্তি হইবে। সুতরাং একটা দেশের লোকের স্বাচ্ছন্দ্য বা দারিদ্র্য বহুপরিমাণে সেই দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে।

৩। বিনিময়—Exchange

কোন মানুষই তাহার অসংখ্য অভাব পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী নিজে উৎপাদন করিতে পারে না। চাষী ধান বা পাট উৎপাদন করে, কিন্তু লবণ, তৈল, বস্ত্র প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্যের জন্য তাহাকে অন্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং একজনের উৎপন্ন দ্রব্যের সহিত অপরের উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময় না হইলে কাহারও সব অভাব মিটিতে পারে না। ব্যক্তির পক্ষে দ্রব্য-বিনিময় তাহার অভাবপূরণের জন্য যেরূপ অপরিহার্য, বিভিন্ন দেশের মধ্যেও সেইরূপ আন্তর্জাতিক বিনিময় (বাণিজ্য) অপরিহার্য। পাটের বিনিময় ভারতকে অনেক সময় বিদেশ হইতে গম বা ঔষধপত্র সংগ্রহ করিতে হয়। এই অংশের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল বিভিন্ন দ্রব্যের বাজার-ব্যবস্থা, বিনিময়ের মাধ্যম

অর্থাৎ অর্থ ও অর্থের সাহায্যে দ্রব্যমূল্য-নির্ধারণ ও পরিশেষে ব্যাঙ্ক প্রভৃতি যে সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান দেশের মধ্যে ও বিদেশে বিনিময়-কার্যে সাহায্য করে।

৪। বণ্টন—Distribution

আধুনিক কালে অভাবমোচনের সকল প্রকার সামগ্রীই বহু লোকের যুক্ত-প্রচেষ্টায় উৎপাদিত হয়। কেহই একাকী সম্পূর্ণ একটি দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে না। এইজন্য ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা এই চারিটি উৎপাদনের অপরিহার্য উপাদান একত্রে কাজ করে। ব্যবস্থাপক নিজে তাঁহার সংগঠনশক্তি প্রয়োগ করিয়া অপর তিনটি উপাদানের সাহায্যে ধন উৎপাদন করেন। সুতরাং উৎপাদিত ধন হইল জমি, মূলধন, শ্রম ও ব্যবস্থাপনার সমবেত প্রচেষ্টার ফল। সমবেত প্রচেষ্টার ফলে যে ধন উৎপাদিত হয়, তাহা এই চারিটি উপাদানের প্রাপ্য এবং চারিটি উপাদানের মধ্যেই ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। ইহাই হইল ধনবিজ্ঞানের একটি প্রধান বিভাগ। যে নীতি অনুসারে উৎপাদিত ধন বা ইহার অর্থমূল্য এই চারিটি উপাদানের মধ্যে বন্টিত হয়, তাহার উপর দেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

৫। সরকারী আয়-ব্যয়—Public Finance

এই বিভাগে রাষ্ট্র কিভাবে অর্থ আহরণ করিয়া বিভিন্ন কার্যের জন্য ব্যয়-সঙ্কুলান করে, তাহাই আলোচিত হয়। সরকারী আয়ের বিভিন্ন উৎস, বিশেষ করিয়া কর-ব্যবস্থা, সরকারী ঋণ ও সরকারী ব্যয়-সম্পর্কে এই বিভাগে আলোচনা করা হয়।

ধনবিজ্ঞান আলোচনার সার্থকতা—Utility of the Study of Economics

ধনবিজ্ঞানে মানুষের অর্থ উপার্জন ও অর্থব্যয়-সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনা হয় বলিয়া অনেকে এই শাস্ত্রকে অসার ও অকেজো শাস্ত্র বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইহা সত্য নহে—ধনবিজ্ঞান আলোচনা করিবার সার্থকতা আছে। মানুষ শুধু তাহার ক্ষুধা মিটাইবার জন্য বাঁচিয়া থাকে না। ক্ষুধা নিবৃত্তি করা ব্যতীতও তাহার আরও মহত্তর উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। কিন্তু আসল কথা হইল যে, ক্ষুধা নিবৃত্তি না হইলে মানুষের উন্নততর জীবন-যাপন আদৌ সম্ভব হয় না। সুতরাং

যে শাস্ত্রে ক্ষুধা মিটাইবার যথাযথ উপায়গুলি বিশদভাবে আলোচিত হয়, সে শাস্ত্রকে অসার বা অকেজো বলা যুক্তিযুক্ত নয়।

ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু হইল ধন বা সম্পদ। এই ধনই হইল মানুষের সুখ-সমৃদ্ধির প্রধান উপকরণ। ধনের যথাযথ উৎপাদন ও সদ্ব্যবহার দ্বারা কি প্রকারে সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন করা যায়, ধনবিজ্ঞানে তাহারই আলোচনা করা হয়। সুতরাং এই শাস্ত্রকে মানব-কল্যাণের প্রধান সহায়ক শাস্ত্র বলিলেও দোষ হয় না।

এতদ্ব্যতীত ধনবিজ্ঞানের বিবিধ তথ্য ও জটিল সমস্যাগুলির আলোচনা করিলে বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়। শাসন-কর্তৃপক্ষ, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী প্রভৃতির পক্ষে ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা একান্ত আবশ্যক। দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির উত্তমরূপে সমাধান করিতে পারিলে শাসন-কর্তৃপক্ষ জনপ্রিয় হইতে পারেন। ব্যবসায়ীর পক্ষেও শিল্প-সংগঠন এবং উৎপাদন ও বিক্রয়-ব্যবস্থার মূল নীতিগুলির সহিত পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পদার্থ-বিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতি ফলপ্রসূ বিজ্ঞান হইলেও এই বিজ্ঞানগুলি হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান যখন মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে প্রয়োগ করা হয়, একমাত্র তখনই এই বিজ্ঞানগুলির আলোচনা সার্থক হয়। সুতরাং উন্নততর জীবন-যাপনের পক্ষে ধনবিজ্ঞানের আলোচনা একান্ত অপরিহার্য।

আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য—Features of the present-day Economic Structure

বর্তমান যুগে মানুষের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার বহুলাংশ রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগ অর্থনৈতিক জীবনের এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার কারণ হইল যে, সামাজিক প্রয়োজনে সমাজের সামগ্রিক চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাগুলি এরূপভাবে প্রযুক্ত হওয়া উচিত যাহাতে সমাজের সকলেই সর্বাধিক তৃপ্তিলাভ করিতে পারে। বাঙ্গলাদেশে গম অপেক্ষা চাউলের চাহিদা বেশী—সুতরাং শস্য উৎপাদন ক্ষেত্রে গমের চাষ অপেক্ষা ধানের চাষ বেশী হওয়া কাম্য এবং এজন্য প্রয়োজন হইলে এ-বিষয়ে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। সমাজের প্রয়োজন অনুসারে উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালিত না হইয়া যদি ব্যক্তিগত খামখেয়ালের দ্বারা উৎপাদন

ও বন্টন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়, তাহা হইলে অনেক সময় দেখা যায় যে, বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যে সমস্ত দ্রব্যের নিতান্ত প্রয়োজন তদপেক্ষা সৌখিন ও বিলাস-দ্রব্যের উৎপাদন বেশী হইতেছে। এইজন্য মানুষের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাগুলি সুসংবদ্ধ ও শৃঙ্খলিত হওয়া প্রয়োজন। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টাগুলি যখন সমাজের সামগ্রিক চাহিদার ভিত্তিতে শৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হয়, তখন তাহাকে একটা নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলা হয়। সব সমাজে সর্বকালে একই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু থাকে না বা থাকিতে পারে না। সামাজিক পরিবর্তনের সহিত অর্থাৎ লোকের চিন্তাধারা, রুচি, অভ্যাস, বৈদেশিক প্রভাব প্রভৃতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটে।

বৃটিশ শাসনকাল পর্যন্ত ভারতে কোন সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল না। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নিয়ন্ত্রিত হইত। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাত্রাও ছিল কম। এই কারণে তদানীন্তন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অপরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Unplanned Economy) বলা যায়। এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ছিল যে, প্রয়োজন অনুসারে উৎপাদন পরিচালিত হইত না। দেশে উৎকট আয়-বৈষম্য ছিল। বর্তমানে দেশ স্বাধীন হইবার পর জাতীয় সরকার একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনানুযায়ী দেশের যাবতীয় অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা—উৎপাদন, বিনিময়, বন্টন ও ভোগ নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। ভারত সরকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন তাহাকে সম্পূর্ণভাবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Planned Economy) বলা যায় না—কারণ উৎপাদনের কয়েকটি ক্ষেত্রে সরকারী ও বে-সরকারী প্রচেষ্টা পাশাপাশি চলিতেছে। কতকগুলি শিল্প সম্পূর্ণরূপে সরকারী নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হইতেছে, আবার কিছু ব্যক্তিগত বা সমবায়-প্রথায় পরিচালিত হইতেছে। সুতরাং ভারতে বর্তমানে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেও এই ব্যবস্থাকে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Mixed Economy) বলা অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

সংক্ষিপ্তসার

ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু

মানুষ কিভাবে তাহার দৈনন্দিন জীবনে অর্থোপার্জন দ্বারা তাহার অসংখ্য

অভাব মোচন করে ধনবিজ্ঞানে সেই বিষয়ই আলোচিত হয়। মানুষের অভাব অসংখ্য ও নানাবিধ, কিন্তু অভাবপূরণের সামগ্রীর স্বল্পতার জন্য তাহাকে পরিশ্রম দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী আহরণ করিয়া অভাব পূরণ করিতে হয়। সুতরাং ধনবিজ্ঞানে মানুষের সেই প্রচেষ্টাগুলি আলোচিত হয়, যাহার একটা আর্থিক মূল্য আছে। সমাজের অঙ্গীভূত মানুষ হিসাবেই মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার আলোচনা করা হয়। অর্থ উপার্জন ও অর্থের ব্যয় ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হইলেও ইহা আলোচনা করিবার প্রধান উদ্দেশ্য হইল মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন দ্বারা তাহার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন করা।

ধনবিজ্ঞান কি ধনেরই বিজ্ঞান

ধনবিজ্ঞানে মানুষের অর্থ উপার্জন সম্পর্কিত কাজের আলোচনা হইলেও অর্থ বা ধন আহরণ করা এই আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। অর্থ ব্যতীত মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় না ইহা সত্য। প্রচুর পরিমাণে যদি ধনোৎপাদন হয় এবং উৎপাদিত ধন যদি ন্যায্যভাবে বন্টিত হয়, তাহা হইলে লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ধন হইতে স্থায়ী সুখ লাভ হয়। এইজন্য বলা হয় যে, ধনবিজ্ঞানে ধন অপেক্ষা মানব-কল্যাণের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অর্থ বা ধন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই সব সময়ে মানুষের কল্যাণ সাধিত হয় না। আবার, এমন অনেক বিষয় আছে যাহা মানব-কল্যাণের সহায়ক হইলেও ধনবিজ্ঞানের অর্থে ধন বলিয়া ধরা হয় না।

ধনবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান

অধুনা ধনবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা হয়, তাহার কারণ হইল ধনবিজ্ঞানে বিজ্ঞান-বিষয়ক বৈশিষ্ট্যগুলি অল্পবিস্তর পরিমাণে দেখা যায়। ধনবিজ্ঞানীও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের ন্যায় তাঁহার বিষয়বস্তুগুলির শ্রেণীবিভাগ, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করিয়া অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে শৃঙ্খলিত জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের মত সম্পূর্ণ বিজ্ঞান না হইলেও ধনবিজ্ঞান আবহ-বিদ্যার ন্যায় একটি অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান।

অর্থনৈতিক সূত্র

অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় ধনবিজ্ঞানেরও কতকগুলি সূত্র আছে। এই সূত্রগুলি

অন্যান্য বিজ্ঞানের সূত্রের ন্যায় অনুমানসিদ্ধ, তবে ইহারা অন্যান্য বিজ্ঞানের সূত্রের ন্যায় সঠিক নহে। ধনবিজ্ঞান অর্থের দ্বারা মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার পরিমাপ করিবার চেষ্টা করে, সুতরাং এই সিদ্ধান্তগুলি নির্ভুল হইতে পারে না।

ধনবিজ্ঞান ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞান

ধনবিজ্ঞান একটি সমাজবিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানে ধনকে কেন্দ্র করিয়া সমাজবদ্ধ মানুষের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টাগুলির আলোচনা করা হয়। সমাজবিজ্ঞান হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতির সহিত ধনবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। ইতিহাস হইতেই মানুষের অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমান যুগে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের মান রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত হয়। নীতিশাস্ত্র বর্তমান অর্থনৈতিক কার্যকলাপগুলিকে এক আদর্শ মানের দিকে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে।

ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর বিভাগ

১। ভোগ-ব্যবহার, ২। উৎপাদন, ৩। বিনিময়, ৪। বণ্টন ও ৫। সরকারী আয়-ব্যয়।

ধনবিজ্ঞান আলোচনার সার্থকতা

ধনবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু হইল ধন-সম্পর্কে আলোচনা করা। এই আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল যে, কি প্রকারে মানুষের প্রয়োজনীয় সম্পদ যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করিয়া ন্যায়সঙ্গত বণ্টন-ব্যবস্থা দ্বারা ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণ-সাধন করা সম্ভব হয়। সুতরাং এই শাস্ত্রকে মানব-কল্যাণের সহায়ক শাস্ত্র বলা যাইতে পারে। রাষ্ট্রনায়ক, ব্যবসায়ী, শ্রমিক-নেতা প্রভৃতির পক্ষে তাঁহাদের নিয়মিত কার্যপরিচালনার জন্য ধনবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলির সহিত পরিচয় একান্ত আবশ্যক।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. Describe the nature of economic efforts. Show how they promote economic welfare.

   অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার প্রকৃতি বর্ণনা কর। এই প্রচেষ্টা দ্বারা অর্থনৈতিক মঙ্গল কিভাবে বৃদ্ধি পায় তাহা বুঝাইয়া দাও।

উঃ—মানুষ তাহার দৈনন্দিন জীবনে নানা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া নানাবিধ কার্য করে। কেহ অভাব মিটাইবার জন্য কাজ করে, কেহ বা সমাজ-সেবার জন্য কাজ করে, আবার কেহ বা পুণ্য অর্জনের জন্য কাজ করে। কিন্তু মানুষের সব কাজই অর্থনৈতিক কাজ নহে। অভাব মিটাইবার

জন্য মানুষ যে কাজ করে, সেই কাজগুলিই হইল অর্থনৈতিক কাজ। আর এই অর্থনৈতিক কাজগুলি অর্থের দ্বারা পরিমাপ করা হয়। গৃহস্থালীর কার্য বা পরার্থে যে কাজ করা হয় অর্থাৎ যে কাজগুলির বিনিময়ে কোন আর্থিক লেন-দেন হয় না, সেগুলিকে অর্থনৈতিক কাজ বলা হয় না। শুধু মাত্র অর্থের মিনিময়ে যে কাজ হয় তাহাই হইল অর্থনৈতিক কাজ। বাড়ীর পরিচারিকা যে কাজ করে, তাহা হইল অর্থনৈতিক কাজ, কারণ সে বেতন পায়, কিন্তু স্ত্রী সে কাজ করিলে তাহাকে অর্থনৈতিক কাজ বলা হয় না, কারণ স্ত্রীর কার্যের জন্য কোন বেতন নাই।

মানুষের অর্থনৈতিক কার্যের দ্বারা দেশের যাবতীয় সম্পদ উৎপাদিত হয়। একদিকে পশুপালন, কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, পরিবহন প্রভৃতি, অন্যদিকে নানাবিধ সমাজ-সেবামূলক কার্য সৃষ্টি করিয়া মানুষ তাহার অভাব দূর করে। সুতরাং অর্থনৈতিক কার্যের সাহায্যে সম্পদ সৃষ্টি করিয়া মানুষ তাহার অসংখ্য অভাব দূর করে। অভাব স্বভাব নষ্ট করে। সম্পদ ছাড়া দারিদ্র্য দূর হয় না। সুতরাং অর্থনৈতিক কার্যই হইল মানুষের সুখ-সমৃদ্ধির প্রধান উপায়।

2. Define Economics and discuss its scope.

ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশপূর্বক ইহার বিষয়বস্তুর আলোচনা কর।

উঃ—যে শাস্ত্রে মানুষের অভাব মিটাইবার উদ্দেশ্যে অর্থোপার্জন ও উপার্জিত অর্থের ব্যয় সম্পর্কে আলোচনা হয়, সেই শাস্ত্রকে ধনবিজ্ঞান বলা হয়। সুতরাং অর্থোপার্জন ও অর্থ ব্যয় সম্পর্কিত কাজগুলিই হইল ধনবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু। মানুষ যে সমাজে বাস করে, সেই সমাজের দ্বারা প্রধানতঃ তাহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং তাহার অর্থনৈতিক কার্যাবলীও তাহার সামাজিক গণ্ডির ভিতর সামাজিক বিধিনিষেধ দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। সুতরাং ধনবিজ্ঞানে আমরা সামাজিক মানুষের অর্থোপার্জন-সম্পর্কিত কার্যের আলোচনা করি, রবিনসন ক্রুসোর মত সমাজ-বিচ্ছিন্ন মানুষের কাজের আলোচনা করি না। ধনবিজ্ঞান একটি জনকল্যাণকর সমাজ-বিজ্ঞান।

3. Explain clearly the subject-matter of Economics. H. S. (Com.) 1963

ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা কর।

উঃ—অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মূল উৎস হইল মানুষের অভাববোধ। টাকা-পয়সা প্রচলিত হইবার পূর্বে মানুষ পরিশ্রম করিয়া তাহার অভাব মোচনের সামগ্রীগুলি সংগ্রহ করিত। বর্তমানে মানুষ পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জন করে ও উপার্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া তাহার অভাব মিটায়। এই অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয়-সম্পর্কিত কাজকর্মগুলি হইল ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে, ধনবিজ্ঞান হইল সেই শাস্ত্র যে শাস্ত্রে মানুষ তাহার অসীম অভাব সীমায়িত উপকরণ দ্বারা কিভাবে মিটায় তাহার আলোচনা করে।

ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর পরিধি সীমাবদ্ধ। এই শাস্ত্র শুধু সামাজিক মানুষের কাজকর্ম লইয়া আলোচনা করে। দ্বিতীয়তঃ, এই শাস্ত্রে শুধু অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয়-সম্পর্কিত কাজগুলিরই আলোচনা হয়। ধনবিজ্ঞান একটি সমাজহিতকারী বিজ্ঞান—অর্থোপার্জন ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনই হইল এই শাস্ত্র আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধনবিজ্ঞানের কতিপয় মৌলিক ধারণা
(Some Fundamental Concepts)

ধনবিজ্ঞানে ধনকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের কার্যাবলীর আলোচনা করা হয়। কিন্তু ধন কাহাকে বলে তাহা জানিতে হইলে তৎপূর্বে দ্রব্য কাহাকে বলে তাহা জানা প্রয়োজন।

দ্রব্য—Goods

যে সমস্ত সামগ্রী মানুষের অভাব দূর করিতে পারে সাধারণত সেই সমস্ত সামগ্রীকে ধনবিজ্ঞানে দ্রব্য বলা হয়, যেমন—বাড়ী, গাড়ী, জল, আলো, বাতাস ইত্যাদি। এখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, দ্রব্য বলিতে শুধু বাড়ী, গাড়ী প্রভৃতি বাস্তব সামগ্রী বুঝায় না, চিকিৎসকের চিকিৎসা নৈপুণ্য, গায়কের কণ্ঠমাধুর্য প্রভৃতি অবাস্তব সামগ্রীগুলিকেও বুঝায়। এক কথায় বলিতে গেলে যে সমস্ত জিনিষের অভাব মিটাইবার ক্ষমতা আছে—তাহা বাস্তবই হোক বা অবাস্তবই হোক তাহাদিগকে দ্রব্য বলা হয়।

দ্রব্যগুলিকে আবার অনায়াসলভ্য দ্রব্য (Free Goods) ও অর্থনৈতিক দ্রব্য (Economic goods) বলা হয়। চাহিদার তুলনায় যে সমস্ত দ্রব্যের সরবরাহ অধিক যেমন, আলো, বাতাস প্রভৃতি তাহাদিগকে অনায়াসলভ্য দ্রব্য বা মূল্যহীন দ্রব্য বলা হয়। যে সমস্ত দ্রব্য চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর যেমন, খাদ্য, বস্ত্র, বাড়ী, গাড়ী সেই সমস্ত দ্রব্যকে অর্থনৈতিক দ্রব্য বা মূল্যবান দ্রব্য বলা হয়; কারণ, এই সমস্ত দ্রব্য পাইতে হইলে মানুষের একটি মূল্য দিতে হয়।

ধন বা সম্পদ—Wealth

ধনবিজ্ঞানে ধন বা সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সুতরাং ধনবিজ্ঞানে ধন কাহাকে বলে তাহার আলোচনা হওয়া উচিত।

সাধারণভাবে 'ধন' বলিতে আমরা টাকা-পয়সা বুঝি এবং এই অর্থে যাহার প্রচুর টাকা-পয়সা আছে তাহাকে ধনী বলি। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে 'ধন' শব্দটি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় না—ইহা একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ধনবিজ্ঞানে

'ধন' বলিতে সেই সমস্ত দ্রব্যকে বুঝায়, যাহা মানুষের অভাব মিটাইতে পারে এবং যে সমস্ত দ্রব্যের সরবরাহ চাহিদার তুলনায় এত কম যে, ইহার দ্বারা সকলের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং সাধারণ অর্থে ধন বলিতে প্রাচুর্য বুঝায়, আর ধনবিজ্ঞানের অর্থে প্রাচুর্যের অভাব হইলে অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর সামগ্রীগুলিকে ধন বলা হয়।

ধনবিজ্ঞানের অর্থে 'ধনের' নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা চাই।

১। উপযোগ বা অভাব মিটাইবার ক্ষমতা—Utility

ধনের প্রথম বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার উপযোগ অর্থাৎ অভাব মিটাইবার ক্ষমতা থাকা চাই। যে দ্রব্য অভাব মিটাইতে পারে না, তাহার কোন চাহিদাও হইতে পারে না। আর যাহার চাহিদা নাই তাহাকে ধন বলা হয় না। নিরক্ষর ব্যক্তির নিকট কোন পুস্তক ধন নহে, কারণ সে উহা পড়িতে পারে না, সুতরাং উহা তাহার অভাব মিটাইতে পারে না।

২। সরবরাহের স্বল্পতা—Scarcity

কিন্তু শুধুমাত্র উপযোগ-সম্পন্ন সামগ্রীগুলিকে ধন বলা যায় না। বাতাস, জল, সূর্যের আলোক প্রভৃতি জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় হইলেও ধনবিজ্ঞানের অর্থে ধন নহে, কারণ ইহারা অনায়াসলভ্য—চাহিদার তুলনায় এগুলির সরবরাহ প্রচুর। সুতরাং ধনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল দুষ্প্রাপ্যতা। যে সমস্ত দ্রব্য পাইতে হইলে পরিশ্রম-প্রয়োগের প্রয়োজন হয় এবং বিনিময়ের মাধ্যমে একটা মূল্য প্রদান করিতে হয়, সেই সমস্ত দ্রব্যকে ধনবিজ্ঞানে ধন বলা হয়। এইজন্য বৃষ্টির জল বা নদীর জল ধনবিজ্ঞানের অর্থে ধন নহে, কিন্তু শহরাঞ্চলে মিউনিসিপালিটি যে জল সরবরাহ করে তাহাকে ধন বলা হয়—কারণ এই জল অপ্রচুর ও অনায়াসলভ্য নহে।

৩। হস্তান্তরকরণযোগ্য—Transferability

যে সমস্ত দ্রব্যের মালিকানা-স্বত্ব এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা সম্ভব, শুধুমাত্র সেই সমস্ত দ্রব্যকেই ধন বলা হয়। যে দ্রব্য হস্তান্তর-যোগ্য নহে, তাহা ধন নহে। বাড়ী প্রভৃতির মালিকানা-স্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য, সুতরাং এগুলিকে ধন বলা যায়। কিন্তু শাসকের শাসনক্ষমতা, কারিগরের দক্ষতা, গায়কের গুণ এগুলির মালিকানা-স্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য নয় বলিয়া ধন হইতে পারে না।

৪। বাহ্যবস্তু—External goods

ধনের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হইল যে, ধন বলিতে শুধু বাহ্যবস্তুগুলিকে বুঝায়—কারণ একমাত্র বাহ্যবস্তুগুলিই হস্তান্তরযোগ্য। শিক্ষকের অধ্যাপনা-নৈপুণ্য ও সুগায়কের কণ্ঠমাধুর্য তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তি। ইহা দান বা বিক্রয় করা যায় না। সূত্রধরের কর্মদক্ষতা তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি, সুতরাং ইহা হস্তান্তরের অযোগ্য এবং সেইজন্য ধন নহে। কিন্তু সূত্রধর-নির্মিত চেয়ার বা টেবিল বাহ্যবস্তু—ইহা তাহার কর্মদক্ষতার সাহায্যে নির্মিত হইলেও বাহ্যবস্তু বলিয়া হস্তান্তরযোগ্য—সুতরাং ধন বলিয়া গণ্য হয়।

ধনবিজ্ঞানের অর্থে ধন বলিতে বাস্তব বা অবাস্তব উভয়বিধ দ্রব্য বুঝায়। খাদ্য, পানীয়, পরিধেয় প্রভৃতি বাস্তব দ্রব্যগুলি যেরূপ মানুষের অভাব মোচন করে, শিক্ষকের বক্তৃতা, গায়কের গান, চিকিৎসকের চিকিৎসা প্রভৃতি কার্যগুলির খাদ্য, পরিধেয় বা আসবাবপত্রের মত কোন বাস্তব অস্তিত্ব না থাকিলেও ইহারা মানুষের অভাব মোচন করে এবং সেই বাস্তব বাহ্যবস্তুগুলির ন্যায় বিনিময়যোগ্য। সুতরাং অবাস্তব অথচ উপযোগসম্পন্ন কাজগুলিকেও ধনবিজ্ঞানে ধন বলা হয়।

ব্যক্তিগত ধন, সমষ্টিগত ধন ও জাতীয় ধন—Personal, Collective and National Wealth

ব্যক্তিগত ধন বলিতে ব্যক্তিবিশেষের ভোগাধিকারে যে সমুদয় দ্রব্য থাকে তাহা বুঝায়। নগদ অর্থ, জমি, গৃহ, আসবাবপত্র, পুস্তক বা অন্য দ্রব্যের উপর রক্ষিত স্বত্ব ব্যক্তিগত ধন বলিয়া ধরা হয়। ব্যবসায়ের সুনাম (Good will of a business) প্রভৃতি অবাস্তব দ্রব্যও ব্যক্তিগত ধনের অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তিগত ধন গণনাকালে অবশ্য ব্যক্তিগত ঋণ বাদ দিতে হইবে।

সমষ্টিগত ধন বলিতে সেই সমস্ত দ্রব্যকে বুঝায়, যাহা কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে অথচ প্রত্যেক ব্যক্তিই এই ধন ভোগব্যবহার করিতে পারে। রাস্তাঘাট, পার্ক, যাদুঘর প্রভৃতি হইল সমষ্টিগত ধনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এইগুলির মালিক হইল সমাজ, কোন ব্যক্তিবিশেষ নহে। ব্যক্তির দিক দিয়া দেখিতে গেলে এইগুলি অনেকটা প্রকৃতিদত্ত দ্রব্যের মত, কারণ ব্যক্তির প্রয়োজন মিটাইতে এইগুলির ভোগব্যবহারের জন্য ব্যক্তির কোন মূল্য দিতে হয় না। কিন্তু এই দ্রব্যগুলি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সমাজের একটা ব্যয় আছে

এবং সেইজন্য প্রয়োজনের তুলনায় এইগুলি স্বল্প। সুতরাং সমাজের দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই দ্রব্যগুলি ধনপর্যায়ভুক্ত।

সমস্ত ব্যক্তির ধনসমষ্টি ও রাষ্ট্রায়ত্ত ধন লইয়া জাতীয় ধন গঠিত হয়। এই ধনসমষ্টি হইতে বিদেশী ঋণ বাদ দিতে হইবে এবং একই ধন যাহাতে একবারের বেশী গণনা না করা হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে। ব্যক্তিগত ধন জাতীয় ধনের অংশ হইলেও জাতীয় ধন ব্যক্তিগত ধন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। নদী, পর্বত, সমুদ্র প্রভৃতি কোনমতেই ব্যক্তিগত ধন নহে অথচ গঙ্গা নদীকে ভারতের একটি প্রধান জাতীয় ধন বলা হয়।

উপযোগ—Utility

ধনবিজ্ঞানে 'উপযোগ' শব্দটির অর্থ হইল অভাব মিটাইবার ক্ষমতা। যে দ্রব্যের দ্বারা আমাদের অভাব পরিতৃপ্ত হয় তাহারই উপযোগ আছে। সুতরাং উপযোগ বলিতে কোন দ্রব্য বুঝায় না—দ্রব্যের গুণ বা ক্ষমতা বুঝায়। পানীয় জল আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করে অর্থাৎ জলের গুণ বা ক্ষমতা হইল তৃষ্ণা নিবারণ করা। সুতরাং জলের এই তৃষ্ণা নিবারণের গুণ বা ক্ষমতাকে উপযোগ বলা হয় এবং এই উপযোগের জন্যই জল আমাদের জীবনে অপরিহার্য বলিয়া গণ্য হয়। এস্থলে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ধনবিজ্ঞানে উপযোগ শব্দটির সহিত কোন ভাল-মন্দের প্রশ্ন জড়িত নাই। যে দ্রব্য অভাব পূরণ করিতে পারে, তাহার উপযোগ আছে—তা সে দ্রব্যটি প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় হউক, আর উপকারী বা ক্ষতিকর হউক না কেন। এই অর্থে দুগ্ধ ও মদ্য উভয়েরই উপযোগ আছে। তবে সকল দ্রব্যই সব সময়ে সকলের নিকট সমান উপযোগসম্পন্ন নাও হইতে পারে।

বিভিন্ন প্রকারের উপযোগ—Different Kinds of Utility

উপযোগ নানাপ্রকারের হইতে পারে, যথা,

১। স্বাভাবিক উপযোগ—Natural Utility

প্রকৃতি-দত্ত দ্রব্যগুলিকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়। অরণ্যজাত বৃক্ষ, খনিজ সম্পদ প্রভৃতি প্রকৃতি-দত্ত দ্রব্যগুলিকে রূপান্তরিত বা স্থানচ্যুত না করিয়া উপযোগ পাওয়া যায় না, কিন্তু আলো, জল, বাতাস প্রভৃতি দ্রব্যগুলি স্বাভাবিক

অবস্থায় আমাদের উপযোগ দেয়। সুতরাং এই দ্রব্যগুলির উপযোগকে স্বাভাবিক উপযোগ বলা হয়।

২। **আকারগত উপযোগ—Form or Shape Utility**

প্রকৃতি-দত্ত দ্রব্যের আকার পরিবর্তন করিয়া দ্রব্যটির নূতন উপযোগ সৃষ্টি বা উপযোগ বৃদ্ধি করা যায়। ছুতার মিস্ত্রী অরণ্যজাত বৃক্ষকে নানা-আসবাবপত্রে রূপান্তরিত করিয়া কাঠের উপযোগ বৃদ্ধি করে। এইরূপে আকার পরিবর্তন করিয়া যে নূতন উপযোগ সৃষ্টি হয়, তাহাকে আকারগত উপযোগ বলা হয়।

৩। **স্থানগত উপযোগ—Place Utility**

অনেক সময় প্রকৃতি-দত্ত দ্রব্যকে স্থানান্তরিত করিয়া অর্থাৎ সহজপ্রাপ্য স্থান হইতে দুষ্প্রাপ্য স্থানে লইয়া উপযোগ বৃদ্ধি করা যায়। খনি হইতে কয়লা উত্তোলন করিয়া শহর ও গ্রামাঞ্চলে প্রেরণ দ্বারা কয়লার উপযোগ বৃদ্ধি করা হয়। ভারত ও পাকিস্তান হইতে বিদেশে পাট রপ্তানীর দ্বারা পাটের উপযোগ বৃদ্ধি পায়।

৪। **কালগত উপযোগ—Time Utility**

বিভিন্ন সময়ে দ্রব্যের উপযোগ হ্রাস-বৃদ্ধি পায়। আমের সময়ে আম সহজপ্রাপ্য বলিয়া আমের উপযোগ কম, কিন্তু অকালে আমের উপযোগ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং অকালে আমের যোগান দিয়া ইহার উপযোগ বৃদ্ধি করা যায়। নানাবিধ ফল, মৎস্য, মাংস প্রভৃতি সংরক্ষণ করিয়া অনেক ব্যবসায়ী অসময়ে এই দ্রব্যগুলির যোগান দ্বারা ইহাদের উপযোগ বৃদ্ধি করে। এইরূপ উপযোগবৃদ্ধিকে কালগত উপযোগ বলা হয়।

৫। **সেবাগত উপযোগ—Service Utility**

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রত্যক্ষ কাজের দ্বারা অভাব পরিতৃপ্ত হয়। এই কাজগুলি কোনপ্রকার নূতন রূপ ধারণ না করিয়াও প্রত্যক্ষভাবে লোকের অভাব মিটায়। গৃহভৃত্যের কাজ, আইনজীবীর কাজ প্রভৃতি এই পর্যায়ভুক্ত এবং প্রত্যক্ষ কাজের দ্বারা পরিতৃপ্তি পাওয়া যায় বলিয়া এইগুলিকে সেবাগত উপযোগ বলা হয়।

উৎপাদন—Production

ধনবিজ্ঞান আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য হইল মানুষ কিভাবে ধন-উৎপাদন দ্বারা

তাহার অসংখ্য অভাব মোচন করিয়া উন্নততর জীবন যাপন করিতে পারে। সুতরাং 'উৎপাদন' শব্দটির অর্থনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে প্রথমেই আলোচনা হওয়া উচিত। সাধারণ অর্থে উৎপাদন শব্দটি নূতন কোন দ্রব্য-সামগ্রী প্রস্তুত করা বুঝায়। সাধারণতঃ বলা হয় যে, তাঁতি কাপড় প্রস্তুত করিতেছে, স্বর্ণকার অলংকার প্রস্তুত করিতেছে, চর্মকার জুতা প্রস্তুত করিতেছে। সাধারণ অর্থে ইহারা সকলেই নূতন দ্রব্য উৎপাদনে ব্যাপৃত রহিয়াছে বুঝায়। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে উৎপাদন শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদন শব্দটির অর্থনৈতিক তাৎপর্য হইল যে, এই শব্দটির দ্বারা কোন দ্রব্য-উৎপাদন বুঝায় না—ইহার দ্বারা বুঝায় দ্রব্যের উপযোগ বৃদ্ধি করা। মানুষ কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে না—কারণ দ্রব্যগুলির প্রকৃতি-দত্ত। মানুষ প্রকৃতি-দত্ত দ্রব্যের উপর তাহার পরিশ্রম প্রয়োগ করিয়া প্রকৃতি-দত্ত দ্রব্যগুলির উপযোগ (Utility) বৃদ্ধি করে মাত্র—নূতন কোন দ্রব্য প্রস্তুত করে না। সুতরাং ধনবিজ্ঞানে উৎপাদনের অর্থ হইল নূতন উপযোগ বা অধিকতর উপযোগ (creation of new or additional utility) সৃষ্টি করা।

এই নূতন বা অধিকতর উপযোগ প্রধানতঃ তিন প্রকারে সৃষ্টি করা যায়। প্রথমতঃ, প্রকৃতি-দত্ত দ্রব্যের আকার পরিবর্তন করিয়া উপযোগ বৃদ্ধি করা যায়। ছুতার মিস্ত্রি একটি গাছকে চেয়ার-টেবিলে রূপান্তরিত করিয়া উপযোগ বৃদ্ধি করে—এই জাতীয় উৎপাদনকে **আকারগত উপযোগ** (Form utility) বৃদ্ধি বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ, স্থানপরিবর্তন করিয়াও দ্রব্যের উপযোগ বৃদ্ধি করা যায়। যেমন, খনিজীবী (Miner) খনি হইতে কয়লা উত্তোলন করিয়া মানুষের ব্যবহার-যোগ্য করিতেছে—বণিক সহজপ্রাপ্য স্থান হইতে কোন দ্রব্যকে দুষ্প্রাপ্য স্থানে স্থানান্তরিত করিয়া দ্রব্যের উপযোগ বৃদ্ধি করিতেছে। ইহাকে **স্থানগত উপযোগ** (Place utility) বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদন করা বলা হয়। তৃতীয়তঃ, **কালগত উপযোগ** (Time utility) বৃদ্ধি করিয়াও উৎপাদন করা হয়। যাহারা কোন দ্রব্যের প্রাচুর্যের সময় সেই দ্রব্য আহরণ করিয়া ভবিষ্যতে দুষ্প্রাপ্যতার সময় যোগান দেয়, তাহারাও উৎপাদক বলিয়া পরিগণিত হয়। এই অর্থে যাহারা মৎস্য, মাংস, ফল ইত্যাদি ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করে, তাহারাও অর্থনৈতিক অর্থে উৎপাদক বলিয়া বিবেচিত হয়।

এই অর্থে জীবনবীমা কোম্পানীগুলিও উৎপাদন-কার্যে ব্যাপৃত বলা চলে।

দ্রব্যের উপযোগ বৃদ্ধি ব্যতীত প্রত্যক্ষভাবে কার্য করিয়াও উপযোগ বৃদ্ধি করা যায় —যেমন গৃহভৃত্য প্রত্যক্ষভাবে কাজ করিয়া তাহার প্রভুর সাহায্য করে। ইহাকে **সেবাগত উপযোগ** (Service utility) বলা হয়।

ভোগ—Consumption

ধনবিজ্ঞানে ভোগ বা সন্তুষ্টি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদন বলিতে যেরূপ নূতন উপযোগ সৃষ্টি বুঝায়, নূতন দ্রব্যের উৎপাদন বুঝায় না, ভোগ বলিতেও তদ্রূপ উৎপাদন দ্বারা সৃষ্ট নূতন উপযোগের বিনাশ (Destruction of utility) বুঝায়। মানুষ অভাব মোচনের জন্য দ্রব্য ব্যবহার করিয়া তাহার উপযোগ দ্বারা নিজের সন্তুষ্টি বিধান করে। সুতরাং ভোগ শব্দটি ধনবিজ্ঞানে উপযোগের বিনাশ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

চাহিদা—Demand

ধনবিজ্ঞানে চাহিদা বলিতে শুধু দ্রব্যের উপযোগ বুঝায় না। চাহিদা বলিতে সক্রিয় চাহিদা (Effective demand) বুঝায় অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট দামে লোকে যে পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক আছে। দ্রব্যের উপযোগ না থাকিলে সে দ্রব্যের কোন চাহিদা হইতে পারে না। সুতরাং ক্রেতার নিকট দ্রব্যটির উপযোগ থাকিবে এবং দ্বিতীয়তঃ, ক্রেতার ক্রয়-ক্ষমতা থাকা চাই। আবার শুধু ক্রয়-ক্ষমতা থাকিলেই চাহিদার সৃষ্টি হয় না। ক্রেতার দ্রব্যটি পাইবার জন্য ক্রয়-ক্ষমতা অর্থাৎ অর্থব্যয় করিবার ইচ্ছা থাকা চাই। সুতরাং চাহিদা বলিতে আমরা বুঝি, (১) একটি উপযোগ-সম্পন্ন দ্রব্য, (২) দ্রব্য ক্রয় করিবার মত অর্থ ও (৩) দ্রব্যটি পাইবার জন্য অর্থব্যয় করিবার ইচ্ছা। সুতরাং ধনবিজ্ঞানে দাম ছাড়া কোন চাহিদা নাই। একটি লোক একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের কি পরিমাণ কিনিবে তাহা দ্রব্যটির সেই সময়কার দামের উপর নির্ভর করে। কমলালেবুর জোড়া ১২ পয়সা হইলে একটি লোক একজোড়া কিনিতে পারে, ২৫ পয়সা হইলে একটি কিনিবে এবং দাম যখন ৫০ পয়সা হয় তখন সে মোটেই না-কিনিতে পারে। সুতরাং কমলালেবুর যে চাহিদা তাহা ইহার মূল্যের উপর নির্ভর করে। মূল্য-নিরপেক্ষভাবে ধনবিজ্ঞানে চাহিদার কোন অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

সরবরাহ—Supply

দাম ছাড়া যেরূপ চাহিদা হয় না, দাম ছাড়া সেইরূপ সরবরাহ বা যোগান হয় না। সরবরাহ বলিতে একটি নির্দিষ্ট মূল্যে যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রেতা বিক্রয় করিতে রাজী থাকে, তাহাকে সরবরাহ বলে। বিক্রেতাগণ বহুপরিমাণ দ্রব্য মজুদ রাখিতে পারে, কিন্তু বিক্রয়ের জন্য মজুদ সমগ্র দ্রব্যপরিমাণকে সরবরাহ বলা যায় না। মজুদ দ্রব্যের যে অংশ একটি নির্দিষ্ট দামে বিক্রয় হয়, সেই অংশকে সরবরাহ বলা হয়।

বিনিময়-মূল্য—Value

মূল্য শব্দটি সাধারণতঃ দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা, ব্যবহারিক মূল্য (Value-in-use) ও বিনিময়-মূল্য (Value-in-exchange)। ব্যবহারিক মূল্যের অর্থ হইল দ্রব্যের উপযোগ। যখন বলা হয় যে, চা অপেক্ষা লবণ অধিকতর মূল্যবান অথবা স্বর্ণ অপেক্ষা লৌহ অধিকতর মূল্যবান, তখন মূল্য শব্দটি উপযোগ অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে 'মূল্য' শব্দটি কেবলমাত্র বিনিময়-মূল্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধারণ অর্থে লৌহ স্বর্ণ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান হইলেও অর্থনৈতিক অর্থে লৌহ অপেক্ষা স্বর্ণ অধিকতর মূল্যবান। ধনবিজ্ঞানে মূল্যের অর্থ হইল বিনিময়-মূল্য অর্থাৎ একটি দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য দ্রব্যের যে পরিমাণ পাওয়া যায় তাহাই হইল সেই দ্রব্যটির মূল্য। সুতরাং মূল্য বলিলে একটি দ্রব্যের ক্রয়-ক্ষমতা বুঝায়। যদি একটি ঘোড়ার বিনিময়ে দুইটি গরু পাওয়া যায়, তাহা হইলে একটি ঘোড়ার ক্রয়-ক্ষমতা বা বিনিময়-মূল্য হইল দুইটি গরু। একটি ঘোড়ার পরিবর্তে দুইটি গরু বিনিময়ের এই হারকে মূল্য (Value) বলা হয়। সুতরাং মূল্য বলিলে দুইটি দ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময়ের অনুপাত (Ratio of exchange) বুঝায়।

অর্থমূল্য বা দাম—Price

দ্রব্যমূল্য অর্থাৎ বিনিময়ের অনুপাত যখন অর্থদ্বারা পরিমাপ করা হয় তখন তাহাকে 'অর্থমূল্য' বা 'দাম' বলা হয়। দ্রব্যের দাম সকল সময়েই অর্থের দ্বারা প্রকাশ করা হয়, কিন্তু বিনিময়-মূল্য অর্থ ব্যতীতও অন্য সমুদয় দ্রব্য দ্বারাই প্রকাশ করা যাইতে পারে। বিনিময়-মূল্য দুইটি দ্রব্যের বিনিময়ের অনুপাত প্রকাশ করে। সুতরাং সকল দ্রব্যের বিনিময়-মূল্য একসঙ্গে বাড়িতে পারে না, কারণ

একটির বিনিময়ের অনুপাত বাড়িলেই অপরটির অনুপাত হ্রাস পায়। কিন্তু সব জিনিসেরই অর্থমূল্য একসঙ্গে বাড়িতে পারে। দাম প্রত্যেকটি জিনিসের স্বতন্ত্র অর্থমূল্য প্রকাশ করে এবং সেইজন্য দেশে অর্থ পরিমাণ বাড়িলে সমস্ত জিনিসের দাম বাড়ে, অর্থ পরিমাণ কমিলে দাম কমে।

সংক্ষিপ্তসার

ধনবিজ্ঞানের কতিপয় মৌলিক ধারণা

দ্রব্য—

উপযোগসম্পন্ন অর্থাৎ অভাব মোচন করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন যে-কোন জিনিসকে দ্রব্য বলা হয়। দ্রব্যকে অনায়াসলভ্য, অথবা অর্থনৈতিক দ্রব্য, বা জাতীয় দ্রব্যে ভাগ করা হয়।

ধন বা সম্পদ—

ধনবিজ্ঞানে সংজ্ঞা হিসাবে ধনের চারিটি বৈশিষ্ট্য থাকা চাই, যথা,—১। উপযোগ, ২। চাহিদার তুলনায় যোগানের স্বল্পতা, ৩। হস্তান্তরযোগ্যতা ও ৪। বহিঃস্থ হওয়া চাই। ধন বলিতে বাস্তব (দ্রব্য) ও অবাস্তব দ্রব্য (কাজ) বুঝায়। ধন আবার ব্যক্তিগত ও জাতীয় ধন হইতে পারে।

উৎপাদন—

মানুষ নূতন দ্রব্য সৃষ্টি করিতে পারে না—সে কেবলমাত্র পরিশ্রম প্রয়োগ করিয়া প্রকৃতি-দত্ত দ্রব্যগুলিকে অধিকতর উপযোগী করে। এই উপযোগসৃষ্টিকে উৎপাদন বলা হয়। ছুতার মিস্ত্রী বৃক্ষকে রূপান্তরিত করিয়া চেয়ার-টেবিলে পরিণত করিতেছে। নূতন উপযোগ তিন প্রকারে সৃষ্টি করা যায়, যথা,—১। আকার পরিবর্তিত করিয়া, ২। স্থান পরিবর্তন করিয়া ও ৩। ব্যবহারের সময় পরিবর্তন করিয়া।

ভোগ—

ভোগ বলিতে ব্যবহার দ্বারা দ্রব্যের উপযোগের বিনাশ বুঝায়। মানুষ উৎপাদন দ্বারা যে নূতন উপযোগ সৃষ্টি করে, ভোগব্যবহার দ্বারা সেই উপযোগের বিনাশ হয়।

বিনিময়-মূল্য—

বিনিময়-মূল্য বলিলে ক্রয়ক্ষমতা বুঝায় অর্থাৎ দুইটি দ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময়ের অনুপাত বুঝায়। বিনিময়ের অনুপাত যখন অর্থ দ্বারা পরিমাপ করা হয় তখন তাহাকে অর্থমূল্য বা দাম বলা হয়।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. Define Economics and discuss its scope.

ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশপূর্বক ইহার বিষয়বস্তুর আলোচনা কর।

উঃ—অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মূল উৎস হইল মানুষের অভাব বোধ। টাকা-পয়সা প্রচলিত হইবার পূর্বে মানুষ পরিশ্রম করিয়া তাহার অভাব মোচনের সামগ্রীগুলি সংগ্রহ করিত। বর্তমানে মানুষ পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জন করে ও উপার্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া তাহার অভাব মিটায়। এই অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় সম্পর্কিত কাজকর্মগুলি হইল ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে, ধনবিজ্ঞান হইল সেই শাস্ত্র যে শাস্ত্রে মানুষ তাহার অসীম অভাব সীমায়িত উপকরণ দ্বারা কিভাবে মিটায় তাহার আলোচনা করে।

ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর পরিধি সীমাবদ্ধ। এই শাস্ত্র শুধু সামাজিক মানুষের কাজকর্ম লইয়া আলোচনা করে। দ্বিতীয়তঃ, এই শাস্ত্রে শুধু অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় সম্পর্কিত কাজগুলিরই আলোচনা হয়। ধনবিজ্ঞান একটি সমাজহিতকারী বিজ্ঞান—অর্থোপার্জন ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনই হইল এই শাস্ত্র আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য।

2. What do you mean by production of wealth in Economics? How far it would be correct to define Economics as "The Science of Wealth?"

ধনবিজ্ঞানে ধনোৎপাদন বলিতে কি বুঝ? ধনবিজ্ঞানকে ধনের বিজ্ঞান বলা কতদূর সমীচীন?

উঃ—ধনবিজ্ঞানে সম্পদ সৃষ্টি বলিলে কোন নূতন দ্রব্য বা সামগ্রীর উৎপাদন বুঝায় না। সম্পদ সৃষ্টির প্রকৃত অর্থ হইল নূতন উপযোগ সৃষ্টি বা দ্রব্যের উপযোগ বৃদ্ধি করা। ছুতার মিস্ত্রী চেয়ার তৈয়ারী করে—ইহার অর্থ হইল ছুতার মিস্ত্রী প্রকৃতি-দত্ত কাঠ চেয়ারে পরিবর্তিত করিয়া কাঠের উপযোগ বৃদ্ধি করে। সম্পদ উৎপাদন বা নূতন উপযোগ সৃষ্টি তিন প্রকারে করা যায়, যথা, (১) আকারগত উপযোগ সৃষ্টি, যেমন কাঠ হইতে চেয়ার, (২) স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি, যেমন খনি হইতে কয়লা উত্তোলন করিয়া খনিজীবী কয়লার উপযোগ বৃদ্ধি করে, (৩) কালগত উপযোগ সৃষ্টি, যেমন যাহারা ফল, মাছ, মাংস প্রভৃতি সংরক্ষণ করিয়া ভবিষ্যতে সেগুলিকে যোগান দিয়া দ্রব্যগুলির উপযোগ বৃদ্ধি করে। আবার গৃহভৃত্য প্রভৃতি শ্রেণীর লোক তাহাদের সেবা-

মূলক কার্যের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে উপযোগ সৃষ্টি করে। এই অর্থে ধনবিজ্ঞানে ছুতার মিস্ত্রী, খনিজীবী ব্যবসায়ী, গৃহভৃত্য প্রভৃতি সকলকেই সম্পদের উৎপাদক বলা যায়।

সত্য বটে ধনবিজ্ঞানে ধন বা সম্পদের আলোচনা করা হয়। কিন্তু সম্পদ আহরণই ধনবিজ্ঞান আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। দেশে যথেষ্ট পরিমাণে সম্পদ উৎপাদিত না হইলে অভাব দূর হয় না ও অভাব দূর না হইলে মানুষের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। ধন হইল কল্যাণ সাধনের একটি উপায় মাত্র। ধনবিজ্ঞান আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করা। সম্পদ ব্যতীত সম্পন্ন হওয়া যায় না, তাই ধনবিজ্ঞানে সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টনের আলোচনা করা হয়, কারণ যথেষ্ট সম্পদ উৎপাদন ও উৎপাদিত সম্পদের ন্যায্য বণ্টন-ব্যবস্থা দ্বারা মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ধনবিজ্ঞান একটি সমাজ হিতকারী বিজ্ঞান—ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ধন নহে, মানুষের কল্যাণ।

3. Define wealth. Are the following wealth ?
(a) B.A. Diploma, (b) The skill of a Surgeon. Give reasons for your answer. H. S. (Com) 1961 Comp.

ধনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর।
নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে কি ধন বলা যায়? (a) বি-এ উপাধিপত্র, (b) অস্ত্রচিকিৎসকের দক্ষতা। যুক্তি দ্বারা উত্তর সমর্থন কর।

উঃ—ধনবিজ্ঞানে সম্পদ শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে সমস্ত বাহ্যবস্তু মানুষের অভাব মিটাইতে পারে, যেগুলি চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর ও যেগুলি বিক্রয়যোগ্য অর্থাৎ হস্তান্তরযোগ্য, সেই দ্রব্যগুলিকে ধনবিজ্ঞানে ধন বা সম্পদ বলা হয়। সুতরাং সম্পদের বৈশিষ্ট্য হইল (১) উপযোগ, (২) অপ্রাচুর্য বা দুষ্প্রাপ্যতা, (৩) বাহ্যবস্তু, (৪) বিনিময় যোগ্যতা। ধনবিজ্ঞানে সম্পদ বলিতে বাস্তব, যেমন, চাউল, কাপড় ও অবাস্তব দ্রব্য, যেমন গায়কের গান, শিক্ষকের বক্তৃতা উভয়কে বুঝায়। সম্পদের উপরি-উক্ত চারিটি বৈশিষ্ট্যের একটি না থাকিলে কোন দ্রব্যকে অর্থ নৈতিক অর্থে সম্পদ বলা যায় না। সাধারণ অর্থে স্বাস্থ্যকে সম্পদ বলা হয়, কিন্তু অর্থ নৈতিক অর্থে স্বাস্থ্য সম্পদ নহে। কারণ, কোন ব্যক্তি তাহার স্বাস্থ্য অপরকে বিক্রয় (হস্তান্তরিত) করিতে পারে না। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সনদ, দার্জিলিং-এর আবহাওয়া বা সুগায়কের কণ্ঠমাধুর্যের সম্পদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি থাকিলেও হস্তান্তরযোগ্য নহে বলিয়া এইগুলি সম্পদ বলিয়া গণ্য হয় না। বি. এ. উপাধিপত্রকেও ধনবিজ্ঞানের অর্থে 'ধন' বলা যায় না। কারণ ধনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি উপাধিপত্রে বর্তমান থাকিলেও উপাধিপত্রের মালিকানাস্বত্ব হস্তান্তরযোগ্য নহে বলিয়া ইহা 'ধন' নহে।

অস্ত্রচিকিৎসকের দক্ষতা তাহার নিজস্ব অন্তর্নিহিত শক্তি। অস্ত্রচিকিৎসক এই দক্ষতা দান, বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারে না। সুতরাং ইহাও ধনপদবাচ্য নহে।

মালিকানার ভিত্তিতে সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদ, সমষ্টিগত সম্পদ ও জাতীয় সম্পদ এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

4. Explain the meaning of the following : —

(a) Production and consumption, (b) Value and Price.

H. S. (Com.) 1960

উৎপাদন ও ভোগ, বিনিময়মূল্য ও দাম এইগুলির অর্থ লিখ।

(a) ধনবিজ্ঞানে উৎপাদন বলিতে নূতন দ্রব্য উৎপাদন বুঝায় না। উৎপাদনের প্রকৃত অর্থ হইল উপযোগ বৃদ্ধি করা বা নূতন উপযোগ সৃষ্টি করা, যেমন ছুতার মিস্ত্রী প্রকৃতি-দত্ত বৃক্ষকে চেয়ার, টেবিলে রূপান্তরিত করিয়া কাঠের উপযোগ বৃদ্ধি করে। নূতন উপযোগ তিন প্রকারে সৃষ্টি করা যায়, যথা, ১। আকার পরিবর্তন করিয়া, ২। স্থান পরিবর্তন করিয়া ও ৩। ব্যবহারের সময় পরিবর্তন করিয়া।

(b) মানুষ উৎপাদন দ্বারা যে নূতন উপযোগ সৃষ্টি করে, ভোগব্যবহার দ্বারা সেই উপযোগের বিনাশ হয়। সুতরাং ভোগ বলিতে দ্রব্যের বিনাশ বুঝায় না, দ্রব্যের উপযোগের বিনাশ বুঝায়। অভাব পূরণ করাই হইল ভোগ।

(c) বিনিময়-মূল্য বলিলে একটি দ্রব্যের পরিবর্তে যে পরিমাণে অন্য দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাকে বুঝায়। একটি ঘোড়ার বিনিময়ে যদি দুইটি গরু পাওয়া যায় তাহা হইলে ঘোড়ার বিনিময়-মূল্য হইল দুইটি গরু। ধনবিজ্ঞানে বিনিময়-মূল্যের অর্থ হইল একটি দ্রব্যের পরিবর্তে অপর দ্রব্যের যে পরিমাণ পাওয়া যায় তাহাই হইল প্রথম দ্রব্যটির বিনিময়-মূল্য।

(d) একটি দ্রব্যের বিনিময়ে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায় তাহাকে দাম বলা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

অভাব (Wants)

অভাব ও ইহার প্রকৃতি—Human wants and their characteristics.

মানুষের ভোগস্পৃহা তাহার অসংখ্য অভাব হইতে উদ্ভূত। শুধু খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান হইলেই মানুষ সন্তুষ্ট হয় না। শরীর ধারণ করা ব্যতীতও মানুষের একটি অন্তর্জীবন আছে। মানুষ চায় তার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি—তাই এই উন্নতির সহায়ক সামগ্রী আহরণের জন্য সে সর্বদা কর্মপ্রচেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে। সামাজিক জীব হিসাবেও শিষ্টাচার বজায় রাখিবার জন্য মানুষের কতকগুলি প্রয়োজন

মিটাইতে হয়। শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মানুষ কতকগুলি অভাবের দাস। এই অভাবগুলির প্রকৃতি জানিতে পারিলেই মানুষের অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয়।

১। মানুষের অভাবের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, অভাবের পরিসমাপ্তি নাই (unlimited in number)। যে মুহূর্তে একটি নির্দিষ্ট অভাব পূরণ হইল, পর মুহূর্তেই পুনরায় নূতন অভাব দেখা যায়। অভাবগুলি যেন মানুষের মনে স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে। কোনটি সম্পর্কে মানুষ সচেতন আবার কোনটি সম্পর্কে সে তেমন সচেতন নহে। কিন্তু প্রথম স্তরের অভাব তৃপ্ত হইলেই দ্বিতীয় স্তরের অভাব সম্পর্কে সে সচেতন হয়। এইরূপে মানুষের অভাবের কোন শেষ নাই, কেননা অভাবগুলি সংখ্যাতীত, নানাজাতীয় ও ক্রমবর্ধমান।

২। মানুষের অভাবের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে, সমগ্রভাবে অভাবগুলির পরিতৃপ্তি করা সম্ভব না হইলেও কোন একটি নির্দিষ্ট অভাব সহজেই পরিতৃপ্ত করা যায় (Each particular want is satiable)। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পানীয়ের প্রয়োজন। একজাতীয় পানীয়ের দ্বারা তাহার তৃষ্ণা দূর হইলে সে অন্যজাতীয় পানীয়ের অভাব বোধ করে। এইরূপে পানীয়ের অভাবের কোন সীমা নাই। কিন্তু একক-ভাবে এই পানীয়ের অভাব এক গ্লাস জলদ্বারা মিটিতে পারে। মানুষের কোন একটি নির্দিষ্ট অভাব সহজেই পরিতৃপ্ত করা যায়—অভাবের এই বৈশিষ্ট্যটির উপর অর্থতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সূত্রটি হইল ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতার সূত্র (Law of Diminishing Utility)। এই সূত্র অনুসারে প্রত্যেকটি অভাব এককভাবে সহজে পূরণীয় বলিয়া যে দ্রব্য দ্বারা ঐ অভাবটি পূরণ হয়, তাহার মাত্রাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপযোগিতাও হ্রাস পায়।

৩। মানুষের অভাবের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল যে, অভাবগুলি পরিপূরক (Complementary)। কতকগুলি অভাব আছে যেগুলি এককভাবে পূরণ করা যায় না। সেগুলি পূরণ করিতে গেলে একাধিক দ্রব্যের সহযোগ প্রয়োজন হয়। যেমন, মোটরগাড়ী চড়িতে হইলে শুধু গাড়ী হইলে চলে না, পেট্রোলের প্রয়োজন হয়। লিখিবার ইচ্ছা হইলে তাহা একমাত্র কলম দ্বারা সম্ভব হয় না। কলম, কালি ও কাগজের প্রয়োজন হয়। কার্যতঃ দেখা যায় যে, প্রায় সব অভাবই একাধিক দ্রব্যের সহযোগে পূরণ হয়। সম্পর্কিত মূলতত্ত্বের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যের

বিশেষ গুরুত্ব আছে। যদি কোন যুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে তাহার পরিপূরক সামগ্রীর উপর তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

৪। অভাবগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহারা প্রতিযোগিতামূলক (Competitive)। অভাব মোচনের উপাদানগুলির অপ্রাচুর্যই হইল ইহার কারণ। যেহেতু অপ্রচুর উপাদান দ্বারা অসংখ্য অভাব মিটান সম্ভবপর নয়, সেইহেতু মানুষের অভাবমোচনের জন্য বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে বাছাই বা পছন্দ করিতে হয়। শ্রান্তিবিনোদনের জন্য সিনেমায় যাওয়া যাইতে পারে, কিংবা খেলার মাঠে যাওয়া যাইতে পারে, অথবা থিয়েটারে যাওয়া চলে। আমাদের সীমিত সময়, অর্থ ও উৎসাহের উপর বিভিন্ন অভাব যেন প্রতিযোগিরূপে তাহাদের দাবী জানাইতেছে। সুতরাং এ অভাবগুলির মধ্যে একটি নিয়মিত প্রতিযোগিতা চলিতেছে। সমান-প্রান্তিক উপযোগিতা সূত্রটি (Law of Equi-marginal Utility) বিকল্পে Principle of Substitution সূত্রটি অভাবের এই বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

৫। অভাবের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, কোন কোন অভাব পরিতৃপ্ত হইলেও সেই অভাবের পরিসমাপ্তি বা নিবৃত্তি ঘটে না। পুনঃ পুনঃ সেই অভাব বোধ হয়। একই অভাব বারবার পরিতৃপ্ত হওয়ার ফলে অভাবটি 'স্বভাবে' পরিণত হয় অর্থাৎ সেই দ্রব্যটির ব্যবহার অভ্যাসে পরিণত হইয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যে পর্যবসিত হয়। এইরূপে মানুষের জীবনযাত্রার মান গঠিত হয়।

প্রত্যেক মানুষের এমন কতকগুলি অভাব আছে যেগুলি সম্বন্ধে সে সর্বদা সচেতন এবং এই অভাবগুলি তৃপ্তি করিতে পারিলে তাহার কষ্টের লাঘব হয়। আবার এমন কতকগুলি অভাব আছে যেগুলি সম্পর্কে মানুষ সচেতন নহে। এই অভাবগুলি তৃপ্তি না হইলেও তাহার কোন কষ্ট হয় না, কিন্তু এই অভাবগুলি তৃপ্ত হইলে সে লাভবান হয়। ট্রাম গাড়ীতে যাতায়াতকারী ব্যক্তিকে কেহ যদি মোটর যানে গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়া দেয়, তাহা হইলে সে বিনা কষ্টে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

অভাবের শ্রেণীবিভাগ—Classification of Human Wants

মানুষের অভাবপূরণের দ্রব্যগুলিকে সাধারণতঃ তিনভাগে ভাগ করা যায়,

যথা, ১। অপরিহার্য দ্রব্য (Necessaries), আরামপ্রদ দ্রব্য (Comforts) এবং বিলাসিতার দ্রব্য (Luxuries)। অপরিহার্য দ্রব্যগুলি হইল সেই দ্রব্যগুলি, যেঁ-গুলির অভাব অবশ্যই পূরণ করিতে হইবে। অপরিহার্য দ্রব্যগুলিকে পুনরায় তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যথা, জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য (Necessaries of life), যেগুলির অভাবে মানুষের পক্ষে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নয়। খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান এই পর্যায়ভুক্ত। দ্বিতীয়তঃ, কর্মক্ষমতা অটুট রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য (Necessaries of efficiency)। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য এই দ্রব্যগুলি অপরিহার্য না হইলেও এইগুলির ভোগদ্বারা কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এইগুলি ভোগের জন্য যে ব্যয় হয়, সে ব্যয়ের অনুপাতে অধিকতর লাভবান্ হওয়া যায়। পুষ্টিকর খাদ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বস্ত্র ও আলো-হাওয়াযুক্ত বাসগৃহ এই পর্যায়ভুক্ত। তৃতীয়তঃ, ব্যবহার-সিদ্ধ বা অভ্যাসগত কতকগুলি দ্রব্য (Conventional necessaries), যেগুলির ব্যবহার জীবনধারণের জন্যও প্রয়োজনীয় নয় অথবা কর্মদক্ষতা বজায় রাখিবার জন্যও আবশ্যক হয় না। এই দ্রব্যগুলির ব্যবহার অনেক সময় সামাজিক শিষ্টাচার পালনের জন্য অথবা অভ্যাসের ফলে অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায় এবং এইগুলি ব্যবহার করিবার জন্য অনেকে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির ভোগ হ্রাস করিতে দ্বিধা করে না। ধূমপান, মদ্যপান বা মূল্যবান পরিধেয় ব্যবহার করা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

আরামপ্রদ দ্রব্যগুলির ব্যবহার মানুষের কর্মদক্ষতা ও চিত্তপ্রসাদ বৃদ্ধি করে। গ্রীষ্মকালে বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়া যে মানুষের শ্রান্তি-বিনোদন করিয়া তাহার কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে ইহা অনস্বীকার্য। কিন্তু আরামপ্রদ দ্রব্য সম্পর্কে এই কথা বলা হয় যে, এই দ্রব্যগুলির ব্যবহার হইতে যে উপযোগিতা পাওয়া যায় তদপেক্ষা অধিক মূল্য প্রদান করিতে হয়।

নিষ্প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবহারকেই (Consumption of superfluous wants) সাধারণতঃ বিলাসিতা বলা হয়। অনেকে ইহাকে নিরর্থক খরচা বলিয়া অভিহিত করেন। মূল্যবান্ অলংকার পরিধান করা বিলাসিতার একটি উদাহরণ।

সাধারণতঃ 'বিলাসিতা' শব্দটি নীতিজ্ঞানবিরোধী ভোগসমূহকে বুঝায়। কিন্তু ইহা সব সময়ে সত্য নহে। বিলাসদ্রব্য ব্যবহারেরও সুফল আছে। মানুষের বিলাসদ্রব্য, যথা, অলংকার, মোটরগাড়ী প্রভৃতি দুর্দিনে সঞ্চিত অর্থের কাজ

করে। বিলাসিতা অনেক সময় মানুষকে নূতন কর্মপ্রচেষ্টায় অনুপ্রাণিত করিয়া সামাজিক অগ্রগতির সহায়তা করে। বিলাসিতার সপক্ষে আরও বলা হয় যে, ধনীর বিলাসদ্রব্য উৎপাদন দ্বারা দরিদ্র অন্নসংস্থান করিতে পারে। নীতিজ্ঞান-বিরোধী বিলাসিতা বর্জনীয় হইলেও বিলাসিতামাত্রই যে ক্ষতিকর ইহা বলা সমীচীন নহে।

অভাবের উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। অভাবপূরণ করিবার দ্রব্যগুলির শ্রেণীবিভাগকালে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এইরূপ বিভাগ চূড়ান্ত নহে—ইহা আপেক্ষিক মাত্র। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ইহার পরিবর্তন প্রয়োজন। একজন ছাত্রের পক্ষে একটি ফাউন্টেন্ পেন অপরিহার্য দ্রব্য হইলেও নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে ইহা বিলাসদ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মদ্যপান অহিতকর বিলাসিতা, কিন্তু শীতপ্রধান দেশে ইহাকে জীবনধারণের উপযোগী দ্রব্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মূল কথা হইল যে, অভাবের তীব্রতা অনুসারে দ্রব্যগুলিকে উপরি-উক্ত শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। কিন্তু সর্বদেশে অথবা সর্বকালে সকল লোকে একই দ্রব্যের অভাব সমানভাবে অনুভব করে না।

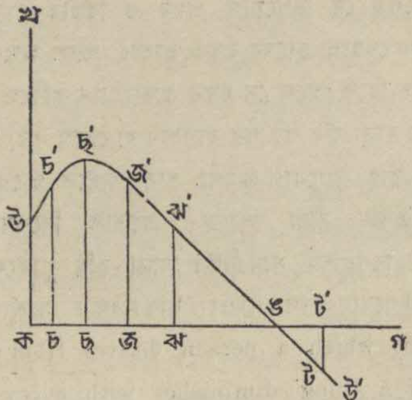
ক্রমহ্রাসমান উপযোগের সূত্র—Law of Diminishing Utility

ধনবিজ্ঞানে উপযোগ শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। অভাবের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মানুষের সমগ্র অভাব অপূরণীয় হইলেও বিশেষ কোন একটি অভাব সহজেই পূরণ করা যায়। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য এক গ্লাস জলই যথেষ্ট, তারপর আর জলের প্রয়োজন অনুভূত হয় না। সম্ভব হইলে অন্যজাতীয় পানীয় গ্রহণ করা যায়। জলের তৃষ্ণা এক বা দুই গ্লাস জলে সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হয়। প্রথম গ্লাস জল বা অত্যধিক তৃষ্ণার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় গ্লাস জল হইতে যে উপযোগিতা পাওয়া যায়, তৃতীয় গ্লাস জলের উপযোগিতা তদপেক্ষা কম। চতুর্থ গ্লাস জলের হয়ত কোনই উপযোগ নাই। অতিরিক্ত শীতের সময় প্রথম পেয়ালা চায়ের উপযোগ অত্যধিক এবং এই এক পেয়ালা চায়ের জন্য কেহ হয়ত অত্যধিক মূল্য দিতেও প্রস্তুত। এক পেয়ালা চা দ্বারা পূর্ণ পরিতৃপ্তি না হইলে দ্বিতীয় পেয়ালার প্রয়োজন হয় এবং দ্বিতীয় পেয়ালার উপযোগ হয়ত প্রথম পেয়ালার উপযোগ

অপেক্ষাও অধিক। এরূপ ব্যক্তির নিকট তৃতীয় ও চতুর্থ পেয়ালা চায়ের উপযোগিতা থাকিলেও সে উপযোগ প্রথম ও দ্বিতীয় পেয়ালার উপযোগিতা অপেক্ষা কম। পঞ্চম পেয়ালা চায়ের হয়ত তাহার পক্ষে আদৌ কোন উপযোগ নাই ও পঞ্চম পেয়ালা দিতে গেলে সে হয়ত প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। এইরূপে একই দ্রব্যের বিভিন্ন মাত্রা যদি পর পর ব্যবহার বা ভোগ করা যায়, তাহা হইলে প্রত্যেক পরবর্তী মাত্রার উপযোগ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। মানুষের ভোগ করিবার ক্ষমতার একটা সীমা আছে। প্রত্যেক বিশেষ অভাব পূরণীয়। সুতরাং নির্দিষ্ট অভাবপূরণের সামগ্রীটির মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে ভোগের অক্ষমতা হেতু সেই সামগ্রীর উপযোগ হ্রাস পাওয়া স্বাভাবিক। মার্শাল বলেন : ("The additional benefit which a person derives from a given increase of his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has.") কোন একটি দ্রব্য ব্যবহার করিয়া যে উপযোগ বা সন্তুষ্টি পাওয়া যায়, ঠিক সেই দ্রব্যটির অতিরিক্ত মাত্রা ব্যবহার দ্বারা অতিরিক্ত উপযোগের পরিবর্তে অতিরিক্ত মাত্রাগুলির উপযোগ হ্রাস পায়। ইহাই হইল ক্রমহ্রাসমান উপযোগের সূত্র। সুতরাং দেখা যায় যে, অভাবপূরণের দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলেই সেই দ্রব্যটির উপযোগ হ্রাস পায়। পর পৃষ্ঠার চিত্র দ্বারা এই সূত্রটির ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

ঐ চিত্রের **কখ** রেখা দ্বারা উপযোগিতার পরিমাপ করা হইতেছে ও **কগ** রেখাদ্বারা ভোগের পরিমাণ পরিমাপ করা হইতেছে। যখন **কচ** পরিমাণ ভোগ করা হয়, তখন উপযোগ পরিমাণ হইল **চচ´**। পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া **কছ** হইলে উপযোগ পরিমাণ হইল **ছছ´**। ভোগের পরিমাণ **কজ** হইলে উপযোগিতা হইল **জজ´**। ভোগের পরিমাণ **কঝ** হইলে উপযোগিতার পরিমাণ হইল **ঝঝ´**। এই উদাহরণে দেখা যাইতেছে যে, প্রথম মাত্রা অর্থাৎ **কচ** পরিমাণ ভোগের পর দ্বিতীয় মাত্রা অর্থাৎ **কছ** পরিমাণ ভোগ করিলে উপযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার পর তৃতীয় ও চতুর্থ মাত্রা অর্থাৎ **জ** ও **ঝ** মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে উপযোগিতার পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। এইরূপে ক্রমাগত একই দ্রব্যভোগের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে, প্রথম দুই-এক মাত্রা বৃদ্ধিতে উপযোগ বৃদ্ধি পাইলেও পরবর্তী মাত্রাগুলির বৃদ্ধির ফলে উপযোগের হ্রাস অবশ্যম্ভাবী। মাত্রাবৃদ্ধির ফলে উপযোগ হ্রাস পাইয়া চিত্রের **ঙ** বিন্দুতে ইহা একেবারেই শূন্য হইবে। ইহার পর মাত্রা-

বৃদ্ধি হইলে উপযোগের পরিবর্তে অনুপযোগের সৃষ্টি হইবে। যখন **কট** পরিমাণ



ভোগ করা হইবে তখন এই অনুপযোগিতার পরিমাণ হইবে **টট'**। **উউ** এই বক্ররেখাটির দ্বারা উপযোগের হ্রাস-বৃদ্ধি দেখান হইয়াছে।

উপযোগ হ্রাসের কারণ—Causes of the Diminution of Utility.

এখন প্রশ্ন হইল যে, একই দ্রব্যভোগের মাত্রাবৃদ্ধির ফলে উপযোগ কেন হ্রাস পায়? পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, প্রত্যেক নির্দিষ্ট অভাবটি সহজেই পূরণ করা যায়। সুতরাং একটি দ্রব্য দ্বারা নির্দিষ্ট অভাবটি পরিতৃপ্ত হইলে সে দ্রব্যটির আর কোন উপযোগ থাকে না—সুতরাং একই দ্রব্যের অধিক পরিমাণ কেহই চায় না। উপযোগ-হ্রাসের দ্বিতীয় কারণ হইল যে, মানুষের একটি নির্দিষ্ট অভাব একটি নির্দিষ্ট দ্রব্য ব্যতীত অন্য দ্রব্য দ্বারা পূরণ হয় না। আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি যে, 'দুধের তেষ্টা ঘোলে মেটে না'—তাই দুধই চাই এবং দুধের মাত্রা বৃদ্ধি পাইলেই দুধের উপযোগিতা হ্রাস পায়। ভাতের পরিবর্তে ফল খাইলে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না অর্থাৎ ফল ভাতের যথার্থ পরিবর্তী সামগ্রী নহে। সুতরাং ভাতই চাই এবং ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে উপযোগিতারও হ্রাস হয়। (Goods are imperfect substitutes).

ক্রমহ্রাসমান উপযোগ সূত্রের ব্যতিক্রম—Limitations of the Law of Diminishing Utility.

অর্থনৈতিক সূত্রগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণকালে দেখা গিয়াছে যে, এই সূত্রগুলি

অনুমানসিদ্ধ মাত্র, দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে ইহাদের কার্যকারিতার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে অর্থাৎ ভোগের পরিমাণ-বৃদ্ধির ফলে উপযোগের পরিমাণ হ্রাস নাও পাইতে পারে। অপরাপর অর্থনৈতিক সূত্রগুলির ন্যায় এই সূত্রটির কার্যকারিতা কতকগুলি নির্দিষ্ট অবস্থার উপর নির্ভর করে। নির্দিষ্ট অবস্থার পরিবর্তন ঘটিলে সূত্রটি আর কার্যকরী হয় না।

১। পর পর মাত্রাবৃদ্ধির ফলে একই দ্রব্যের উপযোগ হ্রাস পায় তখনই, যখন আমরা সেই দ্রব্যের উপযুক্ত পরিমাণ ভোগ করিতে পারি। দ্রব্যটির প্রথম ব্যবহারের পরিমাণ যদি অভাবপূরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পরিমাণ অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে দ্রব্যটির পরবর্তী অতিরিক্ত মাত্রাবৃদ্ধির ফলে উপযোগিতা হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধি পাইবে এবং অভাবটি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত উপযোগের এই বৃদ্ধি চলিতে থাকিবে। চা পান করিবার যে ইচ্ছা তাহা পূর্ণ এক পেয়ালা চায়ে নিবৃত্ত হয়। এক পেয়ালা চা-ই হইল চা পানের উপযুক্ত পরিমাণ। ইহার পরিবর্তে যদি প্রথমে সিকি পেয়ালা, পরে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সিকি পেয়ালা দেওয়া হয়, তাহা হইলে পূর্ণ এক পেয়ালা না হওয়া পর্যন্ত প্রতি সিকি পেয়ালার উপযোগ বৃদ্ধি পায়।

২। দ্বিতীয়তঃ, এই সূত্রটির কার্যকারিতা ভোগ-ব্যবহারের সময়ের ব্যবধানের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের লোকে দুপুরে ও রাত্রে ভাত খায়। দুপুরে ভাত খাইয়া রাত্রে ভাত খাইতে গেলে ভাতের উপযোগ হ্রাস পায় না, কিন্তু বেলা ১২টার সময় ভাত খাইয়া পুনরায় বেলা ১টার সময় ভাত খাইতে গেলে ভাতের উপযোগ হ্রাস পায়। সুতরাং এই সূত্রটির কার্যকারিতা ভোগ-ব্যবহারের একটা নির্দিষ্ট সময়ের উপর নির্ভর করে।

৩। লোকের আয়ের পরিমাণের যদি কোন পরিবর্তন না ঘটে, তাহা হইলে এই সূত্রটি প্রযোজ্য। কিন্তু যদি আয় বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে তাহার নিকট দ্রব্যটির উপযোগ বৃদ্ধি পাইতে পারে।

৪। এই সূত্রটির আরও একটি ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। এই সূত্র অনুসারে কোনও দ্রব্যের ভোগ-ব্যবহারের পরিমাণের বৃদ্ধি ঘটিলেই উপযোগের পরিমাণ হ্রাস পায় বলা হয়, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, এক ব্যক্তির কোন দ্রব্য হইতে উপযোগ তাহার প্রতিবেশীর সেই দ্রব্যের অধিকার-ভোগের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। কোন ব্যক্তির যদি ডাকটিকিট সংগ্রহ ব্যাপারে কোন

নিকটস্থ প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে আর সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর টিকিটগুলি যদি কোন কারণে নষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রথম ব্যক্তির টিকিটের উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। কোন ব্যক্তি তাহার গৃহে টেলিফোনের সংখ্যা বৃদ্ধি না করিয়াও টেলিফোন হইতে অধিক উপযোগিতা পাইতে পারে, যদি টেলিফোনের ব্যবহার প্রসার লাভ করে।

৫। অনেকে বলেন যে, প্রাচীনকালের দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য (Antique)-সংগ্রহ ব্যাপারে এই সূত্রটি প্রযোজ্য নহে। যত বেশী দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য সংগৃহীত হইবে, উপযোগ সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু এই অনুমান সত্য নহে। ডাকটিকিট বা পুরাতন মুদ্রা-সংগ্রহ ব্যাপারে সাধারণতঃ একজাতীয় টিকিট বা একজাতীয় মুদ্রা সংগ্রহ করা হয় না। বিভিন্ন জাতীয় দ্রব্য সংগ্রহ করা হয়, সুতরাং উপযোগ বৃদ্ধি পায়। একজাতীয় টিকিট বা একজাতীয় মুদ্রা সংগ্রহ করিলে তাহার উপযোগ হ্রাস অবশ্যম্ভাবী।

৬। অনেকে বলেন অর্থের ক্ষেত্রে এই সূত্রটি প্রযোজ্য নহে। অর্থ-আহরণের আকাঙ্ক্ষার কোন নিবৃত্তি নাই এবং অর্থের পরিমাণ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপযোগ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কার্যতঃ ইহা সত্য নহে। ধনীর নিকট ৬ পয়সার যে মূল্য, দরিদ্রের নিকট ৬ পয়সার তদপেক্ষা অনেক অধিক মূল্য। অর্থের পরিমাণ-বৃদ্ধির ফলে অর্থের প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়। এই সূত্রটির বিশদ আলোচনা করিয়া অধ্যাপক টাউসিগ্ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই সূত্রটির ব্যতিক্রম এত কম যে, ইহাকে একটি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য অর্থনৈতিক সূত্র বলা যাইতে পারে।

প্রান্তিক উপযোগ ও সমগ্র উপযোগ—Marginal Utility and Total Utility

একটি লোক যদি একসঙ্গে ৫টি আম খায় তাহা হইলে এই ৫টি আম হইতে সে যে তৃপ্তি বা উপযোগ পায়, তাহাকে সমগ্র উপযোগ বা Total Utility বলা হয়। প্রান্তিক উপযোগ বা Marginal Utility বলিতে সেই ব্যক্তি শেষ অর্থাৎ পঞ্চম আমটি খাইয়া যে উপযোগ পাইল, তাহাই বুঝায়। একটি লোক তাহার মজুত দ্রব্যের সামান্য বৃদ্ধিতে যে উপযোগ পায়, তাহাকে প্রান্তিক উপযোগ বলা হয়। প্রান্তিক উপযোগের সংজ্ঞা একটু বিশদভাবে আলোচনা প্রয়োজন।

ক্রেতা দ্রব্যক্রয়কালে মনে মনে হিসাব করে যে, ক্রীত প্রত্যেক মাত্রা দ্রব্যের জন্য প্রদত্ত মূল্য ও প্রত্যেক মাত্রা হইতে প্রাপ্ত উপযোগ সমান কি না। যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্রেতার প্রদত্ত মূল্য ও ক্রীত দ্রব্য হইতে প্রাপ্ত উপযোগ সমান হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রেতা ক্রয় করিবে। প্রদত্ত মূল্য ও প্রাপ্ত উপযোগ সমান হইলে তাহার পর ক্রেতা আর ক্রয় করিবে না। এই শেষ ক্রয়কে প্রান্তিক ক্রয় (Marginal purchase) বলা হয় এবং এই শেষ মাত্রা হইতে যে অতিরিক্ত উপযোগ পাওয়া যায়, তাহাই প্রকৃতপক্ষে প্রান্তিক উপযোগ। নিম্নলিখিত উদাহরণটির দ্বারা প্রান্তিক উপযোগের ধারণা স্পষ্টতর হইবে।

দ্রব্যের মাত্রা Units	সমগ্র উপযোগ Total utility	প্রান্তিক উপযোগ Marginal utility
১ম আম	১০	১০
২য় „	১৮	৮
৩য় „	২৪	৬
৪র্থ „	২৮	৪
৫ম „	৩০	২
৬ষ্ঠ „	৩০	০
৭ম „	২৭	-৩

উপরি-উক্ত উদাহরণ দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, প্রতি পরবর্তী আম হইতে ক্রেতা যে উপযোগিতা পায় তাহা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে এবং ষষ্ঠ আমের ক্ষেত্রে উপযোগিতা শূন্য হয় এবং ইহার পর সপ্তম আম ক্রয় করিলে উপযোগিতার পরিবর্তে অনুপযোগিতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পঞ্চম আম পর্যন্ত উপযোগিতা বৃদ্ধি পায় কিন্তু তৎপরে এই উপযোগিতা-বৃদ্ধি কমিতে থাকে। সুতরাং প্রান্তিক উপযোগিতা বলিতে ক্রীতদ্রব্যের প্রান্তসীমায় অবস্থিত অর্থাৎ শেষ মাত্রার উপযোগিতা বুঝায়। এই উপযোগিতা সর্বাপেক্ষা কম। ক্রম-হ্রাসমান উপযোগিতা সূত্রটি হইতে জানিতে পারা যায় যে, ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে একটা সীমা পর্যন্ত মোট উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কিন্তু ভোগের পরিমাণ যে হারে বাড়ে, উপযোগিতার পরিমাণ সে হারে বাড়ে না। ভোগ পরিমাণ বৃদ্ধির প্রত্যেক পরবর্তী মাত্রার উপযোগিতা হ্রাস পায় অর্থাৎ প্রান্তিক (শেষ) মাত্রার উপযোগিতা হ্রাস পায়। এই জন্য বর্তমানে এই

সূত্রটিকে ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতা সূত্র (Law of Diminishing Utility) আখ্যা না দিয়া **ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতা (Law of Diminishing Marginal Utility)** বলা অধিকতর সমীচীন।

প্রান্তিক উপযোগ ও মূল্য—Marginal Utility and Price.

পূর্ব আলোচনা হইতে স্বভাবতই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, মূল্য দ্বারা প্রান্তিক উপযোগ স্থিরীকৃত হয়, অর্থমূল্য ও প্রান্তিক উপযোগ সমান হওয়া চাই। যে স্থলে উপযোগ ও মূল্য সমান হয়, ক্রেতা সেখানেই তাহার ক্রয় শেষ করে। যদি মূল্য প্রান্তিক উপযোগ অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে ক্রেতা ক্রয় করিবে না। একটি দ্রব্যের সকল মাত্রাই বিনিময়যোগ্য বলিয়া (being interchangeable) শেষ বা প্রান্তিক মাত্রার জন্য যে মূল্য দেওয়া হয়, অপর সকল মাত্রার জন্যও সেই একই মূল্য প্রদত্ত হয়। সুতরাং বলা যায় যে, প্রান্তিক (মাত্রার) উপযোগ মূল্য নির্ধারণ করে। দ্রব্যমূল্য সমগ্র উপযোগের উপর নির্ভর করে না, তাহা না হইলে লবণের মূল্য চায়ের মূল্য অপেক্ষা অধিক হইত। প্রকৃতপক্ষে প্রান্তিক উপযোগ মূল্য স্থির করে না—ইহা মূল্য-নির্ধারণের স্থান সূচিত করে মাত্র। চাহিদা ও যোগান হইল মূল্য-নির্ধারণের প্রকৃত কারণ। মূল্য পরিবর্তিত হইলে প্রান্তিক উপযোগেরও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং মূল্য ও প্রান্তিক উপযোগ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

সংক্ষিপ্তসার

অভাবের বৈশিষ্ট্য—

১। অভাব অসংখ্য কিন্তু, ২। প্রত্যেকটি অভাব এককভাবে সহজে পূরণ করা যায়, ৩। একই অভাব নানাভাবে পূরণ করা যায় অর্থাৎ অভাবগুলির মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা চলে, ৪। অনেক অভাব একমাত্র একাধিক দ্রব্যের সহযোগিতায় দূর করা যায়।

অভাবের শ্রেণীবিভাগ—

অপরিহার্যতার দিক দিয়া অভাবকে ১। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয়

দ্রব্য, ২। আরামপ্রদ দ্রব্য ও ৩। বিলাসিতার দ্রব্য—এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমটি অপরিহার্য, কেননা এই অভাবগুলি পূরণ না হইলে মানুষ বাঁচিতে পারে না। আরামপ্রদ দ্রব্য লোকের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করিলেও উপযোগিতা অপেক্ষা এইগুলির খরচ অনেক বেশী। বিলাসদ্রব্যের কোন উপযোগ নাই বলিলেও চলে। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলিকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয় ; যথা, (ক) বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য, (খ) কর্মক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও (গ) অভ্যাসগত বা ব্যবহারসিদ্ধ দ্রব্য, যেমন অলংকার বা মূল্যবান পরিচ্ছদ। স্থান-কালপাত্র-ভেদে প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বের দিক দিয়াই এই শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে।

ক্রমহ্রাসমান উপযোগ—

যেহেতু মানুষের নির্দিষ্ট কোন অভাব সহজে পূরণ করা যায়, সেইহেতু কোন দ্রব্যের অতিরিক্ত মাত্রা ভোগ করিলে সেই দ্রব্যের উপযোগ হ্রাস পাইতে থাকে। কিন্তু এই উপযোগ-হ্রাসের কোন নির্দিষ্ট সীমা নাই। অনেক সময় দ্বিতীয় পেয়ালা চা হইতে প্রথম পেয়ালা চা অপেক্ষা অধিকতর উপযোগ পাওয়া যায়। তবে একই দ্রব্যের আধিক্য হইলে উপযোগ যে একসময় হইতে হ্রাস পাইবে ইহা ধ্রুবসত্য। তবে দ্রব্যটি একই জাতীয় হওয়া চাই এবং লোকের রুচি, অভ্যাস ও আয় অপরিবর্তনীয় থাকা চাই।

প্রান্তিক উপযোগ ও সমগ্র উপযোগ—

একটি দ্রব্যের বিভিন্ন মাত্রা ক্রয় করিলে যে মাত্রার উপযোগ বাজার-দরের সমান হয় এবং যে মাত্রার পরে ক্রেতা দ্রব্যটির আর অতিরিক্ত মাত্রা ক্রয় করে না, সেই মাত্রাকে দ্রব্যটির প্রান্তিক মাত্রা বলা হয় এবং এই প্রান্তিক মাত্রা হইতে যে উপযোগ পাওয়া যায় তাহাকে প্রান্তিক উপযোগ বলা হয়। এইরূপে একজন ক্রেতা একটি দ্রব্যের যে কয় মাত্রা ক্রয় করে, তাহার প্রত্যেকটির উপযোগ যোগ্ করিলে সমগ্র উপযোগ পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. State and explain the law of Diminishing utility. Name at least two cases of exceptions to the law. H. S. (Com.) 1960, 1965

ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধিটি ব্যাখ্যা কর। ইহার অন্ততঃ দুইটি ব্যতিক্রমের উল্লেখ কর।

উঃ—মানুষের অভাব অসীম হইলেও প্রতিটি নির্দিষ্ট অভাব সসীম অর্থাৎ সহজেই পুরণ করা যায়। অভাবের এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ধনবিজ্ঞানের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের ব্যাখ্যা করা যায়। এই সূত্রটিকে ক্রমহ্রাসমান উপযোগ সূত্র বলা হয়। এই সূত্র অনুসারে বলা হয় যে, যদি কোন লোক একই দ্রব্যের অধিক পরিমাণ পাইতে থাকে তাহা হইলে প্রত্যেক পরবর্তী মাত্রার উপযোগ তাহার নিকট হ্রাস পাইতে থাকিবে ও শেষ পর্যন্ত সেই দ্রব্যটির তাহার নিকট আর কোন উপযোগ থাকিবে না। গরমের দিনে একগ্লাস ঠাণ্ডা জল একটি তৃষ্ণার্ত লোকের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে। প্রথম গ্লাস জলের উপযোগ তাহার নিকট খুব বেশি। কিন্তু দ্বিতীয় গ্লাসের উপযোগ তাহার নিকট অনেক কম। তৃতীয় গ্লাস জলের উপযোগ তাহার নিকট শূন্য। এইরূপে সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, প্রতিটি নির্দিষ্ট অভাব সসীম বলিয়া কোন দ্রব্যের উপযোগ দ্রব্যটির পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমিতে থাকে। মূল্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়া এই উপযোগ হ্রাস বুঝা যায় অর্থাৎ একটি দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে প্রত্যেক পরবর্তী মাত্রার উপযোগ হ্রাস পায় এবং উপযোগ হ্রাসের জন্য লোকে কম মূল্য দিতে চায়।

ক্রমহ্রাসমান বিধিটি ভোগের সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইলেও ইহা একেবারে শর্তহীন নহে। প্রথমতঃ, এই বিধিটি কার্যকরী হইতে গেলে ধরিয়া লইতে হইবে যে, ভোগ ব্যবহারের একক অভাবপূরণের জন্য পর্যাপ্ত হওয়া চাই। চা পান করিবার যে ইচ্ছা তাহা পূর্ণ এক পেয়ালা চায়ে নিবৃত্ত হয়। এক পেয়ালা চা-ই হইল চা-পানের উপযুক্ত পরিমাণ। ইহার পরিবর্তে যদি প্রথমে সিকি পেয়ালা, পরে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সিকি পেয়ালা চা দেওয়া হয়, তাহা হইলে পূর্ণ এক পেয়ালা না হওয়া পর্যন্ত প্রতি সিকি পেয়ালার উপযোগ বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয়তঃ, এই সূত্রটির কার্যকারিতা ভোগ-ব্যবহারের একটা নির্দিষ্ট সময়ের উপর নির্ভর করে। দুপুরে ভাত খাইয়া রাত্রে ভাত খাইতে গেলে ভাতের উপযোগ কমে না, কিন্তু বেলা ১২টার সময় ভাত খাইয়া পুনরায় বেলা ১টার সময় ভাত খাইতে গেলে ভাতের উপযোগ হ্রাস পায়।

2. Distinguish between Total utility and Marginal utility with the help of an example. Explain how they are related to price. H.S.(Com.) 1962

প্রান্তিক উপযোগ ও সমগ্র উপযোগের পার্থক্য কর। মূল্যের সহিত ইহাদের সম্পর্ক বিচার কর।

উঃ—নিম্নলিখিত উদাহরণ সাহায্যে প্রান্তিক উপযোগ ও সমগ্র বা মোট উপযোগ ধারণা দুইটি স্পষ্টতর করা যাইতে পারে।

দ্রব্যের মাত্রা	সমগ্র উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ
১ম আম	১০	১০
২য় "	১৮	৮
৩য় "	২৪	৬
৪র্থ "	২৮	৪
৫ম "	৩০	২
৬ষ্ঠ "	৩০	০
৭ম "	২৭	—৩

উপরি-উক্ত উদাহরণ দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, প্রতি পরবর্তী আম হইতে ক্রেতা যে উপযোগ পায় তাহা ক্রমশঃ কমিতে থাকে এবং ষষ্ঠ আমের ক্ষেত্রে উপযোগ শূন্য হয় এবং ৭ম আম হইতে অনুপযোগ আরম্ভ হয়। ৫ম আম পর্যন্ত উপযোগ বৃদ্ধি পায় কিন্তু তারপর কমিতে থাকে। সুতরাং প্রান্তিক উপযোগ বলিতে ক্রীতদ্রব্যের প্রান্তসীমায় অবস্থিত অর্থাৎ শেষমাত্রার উপযোগ বুঝায়। এই উপযোগ সর্বাপেক্ষা কম এবং ক্রেতার প্রদত্ত মূল্য এই উপযোগের সমান হয়। ক্রীত সকল দ্রব্য হইতে যে উপযোগ পাওয়া যায় তাহাকে সমগ্র উপযোগ বলা হয়। উপরের উদাহরণে ক্রেতা ৫টি আম ক্রয় করিলে তাহার প্রান্তিক উপযোগ হইল ২, আর সমগ্র উপযোগ হইল ৩০।

অর্থমূল্য ও প্রান্তিক উপযোগ সমান হওয়া চাই। যে স্থলে উপযোগ ও মূল্য সমান হয়, ক্রেতা সেইখানেই তাহার ক্রয় শেষ করে। যদি মূল্য প্রান্তিক উপযোগ অপেক্ষা বেশী হয়, তাহা হইলে ক্রেতা ক্রয় না করিতে পারে, আবার মূল্য প্রান্তিক উপযোগ অপেক্ষা কম হইলে ক্রেতা অধিক পরিমাণ ক্রয় করিতে পারে। একটি দ্রব্যের সকলমাত্রাই বিনিময়যোগ্য বলিয়া শেষ বা প্রান্তিক মাত্রার জন্য যে মূল্য দেওয়া হয়, অপর সকল মাত্রার জন্যও সেই একই মূল্য দেওয়া হয়। সুতরাং বলা যায় যে, প্রান্তিক (মাত্রার) উপযোগই মূল্য নির্ধারণ করে। দ্রব্যমূল্য সমগ্র উপযোগের উপর নির্ভর করে না। তাহা না হইলে লবণের মূল্য চায়ের মূল্য অপেক্ষা অধিক হইত।

3. Explain the meaning of the following :— H. S. (Com.) 1964

(a) Free goods and Economic goods.

(b) Market.

(c) Marginal utility.

নিম্নলিখিতগুলির ব্যাখ্যা কর :—(a) অনায়াসলভ্য দ্রব্য ও অর্থনৈতিক দ্রব্য, (b) বাজার, (c) প্রান্তিক উপযোগ।

উঃ (a)—উপযোগ সম্পন্ন অর্থাৎ প্রয়োজনীয় যে-কোন সামগ্রীকে ধনবিজ্ঞানে দ্রব্য বলা হয়। যে সমস্ত জিনিস মানুষের অভাব দূর করিয়া তাহাকে তৃপ্তি দান করিতে পারে, সেইগুলি দ্রব্য বলিয়া অভিহিত হয়। নৈতিক দিক দিয়া সব দ্রব্য একজাতীয় না হইলেও ধনবিজ্ঞানের অর্থে সব দ্রব্যই এক পদবাচ্য। বাতাস, জল, আলো প্রভৃতি ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় যে অর্থে দ্রব্য বলিয়া অভিহিত হয়, অনুরূপ অর্থে মদ্যও তদ্রূপ দ্রব্য বলিয়া পরিচিত।

দ্রব্যগুলিকে আবার প্রকৃতি-দত্ত বা অনায়াসলভ্য দ্রব্য (Free goods) ও অর্থনৈতিক দ্রব্য (Economic goods) বলা হয়। যে দ্রব্যগুলি অনায়াসলভ্য এবং যেগুলি ভোগ করিবার জন্য কোন প্রকার মূল্য প্রদান করিতে হয় না, সেগুলি হইল প্রকৃতি-দত্ত দ্রব্য, যথা, নদীর জল, বায়ু প্রভৃতি। যে দ্রব্যগুলি পাইতে হইলে পরিশ্রম করিতে হয় এবং একটা মূল্য প্রদান করিতে হয়, সেগুলিকে অর্থনৈতিক দ্রব্য বলা হয়। চাহিদার তুলনায় এই দ্রব্যগুলির সরবরাহ অপ্রচুর। অর্থ নৈতিক দ্রব্যগুলি বিনিময়যোগ্য। বাড়ী, গাড়ী, কাপড় প্রভৃতি হইল অর্থ নৈতিক দ্রব্য।

(b) ধনবিজ্ঞানে বাজার বলিতে কোন নির্দিষ্ট স্থান বুঝায় না। ইহার অর্থ হইল এক বা একাধিক দ্রব্য যাহার ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করে এবং এই প্রতিযোগিতার ফলে সমস্ত বাজারে দ্রব্যটির মূল্য সমান হয় অর্থাৎ প্রতিযোগিতার বাজারে একই দ্রব্যের বিভিন্ন মূল্য হইতে পারে না। সুতরাং অর্থনৈতিক অর্থে বাজার বলিলে বুঝা যায় (১) দ্রব্য ক্রয় ও বিক্রয় করিবার জন্য একদল ক্রেতা ও একদল বিক্রেতা, (২) দ্রব্য ক্রয় ও বিক্রয় করিবার জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং (৩) এই পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ফলে একটি নির্দিষ্ট কালে সকল ক্রেতাই একই দ্রব্যের জন্য একই মূল্য প্রদান করিবে এবং সকল বিক্রেতাকেই সেই দ্রব্যের জন্য সমান দাম ধার্য করিতে হইবে। (৪) যে দ্রব্যটির ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে প্রতিযোগিতা চলে, সেই দ্রব্যটির সমজাতীয় হওয়া চাই।

প্রতিযোগিতা যদি স্থানীয় ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহা হইলে তাহাকে স্থানীয় বাজার বলা হয়, যথা, কাঁচা তরকারী, দুধ প্রভৃতির বাজার। প্রতিযোগিতার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাইয়া দেশব্যাপী-প্রতিযোগিতা চলিলে তাহাকে জাতীয় বাজার বলা হয়, যথা, ধান, কাপড়, প্রভৃতির বাজার। প্রতিযোগিতা পৃথিবীব্যাপী প্রসারিত হইলে তাহাকে আন্তর্জাতিক বাজার বলে, যথা, পাট, সোনা, বড় বড় কোম্পানীর শেয়ার প্রভৃতির বাজার। বাজারের আয়তন দ্রব্যটির স্থানান্তর যোগ্যতা, চাহিদার ব্যাপকতা, নমুনা যোগ্যতা, স্থায়িত্ব প্রভৃতির উপর নির্ভর করে।

(c) ক্রেতা দ্রব্য ক্রয়কালে মনে মনে হিসাব করে যে, ক্রীত প্রত্যেক মাত্রা দ্রব্যের জন্য প্রদত্ত-মূল্য ও প্রাপ্ত উপযোগ সমান কিনা। যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্রেতার প্রদত্ত-মূল্য ও ক্রীতদ্রব্য হইতে প্রাপ্ত উপযোগ সমান হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রেতা ক্রয় করিবে। প্রাপ্ত উপযোগ ও প্রদত্ত-মূল্য সমান হইলে তাহার পর ক্রেতা আর ক্রয় করিবে না। এই শেষ ক্রয়কে প্রান্তিক ক্রয় (Marginal purchase) বলা হয় এবং এই শেষ মাত্রা হইতে যে অতিরিক্ত উপযোগ পাওয়া যায় তাহাকে প্রান্তিক উপযোগ (Marginal utility) বলা হয়।

ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধির ধারণা হইতে প্রান্তিক উপযোগের ধারণা করা হয়। ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি হইতে জানা যায় যে, ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে একটা সীমা পর্যন্ত মোট উপযোগ (Total utility) বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ভোগের পরিমাণ যে হারে বাড়ে, উপযোগ পরিমাণ সে হারে বাড়ে না। ভোগ পরিমাণ বৃদ্ধির প্রত্যেক পরবর্তী মাত্রার উপযোগ হ্রাস পায় অর্থাৎ প্রান্তিক (শেষ) মাত্রার উপযোগ কমিতে থাকে। সুতরাং প্রান্তিক উপযোগ বলিতে ক্রীতদ্রব্যের প্রান্ত সীমায় অবস্থিত অর্থাৎ শেষমাত্রার উপযোগ বুঝায়—যে মাত্রার পর ক্রয় করিলে ক্রেতা ক্রীত দ্রব্য হইতে কোন উপযোগ পায় না।

চতুর্থ অধ্যায়

চাহিদার সূত্র ও স্থিতিস্থাপকতা

(Law of Demand and Elasticity of Demand)

চাহিদার সূত্র—Law of Demand.

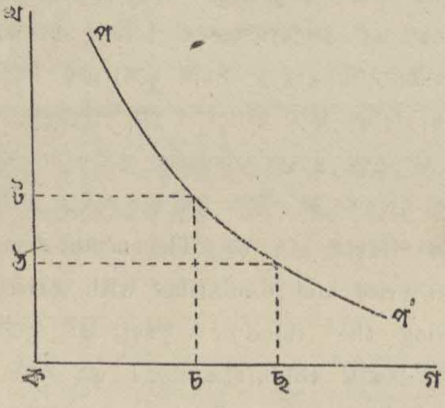
ক্রমহ্রাসমান উপযোগের সূত্র হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, নির্দিষ্ট অভাব পূরণের সামগ্রীর আধিক্য হইলে সেই সামগ্রীর পরবর্তী মাত্রাগুলির উপযোগ ক্রমশঃ কমিতে থাকে। প্রথম পেয়ালা চা পানের পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় পেয়ালার উপযোগ কম এবং এই উপযোগ-হ্রাসের নিমিত্তই পানকারী কম-উপযোগী মাত্রাগুলি অধিক-উপযোগী মাত্রার সমান মূল্যে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক নহে। যেহেতু দ্রব্যটির মাত্রাবৃদ্ধির ফলে উপযোগ হ্রাস পাইতেছে, সেইহেতু কম মূল্য না হইলে ক্রেতা আর সেই দ্রব্যের অধিকমাত্রা ক্রয় করিবে না। চাহিদার সূত্র হইল—স্থিতাবস্থার পরিবর্তন না ঘটিলে মূল্য হ্রাস পাইলে চাহিদার বৃদ্ধি হয় ও মূল্য বৃদ্ধি পাইলে চাহিদার হ্রাস হয় (The amount demanded increases with a fall in price and diminishes with a rise in price, other things remaining the same)। সুতরাং এই সূত্রটিকে ক্রমহ্রাসমান উপযোগ সূত্রের উপ-সিদ্ধান্ত বলা যাইতে পারে। এই সূত্রটি মূল্য ও চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। চাহিদা ও মূল্যের সম্পর্ক হইল বিপরীতমুখী অর্থাৎ মূল্য কমিলে চাহিদা বাড়ে ও মূল্য বাড়িলে চাহিদা কমে, কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মূল্য ও চাহিদার এই সম্পর্ক আনুপাতিক নাও হইতে পারে (though inverse but not necessarily proportionate) অর্থাৎ, মূল্য দ্বিগুণ হইলে চাহিদা যে অর্ধেক হইবে ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

অন্যান্য অর্থনৈতিক সূত্রের ন্যায় এই সূত্রটিও অনুমানসিদ্ধ। কতকগুলি নির্দিষ্ট অবস্থায় এই সূত্রটির কার্যকারিতা নির্ভর করে। প্রথমতঃ, ধরিয়া লইতে হইবে যে, ক্রেতার রুচি, অভ্যাস প্রভৃতি অপরিবর্তিত আছে। রুচি পরিবর্তিত হইলে অনেক সময় দেখা যায় যে, ক্রেতা মূল্য বৃদ্ধি পাইলেও তাহার ক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস করে না। দ্বিতীয়তঃ, ক্রেতার আয়ের পরিমাণ ঠিক থাকা চাই। আয়ের

পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিলে অনেক সময় ক্রয়ের পরিমাণের পরিবর্তন হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, অন্যান্য সামগ্রীর মূল্য বিশেষ করিয়া পরিবর্তী সামগ্রী বা পরিপূরক (Substitutes or Complementary goods) সামগ্রার মূল্য অপরিবর্তনীয় থাকা চাই। যদি কোকো বা কফির মূল্য কমে অথবা দুধ বা চিনি দুষ্প্রাপ্য হয়, তাহা হইলে চায়ের মূল্যের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

চাহিদার সূত্রের ব্যতিক্রম—Limitations to the Law of Demand.

অর্থনৈতিক অন্যান্য সূত্রের ন্যায় চাহিদার সূত্রেরও কতিপয় ব্যতিক্রম আছে। প্রথমতঃ, বলা যায় যে, এমন অনেক দ্রব্য আছে যেগুলি শুধুমাত্র 'লোক দেখান'র



জন্য ব্যবহৃত হয়—তাহাদের নিজস্ব কোন উপযোগিতা নাই। স্ত্রীলোকের অলংকার এই জাতীয় দ্রব্য। স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে বিত্তবান শ্রেণীর মহিলাগণ তাঁহাদের আভিজাত্য প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে অধিক স্বর্ণালংকার ব্যবহার করেন। দ্বিতীয়তঃ, ফাটকা বাজারে (Share Market) দেখা যায় যে, যখন কোন শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পায় তখন মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইতে পারে এই আশায় সকলে শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য ব্যগ্র হয় অর্থাৎ শেয়ারের চাহিদা বৃদ্ধি পায় ও মূল্য হ্রাস পাইলে শেয়ারের চাহিদাও হ্রাস পায়। সুতরাং দেখা যায় যে, চাহিদা প্রধানতঃ মূল্যের উপর নির্ভর করিলেও সম্পূর্ণভাবে ইহার উপর নির্ভর করে না।

৪৪ পৃষ্ঠার চিত্র দ্বারা চাহিদার সূত্রটিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। **কখ** রেখা দ্বারা দ্রব্যমূল্য সূচিত হইতেছে ও **কগ** রেখা দ্বারা দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ দেখান হইতেছে। যখন দ্রব্যমূল্য **কট**, তখন চাহিদার পরিমাণ হইল **কচ**। ইহার পর দ্রব্যমূল্য যখন **কঠ**-এ হ্রাস পাইল, চাহিদা **কচ** হইতে **কছ**-এ বৃদ্ধি পাইল। **পপ** এই বক্র রেখাটির দ্বারা মূল্যের সহিত চাহিদার বিপরীতমুখী সম্পর্ক দেখান হইল।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা—Elasticity of Demand.

চাহিদার সূত্র অনুসারে দেখা যায় যে, চাহিদা ও মূল্যের মধ্যে একটা বিপরীতমুখী সম্পর্ক রহিয়াছে। মূল্যের উত্থান-পতনে চাহিদারও উত্থান-পতন হয়। মূল্যের প্রভাবে চাহিদার এই পরিবর্তন অর্থাৎ সংকোচন ও প্রসারণকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়। সুতরাং চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলিলে চাহিদা ও মূল্যের পারস্পরিক সম্পর্কের মাত্রা বুঝায়। মূল্য-পরিবর্তনের ফলে যে হারে (rate) চাহিদার পরিবর্তন ঘটে, সেই হারই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সূচিত করে।

কিন্তু চাহিদার এই পরিবর্তন মূল্য-পরিবর্তনের সমানুপাতিক নাও হইতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় যে, মূল্যের সামান্য পরিবর্তনে অর্থাৎ হ্রাস-বৃদ্ধিতে চাহিদার গুরুতর পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি বেতারযন্ত্রের মূল্য হ্রাস পায় তাহা হইলে বহুলোকে ইহার ব্যবহার করিবে ফলে চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। অপর পক্ষে এমন অনেক জিনিস আছে যাহার মূল্য অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলেও চাহিদার বিশেষ তারতম্য হয় না। নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য লবণের দাম দ্বিগুণিত হইলেও ইহার চাহিদার বিশেষ পরিবর্তন হয় না। সুতরাং বেতারযন্ত্রের চাহিদা পরিবর্তনশীল, কিন্তু লবণের চাহিদা বিশেষ পরিবর্তনশীল নহে। মূল্যের প্রভাব উভয় দ্রব্যের উপর সমান নহে।

এরূপ দ্রব্য খুব কমই আছে, মূল্য-পরিবর্তনের ফলে যাহার চাহিদার একটুও পরিবর্তন হয় না। মূল্যের পরিবর্তন ঘটিলে সকল দ্রব্যের চাহিদার কিছু-না-কিছু পরিবর্তন ঘটে, তবে এই পরিবর্তনের মাত্রা সর্বক্ষেত্রে সমান নহে। এইজন্য অধ্যাপক মার্শাল বলিয়াছেন যে, মূল্যের একটা নির্দিষ্ট পতনে চাহিদার অধিক বা কম বৃদ্ধি এবং মূল্যের একটা নির্দিষ্ট বৃদ্ধিতে চাহিদার অধিক বা কম হ্রাস—

তদনুসারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার আধিক্য বা স্বল্পতা নির্ণীত হয়। ("The elasticity of demand in a market is great or small according as the amount demanded increases much or little for a given fall in price, and diminishes much or little for a given rise in price.")

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কিসের উপর নির্ভরশীল—Factors on which elasticity depends.

কোন জিনিসের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অনেকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে:

১। প্রথমতঃ বলা যায় যে, স্থিতিস্থাপকতা সামগ্রীটির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে অর্থাৎ সামগ্রীটি অপরিহার্য কিনা। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, জীবন-ধারণের নিমিত্ত অপরিহার্য সামগ্রীগুলির চাহিদা অপরিবর্তনশীল, কেননা মূল্য বৃদ্ধি পাইলেও সেগুলির ব্যবহার বন্ধ করা যায় না—যথা, লবণ। অপর পক্ষে বিলাস-দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা পরিবর্তনশীল। মূল্য বৃদ্ধি পাইলে এই দ্রব্যগুলি ব্যবহার না করিলেও চলে—যথা, গন্ধদ্রব্য।

২। যে-সমস্ত দ্রব্য বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যায়, যেমন বিদ্যুৎ, সে-সমস্ত দ্রব্যের চাহিদা সাধারণতঃ পরিবর্তনশীল। মূল্য বৃদ্ধি পাইলে প্রত্যেকটির ব্যবহারে মিতব্যয়িতা করিয়া ব্যয়সংকোচ সম্ভব হয়।

৩। অভ্যাসগত দ্রব্যগুলির চাহিদা সাধারণতঃ অপরিবর্তনীয় হয়। মূল্য বৃদ্ধি পাইলে লোকে অনেক সময় অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের ব্যয়সংকোচ করিয়া অভ্যাসগত দ্রব্য ব্যবহার করে।

৪। যে-সমস্ত দ্রব্যের উপযুক্ত পরিবর্তী সামগ্রী (Substitutes) পাওয়া যায় সে-সমস্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা পরিবর্তনশীল হয়। বাস্ ও ট্রাম একটির ভাড়া বৃদ্ধি পাইলে লোকে অপরটি ব্যবহার করিবে।

৫। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অনেক পরিমাণে লোকের আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ যাহাঁদের আয় বেশী, মূল্যপরিবর্তনে তাহাদের চাহিদার বিশেষ পরিবর্তন হয় না। স্বল্প-আয়ের লোকের চাহিদাই মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধিতে অধিকতর প্রভাবিত হয়।

৬। যে-সমস্ত দ্রব্যের উপর লোকের আয়ের অতি অকিঞ্চিৎকর অংশ ব্যয়িত হয়, মূল্যের পরিবর্তনে সে-সমস্ত দ্রব্যের চাহিদার বিশেষ তারতম্য হয় না।

৭। যে-সমস্ত দ্রব্যের মূল্য পূর্ব হইতেই অত্যধিক রহিয়াছে, সে-সমস্ত দ্রব্যের মূল্য পুনরায় বৃদ্ধি পাইলে চাহিদা কম হয় কিন্তু স্বল্পমূল্যের দ্রব্যের মূল্য যদি আরও হ্রাস পায় তাহা হইলেও তাহার চাহিদার সাধারণতঃ কোন পরিবর্তন ঘটে না।

স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ—Measurement of Elasticity.

মূল্যের পরিবর্তনের ফলে সকল দ্রব্যেরই চাহিদার অল্পবিস্তর পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু চাহিদার এই পরিবর্তনশীলতার মাত্রা সর্বক্ষেত্রে সমান নহে। সুতরাং বিভিন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার এই পরিবর্তনশীলতার মাত্রা কি উপায়ে জানা যায় তাহাই হইল সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের দুইটি উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে।

প্রথম পদ্ধতি অনুসারে স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করিতে হইলে দ্রব্যটির মূল্যবৃদ্ধির পূর্বে ও পরে দ্রব্যটির জন্য যে-পরিমাণ ব্যয় করা হইয়াছে তাহার তুলনা করিয়া স্থিতিস্থাপকতাকে তিন ভাবে প্রকাশ করা যায়।

১। মূল্যপরিবর্তন হইলেও সমগ্র ব্যয়ের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিলে তাহাকে unit elasticity বা স্থিতিস্থাপকতার স্থিতাবস্থা বলা হয়।

২। স্থিতিস্থাপকতা স্থিতাবস্থার উর্ধ্বে যায় তখন, যখন মূল্যপতনের ফলে সমগ্র ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় অথবা মূল্যবৃদ্ধির ফলে সমগ্র ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পায় (greater than unity)।

৩। স্থিতিস্থাপকতার স্থিতাবস্থা নিম্নাভিমুখী হয় তখন, যখন মূল্যবৃদ্ধির ফলে সমগ্র ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় অথবা মূল্যপতনের ফলে সমগ্র ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পায় (Less than unity)।

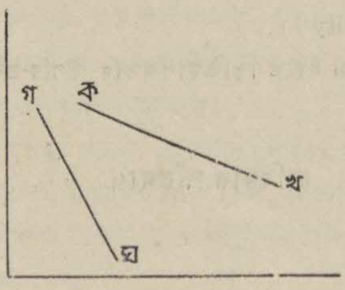
নিম্নলিখিত তালিকা হইতে স্থিতিস্থাপকতার উপরি-উক্ত তিনটি বিভিন্ন রূপ স্পষ্টতর হইবে—

মূল্য	চাহিদার পরিমাণ	সমগ্র ব্যয়
৬ টাকা	৯	৫৪ টাকা
৪.৫০ ”	১২	৫৪ ”
৪ ”	১৪	৫৬ ”
৩ ”	১৫	৪৫

(১) উপরি-উক্ত তালিকায় মূল্য যখন ৬ টাকা হইতে ৪.৫০ পয়সায় হ্রাস হইতেছে তখন চাহিদার পরিমাণ ৯ হইতে ১২ বৃদ্ধি পাইতেছে কিন্তু সমগ্র ব্যয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট রহিয়াছে। ইহার দ্বারা স্থিতিস্থাপকতার স্থিতাবস্থা (unit elasticity) সূচিত হইতেছে। (২) মূল্য ৪.৫০ হইতে যখন ৪ টাকায় হ্রাস পাইতেছে, তখন চাহিদার পরিমাণ ১২ হইতে ১৪ বৃদ্ধি পাইয়া সমগ্র ব্যয়ের পরিমাণ ৫৪এ হইতে ৫৬এ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা স্থিতিস্থাপকতার স্থিতাবস্থার ঊর্ধ্বাভিমুখী গতি বুঝাইতেছে। (৩) মূল্য যখন ৪ টাকা হইতে ৩ টাকায় হ্রাস পাইল, তখন চাহিদার পরিমাণ ১৪ হইতে ১৫ বৃদ্ধি পাইলেও সমগ্র ব্যয়ের পরিমাণ ৫৬ হইতে ৪৫ হ্রাস পাইল। ইহা স্থিতিস্থাপকতার স্থিতাবস্থার নিম্নাভিমুখী গতি বুঝাইতেছে।

স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের দ্বিতীয় পদ্ধতি হইল যে, মূল্য-পরিবর্তনের হারের সহিত চাহিদা-পরিবর্তনের হারের তুলনা করিতে হইবে। মূল্য যদি এক-চতুর্থাংশ হারে বৃদ্ধি পায় আর সেই অনুপাতে চাহিদাও যদি এক-চতুর্থাংশ হারে হ্রাস পায় তাহা হইলে এই অবস্থাকে স্থিতিস্থাপকতার স্থিতাবস্থা (unit elasticity) বলা হয়। কিন্তু মূল্য যদি এক-চতুর্থাংশ হারে বৃদ্ধি পায় এবং চাহিদা যদি এক-চতুর্থাংশেরও অধিক হ্রাস পায় তাহা হইলে এই অবস্থাকে স্থিতিস্থাপকতার স্থিতাবস্থার ঊর্ধ্বাভিমুখী গতি বলা হয়; আর চাহিদা যদি এক-চতুর্থাংশের কম হ্রাস হয় তাহা হইলে এই অবস্থাকে স্থিতিস্থাপকতার স্থিতাবস্থার নিম্নাভিমুখী গতি বলা হয়।

$$\text{স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{চাহিদা পরিবর্তনের হার}}{\text{মূল্য পরিবর্তনের হার}}\text{।}$$



কখ রেখা পরিবর্তনশীল চাহিদার পরিমাপক। **গঘ** রেখা অপরিবর্তনশীল চাহিদার পরিমাপক।

১। যখন মূল্য পরিবর্তন হারের সহিত চাহিদা পরিবর্তনের হারের তুলনা করিয়া চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা স্থির করা হয় তখন তাহাকে মূল্য পরিবর্তনজনিত স্থিতিস্থাপকতা (Price-elasticity) বলা হয়। মূল্যের সামান্যতম পরিবর্তনেও চাহিদা-রেখার প্রতিবিন্দুতে কি পরিমাণ পরিবর্তন হইবে তাহা নির্ণয় করা হয়।

২। আয়ের পরিমাণ পরিবর্তিত হইলেও চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। আয় বৃদ্ধি পাইলে দ্রব্যমূল্য যদি অপরিবর্তনায় থাকে তাহা হইলে অনেক সময় কোন কোন দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। আবার, আয় হ্রাস পাইলে কোন কোন দ্রব্যের চাহিদা কম হয়, যেমন বিলাস দ্রব্য। আয় পরিবর্তন হারের সহিত চাহিদা পরিবর্তনের হারের অনুপাতকে আয়ের পরিবর্তনজনিত চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়।

$$\text{স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{চাহিদা পরিবর্তনের হার}}{\text{আয় পরিবর্তনের হার}}।$$

৩। যুক্ত চাহিদা দ্রব্য ও পরিবর্তী সামগ্রীর ক্ষেত্রে উভয় দ্রব্য এরূপ সম্পর্ক-যুক্ত হইতে পারে যে, একটির মূল্য পরিবর্তিত হইলে অপরটির মূল্য পরিবর্তিত না হইয়াও দ্রব্যটির চাহিদা পরিবর্তিত হইতে পারে। একটি দ্রব্যের মূল্য পরিবর্তনের ফলে অপর একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তনকে চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা (Cross elasticity) বলা হয়।

$$\text{স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{ক-এর চাহিদা পরিবর্তনের হার}}{\text{খ-এর মূল্য পরিবর্তনের হার}}।$$

চাহিদার সূত্র ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা—The Law of Demand and Elasticity of Demand.

চাহিদার সূত্র মূল্য ও চাহিদার সম্পর্ক সূচিত করে। এই সূত্র অনুসারে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তনীয় থাকিলে, মূল্য হ্রাস পাইলে চাহিদা বৃদ্ধি পায় ও মূল্য বৃদ্ধি পাইলে চাহিদা হ্রাস পায়। কি পরিমাণ মূল্য হ্রাস পাওয়ার ফলে কি পরিমাণ চাহিদার বৃদ্ধি হইবে এবং কি পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধির ফলে কি পরিমাণ চাহিদার হ্রাস হইবে—ইহা সূত্রটির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। চাহিদা ও মূল্যের সম্পর্ক যে বিপরীতমুখী—চাহিদার সূত্র হইতে শুধু ইহাই জানা যায়। মূল্যের পরিবর্তনে চাহিদার কি পরিমাণ পরিবর্তন ঘটে তাহা একমাত্র চাহিদার

স্থিতিস্থাপকতার সিদ্ধান্ত দ্বারা জানিতে পারা যায়। মূল্যের উত্থান-পতনে বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ কিভাবে পরিবর্তিত হইবে তাহা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার দ্বারা সূচিত হয়। সুতরাং চাহিদার সূত্র চাহিদা ও মূল্যের বিপরীতমুখী সম্পর্ক বুঝায়—সুতরাং এই সম্পর্ক হইল গুণবাচক (Qualitative)। অপরপক্ষে, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা মূল্যের সহিত চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ক সূচিত করে। সুতরাং এই সম্পর্ক পরিমাণ-বাচক (Qualitative)।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সংজ্ঞার বাস্তব উপযোগ—Practical Utility of the Concept of Elasticity of Demand.

অর্থনৈতিক তত্ত্ব হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ হওয়া ব্যতীত এই সংজ্ঞাটির বাস্তব উপযোগিতাও কম নহে। মূল্য পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া কিভাবে বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদার উপর কার্যকরী হয়, তাহা এই সংজ্ঞাটির সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। করধার্য-ব্যাপারে সরকারী নীতি নির্ধারণেও এই সংজ্ঞাটি বিশেষ সহায়ক হয়। করধার্য-ব্যাপারে সরকারী নীতি নির্ধারণকালে এই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে মূল্য নির্ধারণ করিতে হয়। চাহিদা যদি অপরিবর্তনীয় হয়, তাহা হইলে একচেটিয়া ব্যবসায়ী বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস করিয়াও মূল্য বৃদ্ধি করিতে পারে। কিন্তু চাহিদা যদি পরিবর্তনীয় হয়, তাহা হইলে মূল্য হ্রাস না করিলে অধিক পরিমাণ বিক্রয় করিয়া অধিক মুনাফার সম্ভাবনা থাকে না। শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণ-তত্ত্বেও ইহার গুরুত্ব কম নহে। যদি কোন জাতীয় শ্রমের চাহিদা অপরিবর্তনীয় হয়, তাহা হইলে মজুরি বৃদ্ধি করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। এতদ্ব্যতীত বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লাভের পরিমাণ-নির্ণয়ে এই সংজ্ঞাটি সহায়ক।

ভোগোদ্বৃত্ত—Consumer's Surplus.

ধনবিজ্ঞানে অধ্যাপক মার্শালের অবদানগুলির মধ্যে ভোগোদ্বৃত্ত অন্যতম। যখন কোন ক্রেতা কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয় তখন সে দ্রব্যটির জন্য একটি মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকে ; কিন্তু যদি সে তাহার নিজস্ব মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে ঐ দ্রব্যটি ক্রয় করিতে পারে তাহা হইলে ঐ দ্রব্যটি স্বল্পমূল্যে ক্রয় করিয়া তাহার কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, যাহা সে অন্য কোন দ্রব্য ক্রয় করিয়া ব্যয় করিতে পারে।

একটি দ্রব্য ক্রয় করিয়া ক্রেতা যে অতিরিক্ত সন্তোষ লাভ করে, তাহাকেই ভোগোদ্বৃত্ত নামে অভিহিত করা হয়। মার্শাল বলেন, ক্রেতার ক্রয় করিবার আগ্রহ এত অধিক যে, একটি দ্রব্য ক্রয় না করিয়া চলিয়া যাওয়া অপেক্ষা অধিক মূল্যে উহা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যদি এরূপ ক্ষেত্রে সে তদপেক্ষা কম মূল্যে ঐ দ্রব্যটি পায়, তাহা হইলে ক্রেতার আগ্রহ দ্বারা নির্ধারিত মূল্য ও যে মূল্যে সে দ্রব্যটি পাইতেছে, এই উভয়ের পার্থক্য হইল ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাপক। ("The excess of the price which he would be willing to pay rather than go without the thing over that which he actually does pay is the economic measure of this surplus satisfaction. It may be called consumer's surplus.")

সংক্ষিপ্তসার

চাহিদা ও চাহিদার সূত্র

ধনবিজ্ঞানে দাম ছাড়া চাহিদা হয় না। চাহিদার অর্থ হইল একটা নির্দিষ্ট মূল্যে লোকে যে পরিমাণ দ্রব্য কিনিতে ইচ্ছুক থাকে। দ্রব্য-মূল্যের পরিবর্তনে চাহিদারও পরিবর্তন ঘটে। সাধারণতঃ মূল্য কমিলে লোকের চাহিদা বাড়ে এবং মূল্য বাড়িলে চাহিদা কমে। ইহাকে চাহিদার নিয়ম বলা হয়।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ও ইহা কিসের উপর নির্ভর করে?

মূল্যের পরিবর্তনে চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। মূল্য-পরিবর্তনের সহিত চাহিদার এই পরিবর্তনের সম্বন্ধকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়। মূল্যের সামান্য পরিবর্তনে চাহিদার যদি বেশী পরিবর্তন হয় তাহা হইলে এই চাহিদাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলা হয়। মূল্য একটু বাড়িলে বা কমিলে চাহিদার যদি বিশেষ কোন পরিবর্তন না হয়, তাহা হইলে এই চাহিদাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলা হয়। সাধারণতঃ বিলাসদ্রব্য, বিকল্প দ্রব্য, একাধিকভাবে ব্যবহার-যোগ্য দ্রব্যগুলির চাহিদা হইল স্থিতিস্থাপক। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, অভ্যাসগত দ্রব্য প্রভৃতির চাহিদা হইল অস্থিতিস্থাপক। একচেটিয়া ব্যবসায়ী দাম ঠিক করিবার সময় ও সরকার কর বসাইবার সময় দ্রব্যটির চাহিদা স্থিতিস্থাপক বা অস্থিতিস্থাপক তাহা বিবেচনা করে।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. What do you mean by 'Elasticity of Demand'?
Is the demand for the following commodities elastic or inelastic? Give reasons of your answer.
(a) Salt, (b) Radio, (c) Tea. H. S. (Com.) 1961
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলিতে কি বুঝ ? নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির চাহিদা স্থিতিস্থাপক বা অস্থিতিস্থাপক যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দাও।
(ক) লবণ, (খ) বেতার-যন্ত্র, (গ) চা।

উঃ—কোন দ্রব্যের মূল্য বাড়িলে বা কমিলে দ্রব্যটির চাহিদার হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু দ্রব্যটির মূল্য যে হারে বাড়ে বা কমে চাহিদা সেই হারে কমে বা বাড়ে না। এমন অনেক দ্রব্য আছে যাহার দাম সামান্য কমিলেই লোকে তাহা বেশী পরিমাণে কেনে, আবার অনেক দ্রব্য আছে যাহার দাম বাড়িলে বা কমিলেও মূল্য পরিবর্তনের ফলে চাহিদার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। সুতরাং মূল্য পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা বিভিন্নরূপে পরিবর্তিত হয়। মূল্যের পরিবর্তনের সহিত চাহিদা পরিবর্তনের যে সম্বন্ধ তাহাকেই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়।

মূল্য একটু বৃদ্ধি পাইলে যে সমস্ত দ্রব্যের চাহিদা বেশ কিছু হ্রাস পায় ও মূল্য একটু হ্রাস পাইলে চাহিদা যখন বাড়িয়া যায়, তখন এই ধরণের চাহিদাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলা হয়। মূল্যের সামান্য পরিবর্তনের ফলে চাহিদা যখন বেশী হারে বাড়ে বা কমে তখন চাহিদাকে স্থিতিস্থাপক চাহিদা (Elastic Demand) বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, দাম একটু কমিলে বেতার যন্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, কারণ বেতার-যন্ত্র হইল বিলাসদ্রব্য।

কিন্তু এমন অনেক দ্রব্য আছে যাহার মূল্যের একটু পরিবর্তন ঘটিলে চাহিদার বিশেষ পরিবর্তন হয় না। মূল্যের পরিবর্তনে যে সমস্ত ক্ষেত্রে চাহিদার খুব সামান্য পরিবর্তন ঘটে, সেই সমস্ত চাহিদাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা (Inelastic Demand) বলা হয়, যেমন চাউল, লবণ প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা মূল্যের পরিবর্তনে বিশেষ পরিবর্তিত হয় না। আবার যে সমস্ত দ্রব্যের বিকল্প বা পরিবর্তী সামগ্রী আছে, যেমন চা, সে সমস্ত দ্রব্যের চাহিদা সাধারণতঃ স্থিতিস্থাপক হয়। কারণ দ্রব্যটির মূল্যের পরিবর্তন ঘটিলে লোক বিকল্প দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারে।

2. State and explain the Law of Demand. H. S. (Com.) 1961 Comp.
চাহিদার সূত্রের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা কর।

উঃ—ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি অনুসারে দেখা যায় যে, ভোগের ক্ষেত্রে কোন দ্রব্যের মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে পরবর্তী মাত্রাগুলির উপযোগ কমিতে থাকে। উপযোগ কমিবার ফলে কম মূল্য না হইলে ক্রেতা আর সেই দ্রব্যের অতিরিক্ত মাত্রা ক্রয় করিবে না। চাহিদার সূত্র হইল : অবস্থার পরিবর্তন না ঘটিলে মূল্য কমিলে চাহিদা বাড়ে এবং মূল্য বাড়িলে চাহিদা কমে (The amount demanded increases with a fall in price and diminishes with a rise in price, other things remaining the same)। সুতরাং চাহিদার সূত্রটিকে ক্রমহ্রাসমান উপযোগ

সূত্রের উপসিদ্ধান্ত বলা যাইতে পারে। এই সূত্রটি মূল্য ও চাহিদার বিপরীতমুখী সম্পর্ক নির্ধারণ করে অর্থাৎ মূল্য কমিলে চাহিদা বাড়ে বা মূল্য বাড়িলে চাহিদা কমে।

অন্যান্য অর্থনৈতিক সূত্রের ন্যায় চাহিদার সূত্রটিও সর্তাধীন। প্রথমতঃ, ধরিয়া লইতে হইবে যে ক্রেতার রুচি, অভ্যাস প্রভৃতি অপরিবর্তিত আছে। দ্বিতীয়তঃ, ক্রেতার আয়ের পরিমাণ ঠিক থাকা চাই। এইগুলির পরিবর্তন ঘটিলে মূল্যের পরিবর্তনে চাহিদার পরিবর্তন না ঘটিতে পারে।

মূল্য হ্রাস পাইলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহার প্রথম কারণ হইল যে, মূল্য কমিলে যে ক্রেতাগণ পূর্বমূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিত, তাহারা বর্তমান হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্যে অধিক পরিমাণ ক্রয় করিবে। দ্বিতীয়তঃ, মূল্য হ্রাস পাইলে যাহারা পূর্বমূল্যে দ্রব্যটি ক্রয় করিতে অক্ষম ছিল, বর্তমান স্বল্পমূল্যে তাহারাও ক্রয় করিবে, কেননা বর্তমান হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্য তাহাদের প্রান্তিক উপযোগের সমান হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

উৎপাদনের উপাদান

(Factors of Production)

উৎপাদনের উপাদান—Factors of Production

মানুষের অভাব মিটাইবার জন্য কোন কিছু তৈয়ারী করিতে হইলে যাহা যাহা প্রয়োজন, সেগুলিকে উৎপাদনের উপাদান বা উপকরণ বলা হইয়া থাকে। ধান হইতে ভাত হয় এবং ভাত খাইয়াই আমাদের দেশের লোক সাধারণতঃ বাঁচিয়া থাকে। সুতরাং ধান উৎপাদন করিতে হইলে কি কি দ্রব্যের প্রয়োজন তাহা আলোচনা করিলে উৎপাদনের উপাদান সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যায়। প্রথমতঃ, জমি ছাড়া ধান হয় না। সুতরাং ধান তৈয়ারী করিতে হইলে প্রথম উপাদান হইল **জমি, ভূমি বা মাটি** এবং উহার উর্বরতা অর্থাৎ মাটির উৎপাদিকা-শক্তি। জমি ও ইহার উৎপাদিকাশক্তি প্রাকৃতিক সম্পদের পর্যায়ভুক্ত—মনুষ্যসৃষ্ট নহে। শুধু জমি হইলেই ধান তৈয়ারী হয় না। ধান তৈয়ারী করিতে হইলে জমি চাষ করিতে হয়, এজন্য কৃষি-শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। সুতরাং প্রকৃতিদত্ত জমি হইতে ধান উৎপাদন করিতে হইলে মানুষের **শ্রম** নিতান্ত প্রয়োজন। এইজন্য ভূমি ও

শ্রম এই দুইটিকে উৎপাদনের মূল উপাদান বলা হয়। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, শুধু ভূমি ও শ্রমের দ্বারা সব সময়ে সব রকম উৎপাদন সম্ভব নয়। চাষ করিতে হইলে লাঙ্গল, বলদ, বীজধান, সার প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। এগুলি ছাড়া শুধু ভূমি ও শ্রম ফলপ্রসূ হয় না। লাঙ্গল, বলদ, বীজধান, সার প্রভৃতিও উৎপাদনের সহায়ক সামগ্রী। এগুলিকে বাস্তব **মূলধন** বলা হয়। আদিম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগ পর্যন্ত মানুষ নানাবিধ হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন করিতেছে। সভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অভাবের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। জটিল যন্ত্রপাতির সাহায্যে বহুসংখ্যক শ্রমিককে একত্র সমাবেশ করিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিবার জন্য একদল লোক চাই যাহারা আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত উৎপাদনের বিভিন্ন দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখে। ইহাদিগকে ব্যবস্থাপক, পরিচালক বা সংগঠক বলা হয়। সুতরাং উৎপাদনের জন্য চারিটি উপাদান আবশ্যক ; যথা, ভূমি, শ্রম, মূলধন ও **ব্যবস্থাপনা।**

উপরি-উক্ত চারিটি উপাদানই উৎপাদন-কার্যে অপরিহার্য। কিন্তু সকলের গুরুত্ব সমান নহে। আদিম যুগে মানুষ যখন প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করিত, তখন প্রাকৃতিক সম্পদই ছিল তাহার অভাব মিটাইবার প্রধান উপকরণ। কৃষিযুগে ভূমি ও শ্রমের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইল। পরবর্তী যন্ত্রশিল্পের যুগে মূলধনের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে ও শ্রমের গুরুত্ব কমিতে থাকে। বর্তমান যান্ত্রিক যুগে বিশেষ করিয়া বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রবর্তনের ফলে ব্যবস্থাপনা-কার্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে ভূমি, শ্রম ও মূলধন যথাযথভাবে প্রয়োগ করিয়া উৎপাদন-কার্য পরিচালনার ক্ষমতার উপর উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদনের উৎকর্ষ নির্ভর করে। সুতরাং উপাদানগুলির মধ্যে ব্যবস্থাপকের কার্যই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

ভূমি ও ইহার উৎপাদিকা-শক্তি—Land and its Productivity

ভূমি বলিতে ধনবিজ্ঞানে যাবতীয় প্রকৃতি-দত্ত পদার্থ ও নৈসর্গিক শক্তি বুঝায়। ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা—এই চারিটি হইল উৎপাদনের অপরিহার্য উপাদান। উৎপাদনের উপাদান হিসাবে অন্যান্য উপাদানগুলি হইতে ভূমির বহু পার্থক্য দেখা যায়—

ভূমির বৈশিষ্ট্য—Characteristics of Land

১। ইহার সরবরাহ সীমাবদ্ধ। মূলধনের পরিমাণ বা শ্রমিকের সংখ্যা অন্ততঃ দীর্ঘ মেয়াদে বৃদ্ধি করা যায়, কিন্তু পৃথিবীর সমগ্র স্থলভাগের আয়তনের বিশেষ হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায় না।

২। দ্বিতীয়তঃ, ভূমির কোন উৎপাদন-খরচ নাই। ইহা প্রকৃতির দান হিসাবেই পাওয়া যায়। কিন্তু ভূমি প্রকৃতির দান হইলেও কৃষিকার্য, বাসস্থান-নির্মাণ বা অন্য যে-কোন উদ্দেশ্যেই হউক না কেন, ভূমির সংস্কার করিতে হয়। ভূমির অবস্থান, জলবায়ু ও আদিম উর্বরতা-শক্তির জন্য কোন ব্যয় না হইলেও ভূমিকে ব্যবহারযোগ্য ও ইহার উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য উৎপাদন-ব্যয় প্রয়োজন হয়। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে ভূমিরও একটি উৎপাদন-ব্যয় আছে।

৩। ভূমির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল ইহার গতিশীলতার অভাব। শ্রমিক ও মূলধনের মত সহজপ্রাপ্য স্থান হইতে ভূমি দুষ্প্রাপ্য স্থানে স্থানান্তর করা যায় না। এইজন্য জমির খাজনার পার্থক্য দেখা যায়।

৪। চতুর্থতঃ, বিভিন্ন জমির উৎপাদিকা-শক্তি ও অবস্থান-পরিবেশের এত পার্থক্য দেখা যায় যে, একখণ্ড জমি অন্যখণ্ড জমির পরিবর্তে ব্যবহার করা চলে না। একজন শ্রমিকের পরিবর্তে অপর একজন শ্রমিক নিযুক্ত করা চলে, কিন্তু একখণ্ড জমির পরিবর্তে অন্যখণ্ড জমি সর্বক্ষেত্রে সমান উৎপাদন না করিতেও পারে। সুতরাং জমির ক্ষেত্রে একটির পরিবর্তে অপরটির ব্যবহার চলে না।

পঞ্চমতঃ, ভূমি হইতে উৎপাদন-ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি (Law of Diminishing Returns) আরম্ভ হয়।

ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি কিসের উপর নির্ভর করে—Factors determining the productivity of Land

১। নৈসর্গিক কারণ—Natural factors

নৈসর্গিক কারণেই সাধারণতঃ বিভিন্ন জমির উৎপাদিকা-শক্তির পার্থক্য দেখা যায়। ভূমির রাসায়নিক উপাদান, আবহাওয়া, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, নদী, হ্রদ, সমুদ্র বা পর্বতের নৈকট্য উৎপাদিকা-শক্তিকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। ইহার উপর মানুষের বিশেষ কোন হাত নাই। নৈসর্গিক কারণে গঙ্গানদীর ব-দ্বীপ অঞ্চল উর্বর আর রাজপুতানা অঞ্চল অনুর্বর।

২। মানবীয় কারণ—Human factor

মানুষের চেষ্টা ও জমির উৎপাদিকা-শক্তি পরিবর্তিত হইতে পারে। বর্তমান যুগে মানুষ নানা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া জমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে। বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, জলাভূমি হইতে জল নিষ্কাশন করিয়া, ও স্থানভেদে নানাভাবে সেচব্যবস্থার দ্বারা জলাভূমি বা মরুভূমি উর্বর জমিতে পরিণত করিতেছে।

৩। ভৌগোলিক কারণ—Geographical factor

জমির উৎপাদিকা-শক্তি অনেক স্থলে জমির অবস্থান-স্থলের উপর নির্ভর করে। খারাপ জমি শহরাঞ্চলের নিকটে হইলে দূরের ভাল জমি অপেক্ষা অধিকতর উৎপাদনক্ষম বলিয়া ধরা যায়। জমির এই উৎকৃষ্টতা যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও পরিবহন-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। মানুষ যোগাযোগ-ব্যবস্থার আশাতীত উন্নতিসাধন করিয়া বর্তমানে বহু অব্যবহার্য জমিকে প্রথম শ্রেণীর জমিতে পরিণত করিয়াছে।

উৎপাদন-বিধি (Laws of Returns)

১। ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি—Law of Diminishing Returns

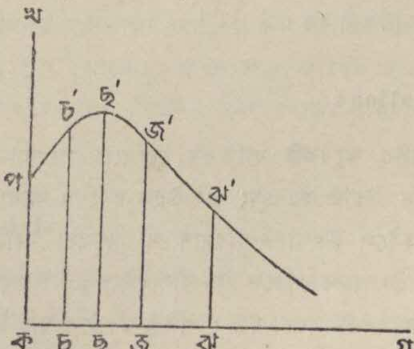
জমি হইতে উৎপন্ন ফসলের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে অধিক ফসল উৎপাদনের প্রয়োজন হয়। অধিক ফসল উৎপাদন করিতে গেলে হয় বেশী জমি চাষ করিতে হয় নতুবা চাষ-করা জমি আরও গভীরভাবে অর্থাৎ অধিক ব্যয়ে চাষ করিতে হয়। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট-পরিমাণ জমিতে যদি ক্রমাগত বেশী হারে শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে সাধারণতঃ সমগ্র উৎপাদন-পরিমাণ বাড়িলেও যে হারে শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করা হয় সে হারে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। শ্রম ও মূলধন-বৃদ্ধির সঙ্গে উৎপন্ন ফসল-বৃদ্ধির হার কমিতে থাকে। কৃষিক্ষেত্রে একই পরিমাণ জমিতে দ্বিগুণ পরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিয়া দ্বিগুণ ফসল পাওয়া যায় না। তাহা হইলে স্বল্প পরিমাণ জমি গভীরভাবে চাষ করিয়া বহু-লোকের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইত। মার্শাল নিম্নলিখিতভাবে এই বিধিটির সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন : "An increase in the capital and labour applied in the cultivation of land causes in general a less than proportionate increase in the amount of produce raised, unless it

happens to coincide with an improvement in the art of agriculture." নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধির কার্যকারিতা দেখান যাইতে পারে :

জমির পরিমাণ	শ্রম ও মূলধনের মাত্রা	সমগ্র উৎপন্ন পরিমাণ	অতিরিক্ত উৎপন্ন
এক বিঘা	৫	১০ মণ	—
"	৫+৫=১০	২৫ "	১৫ মণ
"	৫+৫+৫=১৫	৩৫ "	১০ "
"	৫+৫+৫+৫=২০	৪৩ "	৮ "

উপরের উদাহরণে দেখান হইয়াছে যে, প্রথমতঃ, এক বিঘা জমিতে যদি ৫ মাত্রা শ্রম ও মূলধন দেওয়া হয়, তাহা হইলে ১০ মণ ফসল পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বার যদি শ্রম ও মূলধনের মাত্রা দ্বিগুণ করা হয় তাহা হইলে প্রথম মাত্রা হইতেও অধিক পরিমাণ ফসল পাওয়া যাইতে পারে। প্রথম মাত্রা প্রয়োগের ফলে ১০ মণ, দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগের ফলে ২৫ মণ অর্থাৎ ১৫ মণ বৃদ্ধি পাইল। তৃতীয় ও চতুর্থ মাত্রা প্রয়োগের ফলে সমগ্র উৎপাদন-পরিমাণ বাড়িলেও বৃদ্ধির মাত্রা কমিয়া যথাক্রমে ১০ ও ৮ মণে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে উৎপাদন-বৃদ্ধির হার শ্রম ও মূলধন-বৃদ্ধির হারের সমানুপাতিক হয় না অর্থাৎ উৎপাদন-বৃদ্ধির হার কমিতে থাকে। নিম্নে দেওয়া রেখাচিত্রের সাহায্যে ক্রমহ্রাসমান বিধিটি সুস্পষ্ট করা যাইতে পারে।

কগ রেখা দ্বারা প্রযুক্ত শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ দেখান হইয়াছে এবং **কখ**



রেখা দ্বারা অতিরিক্ত উৎপাদন-পরিমাণ দেখান হইয়াছে। জমি উপযুক্তভাবে চাষ না হওয়ার কারণে অধিক মূলধন ও শ্রম প্রয়োগ করিয়া অনুপাতের অধিক

ফসল পাওয়া যাইতে পারে। মূলধন ও শ্রমের অনুপাতে ফসল-বৃদ্ধি **পছ** বক্র রেখা দ্বারা দেখান হইয়াছে। যখন **কচ** পরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করা হয়, তখন **চচ´** পরিমাণ ফসল পাওয়া যায়। যখন **কছ** পরিমাণ প্রয়োগ করা হয়, তখন **ছছ´** পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইহার পর যদি **কজ** ও তার পর **কঝ** পরিমাণ শ্রম ও মূলধন দেওয়া হয়, তাহা হইলে উৎপাদন-বৃদ্ধির হার হ্রাস পায়। তাই রেখাচিত্রে দেখান হইয়াছে যে, **প** হইতে **ছ´** পর্যন্ত বক্র রেখাটি উর্ধ্বাভিমুখী, কিন্তু ছ´ হইতে **ঝ** পর্যন্ত ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখী।

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, জমি হইতে অধিক উৎপাদন করিতে গেলে উৎপাদন-ব্যয়ও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া যায়। প্রথম বার ১০৲ টাকা ব্যয় করিয়া যদি ১০/০ মণ পাওয়া যায় তাহা হইলে প্রতি মণের জন্য ১৲ টাকা ব্যয় হয়। দ্বিতীয়বার ১০+১০=২০৲ টাকা ব্যয় করিয়া যদি ১০+৭ =১৭ মণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রতি মণ উৎপাদনের ব্যয় হয় ২০÷১৭=প্রায় ১ টাকা ১৮ পয়সা। এইরূপে প্রতিবার জমি হইতে অধিক ফসল উৎপাদন করিতে গেলে উৎপাদন-ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। গভীর চাষ ও ব্যাপক চাষ এই উভয় ক্ষেত্রেই বিধিটি কার্যকরী হয়। যদি কোন চাষী তাহার স্বল্পপরিমাণ জমিতে অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করে বা অধিক পরিমাণ জমিতে সমপরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করে—তাহা হইলে এই উভয় ক্ষেত্রেই ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি কার্যকরী হয়।

ব্যতিক্রম—Limitations

ক্রমহ্রাসমান সূত্রটির কয়েকটি ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, চাষবাস-প্রণালীর যদি উন্নতি হয় এবং এই উন্নত ধরণের কৃষিপদ্ধতি যদি জমিতে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে উৎপাদন-পরিমাণ না কমিয়া বাড়িতে পারে অর্থাৎ অতিরিক্ত পরিমাণে উৎপাদন করিতে ব্যয় হ্রাস হইবে। ভারতের কৃষিকার্যে এই ক্রমহ্রাসমান বিধিটি কার্যকরী দেখা যায়। কিন্তু ভারতে যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নত ধরণের কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তিত করা যায়, লাঙ্গলের পরিবর্তে ট্রাক্টর দ্বারা চাষ করা হয়, সেচব্যবস্থার দ্বারা জমিতে জল দিবার ব্যবস্থা হয় ও বৈজ্ঞানিক সার প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে বিঘাপ্রতি জমিতে ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে

পারে। চাষবাসের প্রণালী অপরিবর্তিত রাখিয়া অধিক শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিলেই জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি কার্যকরী হয়।

দ্বিতীয়তঃ, কোন জমি যদি পূর্বে উপযুক্ত পরিমাণ শ্রম ও মূলধন দ্বারা চাষ করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই জমিতে অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিয়া চাষ করিলে অধিক ফসল পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু চাষ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ শ্রম ও মূলধনের অতিরিক্ত পরিমাণ প্রয়োগ করিলে, শ্রম ও অর্থব্যয়ের তুলনায় উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে না। প্রয়োজনীয় পরিমাণ শ্রম ও মূলধনের অতিরিক্ত পরিমাণ প্রযুক্ত হইলেই উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস পাইতে থাকিবে।

খনি ও মৎস্যস্থলীর ক্ষেত্র—Mines and Fisheries

অধিক পরিমাণ খনিজ দ্রব্য পাইতে হইলে ক্রমশঃই খনির তলদেশে যাইতে হয়। যতই নীচের দিকে যাওয়া যায়, খনিজ দ্রব্য আহরণের জন্য ততই বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় এবং ইহাতে ব্যয় বৃদ্ধি হয়। সুতরাং অতিরিক্ত খনিজ দ্রব্য পাইতে হইলে অতিরিক্ত ব্যয় হয়। খনিজ দ্রব্য প্রাকৃতিক সম্পদ। ইহার পরিমাণের একটা সীমা আছে। সুতরাং অধিক ব্যয় করিলেও কালক্রমে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং শেষ পর্যন্ত উৎপাদন-পরিমাণ শূন্য হয়।

মাছ ধরিবার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, অধিক মাছ ধরিতে গেলে মাছ ধরিবার জন্য অধিক সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন হয় এবং ইহাতে অধিক ব্যয় হয়। নদীতে মৎস্যসংখ্যার একটা সীমা আছে। অধিক ব্যয় করিয়া অনিশ্চিত কাল পর্যন্ত অধিক মৎস্য পাওয়া যায় না। কিছুদিন পরেই মৎস্যের পরিমাণ শ্রম ও অর্থব্যয়ের তুলনায় কম হইবে।

শিল্পক্ষেত্র—Industries

কৃষিক্ষেত্রে একই জমিতে ক্রমাগত শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে, উৎপাদন-পরিমাণ কমে অর্থাৎ উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এখানে ধরিয়া লওয়া হয় যে, শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও জমির পরিমাণ অপরিবর্তিত আছে। যে-কোন উৎপাদন-ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক যদি একটি উৎপাদানের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া অন্য দুইটির পরিমাণ বৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে সে-ক্ষেত্রে

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি কার্যকরী হয়। কিন্তু ব্যবস্থাপক যদি একই সঙ্গে তিনটি উপাদানেরই—জমি, মূলধন ও শ্রম—পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারেন, তাহা হইলে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি কার্যকরী হয় না, অধিকন্তু উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক কিছু দিন পর্যন্ত তিনটি উপাদানেরই অনুপাত বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারেন। কিন্তু জমির ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব নহে, কারণ অন্য দুইটি উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হইলেও জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে। জমি প্রকৃতির দান, মানুষ ইহার আয়তন বৃদ্ধি করিতে পারে না।

২। ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-বিধি—Law of Increasing Returns

ভূমি হইতে উৎপাদন-ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি প্রযোজ্য, কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কোন শিল্পে যদি অধিক পরিমাণে শ্রমিক ও মূলধন নিয়োগ করা যায় তাহা হইলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণও অধিকহারে বৃদ্ধি পায়। উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ অধিকহারে বৃদ্ধি পায় বলিয়া গড়পড়তা ব্যয়ও হ্রাস পায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি কোন শিল্পে ৪০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ২০ হাজার দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা হইলে প্রতি দ্রব্যের গড়পড়তা ব্যয় ২৲ টাকা। কিন্তু এই শিল্পে যদি মূলধন-পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ৬০ হাজার করা হয়, তাহা হইলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৪০ হাজার হইতে পারে। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে গড়পড়তা উৎপাদন-ব্যয় হইল দেড়শ পয়সা। এইরূপে শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করিলে উৎপাদনের হার বাড়িবে এবং গড়পড়তা উৎপাদন-ব্যয় কমিবে।

ইহার কারণ হইল যে, শিল্প-সম্পর্কিত উৎপাদন-ক্ষেত্রে মানুষ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। অধিক পরিমাণে শ্রম ও মূলধন-বৃদ্ধির সহিত শিল্পের আয়তন বৃদ্ধি পায়। শিল্পের আয়তন যতই বাড়িতে থাকে, বৃহদায়তন উৎপাদনের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সুবিধাগুলি ততই বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহার ফলে প্রতিমাত্রা উৎপাদন-খরচ কমে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, শিল্পের উৎপাদন-ক্ষেত্রে এমন এক সময় আসিবে যখন শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেও সমানুপাতিক হারে উৎপন্ন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে না অর্থাৎ শিল্পের ক্ষেত্রেও ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি কার্যকরী হইবে।

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি ও ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-বিধি কৃষি ও শিল্প উভয় উৎপাদন-ক্ষেত্রে কার্যকরী হইতে পারে। কৃষিক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস করিলে উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে, আবার শিল্পের ক্ষেত্রেও কোন কোন সময়ে উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস পাইতে পারে। তবে সাধারণতঃ কৃষি-কার্যে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন হয়, তাহার কারণ হইল জমির সরবরাহ বৃদ্ধি করা যায় না বলিয়া শ্রমবিভাগের সুবিধা পাওয়া যায় না। কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমবিভাগের সাহায্যে বহুদিন পর্যন্ত সুবিধা পাওয়া যাইতে পারে।

৩। পরিবর্তনশীল অনুপাতের সূত্র—Law of Variable Proportion

ভূমি সম্পর্কে আলোচনাকালে দেখা গিয়াছে যে, ভূমির পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া যদি অধিক পরিমাণে মূলধন ও শ্রম প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে উৎপাদনের পরিমাণ আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায় না। শিল্পক্ষেত্রে কিন্তু এই সূত্রটি সর্বত্র প্রযোজ্য নহে। শিল্পের ক্ষেত্রে বলা হয় যে, মূলধন ও শ্রম বৃদ্ধির ফলে ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষ সাধিত হইয়া উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পায়। ইহাকে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন সূত্র (Law of Increasing Returns) বলা হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে মূলধন ও শ্রম প্রয়োগের সমানুপাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থাকে সমানুপাতিক উৎপাদনের সূত্র বা Law of Constant Returns বলা হয়।

অধুনা ধনবিজ্ঞানিগণ বলেন যে, ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন সূত্রটি যে শুধুমাত্র কৃষিকার্যে প্রযোজ্য তাহা নহে—এই সূত্রের প্রয়োগ উৎপাদন-কার্যের সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাঁহারা বলেন যে, উৎপাদন-কার্যে যদি কোন একটি উপাদানের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া অন্যান্য সহযোগী উপাদানগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে উৎপাদনের একটি অবস্থায় অন্য উপাদানগুলির বৃদ্ধি সত্ত্বেও উৎপাদন-বৃদ্ধির হার হ্রাস পায়। কৃষির ক্ষেত্রে ধরিয়া লওয়া হয় যে, জমির পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু মূলধন ও শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। ফলে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন দেখিতে পাওয়া যায়। শিল্প-সম্পর্কিত উৎপাদনক্ষেত্রেও এই সূত্রটি কার্যকরী হইতে পারে। যদি কোন কারণবশতঃ উৎপাদনের একটি উপাদানের সরবরাহ সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে অন্য সহযোগী উপাদানগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেও উৎপাদন সমানুপাতিক হয় না অর্থাৎ

উৎপাদন-খরচা বৃদ্ধি পায়। শিল্পের পরিচালক উপাদানসমূহের যথাযথভাবে সংযোগসাধন করিলেও এরূপ ক্ষেত্রে উৎপাদন-খরচা বৃদ্ধি পায়। যদি কোন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের সমগ্র উপাদানগুলির পরিমাণ সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি করে ও সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে তাহাদের সমন্বয়সাধন করিতে পারে, তাহা হইলে উৎপাদনের পরিমাণ অন্ততঃ সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যদি একটিমাত্র উপাদানের মাত্রা বৃদ্ধি করে ও অন্যগুলির মাত্রা ঠিক রাখে, তাহা হইলে সমানুপাতিক হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না। যদি ভূমির পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া মূলধন ও শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় অথবা মূলধনের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে উভয় ক্ষেত্রে উৎপাদন-বৃদ্ধির হার হ্রাস পাইবে। উৎপাদনের এই বৈশিষ্ট্য উৎপাদনের পরিবর্তনশীল অনুপাত বলিয়া পরিচিত।

শ্রম (Labour)

ধনবিজ্ঞানে শ্রম শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। উৎপাদনের যতগুলি উপাদান আছে তন্মধ্যে শ্রমই হইল অধিক গুরুত্বসম্পন্ন। মানুষের বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি প্রযুক্ত না হইলে অন্যান্য উপাদানগুলি ফলপ্রসূ হইতে পারে না। সুতরাং উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদনের উৎকর্ষ যে বহুল পরিমাণে শ্রমের উপর নির্ভর করে তাহা অনস্বীকার্য। একটা দেশে উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ শ্রমের প্রয়োজন হয় তাহা সেই দেশের শ্রমিকের সংখ্যা ও শ্রমিকের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। অপর পক্ষে শ্রমিকের সংখ্যা নির্ভর করে সেই দেশের জনসংখ্যার উপর। দেশের জনসংখ্যা নির্ভর করে চারিটি অবস্থার উপর, যথা জন্মহার, মৃত্যুহার, বিদেশে গমন ও বিদেশ হইতে আগমন। এইগুলির মধ্যে জন্মহার ও মৃত্যুহার তুলনা করিয়া বৃদ্ধির হার পাওয়া যায়।

ম্যালথাসের সংখ্যাতত্ত্ব—Malthusian Theory of Population

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ম্যালথাস্ নামক জনৈক ইংরাজ ধনবিজ্ঞানী খাদ্যদ্রব্যের সহিত জনসংখ্যার সম্পর্ক বিষয়ে একটি মতবাদ প্রচার করেন। ম্যালথাসের মতে মানুষের প্রজনন-শক্তি অত্যধিক, তাই জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে

বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যা যেরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়, খাদ্যদ্রব্য সে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না। জনসংখ্যা-বৃদ্ধির এই দ্রুতগতিতে গুরুত্ব আরোপ করিবার জন্য ম্যালথাস্ বলেন যে, জনসংখ্যা জ্যামিতিক অর্থাৎ ১, ২, ৪, ৮, ১৬ হারে বাড়ে আর খাদ্যদ্রব্য বাড়ে পাটিগণিতিক অর্থাৎ ১, ২, ৪, ৬, ৮ হারে। সুতরাং খাদ্যদ্রব্য-বৃদ্ধির অনুপাতে জনসংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধির ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ প্রভৃতি দেখা দেয়। কারণ দেশে যে খাদ্য উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারা জনসংখ্যার ভরণপোষণ সম্ভব হয় না। এই অবস্থাকে ম্যালথাস্ অতিরিক্ত জনসংখ্যার অবস্থা (Over-population) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। একটি দেশের ভরণপোষণের সাধ্যাতীত জনসংখ্যা হইলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ প্রভৃতি ঘটিয়া জনসংখ্যা হ্রাস পায়। কিন্তু অতি-প্রাকৃত কারণে জনসংখ্যা হ্রাস পাইলেও জনসংখ্যার সহিত খাদ্যদ্রব্যের সমতা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কারণ মানুষের সহজাত যৌনপ্রবৃত্তির ফলে যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহারা বংশবৃদ্ধি করে এবং পুনরায় অতি-প্রাকৃত কারণে জনসংখ্যা হ্রাস পায় ও পুনঃপুনঃ এই হ্রাস-বৃদ্ধি চলিতে থাকে।

এই অনিশ্চিত ও সঙ্কটজনক অবস্থা যাহাতে না ঘটে সেজন্য ম্যালথাস্ মানুষকে স্বেচ্ছায় বংশবৃদ্ধি না করিয়া সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ম্যালথাসের মতে বিবাহ না করিয়া, অধিক বয়সে বিবাহ করিয়া বা জন্ম-নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সংখ্যাবৃদ্ধি বন্ধ রাখা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। উপরি-উক্ত কৃত্রিম নিরোধ-ব্যবস্থা (Preventive checks) অবলম্বন না করিলে প্রাকৃতিক নিরোধ-ব্যবস্থা (Positive checks) অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ প্রভৃতি অবশ্যম্ভাবী।

ম্যালথাস্ যে তথ্যগুলির ভিত্তিতে তাঁহার সংখ্যাতত্ত্ব-সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ তাহার সমালোচনা করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্তগুলির ত্রুটি দেখাইয়াছেন। প্রথমতঃ, বলা হয় যে, ম্যালথাস্ তাঁহার দেশের সমসাময়িক অবস্থাকে ভিত্তি করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহার জীবিতাবস্থায় তাঁহার নিজ দেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়। তাঁহার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, একটিমাত্র দেশের অবস্থা দেখিয়া এরূপ একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত নহে। দ্বিতীয়তঃ, মানুষের যৌনপ্রবৃত্তির ফলে সংখ্যাবৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক হইলেও সভ্যতাবৃদ্ধির সংগে সংগে এই ইচ্ছা কমিয়া যায়। আর্থিক স্বচ্ছলতার ফলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হইলে, এই উন্নত মান বজায় রাখিবার জন্য লোকে সাধারণতঃ অল্পসংখ্যক ছেলেমেয়ের পিতা হইতে চায়। তৃতীয়তঃ, পাশ্চাত্য

অনেক দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি অবলম্বন হওয়ায় জন্মহার হ্রাস পাইয়া সংখ্যাধিক্য-সমস্যা সংখ্যাল্পতা-সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাসের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে উৎপাদনের পরিমাণও অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতে কি ম্যালথাসের সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য? (ভারত কি জনাকীর্ণ) —Is Malthusian Theory applicable to India? (Is India over-populated.)

১৯৬১ সালের আদমসুমারী (Census) অনুসারে ভারতের লোকসংখ্যা হইল প্রায় ৪৪ কোটি। ১৯২১ সাল হইতে ভারতের জনসংখ্যা অতি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে এমন অবস্থায় আসিয়াছে যে, উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্য দ্বারা ভারতবাসীর ভরণপোষণ সম্ভব নয়। ভারতে যে খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা দেশবাসীর পক্ষে আদৌ যথেষ্ট নহে। দেশের দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব সব সময়েই দেখা যায়। ম্যালথাস্-প্রদত্ত সংখ্যাধিক্যের আরও দুইটি লক্ষণ ভারতে দেখা যায়। এদেশে জন্ম ও মৃত্যু উভয়ের হারই বেশী। ভারতে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোক ব্যতীত অন্য কেহ স্বেচ্ছায় জন্মনিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত নহে। এই কারণে ভারতে জন্মের হার ও মৃত্যুর হার বেশী এবং ইহা হইতে অনুমান করা স্বাভাবিক যে, খাদ্যদ্রব্যের তুলনায় ভারতে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই বৃদ্ধির ফলে রোগ, খাদ্যাভাব প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে বহুলোকের অকালমৃত্যু ঘটিতেছে। সুতরাং ভারতবাসীর অস্বাভাবিক দারিদ্র্যের প্রধান কারণ হইল সংখ্যাধিক্য।

বর্তমান ভারতের বহু মনীষী উপরি-উক্ত মত গ্রহণ করেন না। ভারতে জন্ম ও মৃত্যু উভয় হারই পাশ্চাত্ত্য দেশ অপেক্ষা বেশী হইলেও মৃত্যুহার বেশী হওয়ার জন্য জনসংখ্যা জন্মহারের অনুপাতে কম বাড়িয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, ভারত প্রাকৃতিক সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ। ভারতের এই অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের যদি যথাযথ সদ্ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি-সাধন করিয়া জাতীয় আয় বৃদ্ধিদ্বারা জনসংখ্যার ভরণপোষণ সম্ভব হইবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেই আতঙ্কিত হইবার কারণ নাই। জন-সংখ্যাকে কর্মদক্ষ করিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করিতে পারিলেই সংখ্যা-সমস্যার একমাত্র সন্তোষজনক সমাধান হইতে পারে।

জনসংখ্যা ও জাতীয় আয়—Population and National Income.

আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ বলেন যে, দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি শুধুমাত্র খাদ্যদ্রব্য-বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে না—দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন উৎস হইতে উৎপাদন-পরিমাণের উপর নির্ভর করে। দেশের সম্পদ যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে আতঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই। প্রত্যেক নবজাত শিশু শুধু খাদ্যের চাহিদা লইয়াই জন্মগ্রহণ করে না, সঙ্গে সঙ্গে সে দুইখানি হাত লইয়া জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়া দেশের সমগ্র উৎপাদন-পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে অধিক উৎপাদন দ্বারা অতিরিক্ত জনসংখ্যার ভরণপোষণ চলিতে পারে। একটি দেশে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন যদি বৃদ্ধি না পায়, তাহা হইলে সে দেশ এরূপ অবস্থায় অন্য দেশ হইতে শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময়ের দ্বারা খাদ্য আমদানী করিয়া খাদ্যসমস্যার সমাধান করিতে পারে। ইংলণ্ডে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন-পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম হওয়া সত্ত্বেও ইংলণ্ড শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য দেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিয়া তাহার জীবনযাত্রার মান উন্নত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া সমগ্র জাতীয় আয়-পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে গড়পড়তা মাথাপিছু আয়ও বেশী হইবে। কিন্তু যে জনসংখ্যা হইলে মাথাপিছু আয় সবচেয়ে বেশী হয়, জনসংখ্যা যদি তাহার চেয়েও বেশী হয় তাহা হইলে অবশ্য সম্পদ-পরিমাণ কম হইবে এবং মাথাপিছু আয়ও কমিবে। এইরূপ অবস্থাকে অতিরিক্ত জনসংখ্যার অবস্থা (Over-population) বলা হয় এবং এই অবস্থার প্রতিকার হইল জনসংখ্যা হ্রাস করা। আবার, যে জনসংখ্যা হইলে মাথাপিছু আয় সবচেয়ে বেশী হয়, জনসংখ্যা যদি তার চেয়ে কম হয়, তাহা হইলেও সম্পদ-পরিমাণ কমিবে ও মাথাপিছু আয়ও কমিবে। এই অবস্থাকে সংখ্যাল্পতার অবস্থা (Under-population) বলা হয় এবং ইহার প্রতিকার হইল সংখ্যা বৃদ্ধি করা। সুতরাং দেখা যায় যে, একটি দেশ অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে অথবা সংখ্যাল্পতার জন্য দরিদ্র হইতে পারে। উৎপাদন-দক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিয়া একটি দেশে যে জনসংখ্যা হইলে সম্পদ-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া মাথাপিছু আয় সবচেয়ে বেশী হয়, সেই সংখ্যাকে আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ **কাম্য জনসংখ্যা** (Optimum Number) বলেন। দেশের জনসংখ্যা যদি এই কাম্য সংখ্যা অপেক্ষা বেশী বা কম হয়, তাহা হইলে মাথাপিছু

আয় কমিয়া যাইবে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কাম্য জনসংখ্যা একটি স্থির বা নির্দিষ্ট জনসংখ্যা নহে। এই সংখ্যা দেশে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন-পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। লোকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাইয়া উৎপাদন-পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে সংখ্যা-বৃদ্ধি অনেক সময় উন্নতির সহায়ক হয়। সুতরাং সংখ্যাবৃদ্ধি হইলেই চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই।

শ্রমিক সরবরাহ—Labour Supply

শ্রম উৎপাদনের একটি প্রধান উপাদান। উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষ বহুল পরিমাণে শ্রমিকের সংখ্যা ও শ্রমিকের কর্মদক্ষতার উপর নির্ভর করে। পূর্বেই বলা হইয়াছে শ্রমিকের সংখ্যা দেশের জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে। জনসংখ্যা আবার জন্মহার, মৃত্যুহার, বিদেশ হইতে আগমন ও বিদেশে গমন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। এখন দেখা যাউক, কিসের উপর শ্রমিকের কর্মদক্ষতা নির্ভর করে।

শ্রমিকের দক্ষতা—Efficiency of labour

শ্রমিকের কর্মদক্ষতা আংশিকভাবে তাহার নিজের উপর নির্ভর করে এবং আংশিকভাবে তাহার মালিকের অর্থাৎ ব্যবস্থাপকের উপর নির্ভর করে।

শ্রমিকের কর্মদক্ষতা দেশের ভৌগোলিক অবস্থিতি, জলবায়ু প্রভৃতির উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। জাতিগত বৈশিষ্ট্যই শ্রমিকের দক্ষতার পরিচায়ক। দ্বিতীয়তঃ, উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য, শীতাতপ নিবারণের জন্য যথাযোগ্য পরিধেয় ও আলো-হাওয়াযুক্ত বাসগৃহ দৈহিক ও মানসিক উন্নতির সহায়ক। তৃতীয়তঃ, দক্ষতা বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করে। শিক্ষার দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি সম্যক বিকাশ লাভ করে। সাধারণ শিক্ষা ব্যতীতও শ্রমিকের কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনও আছে। চতুর্থতঃ, শ্রমিকের দক্ষতা তাহার সততা ও কর্তব্যবোধের উপর নির্ভর করে। কর্তব্যনিষ্ঠা ও একাগ্রচিত্ততা হইল শ্রমিকের প্রধান গুণ। পঞ্চমতঃ, ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা, স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা এবং কাজের একঘেয়েমি দূর করিবার জন্য ভ্রমণ ও বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। ষষ্ঠতঃ, শ্রমিকের কাজের নির্ধারিত সময়, উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও সময়মত পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যবস্থা থাকিলে, তাহারা সন্তুষ্টচিত্তে তাহাদের

কর্তব্য পালন করিতে ইচ্ছুক হয়। শ্রমিকের কর্মস্থলের পরিবেশও সুরুচিকর হওয়া চাই। ইহা ছাড়া, মালিক ভাল যন্ত্রপাতি ও উৎপাদনের অন্যান্য সহায়ক সামগ্রীর যোগান দ্বারা শ্রমিকের কর্মদক্ষতা-বৃদ্ধিতে সাহায্য করিতে পারেন। শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শ্রমিকের দক্ষতা তাহার কাজ করিবার ইচ্ছা (Will to work) এবং কাজ করিবার ক্ষমতার (Power to work) উপর নির্ভর করে।

ভারতের শ্রমিকের কর্মদক্ষতা—Efficiency of Indian labour

ভারতের শ্রমিক অন্যান্য দেশের শ্রমিকের তুলনায় কম দক্ষ হইলেও স্বভাবতঃই তাহাদের কম-কর্মদক্ষ বলা উচিত নহে। যে সামাজিক ও আর্থিক পরিবেশে তাহারা বাস করে, সেই পরিবেশই তাহাদের দক্ষতার অভাবের জন্য বেশী দায়ী। খাদ্য, বস্ত্র ও উপযুক্ত বাসগৃহের অভাব হেতু তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল নহে। সুতরাং দারিদ্র্য হইল তাহাদের দক্ষতার প্রধান অন্তরায়। ইহা ছাড়া, জাতিভেদ-প্রথা, পারিবারিক বন্ধন প্রভৃতিও তাহাদের গতিশীলতা রুদ্ধ করিয়াছে। তাহারা তাহাদের প্রকৃতিগত ও রুচিগত কার্যে যোগদান করিবার সুযোগ খুব কমই পায়। সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষ করিয়া কারিগরি শিক্ষার অভাবই তাহাদের দক্ষতার অভাবের প্রধান কারণ বলা যাইতে পারে। কাজের স্থায়িত্ব, মালিকের সহানুভূতি, উপযুক্ত পরিমাণ পারিশ্রমিকের অভাব ও অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তাহাদের শরীর ও মন পুষ্ট হইতে পারে না। এইসমস্ত কারণে ভারতের শ্রমিকের কর্মদক্ষতা কম ও তাহাদের উৎপাদন-পরিমাণও কম। ব্যাপকভাবে শিক্ষার প্রসার দ্বারা উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারিলে ভারতের শ্রমিকও উন্নত দেশসমূহের শ্রমিকের সমান দক্ষ হইতে পারিবে।

শ্রম-বিভাগ—Division of Labour

কোন লোকই তাহার প্রয়োজনীয় সমুদয় দ্রব্যই তৈয়ারী করিতে পারে না, কারণ তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তির একটি সীমা আছে। এইজন্য দেখা যায় যে, বিভিন্ন লোক তাহার রুচি ও কর্মক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন কাজ করে। কৃষক কৃষিজাত দ্রব্য-উৎপাদন করে, শিল্পী শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করে, কর্মকার লৌহদ্রব্য উৎপাদন করে, শিক্ষক অধ্যাপনা করেন। এইরূপে বিভিন্ন লোক একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন কাজে যখন তাহার কর্মপ্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ রাখে তখন এই

নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ, কর্মপ্রচেষ্টাকেই বিশেষত্বশীলতা (Specialisation) বলা হয়। বর্তমান যুগে উৎপাদন-ব্যবস্থায় এই বিশেষত্বশীলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। সমগ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বা স্তরে বিভক্ত হয় এবং প্রত্যেকটি অংশ সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয়। কিন্তু বিশেষত্বশীলতার দোষ হইল যে, এই পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তিই একাকী সম্পূর্ণ কাজটি করিতে পারে না। যে কৃষক ধান উৎপাদন করে তাহাকে লাঙ্গলের জন্য ছুতার মিস্ত্রী ও কর্মকারের সাহায্য লইতে হয়, যে জুতা তৈয়ারী করে তাহাকে অপর ব্যক্তির নিকট হইতে পাকা চামড়া (Tanned Leather) সংগ্রহ করিতে হয়। নতুবা তাহার কর্মপ্রচেষ্টা সার্থক হইতে পারে না। এইজন্য বিশেষত্বশীলতা ফলপ্রসূ হয় তখন যখন বিশেষত্বশীলতার সহিত সহযোগিতা (co-operation) যুক্ত হয়। সুতরাং বর্তমান যুগে শ্রম-বিভাগের ভিত্তিতে যে বৃহৎ বহরে উৎপাদন-কার্য পরিচালিত হয় তাহার মূল কারণ হইল বিশেষত্বশীলতা ও সহযোগিতার একত্র সমাবেশ। এইরূপে সমাজের বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কাজ করে এবং বিনিময়ের সাহায্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের (সহযোগিতা) দ্বারা তাহাদের নানাজাতীয় অভাব পূরণ করে।

বিভিন্ন ধরণের শ্রম-বিভাগ—Different forms of Division of Labour.

মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে শ্রম-বিভাগ নীতি ধীরে ধীরে প্রবর্তিত হইয়াছে। আদি মানবসমাজে হয়ত পুরুষ ও নারীর মধ্যে কাজের ভাগ ছিল কিন্তু কালক্রমে ইহা বিস্তার লাভ করিতে লাগিল। গুণ ও কাজের ভিত্তিতেই আমাদের ভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—চারিটি জাতির সৃষ্টি হয়। এই বিভাগকে বৃত্তিগত বা ব্যবসায়গত শ্রম-বিভাগ (Division into trades and professions) বলা হয়। সামাজিক অগ্রগতির ফলে পরবর্তী যুগে শ্রম-বিভাগ নীতি অধিকতর বিশেষত্বশীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রম-বিভাগের প্রথম যুগে কৃষককে কৃষিকার্য-সংক্রান্ত সকল কাজই করিতে হইত, কিন্তু পরবর্তী যুগে একজনে শুধু লাঙ্গল তৈয়ারী করিতে লাগিল ও অপর জনে শুধু চাষবাস কাজে রত থাকিল। এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন কাজগুলি ছোট ছোট অংশে ভাগ হয়, কিন্তু প্রত্যেকটি অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ (Division into process which is complete)। বর্তমান যুগে যন্ত্রের

সাহায্যে উৎপাদন ক্ষেত্রে মানুষের এই আদিম কর্মবিভাগ নীতি জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। প্রত্যেকটি উৎপাদন-কার্যই শত শত ক্ষুদ্র পদ্ধতিতে বিভক্ত হয় এবং যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন শ্রমিক দ্বারা প্রত্যেকটি পদ্ধতির কার্য নিষ্পন্ন হয়। য়্যাডাম্ স্মিথ প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে লিখিয়াছিলেন যে, সামান্য একটি আলপিন প্রস্তুত-কার্য শতাধিক বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভক্ত ছিল। কেহ জড়ানো তার সোজা করে, কেহ তারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে কাটে, কেহ পিনের মাথার বল করে, কেহ বা পিনের নিম্নভাগ সূক্ষ্ম করে। জুতা-তৈয়ারীর কারখানাতেও বর্তমানে দেখা যায় যে, কাঁচাচামড়া পাকা করিবার পদ্ধতি হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ জুতা তৈয়ারী কাজ অসংখ্য ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেকটি পদ্ধতি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পদ্ধতির সহিত সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু এককভাবে প্রত্যেকটি পদ্ধতিই অসম্পূর্ণ ও উপযোগবিহীন (Division into process which is incomplete)। সকল পদ্ধতির সহযোগিতায় সম্পূর্ণ জুতা প্রস্তুত হয়।

ইহা ছাড়াও আর এক ধরণের শ্রম-বিভাগ দেখা যায়। ইহা স্থানীয় বিশেষত্বশীলতার (Territorial Specialisation) উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহাকে স্থানীয় বা ভৌগোলিক শ্রম-বিভাগ (Territorial Division of labour) বলা হয়। আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত বা জমির বিশেষ উর্বরতা শক্তির জন্য কোন কোন স্থানে বিশেষ কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশে পাট উৎপন্ন হয় বলিয়া পাটশিল্পগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বস্ত্রশিল্পগুলি বোম্বাই ও আমেদাবাদ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রম-বিভাগের সুবিধা—Advantages of Division of Labour

শ্রম-বিভাগের অনেক সুবিধা আছে। এই ব্যবস্থায় একটি কাজ ছোট ছোট অংশে ভাগ করা হয়। য়্যাডাম্ স্মিথ যে পিন তৈয়ারীর উদাহরণ দিয়াছেন তাহার সাহায্যেই শ্রম-বিভাগের সুবিধাগুলি, বুঝিতে পারা যায়। একজন লোক একাকী যদি পিন তৈয়ারী করে তাহা হইলে তাহাকে পিন তৈয়ারী কাজের প্রত্যেক অংশ নিজেকে করিতে হয়। তাহাকে একটি কাজ শেষ করিয়া অন্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে অন্য কাজ করিতে হয়। এক কাজ ও একটি হাতিয়ার ছাড়িয়া তাহাকে অন্য হাতিয়ারের সাহায্যে নূতন কাজ করিতে হয়। অনেক সময় স্থান ত্যাগ করিতে হয়। ইহার ফলে বহু সময় নষ্ট হয়। কোন

যন্ত্রপাতিই সব সময়ে কাজে ব্যবহার হয় না। একজন লোককে পিন তৈয়ারীর সব কাজ করিতে হয় বলিয়া সে কোন কাজই ভাল করিয়া করিতে পারে না, ফলে ভাল পিন তৈয়ারী হয় না। লোকটিকে নানা কাজ করিতে হয় বলিয়া সে দ্রুত কোন কাজ করিতে পারে না, ফলে উৎপাদন পরিমাণও কম হয়। কিন্তু পিন তৈয়ারীর কাজ যদি বিভিন্ন লোকের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া যায় ও সকলে মিলিয়া যদি কাজটি করে তাহা হইলে অল্প সময়ে বহু উৎকৃষ্ট ধরণের পিন তৈয়ারী করা সম্ভব। কারণ, প্রথমতঃ, ভাগ হওয়ার ফলে কাজটি সোজা হয়। দ্বিতীয়তঃ, সম্পূর্ণ কাজটির বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন শ্রমিকগণের মধ্যে তাহাদের যোগ্যতা অনুসারে ভাগ করিয়া দেওয়া যায়। তৃতীয়তঃ, প্রত্যেকেই একই কাজ বার বার করে বলিয়া তাহার কাজের দক্ষতা বাড়ে ও সেই কাজ দ্রুত করিতে পারে। চতুর্থতঃ, ইহাতে সময় আদৌ নষ্ট হয় না, কারণ প্রত্যেকেই একই জায়গায় একই যন্ত্র লইয়া কাজ করে। কাজটি ভাগ হয় বলিয়া কাজটির একটি অংশ শিখিতে বেশী সময় লাগে না। পঞ্চমতঃ, এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক শ্রমিক পৃথক পৃথক কাজ করে বলিয়া প্রত্যেকের জন্য একপ্রস্থ যন্ত্রপাতি লাগে এবং এই একপ্রস্থ যন্ত্রপাতির সবচেয়ে বেশী ব্যবহার হয়। ষষ্ঠতঃ, কাজটি ছোট ছোট অংশে ভাগ হয় বলিয়া শ্রমিকের কষ্ট লাঘব হয়। সপ্তমতঃ, ছোট ছোট সরল অংশে বিভক্ত কাজগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এইজন্য শ্রমিকগণ এক অংশের কাজ হইতে অপর অংশের কাজে যাইতে পারে। ইহাতে শ্রমিকের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং দেখা যায় যে, শ্রম-বিভাগের ফলে শ্রমিকগণের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ অল্প সময়ে তাহারা অধিক পরিমাণ ও উৎকৃষ্ট ধরণের দ্রব্য তৈয়ারী করিতে পারে। ফলে উৎপাদন-ব্যয় কম হয়। উৎপাদন-ব্যয় কম হইলে মূল্য হ্রাস হয় এবং জিনিসের দাম কমিলে ক্রেতা-সাধারণের সুবিধা হয়।

শ্রম-বিভাগের অসুবিধা—Disavantages

সমাজের দিক দিয়া শ্রম-বিভাগ কল্যাণকর হইলেও শ্রমিকের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহার কয়েকটি অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ, একই কাজ বার বার করিতে করিতে কাজে একঘেয়েমি জন্মে। ইহাতে কাজের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ কমিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, একধরণের কাজ করিতে হয় বলিয়া শ্রমিকের

চিত্তের প্রসার কমিয়া যায়। যে শ্রমিক নিত্যই কলে সূতা জোগান দেয়, তাহার অন্য কোন বিষয়ে আর তাদৃশ আসক্তি থাকে না। সে নিজেই একটি যন্ত্রে পরিণত হয়। তৃতীয়তঃ, অত্যধিক শ্রম-বিভাগের ফলে বেকার সমস্যা দেখা দিতে পারে। যদি কোন কারণে একটি বিশেষ কাজে মন্দা দেখা দেয়, তাহা হইলে এই অত্যধিক বিশেষত্বশীলতার ফলে শ্রমিকেরা অন্য কোন কাজ করিয়া জীবিকা অর্জনে অক্ষম হয়। চতুর্থতঃ, বড় বহরের উৎপাদনক্ষেত্রেই শ্রম-বিভাগ সম্ভব। যেখানে হাজার হাজার শ্রমিক একত্র হইয়া যন্ত্রের সাহায্যে কাজ করে, সেখানকার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। শ্রমিকগণও অস্বাস্থ্যকর বস্তি অঞ্চলে বাস করিতে বাধ্য হয় এবং কাজের একঘেয়েমি দূর করিবার জন্য নানা অস্বাস্থ্যকর আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হয়। ফলে তাহাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।

উপরে শ্রম-বিভাগের যে দোষগুলির উল্লেখ করা হইল তাহা সহজেই দূর করা সম্ভব। দেশের সরকার আইন প্রণয়ন করিয়া শ্রমিকের কাজের সময় ও মজুরির পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারেন। মালিকও শ্রমিকের বাসস্থান, চিকিৎসা, খেলাধূলা ও রুচিকর আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের কাজের ইচ্ছা ও কাজের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করিতে পারেন।

শ্রম-বিভাগের সীমা—Limits to Division of Labour

শ্রম-বিভাগের ভিত্তিতে উৎপাদন-কার্য পরিচালিত হইলে বেশী পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা যায় ও ইহাতে উৎপাদন-ব্যয়ও হ্রাস পায়। সুতরাং সকল উৎপাদকই বেশী লাভ করিবার উদ্দেশ্যে যন্ত্রের সাহায্যে শ্রম-বিভাগের ভিত্তিতে বহু শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া অধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা করে। কিন্তু বাজারে যদি দ্রব্যটির বিশেষ চাহিদা না থাকে তাহা হইলে শ্রম-বিভাগের ভিত্তিতে অধিক পরিমাণ উৎপাদন করিয়া কোন লাভ নাই। একজন তাঁতী যদি মাসে ৫০ খানা কাপড় একাই তৈয়ারী করিতে পারে এবং যদি ঐ জায়গায় ৫০ খানার বেশী চাহিদা না থাকে তাহা হইলে সে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য দ্বিতীয় আর একজন লোক নিযুক্ত করিতে পারে না। সুতরাং শ্রম-বিভাগ সম্ভব তখনই যখন শ্রম-বিভাগের ভিত্তিতে উৎপাদিত দ্রব্যটির বিস্তৃত চাহিদা থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত দ্রব্যের চাহিদা হইল ঋতুগত অর্থাৎ সাময়িককালের জন্য

সে সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদন ক্ষেত্রেও শ্রম-বিভাগ সম্ভব নয়। যদি কোন দ্রব্যের চাহিদা বৎসরে তিনমাসকাল স্থায়ী হয় (যেমন আমাদের এখানে পশমজাত দ্রব্য) তাহা হইলে সে সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যবস্থায় বহু শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া শ্রম-বিভাগ প্রবর্তন করা লাভজনক হয় না।

মূলধন বা পুঁজি (Capital)

মূলধনের সংজ্ঞা—Definition of Capital

ধনবিজ্ঞানে মূলধন শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। ধন বা সম্পদ মাত্রই আমাদের কোন-না-কোন অভাব দূর করিতে পারে। কোন ধন প্রত্যক্ষভাবে মানুষের অভাব দূর করিতে পারে এবং এই জাতীয় ধনকে ভোগ্যবস্তু বলা হয় ; যথা, খাদ্য, বস্ত্র, গায়কের গান ইত্যাদি। আবার, আর কতকগুলি ধন আছে যাহা পরোক্ষভাবে আমাদের অভাব দূর করে ; যেমন, লাঙ্গল, মেসিন, তাঁত, ইত্যাদি। এইগুলিকে মূলধন দ্রব্য বলা হয়, কারণ এইগুলির সাহায্যে যে দ্রব্যগুলি তৈয়ারী হয়, সেগুলি আমাদের অভাব দূর করে। সুতরাং মূলধন হইল ধনের সেই অংশ, যে অংশের সাহায্যে আরও অধিক দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। মেশিন, কলকারখানা, কারখানাবাড়ী, কাঁচামাল, শ্রমিকদের জন্য খাদ্য-বস্ত্র ইত্যাদি যাহা কিছু উৎপাদনে সাহায্য করে, তাহাকে মূলধন বলা যাইতে পারে।

মূলধনের প্রকৃতি—Nature of Capital

১। মূলধন সম্পূর্ণরূপে মানুষ কর্তৃক উৎপাদিত উপাদানও নহে, আবার সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির দানও নহে। মানুষ প্রকৃতির দানের উপর শ্রম বিনিয়োগ করিয়া মূলধন সৃষ্টি করে, কিন্তু এই মূলধন আপাতঃ কোন অভাবপূরণ না করিয়া অভাবপূরণের সামগ্রী-উৎপাদনের সহায়তা করে এবং শেষ পর্যন্ত মূলধন-সাহায্যে উৎপাদিত সামগ্রী দ্বারা আমাদের অভাব পূরণ হয়। সুতরাং বর্তমানে যাহাকে মূলধন বলা হইতেছে, তাহা প্রকৃতির দান ও মানুষের অতীতের পরিশ্রমের ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে।

২। মূলধনের একটা চাহিদা আছে এবং এই চাহিদার কারণ হইল মূলধনের

উৎপাদনক্ষমতা (Productivity)। মূলধনের সাহায্যে উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষ বিনা-মূলধনে উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষ অপেক্ষা বহুগুণ অধিক, এবং সেইজন্য মূলধনের একটা চাহিদা আছে।

৩। মূলধন সঞ্চয়ের ফল (Capital is the result of saving)। মানুষ প্রকৃতি-দত্ত সম্পদের উপর শ্রম প্রয়োগ করিয়া মূলধন সৃষ্টি করে। এই মূলধন প্রত্যক্ষভাবে ভোগ-ব্যবহারে নিযুক্ত না হইয়া অতিরিক্ত উৎপাদনকার্যে নিযুক্ত হইয়াছে বা নিযুক্ত হইবার অপেক্ষায় থাকে। যে ধন সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত হয়, তাহা মূলধন নহে। যে ধন বর্তমানে ভোগ-ব্যবহার না করিয়া উৎপাদনে নিযুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে সঞ্চিত হয় তাহাই হইল মূলধন। এইজন্য মূলধনকে সঞ্চয়ের ফল বলা হয়। এ দিক দিয়া দেখিতে গেলে মূলধনকে ভোগাতিরিক্ত উৎপাদন বলা যাইতে পারে।

৪। চাহিদার দিক দিয়া দেখিতে গেলে মূলধনের উৎপাদন-ক্ষমতার উপর যেরূপ গুরুত্ব আরোপ করা হয়, সরবরাহের দিক দিয়া দেখিতে গেলে মূলধনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় (Prospective) উপর তদ্রূপ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। লোকে মূলধন হইতে একটা আয় পাইবার উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করে এবং সঞ্চয় না হইলে চাহিদা মিটিতে পারে না।

ভূমি ও মূলধন—Land and Capital

ভূমি ও মূলধন উভয় দ্রব্যই উৎপাদনের উপাদান হইলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। ভূমি প্রকৃতির দান, মানুষ ইহা সৃষ্টি করিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতি-দত্ত দ্রব্যের উপর মানুষের শ্রম প্রয়োগ করিয়া মূলধনের সৃষ্টি হয়। এইজন্য অনেকে মূলধনকে শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন উৎপাদনের উপাদান (Produced means of production) বলেন। দ্বিতীয়তঃ, ভূমির পরিমাণ নির্দিষ্ট। মানুষ চেষ্টা করিয়াও ইহার বৃদ্ধি করিতে পারে না। কিন্তু দীর্ঘ সময়ে মূলধন-পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়। তৃতীয়তঃ, ভূমির গতিশীলতা নাই—ইহা স্থানান্তর করা যায় না। কিন্তু যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতি মূলধন স্থানান্তরযোগ্য। চতুর্থতঃ, ভূমির বিনাশ নাই, কিন্তু মূলধন শেষ পর্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

ধন ও মূলধন—Wealth and Capital

ধন ও মূলধনের পার্থক্য করিতে গেলে বলা চলে যে, সকল মূলধনই ধন,

কিন্তু সকল ধন মূলধন না-হইতেও পারে। যখন কোন উৎপাদিত দ্রব্য বর্তমান অভাব পূরণের জন্য ভোগ-ব্যবহার করা হয়, তখন তাহাকে ধন বলা হয়—আর উৎপাদিত দ্রব্যটি যদি আশু প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ব্যবহার না করিয়া অধিক উৎপাদনের উদ্দেশ্যে উৎপাদনের উপাদান-হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে দ্রব্যটিকে মূলধন বলা যাইতে পারে। উৎপন্ন ধান্যকে যদি চাউলে পরিবর্তিত করিয়া বর্তমানে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে ধন বলা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ ধান্য খাদ্য হিসাবে ব্যবহার না করিয়া আরও ধান্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে যদি বীজধান হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে ঐ ধান্যকে মূলধন বলা যায়। কোন দ্রব্য ধন কি মূলধন তাহা স্থির করিতে হইলে কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইতেছে তাহা দেখিতে হইবে। সুতরাং যে ধন মানুষের পরিশ্রমের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে এবং যাহা আরও অধিক উৎপাদন-কার্যে উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তাহাই হইল মূলধন।

মূলধন ও আয়—Capital and Income

মূলধন হইল আয়প্রদ অর্থাৎ আয়ের উৎস। উৎপাদিত ধনের যে অংশ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সঞ্চিত ও একত্রীভূত করিয়া রাখা হয় এবং মূলধনের অধিকারী তাহার এই সঞ্চিত মূলধন হইতে যে নিয়মিত প্রতিদান পান, তাহা হইল আয়। গৃহ নির্মাণ করিয়া অপর ব্যক্তিকে ভাড়া দিলে, গৃহ হইল মূলধন এবং গৃহ হইতে মাসিক যে ভাড়া পাওয়া যায়, তাহাকে আয় বলা হয়। সুতরাং মূলধন হইতে প্রাপ্ত আয়কে একটা প্রবাহ বলা যাইতে পারে, আর মূলধন হইল একটি আয়প্রদ সঞ্চিত তহবিল। মূলধন হইতে প্রাপ্ত আয় সঞ্চিত হইয়া পুনরায় মূলধন সৃষ্টি করিতে পারে।

মূলধন ও অর্থ—Capital and Money

ব্যবসায়ীর ভাষায় অর্থ ও মূলধন একার্থবোধক হইলেও অর্থকে ঠিক মূলধন বলা যায় না। অর্থপরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই মূলধন বৃদ্ধি পায় না। ভারতে বর্তমানে অর্থের প্রাচুর্য থাকিলেও মূলধনের নিতান্ত অভাব দেখা যায়। অর্থ বিনিময়ের বাহন। অর্থদ্বারা উৎপাদনের উপাদান ও ভোগ্যবস্তু সংগ্রহ করা যায় এবং এই দ্রব্যগুলির মূল্য পরিমাপ করা যায়। কিন্তু অর্থের সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন পরিচালনা করা যায় না।

মূলধনের প্রকার-ভেদ—Different forms of Capital

মূলধনকে সাধারণতঃ স্থায়ী মূলধন (Fixed Capital) ও চল্‌তি বা পরিবর্তনশীল মূলধন (Circulating Capital) এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা, বাড়ীঘর প্রভৃতি যে মূলধনগুলি বহুদিন ধরিয়া উৎপাদন-কার্যে সাহায্য করে, তাহাদিগকে স্থায়ী মূলধন বলা হয়। উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল, খাদ্যবস্তু যাহা একাধিকবার উৎপাদনে ব্যবহার করা যায় না—যাহা একবার ব্যবহার করিলে অন্যরূপ ধারণ করে, তাহাকে পরিবর্তনশীল বা চলতি মূলধন বলা হয়। কলে তূলা দিলে তূলা সূতায় রূপান্তরিত হয়—একই তূলা এক-বারের অধিক ব্যবহার করা যায় না। সুতরাং তূলা হইল চল্‌তি বা পরিবর্তনশীল মূলধন, কিন্তু যে কল তূলাকে সূতায় পরিবর্তিত করে তাহা দীর্ঘদিন ধরিয়া বারবার ঐ একই কার্য করে ; একবার ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং কল হইল স্থায়ী মূলধন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, স্থায়ী এবং চল্‌তি মূলধনের এই পার্থক্য মূলগত পার্থক্য নহে। একই দ্রব্য স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে চল্‌তি ও স্থায়ী উভয়বিধ মূলধন হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে। সেলাইয়ের কল ক্রেতার নিকট স্থায়ী মূলধন হইলেও বিক্রেতার নিকট চল্‌তি মূলধন। ৫০ মাইল ভ্রমণে মোটর গাড়ীর পেট্রোল চল্‌তি মূলধন ও চাকার রবার স্থায়ী মূলধন বলিয়া কথিত হইলেও ৫০০ মাইল ভ্রমণ-ক্ষেত্রে পেট্রোল ও টায়ার উভয়কেই চল্‌তি মূলধন বলা চলে।

মূলধনকে আবার উৎপাদক মূলধন (Producer's Capital) ও উপভোগ্য মূলধন (Consumer's Capital) বলা হয়। যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা যাহা উৎপাদনে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে, তাহাকে যান্ত্রিক বা উৎপাদক মূলধন বলা হয়। যে সমস্ত মূলধন, যথা, খাদ্য-বস্ত্র, গৃহ প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে শ্রমিকগণের অভাব মোচন করিয়া উৎপাদনে সাহায্য করে সেগুলিকে উপভোগ্য মূলধন বলা হয়।

যে সমস্ত মূলধন একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন-কার্যে ব্যবহৃত হয়, অন্য কোন কার্যে ব্যবহার করা যায় না, তাহাদিগকে নিমজ্জ বা বিশিষ্ট (Sunk or Specialised) মূলধন বলা হয় ; যেমন, কাঠ কাটিবার জন্য করাত শুধু একই কাজে লাগে। যে মূলধন উৎপাদনের বহুক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়, তাহাকে ভাসমান (Floating) মূলধন বলা হয়, যেমন, কয়লা বা লোহ। একাধিক উৎপাদন-কার্যে ইহার ব্যবহার হয়।

মূলধনের কাজ—Functions of Capital

মূলধন ছাড়া উৎপাদনের পরিমাণ-বৃদ্ধি ও উৎপাদনের উৎকর্ষ সম্ভব নয়। জেলে হাত দিয়া যে কয়টি মাছ ধরিতে পারে, নৌকা, জাল ও অন্যান্য সহায়ক সামগ্রীর সাহায্যে তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ ও নানাজাতীয় মাছ ধরিতে সক্ষম হয়। কৃষি, শিল্প, খনি, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি উৎপাদনের সর্বক্ষেত্রেই মূলধনের সাহায্য ব্যতীত উৎপাদন সম্ভব নহে। মূলধনের সাহায্যে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে উপাদানগুলির পারিশ্রমিকও বৃদ্ধি পায়। শ্রমিক, মালিক প্রভৃতি সকলেরই আয় বৃদ্ধি পাইয়া জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

চল্‌তি মূলধনের সাহায্যে আধুনিক সময়সাপেক্ষ উৎপাদন-ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, একটি বস্ত্রশিল্প গঠিত হইয়া বস্ত্র তৈয়ারী হইয়া বাজারে বিক্রীত হইতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। শ্রমিকেরা এতদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারে না। চল্‌তি মূলধন হইতেই এই জাতীয় শিল্পে নিযুক্ত কর্মিগণকে তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করা হইয়া থাকে। মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়। মার্কিন-দেশ উন্নত, তাহার প্রধান কারণ হইল দেশে মূলধনের অভাব নাই। আর ভারত অনুন্নত, তাহার প্রধান কারণ হইল দেশে মূলধনের অভাব—তাই ভারত অর্থ-নৈতিক উন্নতির জন্য বিদেশ হইতে মূলধন সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত।

মূলধন গঠনের উপাদান—Factors governing formation of Capital

দেশের মূলধনবৃদ্ধি তাহার সঞ্চয়ের উপর নির্ভ করে। দেশের সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করে দুইটি অবস্থার উপর। একটি অবস্থা হইল মানসিক (Subjective) অর্থাৎ সঞ্চয়ের ইচ্ছা (Will to Save) অপরটি বাহ্যিক (Objective) অর্থাৎ সঞ্চয়ের ক্ষমতা (Power to Save)।

সঞ্চয়ের ইচ্ছা—মানুষের দূরদৃষ্টি, স্বজন-প্রীতি এবং সমাজে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে। ভবিষ্যৎ অজানা ও অনিশ্চিত। এই ভবিষ্যতের জন্যই মানুষ সঞ্চয় করে। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, বিধবা হইলে স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য লোকে সঞ্চয় করে। শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দূরদৃষ্টি ও কর্তব্যবুদ্ধি বৃদ্ধি পায়। সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি মানুষের

একটি জন্মগত সংস্কার। অসভ্য মানুষও কোন কিছু পাইলেই তাহার কিয়দংশ আগামী কালের জন্য রাখিয়া দেয়। উচ্চাকাঙ্ক্ষাও মানুষের সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করে।

সঞ্চয়ের ক্ষমতা—মূলধন-গঠন শুধু সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না —সঙ্গে সঙ্গে লোকের সঞ্চয়ের ক্ষমতাও থাকা চাই। এজন্য ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক হওয়া প্রয়োজন। যেখানে কোন উদ্বৃত্ত নাই, সেখানে সঞ্চয় সম্ভব নয়। সুশাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়া লোকের জীবন, ধন ও মানের নিরাপত্তা সৃষ্টি না হইলে লোকে সঞ্চয় করিতে সাহস করে না। দস্যু-তস্কর বা অত্যাচারী সরকার বর্তমান থাকিলে লোকে সঞ্চিত ধন ভোগ করিতে পারে না। সঞ্চয়ের জন্য দেশে সঞ্চয়ের সুযোগ-সুবিধা থাকা চাই। এই উদ্দেশ্যে দেশে বহু ব্যাঙ্ক, বীমা-কোম্পানী, অংশীদারী কারবার প্রভৃতি একান্ত আবশ্যক। এই প্রতিষ্ঠানগুলি জনসাধারণকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে। সুদের হার যদি বেশী হয়, তাহা হইলে লোকে সঞ্চয়ে আকৃষ্ট হয়। তবে একথা সব সময়ে সত্য নহে। ইহা ছাড়া, একটি দেশে প্রচলিত ধর্মীয় এবং সামাজিক প্রথা ও অনুষ্ঠানগুলিও পরোক্ষভাবে সঞ্চয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, একটি দেশের মূলধন-গঠন নানা জটিল অবস্থার উপর নির্ভর করে।

ভারতে মূলধনের অভাবের কারণ—Causes of paucity of Capital in India

ভারতে মূলধনের একান্ত অভাব দেখা যায়। ভারতবাসীর চরম দারিদ্র্যই হইল মূলধনের অভাবের প্রধান কারণ। যে দেশের লোকের মাথাপিছু মাসিক আয় হইল মাত্র ২৪৲ টাকা সে দেশে সঞ্চয় দ্বারা মূলধন বৃদ্ধির আশা দুরাশা মাত্র। দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী আর এই কৃষকগণই হইল সর্বাপেক্ষা গরীব। সুতরাং কৃষকদের দারিদ্র্য দূর করিয়া তাহাদের আয় বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা না হইলে মূলধন-বৃদ্ধি সম্ভব নয়। শুধু আয়বৃদ্ধি করিলেই চলিবে না, তাহাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করিয়া তাহাদের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করিতে হইবে। ভারতের লোক ধর্মপ্রাণ ও আচারনিষ্ঠ। নানাবিধ সামাজিক অনুষ্ঠানেও তাহারা সাধ্যাতীত ব্যয় করে। এই জাতীয় ব্যয় শিক্ষা-বিস্তার করিয়া নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। ভারতের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে। গ্রামাঞ্চলে সঞ্চয়ের সুযোগ নাই বলিলেও

চলে। সঞ্চয় বৃদ্ধি করিতে হইলে গ্রামে গ্রামে ব্যাঙ্ক, সেভিংস ব্যাঙ্ক, সমবায়-সমিতি প্রভৃতি গঠন করিয়া গ্রামবাসিগণকে সঞ্চয় করিবার সুযোগ দিবার ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন। ভারত সরকার বর্তমানে এবিষয়ে অবহিত হইয়া স্টেট ব্যাঙ্কের সাহায্যে গ্রাম এলাকায় আধুনিক ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার সুযোগ সম্প্রসারিত করিতেছেন।

মূলধন সংগঠন—Capital Formation

উৎপাদনের একটি প্রধান উপাদান হিসাবে মূলধনের গুরুত্ব সর্বদেশে স্বীকৃত হয়। পাশ্চাত্ত্যের উন্নত দেশগুলিতে মূলধনের প্রাচুর্য দেখা যায়। বহু পূর্ব হইতেই এই সমস্ত দেশে শিল্প-বাণিজ্য প্রসার লাভ করিবার ফলে ইহারা অনুন্নত দেশগুলিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করিয়া এই সমস্ত দেশ হইতেও ছলে-বলে-কৌশলে প্রচুর মূলধন সংগ্রহ করে। সুতরাং এই দেশগুলির জাতীয় আয়-পরিমাণ, জনপ্রতি আয়, সঞ্চয় পরিমাণ অধিক, ফলে মূলধন পরিমাণও অধিক।

মূলধন সংগঠন সাধারণতঃ তিন স্তরে বিভক্ত। প্রথমতঃ, ব্যয় সংকোচ সাহায্যে সঞ্চয় সৃষ্টি, দ্বিতীয়তঃ, সঞ্চিত অর্থকে যথাযথভাবে আয়ের উৎসরূপে বিনিয়োগ করা এবং তৃতীয়তঃ, এই নিযুক্ত অর্থকে মূলধনী দ্রব্যে (যন্ত্রপাতি, কলকারখানা ইত্যাদি) রূপান্তরিত করা।

সঞ্চয়ের এই তিনটি স্তর বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, মূলধন গঠনের প্রাথমিক স্তর হইল সঞ্চয়। সঞ্চয়ের জন্য ভোগ নিবৃত্তির প্রয়োজন। এজন্য সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও তৎসঙ্গে সঞ্চয়ের ক্ষমতা থাকা চাই। অনুন্নত দেশগুলিতে লোকের মাথাপিছু আয় এত কম যে, তাহাদের সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকিলেও ক্ষমতা নাই। মূলধন গঠনের দ্বিতীয় স্তর হইল সঞ্চয়ের যথাযথ বিনিয়োগ। এজন্যও বিনিয়োগের ইচ্ছা ও বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা থাকা একান্ত আবশ্যক। অনুন্নত দেশগুলিতে সঞ্চয় বিনিয়োগের ক্ষেত্র খুব সীমাবদ্ধ। ব্যাংক, বীমা ব্যবসায় প্রভৃতি সঞ্চয় বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের অভাবই হইল বিনিয়োগের প্রধান অন্তরায়। ইহা ছাড়া, অনুন্নত দেশের লোকে ঝুঁকিপূর্ণ শিল্প-বাণিজ্যে সাধারণতঃ তাহাদের কষ্টার্জিত অর্থ বিনিয়োগ করিতে চায় না। তৃতীয়তঃ, সঞ্চিত অর্থের সাহায্যে মূলধন দ্রব্য ও উৎপাদনের সহায়ক ভারী ও মূল শিল্পগুলির

প্রসার প্রয়োজন। অনুন্নত দেশগুলিতে এই সমস্ত ব্যবস্থার একান্ত অভাবের ফলে মূলধন গঠন সম্ভব হয় না।

পরিচালক বা ব্যবস্থাপক—Organiser

বর্তমান যুগে জটিল যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিরাট বহরে উৎপাদনকার্য পরিচালিত হয়। উৎপাদিত দ্রব্য আন্তর্জাতিক বাজারে কেনাবেচা হয় এবং এই আন্তর্জাতিক বাজারের মূল্য পরিবর্তনের দিকে ও চাহিদা পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উৎপাদন করিতে হয়। কাজেই উৎপাদনের ঝুঁকি ও দায়িত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানে একত্রে বহু শ্রমিক কাজ করে, সেজন্য শ্রমিকদের জন্য কাজ বন্টন করা ও প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করাও কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং বর্তমান যুগে পরিচালকের কাজের গুরুত্ব সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পরিচালকের কাজ—Functions of the Entrepreneur

উৎপাদনের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত উদ্যোক্তাকে দেখিতে হয়। তিনিই শিল্প-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্থান নির্বাচন করেন ও উপযুক্ত গৃহাদি নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। কাঁচামাল সংগ্রহ, যন্ত্রপাতি ক্রয়, শ্রমিক নিয়োগ ও শ্রমিকদের মধ্যে কাজ ভাগ করিয়া দেওয়াও তাঁহার কার্য। উৎপাদিত দ্রব্য উপযুক্ত মূল্যে বাজারে বিক্রয় করা ও সেজন্য বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থাও তাঁহাকে করিতে হয়। লোকের রুচির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাকে উৎপাদনের নূতন নূতন পদ্ধতি প্রবর্তন করিতে হয়, নতুবা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তাঁহার মুনাফা পরিমাণ কম হয়। উৎপন্ন দ্রব্য হইতে বিক্রয়লব্ধ আয় তাঁহাকে জমির বা গৃহের মালিক, মজুর ও মূলধনের অধিকারীকে যথাক্রমে খাজনা, মজুরি ও সুদ হিসাবে দিতে হয়। অর্থাৎ উৎপাদনের সমস্ত খরচ মিটাইয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহা হইলেই তিনি তাহা মুনাফা হিসাবে গ্রহণ করিতে পারেন। ঝুঁকি বহন করাই হইল উদ্যোক্তার প্রধান কাজ। উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানগুলি কোন ঝুঁকি লয় না—একমাত্র উদ্যোক্তাই এই ঝুঁকি বহন করেন এবং তাঁহার মুনাফার পরিমাণ তাহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, কর্মদক্ষতা ও সংগঠন শক্তির উপর নির্ভর করে। এইজন্যই উদ্যোক্তাকে শিল্পের অধিনায়ক (Captain of industry) বলা হয়। কারণ তিনিই ভূমি,

মূলধন ও শ্রমের যথাযথ সংযোগ সাধন করিয়া উৎপাদনে সাহায্য করেন। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ব্যবস্থাপক ব্যবসায় পরিচালনা করেন। ব্যবসায়ের ঝুঁকি বহন করেন ও নূতন নূতন উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

সংক্ষিপ্তসার

উৎপাদনের উপাদান

ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা—এই চারিটি হইল উৎপাদনের উপাদান। বর্তমান যান্ত্রিক যুগে বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার ফলে অন্যান্য উপাদান অপেক্ষা ব্যবস্থাপনা উপাদানটির গুরুত্ব বাড়িয়াছে।

ভূমি—ভূমি বলিতে ধনবিজ্ঞানে যাবতীয় প্রাকৃতিক পদার্থ ও নৈসর্গিক শক্তি বুঝায়।

ভূমির বৈশিষ্ট্য—১। ভূমির সরবরাহ সীমাবদ্ধ, ২। ভূমির উন্নতির জন্য ব্যয় হইলেও ইহার কোন উৎপাদন-খরচ নাই, ৩। গতিশীলতার অভাব, ৪। বিভিন্ন জমির উৎপাদিকা-শক্তির বিভিন্নতার জন্য ভূমির পরিবর্তন সম্ভব নহে, ৫। ভূমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি প্রযোজ্য।

ভূমির উৎপাদিকা-শক্তির উপাদান

ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি নির্ভর করে—১। নৈসর্গিক কারণ, ২। মানবায় কারণ ও ৩। ভৌগোলিক কারণের উপর।

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের অর্থ হইল যে, ভূমির পরিমাণ সমান রাখিয়া যদি অন্য দুইটি উপাদানের মাত্রা বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে শ্রম ও মূলধন যে পরিমাণে জমিতে প্রযুক্ত হয় তদপেক্ষা কম হারে ভূমি হইতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ উৎপাদন-বৃদ্ধি শ্রম ও মূলধনের সমানুপাতিক হয় না। ফলে, উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পায়। যদি চাষবাসের পদ্ধতির কোন পরিবর্তন না ঘটে বা জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে এই বিধিটি কার্যকরী হয়; ভূমি ব্যতীত খনিকার্যে, মৎস্যস্থলী প্রভৃতিতেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। ভূমির আয়তনের ও উৎপাদিকা-শক্তির সীমাবদ্ধতার জন্যই এই বিধি কার্যকরী হয়।

ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-বিধি

কোন শিল্পে যদি অধিক হারে মূলধন ও শ্রম নিয়োগ করা যায়, তাহা হইলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণও অধিক হারে বৃদ্ধি পায়, ফলে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়। ইহার কারণ হইল যে, শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপাদানগুলির মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া শিল্পের প্রসার সম্ভব এবং এইজন্য নানাবিধ ব্যয় সংকোচ হয়।

শ্রমিক-সরবরাহ

শ্রমিকের সরবরাহ শ্রমিকের সংখ্যা ও শ্রমিকের দক্ষতার উপর নির্ভর করে। শ্রমিকের সংখ্যা দেশে জন্মহার, মৃত্যুহার, বিদেশ হইতে আগমন ও বিদেশে গমনের উপর নির্ভর করে।

শ্রমিকের দক্ষতা

শ্রমিকের দক্ষতা তাহার নিজের ও ব্যবস্থাপকের উপর নির্ভর করে। শ্রমিকের শারীরিক শক্তি ও বুদ্ধি, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও কর্তব্যজ্ঞান তাহার দক্ষতা বৃদ্ধি করে। এই দক্ষতা-বৃদ্ধির জন্য খাদ্য, পরিধেয়, বাসস্থান, উপযুক্ত বেতন, নির্ধারিত কাজ ও ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা থাকা চাই। ব্যবস্থাপক তাঁহার ব্যবস্থাপনা-নৈপুণ্যের দ্বারা শ্রমিকের কর্মদক্ষতা-বৃদ্ধিতে সাহায্য করিতে পারেন।

শ্রম-বিভাগ—শ্রম-বিভাগ বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। একটি কার্যকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করিয়া এক একটি ভাগ যখন পৃথক্ পৃথক্ লোক দ্বারা সম্পাদিত হয় তখন তাহাকে শ্রম-বিভাগ বলা হয়। একজোড়া জুতা একজন চর্মকার প্রথম হইতে শেষ অবধি প্রস্তুত করিতে পারে অথবা এই প্রস্তুত-কার্য বিভিন্ন অংশে ভাগ করিয়া এক একটি ভাগ পৃথক ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন করা যায়। বর্তমান যান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় শ্রম-বিভাগ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তির দিক দিয়া এই শ্রম-বিভাগ বিশেষত্বশীলতা সূচিত করে, সমাজের দিক দিয়া শ্রম-বিভাগ সহযোগিতা সূচিত করে।

সুবিধা—১। শ্রম-বিভাগের দ্বারা শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, সময়ের অপব্যয় রহিত হয়, যন্ত্রপাতিরও কোন অপচয় হয় না। ২। শ্রম-বিভাগের ফলে জটিল কার্য সরল হয় ও ৩। শ্রমিকগণের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। ৪। শ্রম-বিভাগ উৎপাদন খরচা হ্রাস করিয়া দ্রব্যমূল্য নিম্নাভিমুখী করে। ৫। ইহাতে লোকে সস্তায় উৎকৃষ্টতর দ্রব্য পাইতে পারে।

অসুবিধা—শ্রম-বিভাগের অসুবিধা হইল যে ১। ইহাতে শ্রমিকের সাধারণ কর্মপটুতা হ্রাস পায় ও ২। কাজের নূতনত্ব থাকে না। ৩। একই কাজ করিতে করিতে শ্রমিকের চিত্তের বহুমুখিতা নষ্ট হয়।

সীমা—উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা ও উৎপাদনের ধারাবাহিকতার উপরই শ্রম-বিভাগের সম্ভাব্যতা নির্ভর করে।

মূলধন—ধনের যে অংশ অধিক উৎপাদনে সাহায্য করে অর্থাৎ যে-কোন আকারে একটি অতিরিক্ত আয় অর্জন করিতে পারে, তাহাকে মূলধন বলা হয়। মূলধন হইল আয়ের উৎস। মূলধন ভূমির ন্যায় প্রাকৃতিক উপাদান নহে, আবার সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যসৃষ্ট নহে। মানুষ প্রকৃতি-দত্ত দ্রব্যের উপর শ্রম বিনিয়োগ করিয়া মূলধন সৃষ্টি করে।

উৎপাদনের একটি উপাদান হইলেও ভূমির সহিত ইহার পার্থক্য সুস্পষ্ট। ভূমির পরিমাণ সীমিত, মূলধনের পরিমাণ পরিবর্তনীয়। ভূমি প্রকৃতির দান, মূলধন মনুষ্যসৃষ্ট। মূলধন শেষ পর্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় কিন্তু ভূমির বিনাশ নাই।

গৃহ, কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতিকে স্থায়ী মূলধন বলা হয়, কারণ ইহারা দীর্ঘকালব্যাপী উৎপাদনে সাহায্য করে কিন্তু কাঁচামাল প্রভৃতি একাধিকবার উৎপাদনে ব্যবহারযোগ্য নহে বলিয়া ইহাদিগকে চলতি মূলধন বলা হয়।

(১) মূলধন উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে। (২) মূলধন যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতি সংগ্রহ করে। (৩) মূলধন উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকগণকে ভোগ্যবস্তু সরবরাহ করে।

মূলধনের উপর উৎপাদন নির্ভর করে। সুতরাং মূলধন-বৃদ্ধি আবশ্যক। মূলধন-বৃদ্ধি নির্ভর করে (ক) সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও (খ) সঞ্চয়ের ক্ষমতার উপর। সঞ্চয়ের ইচ্ছা লোকের দূরদৃষ্টি, পারিবারিক স্নেহ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়। সঞ্চয়ের ক্ষমতা না থাকিলে লোকের সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইতে পারে না। সঞ্চয়-ক্ষমতা নানা অবস্থার উপর নির্ভর করে যথা, উদ্বৃত্ত আয়, জীবন ও ধনের নিরাপত্তা, সঞ্চয় করিবার সুযোগ, সুদের হার প্রভৃতি।

ব্যবস্থাপক—অধুনা উৎপাদন-ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপনা-কার্য সর্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ভূমি, শ্রম ও মূলধনের যথাযথ সংযোগ সাধন করিয়া অধিক পরিমাণে উৎকৃষ্টতর দ্রব্য উৎপাদনের জন্যই ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন এবং যিনি এই উপাদানগুলির যথাযথ সংযোগ সাধন করেন তাঁহাকে ব্যবস্থাপক বলা হয়।

ব্যবস্থাপক উৎপাদনের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত উৎপাদন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন। ক্রয়-বিক্রয়, শ্রমিক-নিয়োগ, মূলধন সংগ্রহ করা, উৎপাদিত আয় বন্টন করা ব্যতীতও ব্যবস্থাপককে ঝুঁকি বহন করিতে হয়। উৎপাদনের অনিশ্চয়তার জন্য একমাত্র তিনিই দায়ী। তাঁহার লভ্যাংশ তাঁহার ব্যবস্থাপনা-নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করে।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. What are the principal factors of production ?

উৎপাদনের প্রধান উপাদানগুলি কি ?

উঃ—প্রকৃতি (Nature) ও মানুষ (Man)-এই দুইটি হইল উৎপাদনের প্রধান উপাদান। প্রকৃতি-দত্ত সামগ্রীগুলির মানুষ তাহার পরিশ্রম ও বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া তাহার প্রয়োজনমত দ্রব্যাদি উৎপাদন করিয়া তাহার অসংখ্য অভাব মোচন করে। সাধারণতঃ, ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা এই চারিটিকে বর্তমানে উৎপাদনের উপাদান বলা হয়। শ্রম ও ব্যবস্থাপনা হইল মানবীয় উপাদান (Human factors), আর ভূমি হইল প্রকৃতি-দত্ত উপাদান। মূলধন মনুষ্য-সৃষ্ট উৎপাদনের উপাদান হইলেও মূলধনের মূল উপাদান প্রকৃতি হইতে সংগৃহীত হয়।

2. What are the functions of an organiser ?

পরিচালকের কাজ বর্ণনা কর।

উঃ—পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সংগঠক বা উদ্যোক্তা বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থার প্রাণ-স্বরূপ। ব্যবসায়ের পরিকল্পনা (planning) হইতে আরম্ভ করিয়া উপার্জিত আয় বন্টন করা পর্যন্ত তাহার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। কখন, কোথায়, কি পদ্ধতিতে কি কি দ্রব্য উৎপাদিত হইবে তাহা তিনি স্থির করেন। কাঁচামাল, শ্রমিক, মূলধন প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া প্রত্যেকটি উপাদানের উপযুক্ত সংমিশ্রণে সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত করিতে হয়। বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন ব্যবস্থা তাহাকেই করিতে হয়। জমির মালিকের খাজনা, শ্রমিকের মজুরি ও মূলধনের সুদ দিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাই তাহার প্রাপ্য। সুতরাং তাহার লাভের পরিমাণ তাহার পরিচালনা দক্ষতার উপর নির্ভর করে।

ইহা ছাড়া, ব্যবসায়ের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা তাহাকেই বহন করিতে হয়। লোকের রুচি পরিবর্তন, দেশে ও বিদেশে চাহিদার পরিবর্তনের উপর তাহাকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। অনেক সময় দক্ষ ব্যবস্থাপক নূতন দ্রব্য উৎপাদন করিয়া লোকের রুচি পরিবর্তন সাহায্যে তাহার লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। নূতন যন্ত্রপাতি ব্যবসায়ে ব্যবহার করিয়া কি ভাবে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা যায়, তাহার উপরও তাহার লাভের পরিমাণ নির্ভর করে। তাহার অধীনে বহু শ্রমিক কাজ করে। সুতরাং ব্যবস্থাপকের একজন জনপ্রিয় নেতার গুণ থাকা চাই।

3. On what does the supply of labour depend ?

শ্রমিক সরবরাহ কিসের উপর নির্ভর করে ?

উঃ—একটি দেশের শ্রমিকের সংখ্যা সেই দেশের জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে। কিন্তু

জনসংখ্যা বেশী হইলে যে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে তাহা ঠিক নহে। শিশু, বৃদ্ধ, ধনী, মহিলা, সাধু, ফকির, অক্ষম-উন্মাদ প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদিগকে সমগ্র জনসংখ্যা হইতে বাদ দিতে হইবে। সুতরাং শ্রমিকের সংখ্যা কর্মক্ষম যুবক ও মধ্যবয়স্ক জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে। আবার কর্মক্ষম সকল লোকই সব সময় সমানভাবে কাজ করে না। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শ্রমিকের কাজের সময়, কাজের দক্ষতা ও কাজের ক্ষমতার উপর শ্রমের সরবরাহ নির্ভর করে।

4. What do you mean by efficiency of labour ? What are the conditions on which the efficiency of labour depends ? H. S. (Com.) 1960

শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বলিলে কি বুঝ ? কি কি অবস্থার উপর কর্মদক্ষতা নির্ভর করে ?

উঃ—শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বলিতে তাহার উৎপাদন ক্ষমতা বুঝায়। একটি দেশে বহুল পরিমাণে ধনোৎপাদন করিয়া জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিতে শ্রমিকের কর্মদক্ষতার গুরুত্ব অসীম। শ্রমিক দক্ষ না হইলে প্রাকৃতিক সম্পদ ও উৎপাদনের সহায়ক যন্ত্রপাতি মূলধন ফলপ্রসূ হইতে পারে না। সুতরাং দেশের ধনোৎপাদনের প্রধান সহায়ক হইল শ্রমিকের কর্মদক্ষতা। শ্রমিকের এই দক্ষতা দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে : (১) শ্রমিকের কাজ করিবার শক্তি ও (২) কাজ করিবার ইচ্ছা।

১। শ্রমিকের কাজ করিবার সামর্থ্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে : যথা, (ক) দেশের জলবায়ু, (খ) জাতীয় বৈশিষ্ট্য, (গ) শারীরিক শক্তি (শারীরিক শক্তি আবার খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের উপরে অনেকাংশে নির্ভর করে), (ঘ) সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা (সাধারণ শিক্ষা শ্রমিকের মনের প্রসারতা বৃদ্ধি করে ও কারিগরি শিক্ষা শ্রমিককে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কলা-কৌশল শিক্ষা দিয়া যোগ্য করে), (ঙ) নৈতিক চরিত্র (শ্রমিকের কর্তব্যজ্ঞান ও দায়িত্ববোধ থাকা চাই)।

২। কাজ করিবার ইচ্ছা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে :—

(ক) কাজের সময় ও কাজের পরিবেশ, (খ) কাজের স্থায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা, (গ) উপযুক্ত পরিমাণ পারিশ্রমিক ও ঠিক সময়ে পাওয়ার সম্ভাবনা, (ঘ) উন্নতির আশা, স্বাধীনতা ও কাজের একঘেয়েমি দূর করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে পরিবর্তন ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা।

পরিশেষে মালিক ও উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও কাজের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া এবং সর্বোপরি শ্রমিকের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া তাহার কাজের ইচ্ছা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে পারে।

উপরি-উক্ত যে সমস্ত অবস্থার উপর শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা নির্ভর করে, ভারতে সেই অবস্থা-গুলি নাই বলিলেও চলে। ভারতের শ্রমিকের খাদ্য, বস্ত্র ও আবাসস্থানের অবস্থা নিতান্ত খারাপ। যান্ত্রিক শিক্ষা দূরের কথা, সাধারণ শিক্ষা হইতেও তাহারা বঞ্চিত। কল-কারখানার দূষিত আবহাওয়া ও মালিকের ঔদাসীন্য শ্রমিকের কর্মদক্ষতার সহায়ক নহে। সুতরাং ভারতের শ্রমিকের কাছে বর্তমানে দক্ষতার আশা করা যায় না।

5. What do you mean by land in Economics ? What are its peculiarities ?

ধনবিজ্ঞানে ভূমি বলিতে কি বুঝ ? ইহার বৈশিষ্ট্য কি কি ?

উঃ—ধনবিজ্ঞানে ভূমি বলিতে যাবতীয় প্রাকৃতিক পদার্থ (খনিজ, বনজ, জলজ) ও নৈসর্গিক শক্তি (বাষ্পীয়, বৈদ্যুতিক) বুঝায়।

ভূমির বৈশিষ্ট্য হইল যে, মূলধন বা শ্রমিকের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হইলেও ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় না। অন্যান্য উপাদানগুলির ন্যায় ভূমি স্থানান্তর করা যায় না। ভূমির উন্নতির জন্য ব্যয় হইলেও ভূমির কোন উৎপাদন খরচ নাই। ভূমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি কার্যকরী হয়।

6. State and explain the law of Diminishing Returns. Is it applicable to (a) mines and (b) manufacturing industries ? H. S. (Com.) 1961

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন সূত্রটির ব্যাখ্যা কর। এই সূত্রটি কি (ক) খনি ও (খ) শিল্প উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ?

উঃ—কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে যদি ক্রমাগত বেশী হারে শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে সাধারণতঃ সমগ্র উৎপাদন পরিমাণ বাড়িলেও যে হারে শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করা হয় সে হারে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধির সঙ্গে উৎপন্ন ফসল বৃদ্ধির হার কমিতে থাকে। কিছুদিন পর্যন্ত হয়ত ফসল বৃদ্ধির হার শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধির হারের সমানুপাতিক বা তদপেক্ষা বেশী হইতে পারে, কিন্তু এমন এক সময় আসিবে যখন একই পরিমাণ জমিতে দ্বিগুণ খরচ করিয়াও দ্বিগুণ পরিমাণ ফসল পাওয়া সম্ভব হইবে না। সুতরাং অধিক ফসল উৎপাদন করিতে হইলে অতিরিক্ত খরচ হইবে অর্থাৎ উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। যদি চাষবাসের পদ্ধতির কোন পরিবর্তন না হয় বা জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে এই বিধিটি কার্যকরী হয়।

(a) খনি ও মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে এই বিধিটি প্রযোজ্য। অধিক পরিমাণে খনিজ পদার্থ উত্তোলন করিতে গেলে খনির নিম্নদেশে যাইতে হয় এবং এজন্য অধিক খরচ হয়। ব্যয়বৃদ্ধির তুলনায় খনিজ পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। কারণ খনির ক্ষেত্রে আরও দেখা যায় যে, ব্যয়বৃদ্ধি করিলেও এমন একটি সময় আসিবে, যখন খনিজ পদার্থ আর পাওয়া যাইবে না।

(b) শিল্পের ক্ষেত্রেও এই বিধিটি কার্যকরী হইতে পারে। তবে কৃষিক্ষেত্রে যতটা কঠোরভাবে এই বিধিটি কার্যকরী হয়, শিল্পের ক্ষেত্রে তত হয় না। কারণ কৃষিক্ষেত্রে কৃষক জমির পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। উৎপাদন ক্ষেত্রে উৎপাদক যদি কোন একটি উপাদানের পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখিয়া অপর দুইটির পরিমাণ বৃদ্ধি করে তাহা হইলে উৎপাদন হ্রাস পায় এবং এই কারণে জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন হয়। কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ উৎপাদনের সব কয়টি উপাদান—শক্তি, শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধি করা যায় বলিয়া ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের পরিবর্তে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন হয়। কিন্তু কোন কারণে শিল্পেও যদি কোন একটি উপাদানের সরবরাহ নির্দিষ্ট রাখিয়া অন্য উপাদানগুলির সরবরাহ বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে সমগ্র উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও উৎপাদন বৃদ্ধি হার অন্য দুইটি উপাদান বৃদ্ধির সমানুপাতিক হইবে না অর্থাৎ অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে।

7. Define capital.

Distinguish between Fixed capital and Circulating capital.

মূলধনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। স্থায়ী ও চল্‌তি মূলধনের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও।

উঃ—উৎপাদিত ধনের যে অংশ পুনরায় উৎপাদন-কার্যে ব্যবহৃত হয় তাহাকে মূলধন বলা

হয়। সুতরাং মূলধন হইল (ক) ধনের অংশ ও (খ) মনুষ্য উৎপাদিত। যন্ত্রপাতি, কারখানা গৃহ, কাঁচামাল, শ্রমিকগণের জন্য মজুত খাদ্যাদি মূলধন পর্যায়ভুক্ত।

যে সমস্ত দ্রব্য দীর্ঘদিন ধরিয়া উৎপাদন-কার্যে সাহায্য করে, একবার ব্যবহারে নিঃশেষ হয় না, তাহাদিগকে স্থায়ী মূলধন বলা হয়, যথা, যন্ত্রপাতি, কারখানা গৃহ প্রভৃতি। আর যে সমস্ত দ্রব্য উৎপাদন কার্যে একবারের অধিক ব্যবহার করা যায় না, তাহাকে চল্‌তি মূলধন বলা হয়। কাপড়ের কলে যে সূতা ব্যবহার করা হয় তাহা একবারের অধিক ব্যবহার করা যায় না। কারণ সূতা কাপড়ে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু কাপড়ের কল অপরিবর্তিত থাকিয়া বহুদিন পর্যন্ত বহু পরিমাণ কাপড় প্রস্তুত করিতে সাহায্য করে। সুতরাং কল হইল স্থায়ী মূলধন, আর সূতা হইল চল্‌তি মূলধন।

8. Explain the functions of capital. What are the conditions favourable for the formation of capital in a country? H. S. (Com.) 1961 Comp.

মূলধনের কার্যকারিতা বর্ণনা কর। মূলধন গঠনের সহায়ক উপাদানগুলি কি কি?

উঃ—মূলধন হইল উৎপাদনের একটি একান্ত সহায়ক উপাদান। বর্তমান যুগে মূলধন (যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা প্রভৃতি) ব্যতীত কোনপ্রকার উৎপাদন কার্যই চলিতে পারে না।

মূলধনের প্রধান কাজ হইল (১) শ্রমিকের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করা। (২) মূলধন ব্যবহারের ফলে উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ও উৎপাদন-খরচা কম হয়। এই কারণেই হস্তচালিত তাঁত অপেক্ষা কাপড়ের কলে অধিক পরিমাণ বস্ত্র অল্প খরচায় অল্প সময়ে প্রস্তুত করা সম্ভব হয়। (৩) উৎপাদন ব্যয় কমিলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায় ও সাধারণ লোকে অল্পমূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। (৪) মূলধনের সাহায্যে সূক্ষ্ম কাজ সম্ভব হয়। (৫) বর্তমানে মূলধন সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থায় ভোগ্যবস্তুর উৎপাদনে দীর্ঘ সময় লাগে। কল-কারখানা স্থাপন হইতে আরম্ভ করিয়া ভোগ্যবস্তু উৎপাদন পর্যন্ত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। এই অন্তর্বর্তী সময়ে মূলধন শ্রমিক ও মালিককে কাঁচামাল, খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান সরবরাহ করে।

দেশে মূলধন বৃদ্ধি দুইটি অবস্থার উপর নির্ভর করে: (১) সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও (২) সঞ্চয়ের শক্তি।

১। সঞ্চয়ের ইচ্ছা না থাকিলে সঞ্চয়ের ক্ষমতা থাকা সত্বেও অনেক সময়ে সঞ্চয় করা যায় না। লোকের সঞ্চয়ের ইচ্ছা নির্ভর করে (ক) পারিবারিক স্নেহ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ যশ ও মর্যাদালাভের ইচ্ছা, (খ) দূরদৃষ্টি অর্থাৎ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থা করিবার প্রবৃত্তি, (গ) উপার্জিত অর্থের নিরাপত্তা (দেশে সুশাসনব্যবস্থা থাকা চাই), (ঘ) সঞ্চয় করিবার সুযোগ অর্থাৎ দেশে বহুসংখ্যক ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতি থাকা চাই, (ঙ) সুদের হার অর্থাৎ সুদের হার বেশী হইলে লোকের সঞ্চয়ের ইচ্ছা বেশী হইবে।

২। সঞ্চয়ের ক্ষমতা না থাকিলে শুধু ইচ্ছা থাকিলেই সঞ্চয় করা যায় না। সঞ্চয়ের জন্য উদ্বৃত্ত আয় অর্থাৎ ব্যয় অপেক্ষা আয় বেশী হওয়া প্রয়োজন।

দেশের সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির আধিক্যে অনেক সময় সঞ্চয় ব্যাহত হয়, যেমন আমাদের দেশে লোকে পূজা-পার্বণে সাধ্যাতীত ব্যয় করে—সুতরাং সঞ্চয় করিতে পারে না।

ভারতের পিতা-মাতা স্নেহশীল হইলেও তাহাদের উদ্বৃত্ত আয় নাই বলিয়া ও সঞ্চয়ের সুযোগ-সুবিধার অভাবে ভারতে মূলধন বৃদ্ধি পাইতে পারে না।

9. Explain and illustrate the advantages of division of labour. Discuss the statement that divison of labour is limited by the extent of the market.

শ্রমবিভাগের সুবিধাগুলি দৃষ্টান্তসহ বুঝাইয়া দাও। বাজারের চাহিদার বিস্তৃতির দ্বারা শ্রমবিভাগ সীমাবদ্ধ—ইহার তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও।

উঃ—শ্রম-বিভাগের অর্থ হইল একটি সম্পূর্ণ উৎপাদন পদ্ধতিকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করিয়া প্রত্যেক অংশের ভার ভিন্ন ভিন্ন লোকের হাতে দেওয়া। কোন লোকই নিজে তাহার প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য উৎপাদন করিয়া সব অভাব মিটাইতে পারে না। কৃষক ধান উৎপাদন করে, তাঁতী কাপড় তৈয়ারী করে। সুতরাং তাঁতি কৃষকের উপর নির্ভর করে এবং কৃষক তাঁতির উপর নির্ভর করে। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেকেই নিজে একটিমাত্র বিশেষ কাজে রত থাকে এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যের জন্য অপর লোকের উপর নির্ভর করে। সুতরাং সহযোগিতা ছাড়া শ্রম-বিভাগ নীতি সফল হইতে পারে না। বর্তমান যান্ত্রিক যুগে এই শ্রম-বিভাগ নীতি আরও জটিল হইয়াছে। পূর্বে একজন মুচি একাই এক জোড়া জুতা তৈয়ারী করিত। কাঁচাচামড়া পাকা করিবার কাজ হইতে জুতা তৈয়ারীর সম্পূর্ণ কাজ সে একাকী করিত। বর্তমানে এই জুতা তৈয়ারীর কাজ অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হইয়াছে ও প্রত্যেকটি ভাগই যন্ত্রের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন লোক দ্বারা করা হয়। বর্তমানে জুতা তৈয়ারীর প্রত্যেকটি ভাগই হইল অসম্পূর্ণ এবং এই অসম্পূর্ণ পদ্ধতিগুলির সংযোগে (সহযোগিতায়) সম্পূর্ণ জুতা তৈয়ারী হয়। সুতরাং জটিল শ্রমবিভাগ-পদ্ধতিও সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

সুবিধা—১। শ্রম-বিভাগে কাজটি ভাগ হওয়ার ফলে প্রত্যেকে তাহার গুণ ও দক্ষতা অনুযায়ী কাজ করিতে পারে।

২। শ্রমিক একই কাজে নিযুক্ত থাকে বলিয়া তাহার কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৩। এক কাজ হইতে অন্য কাজে যাইতে হয় না বলিয়া সময়ের অপচয় বন্ধ হয় ও সে দ্রুততর কাজ করিতে পারে।

৪। সম্পূর্ণ কাজ অপেক্ষা কাজের একটি অংশ শিখিতেও কম সময় লাগে।

৫। শ্রম-বিভাগের ফলে কাজটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ হইয়া প্রায় একই ধরণের হয়। একই ধরণের কাজ যন্ত্র সাহায্যে করা যায়। সুতরাং শ্রম-বিভাগের ফলে যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়।

৬। প্রত্যেকে পৃথক কাজ করে বলিয়া একপ্রস্থ যন্ত্রপাতির সর্বাধিক ব্যবহার সম্ভব হইয়াছে।

৭। সুতরাং শ্রম-বিভাগের ফলে কম সময়ে অধিক পরিমাণ দ্রব্য কমখরচায় তৈয়ারী করা সম্ভব হয়। ইহার ফলে মূল্য হ্রাস পায় ও মূল্য কমিলে ক্রেতা সাধারণের সুবিধা হয়।

শ্রম-বিভাগের সুবিধাগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যতই শ্রম-বিভাগ করা যাইবে, ততই উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে ও সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন-ব্যয় কমিবে। সুতরাং শ্রম-বিভাগের

ফলে উৎপাদকের মুনাফা বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু ইহা সব সময়ে সত্য নহে। বাজারের আয়তনই হইল ইচ্ছামত শ্রম-বিভাগ প্রবর্তন করিবার প্রধান অন্তরায়। শ্রম-বিভাগের ফলে উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বাজারে জিনিসটির চাহিদা যদি না থাকে বা চাহিদা যদি সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে শ্রম-বিভাগের সাহায্যে অধিক দ্রব্য উৎপাদন করিলে দ্রব্যগুলি অবিক্রীত থাকিবে অথবা খুব কম-মূল্যে জিনিসটি বিক্রয় করিতে হইবে। ইহাতে উৎপাদকের লোকসান হইবে। সুতরাং দ্রব্যটির বিক্রয় বাজারের আয়তন অর্থাৎ চাহিদার পরিমাণের দ্বারা শ্রম-বিভাগ সীমাবদ্ধ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প-সংগঠন

(Small and Large-scale industries)

শিল্পের সংজ্ঞা—Definition of Industry

শিল্প বলিতে ব্যাপক অর্থে সমস্ত উৎপাদন-ব্যবস্থাই বুঝায়। এই অর্থে কৃষিও ভারতের সর্বপ্রধান শিল্প বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু কৃষি ও শিল্প একজাতীয় উৎপাদন পদ্ধতি নহে। কৃষিকার্যে মানুষের শ্রম অপরিহার্য হইলেও প্রকৃতির সাহায্য ব্যতীত কৃষিকার্য সম্ভব হয় না—সুতরাং কৃষি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। এখানে প্রকৃতিই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। শিল্পের ক্ষেত্রে প্রকৃতির অবদান থাকিলেও মানুষ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। শিল্পে মানুষ প্রকৃতি হইতেই কাঁচামাল (কৃষিজাত, খনিজ) সংগ্রহ করে বটে, তবে যন্ত্রের সাহায্যে নিজের কায়িক পরিশ্রম ও বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া এই কাঁচামালগুলিকে নানাজাতীয় ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যে পরিণত করে। সুতরাং শিল্পের ক্ষেত্রে মানুষই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। যন্ত্রের সাহায্যে বাষ্পীয় বা বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া যে উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয় তাহাকে বিশেষ অর্থে শিল্প বলা হয়।

বৃহৎ, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প কাহাকে বলে—What are Large-scale, Small-scale and Cottage industries

শিল্পগুলিকে সাধারণতঃ বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের পর্যায়ে ভাগ করা

হয়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদন-কার্য বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে যন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হয় এবং যেখানে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা কমপক্ষে অন্ততঃ ৫০০ জন, সেই সমস্ত উৎপাদন-ব্যবস্থাকে বৃহৎ শিল্প বলা হয়। নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ৫০ হইতে ৫০০ শত হইলে, তাহাকে মাঝারি (Medium-sized) শিল্প বলা হয়। নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা যদি ৫০ জনের কম হয় অথবা শিল্পে কোন শক্তি ব্যবহৃত না হইয়াও যদি শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ১০০ জন পর্যন্ত হয় তাহা হইলেও এই জাতীয় শিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্প বলা হয়।

যে শিল্পগুলি সাধারণতঃ পারিবারিক ভিত্তিতে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্য ব্যতীত অল্পসংখ্যক শ্রমিক দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহাদিগকে কুটিরশিল্প বলা হয়। কুটিরশিল্প প্রধানতঃ গ্রামকেন্দ্রিক হইলেও শহরাঞ্চলেও ইহার প্রসার দেখা যায়।

শিল্প-সংগঠন—Organisation of Industries

বৃহদায়তন শিল্প একমালিকী, অংশীদারী অথবা যৌথ-মূলধনী কারবারের ভিত্তিতে গঠিত হইতে পারে। কিন্তু বড় বড় শিল্পে এত অধিক মূলধনের প্রয়োজন হয় যে, তাহা একজন মালিকের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নাও হইতে পারে। ইহা ছাড়া, এই কারবারের ঝুঁকিও এত বেশী যে, মালিক একাকী এই ঝুঁকি সাধারণতঃ লইতে ইচ্ছুক হয় না। এই কারণে বড় বড় শিল্পের ক্ষেত্রে বর্তমানে অংশীদারী ও বিশেষ করিয়া যৌথ-মূলধনী কারবারের আধিক্য দেখা যায়। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পগুলি সাধারণতঃ একমালিকী কারবারের ভিত্তিতে গঠিত হয়।

বৃহদায়তন শিল্প আবির্ভাবের কারণ—Causes of the growth of Large-scale industries

বর্তমান যুগে উৎপাদনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছোট ছোট শিল্পের পরিবর্তে বড় বড় শিল্প দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট তাঁত শিল্পের স্থলে বৃহৎ বহরের বস্ত্রশিল্প গঠিত হইয়াছে। ফলে, একদিকে যেরূপ ছোট ছোট শিল্পের সংখ্যা কমিয়াছে, অপর দিকে সেইরূপ বড় শিল্পের আয়তন বৃদ্ধি পাইয়াছে। উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রম-বিভাগ নীতির প্রবর্তন ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারই হইল বৃহদায়তন শিল্প উদ্ভবের প্রধান কারণ। এখন দেখা যাউক, শ্রম-বিভাগ কি এবং উৎপাদনে শ্রম-বিভাগের কি কার্যকারিতা আছে।

বৃহদায়তন শিল্পের সুবিধা—Advantages of Large-scale production

বর্তমান যুগে বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রসারলাভ করিয়াছে, ফলে ক্ষুদ্র ও কুটির-শিল্পগুলির সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। যন্ত্রের সাহায্যে হাজার হাজার শ্রমিক বহুপরিমাণ সামগ্রী একসঙ্গে উৎপাদন করিতেছে। অল্প বহর অপেক্ষা বৃহৎ বহরে উৎপাদন করিবার কতকগুলি সুবিধা আছে। এই সুবিধাগুলির জন্যই বর্তমানে বৃহৎ বহরের উৎপাদন-ব্যবস্থা ক্ষুদ্র বহরের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। সুবিধাগুলি হইল আবার দুই রকমের—আভ্যন্তরীণ (Internal) ও বাহ্যিক (External)। কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান আকারে বড় হইলে অনেক বিষয়ে ইহার গড়পড়তা উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। ইহার কারণ হইল যে, বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে এক সঙ্গে অনেক কাঁচামাল কিনিতে হয় এবং একসঙ্গে অনেক মাল কিনে বলিয়া সে পাইকারী দরে কিনিতে পারে। অনুরূপভাবে তাহার বিজ্ঞাপনের ব্যয়ও কম। এই সুবিধাগুলিকে আভ্যন্তরীণ সুবিধা বলা হয়। ইহাতে শিল্পটির ব্যয়-সংকোচ হয়।

বাহ্যিক সুবিধাগুলি কোন একটি শিল্পের প্রসারের উপর নির্ভর করে না—এই সুবিধাগুলি নির্ভর করে সমগ্রভাবে শিল্পটির প্রসারের উপর। শিল্প স্থানীয়করণের ফলে এই সুবিধাগুলি পাওয়া যায়। এক জায়গায় একজাতীয় বহু কারখানা স্থাপিত হইলে বহু অনুপূরক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প প্রধান শিল্পটির কাঁচামাল সরবরাহের জন্য নিকটবর্তী স্থানে স্থাপিত হয়। মূলধন সরবরাহ করিবার জন্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রমিকেরাও কাজ পাইবার জন্য ঐ স্থানে সমবেত হয়। এইজাতীয় সুবিধা সমস্ত শিল্পটির প্রসারের উপর নির্ভর করে এবং এই সুবিধাগুলি একটি শিল্পের অন্তর্গত সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি পাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, বস্ত্রবয়ন শিল্পের প্রসার হইলে অধিক পরিমাণে বস্ত্রবয়ন যন্ত্র উৎপাদিত হয়। ফলে, যন্ত্র উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায় ও বয়ন-শিল্পগুলি একযোগে কম মূল্যে বস্ত্র-বয়ন যন্ত্র ক্রয় করিয়া ব্যয় সংকোচ করিতে পারে।

আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সুবিধাগুলি হইল :—

১। বৃহদায়তন উৎপাদনে শ্রম-বিভাগের সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায়। যদি একসঙ্গে বহু শ্রমিক কাজ করে, তাহা হইলে পরিচালক শ্রমিকের যোগ্যতানুসারে

প্রত্যেক শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করিতে পারে। উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত হইলে শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, ফলে উৎপাদন-পরিমাণও বাড়িয়া যায়।

২। বহুদ্রব্য একসঙ্গে ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধা—বড় বড় শিল্পগুলিতে বহু কাঁচামালের প্রয়োজন হয়। একসঙ্গে বহুপণ্য ক্রয় করিলে সুবিধাজনক দরে পাওয়া যায়, যাহা ছোট শিল্পের মালিকের পক্ষে সম্ভব নয়। বিক্রয়-ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, একসঙ্গে অধিক দ্রব্য বিক্রয় করিলে বিক্রয়-ব্যয় কম হয় এবং একসঙ্গে সমগ্র মুনাফা পাওয়া যায়।

৩। দক্ষতার সুবিধা—বড় বড় শিল্পের মালিকগণ অধিক অর্থব্যয় করিয়া সুদক্ষ শ্রমিক ও কারিগর নিযুক্ত করিতে পারে। দক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত হইলে উৎপাদন-পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

৪। যন্ত্র ব্যবহারের সুবিধা—বড় কারখানার মালিক যাহার প্রচুর মূলধন আছে, একমাত্র তিনিই আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করিতে পারেন।

৫। উপজাত দ্রব্যের সদ্ব্যবহার—বৃহৎ শিল্পের মালিক উপজাত দ্রব্য (By-product) নষ্ট হইতে দেয় না। ইহা হইতে নূতন নূতন দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বাজারে বিক্রয় করে। ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব নহে, কারণ ইহার কাঁচামালের পরিমাণ কম, সুতরাং অল্পপরিমাণ উপজাত দ্রব্যের দ্বারা অন্য কিছু প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। বড় বড় কাঠের কারখানায় করাতের গুঁড়া প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং এই গুঁড়া জ্বালাইয়া তাহারা উত্তাপ সৃষ্টি করে, কিন্তু ছোট কারখানায় অল্প পরিমাণ গুঁড়া সাধারণতঃ নষ্টই হয়।

৬। বড় বড় কারখানার মালিকগণ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহিত পরীক্ষা ও গবেষণাগার যুক্ত রাখেন। এই সমস্ত গবেষণাগারে নূতন নূতন উৎপাদন-পদ্ধতি আবিষ্কারের পরীক্ষাকার্য চলে। নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে পারিলে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়। ক্ষুদ্র শিল্পের মূলধন কম বলিয়া এই পরীক্ষা ও গবেষণা-কার্য সম্ভব নহে।

৭। বর্তমান যুগে বিক্রয়-পরিমাণ বিজ্ঞাপন ও প্রচার-কার্যের উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রেও বড় বড় কারখানার মালিকগণের সুবিধা বেশী। প্রচার কার্যে অধিক পরিমাণ ব্যয় করিয়া তাঁহারা অধিক পরিমাণ পণ্য-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

৮। ইহা ছাড়া, বৃহদায়তন শিল্পের আর একটি সুবিধা হইল যে, যন্ত্রের সাহায্যে

উৎপাদন-বৃদ্ধির ফলে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন সম্ভব হয় অর্থাৎ অধিক পরিমাণ উৎপাদন হইলে দ্রব্য-প্রতি উৎপাদন-ব্যয়ও হ্রাস পায়; ইহার ফলে মূল্য হ্রাস পাইয়া বিক্রয়-পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে, উৎপাদকের বেশী লাভ হয়। বাহ্যিক সুবিধাগুলি সাধারণতঃ শিল্পটির প্রসারের উপর নির্ভর করে। শিল্পসংখ্যা বাড়িয়া যদি একস্থানে কেন্দ্রীভূত হয়, তাহা হইলে দক্ষ শ্রমিক, কাঁচামাল, মূলধন প্রভৃতি পাইতে অসুবিধা হয় না। ইহার ফলেও নানাপ্রকার ব্যয়সংকোচ হয়।

অসুবিধা—Disadvantages

বড় বড় শিল্পের যে সবই সুবিধা তাহা নহে। ইহাদের কিছু কিছু অসুবিধাও আছে। অসুবিধাগুলি হইল :—

১। বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বহুসংখ্যক শ্রমিক একসঙ্গে কাজ করে। ইহার ফলে মালিক ও শ্রমিকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিনষ্ট হইয়াছে। এইজন্য প্রায়ই শ্রমিক-মালিক বিরোধ ঘটে এবং উৎপাদন-কার্য বাধাপ্রাপ্ত হয়।

২। বড় বড় শিল্পে বহু শ্রমিক একস্থানে কাজ করে। শ্রমিকদের বাসস্থান শৃঙ্খলাহীনভাবে গড়িয়া উঠে বলিয়া প্রায়ই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রসারের সীমা—Limits to Large-scale production

অনেকের ধারণা শিল্পপ্রতিষ্ঠান বড় হইলেই একসঙ্গে বহুদ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় ও সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন-ব্যয়ও কমে। কিন্তু বড় বহরে উৎপাদন সবসময়ে সম্ভব হয় না। এই কারণে বৃহৎ শিল্পের সহিত ক্ষুদ্র শিল্পও পাশাপাশি দেখা যায়। নানাকারণে সবসময়ে বৃহৎ বহরে উৎপাদন সম্ভব হয় না।

প্রথমতঃ, যে সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা কম এবং সেইজন্য বিক্রয়-বাজার সঙ্কীর্ণ, সে সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদন বড় বহরে করিলে উৎপাদকের লোকসান হয়। যেখানে জিনিসের চাহিদা নাই, সেখানে চাহিদার অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন করিয়া লাভ নাই। সুতরাং শিল্পের আয়তন চাহিদার ব্যাপকতা ও বাজারের বিস্তৃতির উপর নির্ভর করে।

দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত দ্রব্যের সংবৎসরব্যাপী চাহিদা হয় না, শুধু বৎসরের এক নির্দিষ্ট সময়ে চাহিদা হয়, যে সমস্ত ক্ষেত্রেও বৃহদায়তন উৎপাদন করিয়া লাভ নাই।

আমাদের অঞ্চলে শীতকালেই গরম জামাকাপড়ের চাহিদা হয়, অন্য ঋতুতে প্রয়োজন হয় না। সুতরাং ঋতুগত চাহিদার ক্ষেত্রেও শিল্পের আয়তন ক্ষুদ্র হয়।

তৃতীয়তঃ, উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে শিল্পের আয়তন বৃদ্ধি পাইয়া কিছুদিন পর্যন্ত উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়, কিন্তু শিল্প ক্রমাগত বাড়িয়া চলিলে এক সময়ে এই উৎপাদন-ব্যয় না কমিয়া বৃদ্ধি পাইবে। ব্যবস্থাপকের পরিচালনা-শক্তিরও একটা সীমা আছে। শিল্পপ্রতিষ্ঠান যদি এতবড় হয় যে, ব্যবস্থাপকের পক্ষে সবদিকে লক্ষ্য রাখা সম্ভব হয় না, তাহা হইলে শিল্প-পরিচালনায় দক্ষতার অভাব দেখা দিবে। ফলে, ব্যয় হ্রাসের পরিবর্তে ব্যয় বৃদ্ধি হইবে, কারণ একা পরিচালকের পক্ষে শিল্পের বিভিন্ন বিভাগের উপরই সমান দৃষ্টি রাখা সম্ভব নয়।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সুবিধা—Advantages of Small-scale production

বৃহদায়তন শিল্পের সুবিধাগুলি আলোচনা করিলে এই কথাই মনে হয় যে, বড় বড় শিল্পগুলির সহিত ছোট ছোট শিল্পগুলি প্রতিযোগিতা করিয়া টিকিয়া থাকিতে পারে না—কারণ বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সুবিধার সাহায্যে অনেক পরিমাণে ব্যয়সংকোচ করিতে পারে, যাহা ছোট শিল্পগুলির পক্ষে সম্ভব নহে। কাজেই ছোট শিল্পগুলি প্রতিযোগিতার অসামর্থ্যের জন্য ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নির্ভুল নহে। বাজারে এখনও পর্যন্ত বহু ছোট-খাট শিল্পপ্রতিষ্ঠান টিকিয়া আছে, তাহাদের ক্রয়-বিক্রয় অল্প হইলেও তাহারা একেবারে মরিয়া যায় নাই। দেশে বড় বড় কাপড়ের কল স্থাপিত হইলেও তাঁতি এখনও পর্যন্ত তাঁতের সাহায্যে কাপড় বুনিতেছে। ইহার কারণ হইল যে, ছোট ছোট শিল্পগুলির কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে, যে সুবিধাগুলি বড় শিল্পগুলির নাই।

ছোট ছোট শিল্পগুলির বিশেষ সুবিধা হইল :—

১। ছোট ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি ক্রেতার রুচিমত সৌখিন ও নানাজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন করিয়া ক্রেতাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে। বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি যন্ত্রের সাহায্যে শুধু একধরণের দ্রব্য (Standardized goods) প্রস্তুত করিতে পারে বলিয়া ক্রেতাগণের বিভিন্ন রুচির পরিচর্যা করিতে পারে না। দর্জির কাজ, চুল ছাঁটাইয়ের কাজ প্রভৃতি এই জন্যই ছোট বহরে হয়।

২। যে সমস্ত ক্ষেত্রে ক্রেতার রুচি সচরাচর পরিবর্তিত হয় বা লোকের

অভ্যাস ও রীতি পরিবর্তিত হয়, সেখানেও ছোট ছোট শিল্পজাতদ্রব্যের চাহিদা অধিক হয়। অলঙ্কার-নির্মাণের ক্ষেত্রে ইহা দেখা যায়। স্বর্ণকার ফ্যাসান-পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ক্রেতার সন্তুষ্টিবিধান করিতে পারে বলিয়া এখনও টিকিয়া আছে।

৩। ছোট ছোট কারখানায় যেখানে অল্পসংখ্যক শ্রমিক কাজ করে, সেখানে মালিকের পক্ষে সর্বদিকে লক্ষ্য রাখা সম্ভব হয়। মালিক নিজে সবদিকে দেখা-শুনা করে বলিয়া উৎপাদনের অপচয় কম হয়। ইহা ছাড়াও, ক্ষুদ্র শিল্পে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক ব্যক্তিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে। ইহার ফলে ছোট শিল্পে শ্রমিক-মালিক বিরোধ ঘটে না বলিয়া উৎপাদনকার্য সুষ্ঠু হয়।

৪। এমন অনেক কাজ আছে যাহাতে শিল্পীর ব্যক্তিগত দক্ষতা ও ক্রেতার সহিত ব্যক্তিগত সংস্পর্শের প্রয়োজন হয়। ভাল পোষাক তৈয়ারীর ক্ষেত্রে দর্জির দক্ষতা ও ক্রেতার রুচি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

৫। উপরি-উক্ত সুবিধাগুলি ব্যতীতও আধুনিক কালে ক্ষুদ্র শিল্পগুলির বৃহৎ শিল্পগুলির তুলনায় পূর্বে যে পরিমাণ অসুবিধা ছিল তাহাও অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে। ছোট ছোট শিল্পগুলি এখন অনেক অধুনা-আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া অল্প সময়ে বেশী কাজ করিতে পারে। ছুরি-কাঁচি শান দেওয়া ও চুল ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে শিল্পী ছোট ছোট যন্ত্র ব্যবহার করিয়া অনেক মিতব্যয়িতা করিতে পারে। সুতরাং ক্ষুদ্র শিল্পগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন হইলেও একেবারে বিলুপ্ত হইতে পারে না।

ভৌগোলিক শ্রম-বিভাগ বা শিল্পের স্থানীয়করণ—Localisation of Industries

যখন একই দ্রব্য অথবা একই জাতীয় দ্রব্য উৎপাদন অথবা বিক্রয় করে এইরূপ কতকগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থাপিত হয়, তখন শিল্প-গুলির এই একত্র সমাবেশকে শিল্পের স্থানীয়করণ বলা চলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, পাটকলগুলি কলিকাতার সন্নিকটবর্তী অঞ্চলে হুগলী নদীর তীরে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। শিল্পের এই স্থানীয়করণ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতা সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। কলেজ

ষ্ট্রীটে পুস্তক-প্রকাশকের ভীড়, রাধাবাজারে ঘড়ির দোকান প্রভৃতি ক্ষুদ্র অঞ্চলের মধ্যে শিল্পের এই স্থানীয়করণ-প্রবণতার পরিচয় দেয়। আবার সমগ্র দেশের দিক দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, বোম্বাই ও আমেদাবাদ অঞ্চলে বস্ত্রশিল্প কেন্দ্রীভূত ; পাটকলগুলি বাংলা অঞ্চলেই স্থাপিত হইয়াছে।

শিল্প স্থানীয়করণের কারণ—Causes of Localisation of Industries

নানাকারণে এক একটি শিল্প একই অঞ্চলে স্থাপিত হয়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কারণগুলি হইল প্রধান—

১। নৈসর্গিক কারণ—Natural or Physical Causes.

(ক) যে অঞ্চলে শিল্প-স্থাপনার অনুকূল আবহাওয়া পাওয়া যায়, সেই অঞ্চলে এক একটি বিশেষ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়।

(খ) যে অঞ্চলে কাঁচামাল, খনিজ পদার্থ, বনজাত দ্রব্য বা কৃষিজাত দ্রব্য সহজে পাওয়া যায়।

(গ) যেখানে কয়লা প্রভৃতি জ্বালানী দ্রব্য এবং সস্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যায়।

২। অর্থনৈতিক কারণ—Economic Causes

বর্তমান যুগে অন্য কারণ অপেক্ষা অর্থনৈতিক কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিল্পগুলির একত্র সমাবেশ হয়। অর্থনৈতিক কারণগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়ঃ

(ক) যেখানে যথেষ্ট পরিমাণে শ্রমিক পাওয়া যায়,

(খ) যেখানে যথেষ্ট পরিমাণ মূলধন পাওয়া যায়,

(গ) যেখানে যোগাযোগ-ব্যবস্থার সুবিধার জন্য কাঁচামাল ক্রয় করিবার সুবিধা ও উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়ের সুবিধা আছে।

উপরি-উক্ত কারণে পাটকলগুলি কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে স্থাপিত হইয়াছে।

৩। রাজনৈতিক কারণ—Political Causes.

পূর্বে অনেক সময় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি রাজা-বাদশাহদের আনুকূল্যে স্থাপিত হইত। বর্তমান যুগেও বহু জাতীয় সরকার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

৪। প্রথম স্থাপনের অনুপ্রেরণা—**Momentum of earlier start.**

যখন কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থাপিত হইয়া বিখ্যাত হয় অর্থাৎ সুনাম অর্জন করে, তখন পূর্ববর্তী শিল্পের সুনামের অংশ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে ঐ জাতীয় আরও অনেক শিল্প উক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিল্প স্থানীয়করণের সুবিধা—Advantages of Localisation of Industries

১। কোন একটি স্থানে শিল্পের সমাবেশ হইলে তত্রত্য শিল্পগুলি সহজেই সুনাম অর্জন করিয়া জনপ্রিয় হয়।

২। শিল্প স্থানীয়করণের ফলে সেই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকগণের সন্তানসন্ততিগণ সহজেই উক্ত শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের রহস্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করে। এইরূপে বংশপরম্পরাক্রমে শিল্পনৈপুণ্য বৃদ্ধি পায়।

৩। একত্র সমাবেশ দ্বারা শিল্পগুলি অনেক সুবিধা পায়। সহযোগতামূলক-ভাবে তাহারা উৎপাদনের উপাদানগুলি ক্রয় করিতে পারে এবং উৎপন্ন দ্রব্যগুলি সহযোগিতামূলক ভাবে বিক্রয় করিয়া অধিকতর লাভবান হয়।

৪। যখন কোন অঞ্চলে শিল্প-সমাবেশ হয় তখন ঐ শিল্পের কাঁচামাল যোগান দিবার উদ্দেশ্যে বা উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য অনুপূরক অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান (Supplementary Industries) কাছাকাছি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫। একই অঞ্চলে নানা জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলে বহু কর্মসংস্থান হয়। ফলে বেকার সমস্যার সমাধান হয়।

৬। শিল্প সমাবেশের আরও একটি সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায়। শিল্পগুলি একই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাদের মূলধন ও শ্রমিকের সন্ধান করিতে হয় না। যেখানে শিল্প সমাবেশ হয়, মূলধন ও শ্রমিক বিনিয়োগ-উদ্দেশ্যে সেই অঞ্চলের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

শিল্প স্থানীয়করণের অসুবিধা—Disadvantages of Localisation of Industries

শিল্প স্থানীয়করণের অনেক সুবিধা থাকিলেও ইহার কয়েকটি গুরুতর অসুবিধা আছে।

১। অত্যধিক স্থানীয়করণের ফলে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হইতে পারে।

২। শিল্প স্থানীয়করণের আর একটি ত্রুটি হইল যে, ইহার ফলে বেকার সমস্যা উৎকটরূপে দেখা দিতে পারে। যদি কোন কারণে প্রতিষ্ঠিত কোন শিল্পে মন্দা উপস্থিত হয় তাহা হইলে উৎপাদন হ্রাস পায় এবং ইহার ফলে বেকার সমস্যার সম্ভাবনা থাকে। এইজন্য প্রধান শিল্পের অনুপূরক শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা যায়।

৩। শিল্পের অত্যধিক স্থানীয়করণের ফলে এক অঞ্চলে এক শ্রেণীর শ্রমিকের চাহিদার সৃষ্টি হয়। যেখানে লোহ ও ইস্পাত শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে শুধু পুরুষ শ্রমিক কাজ করিতে পারে। স্ত্রীলোক ও অল্পবয়স্ক পুরুষের অন্য স্থানে যাইতে হয়।

৪। অতিরিক্ত স্থানীয়করণের ফলে একই অঞ্চলে অধিক লোকের সমাবেশ হয়। ইহার ফলে বাসগৃহের অভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে।

৫। শিল্প স্থানীয়করণের তাৎপর্য হইল যে, দেশের একটি অঞ্চল একটি বা কয়েকটি নির্দিষ্ট দ্রব্য উৎপাদনে রত থাকে। ইহার ফলে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য সেই অঞ্চলকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার গোলযোগ ঘটিলে বা যুদ্ধকালে এই পরনির্ভরশীলতার জন্য সেই অঞ্চলকে অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়।

৬। শিল্প একই অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইলে বর্তমান যুগে ইহা শত্রুপক্ষের প্রধান আক্রমণস্থলরূপে পরিগণিত হয়।

শিল্প স্থানীয়করণের যে সকল অসুবিধার কথা উপরে আলোচিত হইল তাহা দূর করিবার একমাত্র উপায় হইল শিল্পগুলিকে একই অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত না করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপন করা।

ভারতের শিল্প-সংগঠন—Industrial Organisation in India

আমাদের দেশ শিল্পক্ষেত্রে কত অনুন্নত তাহা আমাদের জাতীয় আয় বিশ্লেষণ করিলে জানিতে পারা যায়। জাতীয় আয়ের শতকরা মাত্র ১৬'১ পরিমাণ খনিজ, শিল্পজাত এবং হস্তশিল্প হইতে উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে বৃহৎ শিল্প হইতে জাতীয় আয়ের শতকরা মাত্র ৬ ভাগ পাওয়া যায় এবং বৃহৎ শিল্পে দেশের শতকরা মাত্র ২ জন নিযুক্ত আছে। ভারতে বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য

হইলেও বর্তমানে আমাদের জাতীয় সরকার নানাভাবে শিল্প-সম্প্রসারণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন।

ভারতের শিল্প-সংগঠনগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে বস্ত্র, চিনি, কাগজ প্রভৃতি ভোগ্যবস্তু-উৎপাদনের শিল্পগুলি উল্লেখ করা যায়। এই শিল্পজাত দ্রব্যগুলি প্রত্যক্ষভাবে মানুষের ভোগব্যবহারের কাজে লাগে এবং এইজন্য শিল্পগুলিকে ভোগ্যবস্তু উৎপাদন-শিল্প (Consumer's Goods Industries) বলা হয়। বিদ্যুৎ-শক্তি, সিমেন্ট, লৌহ ও ইস্পাত, যন্ত্রনির্মাণ প্রভৃতি শিল্পগুলিকে মূল বা গুরু (Basic or Heavy Industries) বলা হয়, কারণ এই শিল্পজাত দ্রব্য সরাসরি ভোগব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হয় না। এই শিল্পজাত দ্রব্যগুলি ভোগ্যবস্তু-উৎপাদনের সহায়ক উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই গুরু বা মূল শিল্পগুলির উন্নতি না হইলে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়। ভারতে এই মূল শিল্পগুলির নিতান্ত অভাব দেখা যায় এবং এইগুলির অভাবের জন্যই ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি দ্রুত হইতে পারে নাই।

ভারতে বর্তমানে যে সমস্ত শিল্প গঠিত হইয়াছে তাহাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

বস্ত্র-শিল্প—কাপড়ের কলই হইল ভারতের সর্বপ্রধান শিল্প। এই শিল্পে নিযুক্ত মোট মূলধনের পরিমাণ ১০৫ কোটি টাকারও অধিক এবং শ্রমিকসংখ্যা হইল ৮ লক্ষ। ১৮১৮ সালে ভারতে কলিকাতার নিকট প্রথম বস্ত্র শিল্পের সূচনা হইলেও প্রকৃতপক্ষে বলা যায় যে, ১৮৫৩ সালে বোম্বাইয়ে প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হয় এবং এখনও পর্যন্ত বোম্বাই ও আমেদাবাদ অঞ্চলেই বেশীর ভাগ কাপড়ের কল অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ ও উত্তরপ্রদেশেও কাপড়ের কল আছে। ১৯২৭ সাল হইতে ভারতের বস্ত্র-শিল্প সংরক্ষণ নীতির সাহায্যে বাড়িতে থাকে এবং বর্তমানে বস্ত্র-শিল্পের এত উন্নতি হইয়াছে যে, দেশের সমগ্র প্রয়োজনের প্রায় ৭০ ভাগই এদেশের কাপড়ের কলে প্রস্তুত হয়। ১৯৪৭ সাল হইতে বস্ত্র-শিল্পকে সংরক্ষণ-মুক্ত করা হইয়াছে। বস্ত্র-শিল্প যৌথমূলধনী কারবারের ভিত্তিতে গঠিত এবং এদেশের বস্ত্র-শিল্পে নিযুক্ত মূলধন ও পরিচালনা-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনানুসারে ভারতে বস্ত্র-শিল্পের উৎপাদন-পরিমাণ বর্তমান উৎপাদন-পরিমাণ ৫৫০ কোটি গজ হইতে ৫৮০ কোটি গজ করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে।

লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প—দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই শিল্পটির গুরুত্ব

খুব বেশী, কারণ ইহা একটি মূলশিল্প। ভারতে এই শিল্পপ্রতিষ্ঠার ইতিহাসের সহিত স্যর্ জেমসেদ্‌জি টাটার নাম অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এই শিল্প-প্রতিষ্ঠানটি বিহারে অবস্থিত এবং সমগ্র এশিয়া ও বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান। টাটা ব্যতীতও পশ্চিমবাংলার বার্ণপুরে ও মহীশূরে আরও দুইটি লৌহ ও ইস্পাতের শিল্পপ্রতিষ্ঠান আছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ খুব কম। দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ১৯৬০-৬১ সালে ৬০ লক্ষ টন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে সরকারী চেষ্টায় বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করিয়া আরও তিনটি লৌহ ও ইস্পাত শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠিত হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে ৯৩ লক্ষ টন ইস্পাত পিণ্ড তৈয়ারী হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পাট-শিল্প—১৮৫৫ সালে বাংলাদেশে প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়। পাটকল-গুলি কলিকাতার সন্নিকটে হুগলী নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। পাটজাত দ্রব্য প্রধানতঃ বিদেশে রপ্তানী করা হয় এবং ভারতের অর্জিত ডলারের বেশীর ভাগ পাটজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া পাওয়া যায়। পাট-শিল্পগুলির অধিকাংশের মালিক হইল স্কটল্যাণ্ডবাসী। বর্তমানে ভারতীয়গণও কিছু কিছু কল স্থাপন করিয়াছেন। বঙ্গবিভাগের পর কাঁচামালের অভাবে এই শিল্পটির দুর্দিন আসিয়াছিল। বর্তমানে ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে পাট-উৎপাদনের ব্যবস্থা হওয়াতে এই শিল্পটির কাঁচামালের জন্য আর পূর্ব-পাকিস্তানের উপর তেমন নির্ভর করিতে হয় না।

শর্করা (চিনি)-শিল্প—দেশীয় পদ্ধতিতে বহুকাল পূর্ব হইতেই ভারতে চিনি প্রস্তুত হইত এবং এ বিষয়ে কাশীর চিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বর্তমানে সাদা চিনি প্রস্তুত করিবার জন্য ভারতে বহু চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে এবং অধিকাংশ চিনির কল বিহার ও উত্তরপ্রদেশে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণতঃ ইক্ষু হইতেই চিনি প্রস্তুত হয়। ভারতের কলগুলি হইতে যে পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হয়, তাহাতে দেশের চাহিদা মিটিয়া যায়। চিনি-শিল্পও ১৯৩২ সাল হইতে সংরক্ষিত হয়।

কাগজ-শিল্প—হুগলী জেলায় ১৮৭০ সালে প্রথম কাগজের কল স্থাপিত হয়। বর্তমানে ভারতে প্রায় ১০.১২টি কাগজের কল আছে, কিন্তু ইহাদের অধিকাংশই বিদেশী পরিচালনাধীন। এই শিল্পটিও একটি সংরক্ষিত শিল্প।

চা-শিল্প—রপ্তানী বাণিজ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ভারতে চা-শিল্প

একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। চীনদেশে ভারত অপেক্ষা অধিক পরিমাণ চা উৎপন্ন হইলেও ভারতই সবচেয়ে বেশী পরিমাণ চা বিদেশে রপ্তানী করে। ভারতে উৎপন্ন চায়ের প্রায় ৮০ ভাগ পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে জন্মে। তবে চা-বাগানের অধিকাংশের মালিক হইল য়ুরোপীয়।

সিমেণ্ট-শিল্প—১৯০১ সালে মাদ্রাজে সর্বপ্রথম সিমেণ্টের কারখানা স্থাপিত হয়। বর্তমানে সিমেণ্টের উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও দেশের চাহিদার তুলনায় উৎপাদন-পরিমাণ যথেষ্ট নহে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনানুসারে ভারতে ১৯৬৫-৬৬ সালে আরও ১ কোটি ৩০ লক্ষ টন সিমেণ্ট উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

দেশলাই-শিল্প—প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতেই ভারতে এই শিল্পটি প্রসার লাভ করে। সংরক্ষিত শিল্পগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। দেশলাই-উৎপাদনে ভারত এখন সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল।

যন্ত্রপাতি নির্মাণ-শিল্প—বাই-সাইকেল, সেলাইয়ের কল, ডিজেল ইঞ্জিন, প্রভৃতি লঘুযন্ত্র-নির্মাণের ক্ষেত্রে কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভারতে অভাবনীয় উন্নতি ঘটিয়াছে। দেশে বর্তমানে রেডিও সেট, ইলেকট্রিক বাল্‌ব ও পাখা প্রভৃতির উৎপাদন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। গুরুযন্ত্রের নির্মাণ-ক্ষেত্রে উন্নতি অবশ্য আশানুযায়ী হয় নাই।

গুরু রাসায়নিক-শিল্প—নানাজাতীয় এ্যাসিড, কস্টিক সোডা প্রভৃতি গুরু রাসায়নিক শিল্পগুলি মূলশিল্প নামে অভিহিত হয়। কারণ, এই শিল্পজাত দ্রব্যগুলি সাবান, বস্ত্র, কাচ প্রভৃতি শিল্পের প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভারতে এ জাতীয় শিল্প ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে এবং দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় এই জাতীয় শিল্পের প্রসারের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

সরকার পরিচালিত-শিল্প—উপরে যে শিল্পগুলির বিবরণ দেওয়া হইল, সেগুলি দেশী ও বিদেশী ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন শিল্প। এই শিল্পগুলি ব্যতীতও বর্তমানে ভারত সরকার পরিকল্পনানুযায়ী অনেকগুলি শিল্পগঠনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইতিমধ্যে এই শিল্পগুলির গঠনকার্য ও অনেকক্ষেত্রে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনও আরম্ভ হইয়াছে। সরকার-পরিচালিত শিল্পগুলির মধ্যে **সিন্ধ্রি রাসায়নিক সার কারখানা, চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন কারখানা,** বাঙ্গালোরের

মেশিনটুল কারখানা, পুনায় পেনিসিলিন কারখানা, ভিজিগাপট্টমের হিন্দুস্থান জাহাজনির্মাণ কারখানা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিন্ধ্রির সার কারখানা এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম। এই কারখানা নির্মাণ করিতে ২৩ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং প্রতিদিন এই কারখানা হইতে প্রায় এক হাজার টন রাসায়নিক সার প্রস্তুত হয়। ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে চিত্তরঞ্জনে ইঞ্জিন তৈয়ারীর কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই কারখানার কাজ আশাতীতভাবে সাফল্যলাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনানুযায়ী ভারত সরকার গুরু বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পের আরও কয়েকটি কারখানা স্থাপনের সংকল্প করিয়াছেন।

ভারতের কুটিরশিল্প—Cottage Industries in India

একসময়ে ভারত যে কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনে জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভ হইতে ভারতে কুটিরশিল্পের অবনতি আরম্ভ হয়। এই অবনতি সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে কুটিরশিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এখনও ভারতের শতকরা ১১.২ জন লোক কুটিরশিল্পে নিযুক্ত এবং জাতীয় আয়ের শতকরা ৯.৬ ভাগ এই ছোট ছোট শিল্পগুলি হইতে পাওয়া যায়।

কুটিরশিল্পের সুবিধা হইল যে, পারিবারিক পরিবেশে এই শিল্পগুলির কাজ পরিচালিত হয় বলিয়া এখানে সহরের দূষিত আবহাওয়া নাই এবং শ্রমিকগণ তাহাদের অভিভাবকগণের তত্ত্বাবধানে কাজ করে বলিয়া কোনপ্রকার বদ-অভ্যাসের দাস হয় না। ইহা ছাড়া, যে সময়টা আলস্যে অতিবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা, সেই সময়টা এই কাজে ব্যয় করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার হয়। পরিশেষে বলা যায় যে, ইহা কৃষক ও অন্যান্য শ্রমিকের আয় বৃদ্ধি করিবার একটি অতিরিক্ত উপায় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

কুটিরশিল্পের ত্রুটির কারণ—Defects of Cottage Industries

ভারতে কুটিরশিল্পগুলির বর্তমানে নানা সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। কুটিরশিল্পে যে সমস্ত কারিগর ও শ্রমিক নিযুক্ত আছে তাহারা গতানুগতিক পদ্ধতিতে তাহাদের উৎপাদন পরিচালনা করে। সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার অভাবে তাহারা আধুনিক রুচিসম্মত সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া ক্রেতার সন্তুষ্টি বিধান করিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, কুটিরশিল্পীও কৃষকের ন্যায় অতি দরিদ্র। মূলধনের অভাবে তাহারা আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ক্রয় করিয়া উৎকৃষ্টতর দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে পারে না। মহাজনদের নিকট হইতে তাহারা চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করে এবং মহাজনদিগের নিকটই স্বল্পদরে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়।

তৃতীয়তঃ, যান্ত্রিক শিক্ষার অভাবে তাহারা আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে পারে না। তাহাদের রক্ষণশীল মনোবৃত্তিও তাহাদের নূতন নূতন পদ্ধতি গ্রহণের অন্তরায় হয়।

চতুর্থতঃ, কুটির শিল্পজাত উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের কোন সুসংবদ্ধ বাজার-ব্যবস্থা নাই। এই কারণে তাহারা বিচ্ছিন্নভাবে ফড়িয়া ও দালালের সাহায্যে দ্রব্য বিক্রয় করে। ফলে, লাভের বেশীর ভাগ এই দালালগণ পায় ও কুটিরশিল্পীর অবস্থার কোন উন্নতি হয় না।

পঞ্চমতঃ, আমাদের দেশের কুটিরশিল্পে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয় না, শুধু তাহাই নহে, এখানে বাষ্প বা বিদ্যুৎ-শক্তিও ব্যবহৃত হয় না। এই কারণে কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় বেশী হয় এবং এই শিল্পগুলি বৃহদায়তন শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না বলিয়া হঠিয়া যায়।

কুটিরশিল্পের উন্নতির উপায়—Measures for the improvement of Cottage Industries

কুটিরশিল্পগুলিকে পুনর্জীবিত করিতে পারিলে বহুলোকের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। এই শিল্পগুলি প্রসার লাভ করিলে গ্রামীণ বেকার সমস্যারও কিছু সমাধান হইতে পারে। সুতরাং এজন্য জনসাধারণ ও দেশের সরকারের তৎপর হওয়া উচিত।

প্রথমতঃ, এই উদ্দেশ্যে দেশে ব্যাপক শিক্ষা ও কারিগরি জ্ঞান বিস্তার করিতে হইবে। কুটিরশিল্পিগণ যদি লোকের পরিবর্তিত রুচি অনুযায়ী সামগ্রী প্রস্তুত করিতে পারে তাহা হইলে কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া শিল্পীর আয় বৃদ্ধি পাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রচারকার্য প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে, জেলায় জেলায় শিল্পজাত দ্রব্যের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা দরকার। ইহা ছাড়া, কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের মেলা, প্রদর্শনী

প্রভৃতি দ্বারাও জনসাধারণকে শিল্পজাত দ্রব্যের সহিত পরিচিত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিদেশেও এইরূপ প্রদর্শনী খুলিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, কুটিরশিল্পে নিযুক্ত কর্মিগণ যাহাতে অল্পসুদে ঋণ পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বিশেষ সমবায় ঋণদান সমিতি গঠন করা প্রয়োজন।

চতুর্থতঃ, কুটিরশিল্পিগণ যাহাতে অল্পমূল্যে কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে পারে ও দালালের সাহায্য ব্যতীত ন্যায্য মূল্যে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া সমগ্র পরিমাণ লাভ পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন। এজন্য সমবায় ক্রয় ও বিক্রয় সমিতি স্থাপন করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

পরিশেষে কুটিরশিল্পিগণ যাহাতে স্বল্পমূল্যে বিদ্যুৎ-শক্তি পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারিলে একদিকে যেমন তাহাদের শ্রমের লাঘব হইবে, অপরদিকে সেইরূপ উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইয়া তাহাদের বড় শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার ক্ষমতা বাড়িবে।

ভারতের কয়েকটি প্রধান কুটিরশিল্প—Some Important Cottage Industries of India

তাঁত-শিল্প—ভারতের সর্বপ্রধান কুটিরশিল্প হইল হস্তচালিত তাঁত। এই শিল্প বর্তমানে প্রায় ১৫০ কোটি গজ বস্ত্র বয়ন করে এবং ৬০ লক্ষ লোক এই তাঁত-শিল্পের সাহায্যে জীবিকা অর্জন করে। ভারতের প্রায় সর্বত্রই এই শিল্প দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের শান্তিপুরের ধুতি ও ধনেখালির শাড়ি বিখ্যাত। আসামে তাঁত-শিল্পের প্রচলন আছে। তাঁতের কাপড়ের বৈশিষ্ট্যের জন্য এখনও পর্যন্ত এই শিল্পটি মিলের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া টিকিয়া আছে এবং আশা করা যায় যে, উপযুক্ত সরকারী সাহায্য পাইলে এই শিল্পটি আরও উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। তৃতীয় পরিকল্পনানুসারে তাঁত শিল্প হইতে ৩৫০ কোটি গজ কাপড় তৈয়ারী হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

রেশম-বয়ন—তাঁত ব্যতীত গুটিপোকা হইতে রেশম-উৎপাদন ও কাপড় তৈয়ারী করা আর একটি শিল্প। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমে, আসাম, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি রাজ্যে এই শিল্পের প্রচলন দেখা যায়।

কাঁসা-পিত্তল শিল্প—ভারতে ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে কাঁসা-পিতলের

ব্যবহার খুব বেশী। বর্তমানে অবশ্য য়্যালুমিনিয়ম-নির্মিত বাসনপত্রের ব্যাপক ব্যবহার হয় বলিয়া এই শিল্পের প্রসার বাধা পাইয়াছে। পশ্চিমবাংলার মুর্শিদাবাদ জেলার খাগড়া এজন্য বিখ্যাত।

মৃৎ-শিল্প—ভারতের মৃৎ-শিল্প খুব প্রাচীন এবং দেশের সর্বত্র ইহার প্রচলন দেখা যায়। দরিদ্র শ্রেণীর লোক সাধারণতঃ মাটির বাসনপত্র ব্যবহার করে। ইহা ছাড়া, নানাজাতীয় মাটির খেলনা ও দেবদেবীর মূর্তি তৈয়ারী করিয়াও বহুলোক জীবিকা অর্জন করে। কৃষ্ণনগরের মৃৎ-শিল্প ভারতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছে।

ইহা ছাড়া, আরও বহুরকমের কুটিরশিল্প এদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। কর্মকার, সূত্রধর প্রভৃতিও কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বাঁশের ও বেতের কাজ, বিড়ি-উৎপাদন, মক্ষিকা-পালন, সরিষা প্রভৃতি তৈলবীজ হইতে তৈল উৎপাদন, কাচদ্রব্য নির্মাণ, মিষ্টান্ন তৈয়ারী প্রভৃতি নানা কাজে বহু সহস্র লোক নিযুক্ত আছে। সুতরাং এই শিল্পগুলির উন্নতি করিতে পারিলে যে কত লোক উপকৃত হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

ভারতে শিল্পে অনগ্রসরতার কারণ—Causes of Industrial drawbacks in India

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য শিল্পোন্নয়ন অপরিহার্য। যে দেশে শিল্পের উন্নতি হয় নাই, সে দেশের জাতীয় আয়-পরিমাণ কম, ফলে মাথাপিছু আয়ও কম হয়। শিল্পোন্নতির জন্য উৎপাদনের সহায়ক সামগ্রীগুলি প্রচুর পরিমাণে দেশে থাকা চাই। এই সামগ্রী হইল—প্রাকৃতিক সম্পদ, দক্ষ শ্রমিক, প্রচুর মূলধন ও ব্যবস্থাপনা-নৈপুণ্য। এখন দেখা যাউক আমাদের দেশে উপরি-উক্ত শিল্পোন্নয়নের সহায়ক উপাদানগুলি কি পরিমাণে আছে এবং এই উপাদানগুলির সাহায্যে আমাদের দেশে শিল্পোন্নয়ন কতখানি সম্ভব।

প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বলা যায় যে, মোটামুটিভাবে ভারতে শিল্পোন্নয়নের সহায়ক নানা উপাদান আছে। নানাজাতীয় শস্য ও কাঁচামাল উৎপন্ন করিবার উপযুক্ত জমি ভারতে বর্তমান। নানাজাতীয় আবশ্যকীয় খনিজ সম্পদেও ভারত সমৃদ্ধ। শিল্পের উন্নতির জন্য কয়লা প্রয়োজন। ভারতে কয়লার খনির প্রাচুর্য থাকিলেও এই খনিগুলি দেশের একটিমাত্র অঞ্চলেই

(পশ্চিমবাংলা ও বিহার) কেন্দ্রীভূত। এই কারণে অন্য অঞ্চলে কয়লার পরিবহন খরচা অত্যধিক পড়ে। ভারতে পেট্রোলিয়মেরও একান্ত অভাব। এজন্য বিদেশী আমদানীর উপর নির্ভর করিতে হয়। এ দেশের শক্তিসম্পদও শিল্পোন্নয়নের পক্ষে যথেষ্ট নহে। জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুতের উৎসগুলির এখনও পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হয় নাই। সুতরাং প্রাকৃতিক সম্পদ বর্তমান থাকিলেও তাহার যথাযথ ব্যবহার হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতে সুদক্ষ শ্রমিকের একান্ত অভাব। আধুনিক যন্ত্রপাতির সহিত পরিচিত কারিগরি শিক্ষায় নিপুণ শ্রমিক দেশে নাই বলিলেও চলে। দক্ষ শ্রমিকের সাহায্য ব্যতীত শিল্পের উন্নতি সম্ভব নহে।

তৃতীয়তঃ, মূলধনের অভাবই হইল ভারতের শিল্পোন্নতির প্রধান অন্তরায়। ভারতে এ পর্যন্ত যতগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের বেশীর ভাগই বিদেশী মূলধনের সাহায্যে গঠিত হইয়াছে। দেশের লোক দরিদ্র বলিয়া তাহাদের সঞ্চয়-ক্ষমতা নাই এবং দেশে যে সামান্য পুঁজি ছিল তাহাও শিল্পক্ষেত্রে ঝুঁকির জন্য নিযুক্ত হয় নাই। দেশে ব্যাঙ্ক বা যৌথ-মূলধনী কারবার প্রভৃতি সঞ্চয় সহায়ক প্রতিষ্ঠানেরও অভাব।

চতুর্থতঃ, শিল্প পরিচালনার জন্য যে সংগঠন-শক্তি ও নেতৃত্বের প্রয়োজন হয় তাহাও এদেশে খুব বিরল। প্রাতঃস্মরণীয় জেমসেদ্‌জি টাটা ও আর. এন. মুখার্জির মত প্রথম শ্রেণীর ব্যবস্থাপক নাই বলিলেও চলে। ইহা ছাড়া, আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় অত্যধিক মাত্রায় চাকুরি-প্রিয়। ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ কোন আকর্ষণ নাই। পরিশেষে বলা যায় যে, ভারতের ব্রিটিশ শাসকগণ এদেশের শিল্পোন্নতির কোন ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন না। দেশ কৃষি-জীবী হইয়া দরিদ্র থাকিলে শাসকশ্রেণীর স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকিত। তাই তাঁহারা এ দেশে শিল্পপ্রসারের কোন প্রকৃত চেষ্টা করেন নাই।

শিল্পোন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা—Measures for the development of industries

ভারতের দ্রুত শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন হইল সরকারী হস্তক্ষেপ ও সরকারী সাহায্য। ব্যাপকভাবে শিল্পের প্রসার করিতে হইলে যে পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন, তাহা ব্যক্তিগত সঞ্চয় হইতে পাওয়া সম্ভব নহে।

একমাত্র সরকারই বিদেশী ঋণ সংগ্রহ করিয়া শিল্পের প্রসারে সাহায্য করিতে পারে। ইহা ছাড়া, শিল্পোন্নয়নের জন্য সংরক্ষণ-নীতিও অনেক ক্ষেত্রে অবলম্বন করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, দেশে সঞ্চয়-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া যাহাতে মূলধন-পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থসাহায্য করিবার জন্য শিল্প সহায়ক নানাজাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রেও সরকারী সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ, শ্রমিকগণকে কর্মদক্ষ করিতে হইবে। এজন্য সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার বহুল প্রসার অত্যাবশ্যক। শ্রমিকগণকে কার্যে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের মজুরির হার বৃদ্ধি করিয়া যাহাতে তাহারা কর্মদক্ষতা অটুট রাখিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিকগণের বাসস্থান ও সামাজিক পরিবেশেরও উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন।

সর্বোপরি এদেশের জনসাধারণকে কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট করা প্রয়োজন। সুদক্ষ পরিচালক না হইলে শিল্পের উন্নতি সম্ভব নহে। যাহাতে দেশের শিক্ষিত যুবকগণ শিল্প ও ব্যবসায়ের দিকে আকৃষ্ট হন সেই উদ্দেশ্যে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন নিতান্ত প্রয়োজন। ইংরাজ, জার্মান বা রুশীয়গণের সাহায্যে লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প গঠিত হইলেই শুধু চলিবে না, ভারতবাসীর মনে রাখিতে হইবে যে, এগুলির পরিচালনা-ভার তাহাদের স্বহস্তে গ্রহণ করিতে হইবে—নতুবা পরমুখাপেক্ষী হইয়া চির-দারিদ্র্য বরণ করিতে হইবে।

সংক্ষিপ্তসার

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প-সংগঠন

ভারতে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কিছু বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান দেখা যায়। যে সমস্ত শিল্পে পাঁচ শতাধিক শ্রমিক বাষ্পীয় বা বৈদ্যুতিক শক্তি পরিচালিত যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদনে নিযুক্ত থাকে, সেই শিল্পগুলিকে বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান বলা হয়। ভারতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলি সাধারণতঃ একমালিকানা বা অংশীদারী কারবারের ভিত্তিতে গঠিত, কিন্তু বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি প্রায়ই যৌথ-মূলধনী কারবার।

বৃহৎ শিল্পের সুবিধা—বড় বড় শিল্পগুলির অনেক সুবিধা দেখা যায়; যথা, একসঙ্গে কাঁচামাল ক্রয়, একসঙ্গে বিক্রয়, বিজ্ঞাপন ও প্রচার প্রভৃতি কার্যে ব্যয় সংকোচ করিতে পারে। ইহা ছাড়া, নূতন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া ও গবেষণা-মূলক কার্যের দ্বারাও ব্যয় সংকোচ করিতে পারে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বাজারের বিস্তৃতি যদি কম হয় এবং চাহিদা যদি সাময়িককালের জন্য হয়, তাহা হইলে বড় বহরে উৎপাদন লাভজনক হয় না।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সুবিধা

ছোট ছোট শিল্পগুলি যে বড় শিল্পগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া টিকিয়া আছে তাহার কারণ হইল যে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি :

১। ক্রেতার রুচিমত দ্রব্য তৈয়ারী করিতে পারে, ২। মালিকের পক্ষে সবদিকে লক্ষ্য রাখা সম্ভব, ৩। ক্রেতার সহিত ব্যক্তিগত সম্পর্কে আসা সম্ভব, ও ৪। ছোট-খাট যন্ত্রপাতির ব্যবহার।

ভারতের শিল্প-সংগঠন

ভারতের বড় বড় শিল্পগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। বস্ত্র, চিনি, চা প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুর উৎপাদক শিল্প এবং লৌহ-ইস্পাত, বৈদ্যুতিক-শক্তি, সিমেণ্ট প্রভৃতি মূল বা গুরু শিল্প। এই শিল্পগুলির মধ্যে বস্ত্র, লৌহ-ইস্পাত, চিনি, চা, কাগজ, যন্ত্রপাতি নির্মাণ, ও গুরু রাসায়নিক শিল্পগুলি প্রধান।

ইহা ছাড়াও সরকারী পরিচালনাধীনে বর্তমানে বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠিত হইতেছে; যথা, চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন কারখানা, সিন্ধ্রি রাসায়নিক সার কারখানা, হিন্দুস্থান জাহাজ কারখানা ইত্যাদি।

ভারতের কুটিরশিল্প

ভারতের কুটিরশিল্প এক সময়ে জগদ্বিখ্যাত ছিল। বর্তমানে নানাকারণে ইহাদের অবনতি ঘটিয়াছে। অবনতির কারণগুলি হইল :

১। শিল্পিগণের মধ্যে সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার অভাব।

২। মূলধনের অভাব।

৩। বিক্রয়-ব্যবস্থার ত্রুটি

৪। শিল্পে শক্তি ব্যবহারের অভাব।

নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিয়া কুটিরশিল্পের পুনরুজ্জীবন সম্ভব :

১। সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার, ২। অল্পসুদে মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা, ৩। শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য দেশে ও বিদেশে ব্যাপক প্রচার কার্য, ৪। শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের সু-ব্যবস্থা করা, ৫। শিল্পে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের সুযোগদান। তাঁত, রেশমবয়ন, কাঁসা-পিতলের বাসন প্রস্তুত, মাটির বাসন ও খেলনা প্রস্তুত প্রভৃতি এ দেশের কয়েকটি প্রধান কুটিরশিল্প।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. What is meant by internal and external economies of large-scale production. Illustrate your answer by giving two concrete examples of each. H. S. (Com.) 1960

আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয়সংকোচ বলিতে কি বুঝ? দুইটি বাস্তব উদাহরণ সাহায্যে উত্তর লিখ।

উঃ—বর্তমান যুগে বৃহদায়তন শিল্পের আবির্ভাব হইয়াছে। উৎপাদনে শ্রমবিভাগের প্রবর্তন ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে বৃহদায়তন শিল্পের গঠন সম্ভব হইয়াছে। কারণ, বৃহৎ বহরে উৎপাদন না করিলে শিল্পে শ্রমবিভাগ বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার সম্ভব হয় না। শিল্পপ্রতিষ্ঠান বড় হইলে অধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন হয় ও উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়; বৃহৎ বহরে উৎপাদন করিলে দুইটি কারণে ব্যয় হ্রাস হয়—একটি হইল আভ্যন্তরীণ (Internal economies), অপরটি হইল বাহ্যিক (External economies)।

আভ্যন্তরীণ—কোন একটি শিল্পের আয়তন বৃদ্ধি পাইলেই এই ব্যয় সংকোচ হয়। ব্যয় সংকোচের কারণগুলি হইল—

১। অতি আধুনিক ও উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতির ব্যবহার—ইহার ফলে ব্যয় হ্রাস পায়।

২। উপজাত দ্রব্যের (By-product) যথাযথ ব্যবহার দ্বারা আয় বৃদ্ধি হয়। উপজাত দ্রব্যের পরিমাণ স্বল্প বলিয়া ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি ইহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে না।

৩। বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ ছোট-খাট কাজগুলি অধস্তন কর্মচারিগণের হাতে দিয়া নিজে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনঃসংযোগ করিতে পারেন—ইহাতে পরিচালনা-কাজ দক্ষতার সহিত নিষ্পন্ন হয়।

৪। ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধা—একসঙ্গে বহুমাল কিনিলে কিছু কম দরে পাওয়া যায়। একসঙ্গে বহুমাল বিক্রয় করিলে বিক্রয় খরচও কম হয়। বড় ব্যবসায়ী অনেক দ্রব্যের জন্য বিজ্ঞাপন দেয়, সুতরাং বিজ্ঞাপন-খরচও কম।

৫। মূলধন সংগ্রহ ব্যাপারেও বড় শিল্পের সুবিধা বেশী। শিল্প যতই বড় হয় ও বাজারে প্রতিষ্ঠা হয়, ততই কম সুদে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে।

৬। ঝুঁকি বহনের ক্ষমতা—বড় ব্যবসায়ীর ঝুঁকি বেশী হইলেও সে নানা জায়গায় নানা দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় করে। সেইজন্য একটি দ্রব্যে বা একটি জায়গায় লোকসান হইলেও অন্য দ্রব্যে বা অন্য জায়গায় লাভ করিয়া গড়ে পোষাইয়া লয়। ছোট ব্যবসায়ীর পক্ষে ইহা সম্ভব নহে।

বাহ্যিক—ব্যয় সংকোচের এই কারণগুলি কোন একটি শিল্পের আয়তন বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে না—শিল্পটির সমগ্রভাবে বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। দেশে যদি চিনির চাহিদা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে চিনির কলের সংখ্যা বাড়িবে এবং চিনির কলের সংখ্যা বাড়িলে প্রত্যেকটি চিনির কল কতকগুলি সুবিধা পইবে এবং এই সুবিধাগুলির ফলে ব্যয় সংকোচ হইবে।

১। চিনির কলের সংখ্যা বাড়িলে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। ফলে যন্ত্রপাতির উৎপাদন বেশী হইবে। যন্ত্রপাতির উৎপাদন বেশী হইলে যন্ত্রপাতি উৎপাদনের ব্যয় কমিবে। ইহাতে চিনির কলের মালিক অল্পমূল্যে যন্ত্রপাতি ক্রয় করিয়া ব্যয় সংকোচ করিতে পারিবে।

২। শিল্পের স্থানীয়করণের ফলে অর্থাৎ এক জাতীয় অনেকগুলি শিল্প কাছাকাছি প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রত্যেকটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থানীয়করণের সব সুবিধাগুলি পাইবে। কাঁচামালের ব্যবসায়ীরা একসঙ্গে বহু মাল বিক্রয়ের জন্য শিল্পাঞ্চলে মাল যোগান দিবে, শ্রমিকেরা কাজের জন্য শিল্পাঞ্চলে আকৃষ্ট হইবে, মাল আনা-নেওয়ার জন্য রেল কোম্পানি বা অন্য পরিবহন কর্তৃপক্ষ শিল্পাঞ্চলে স্টেশন স্থাপন করিবে। এই সব কারণে বাহ্যিক ব্যয় হ্রাস পায়।

2. Describe the advantages of large-scale production. How is it that in spite of all these advantages of large-scale production, the small producer is till surviving?

> বৃহৎ শিল্পের সুবিধাগুলি বর্ণনা কর। বৃহৎ শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় ক্ষুদ্র শিল্প কিভাবে টিকিয়া থাকে তাহা লিখ।

উঃ—প্রথমভাগের উত্তরের জন্য ১নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয় কম বলিয়া তাহারা উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে অপেক্ষাকৃত সস্তায় বিক্রয় করিতে পারে, কিন্তু ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদনের সুবিধা কম বলিয়া তাহাদের উৎপাদন-ব্যয় বেশী, সেজন্য তাহারা অল্পদরে জিনিস বিক্রয় করিতে পারে না। সুতরাং বড় শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া ছোট শিল্পের টিকিয়া থাকা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহা হইলেও দেখা যায় যে, আমাদের দেশের তাঁতশিল্প বড় বড় কাপড়ের কলের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া যেভাবেই হউক এখনও টিকিয়া আছে। টিকিয়া থাকিবার কারণ হইল যে, ছোট ছোট শিল্পগুলিরও এমন কতকগুলি সুবিধা আছে যাহা বড় শিল্পগুলির নাই। সুবিধাগুলি হইল:

১। ক্রেতার রুচিমত দ্রব্য তৈয়ারী করিতে পারে যাহা বড় শিল্পে যন্ত্রের সাহায্যে সম্ভব নয়।

২। মালিকের পক্ষে সব দিকে লক্ষ্য রাখা সম্ভব। ছোট শিল্পে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক বড় শিল্পের শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের মত তিক্ত হয় নাই। ইহাতে কাজ ভাল হয়।

৩। ছোট শিল্পে বিক্রেতার ক্রেতার ব্যক্তিগত সম্পর্কে আসিয়া ক্রেতার মনস্তুষ্টি করা সম্ভব।

৪। পরিবর্তনশীল রুচি ও চাহিদার ক্ষেত্রে ছোট ব্যবসায়ী ক্রেতার রুচিসম্মত চাহিদা মিটাইতে পারে।

৫। অধুনা ছোট-খাট যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া ক্ষুদ্র শিল্পগুলি তাহাদের পূর্বতন অনেক অসুবিধা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে।

3. Indicate the importance of the village and small scale industries in our economy. What measures would you suggest so that they may develop side by side with our large-scale industries?

H. S. (Hu.), 1960 ; H. S. (Comp), 1960

অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলির গুরুত্ব বুঝাইয়া দাও। বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান-গুলির সহিত একযোগে এই শিল্পগুলির উন্নতির উপায় আলোচনা কর।

উঃ—অনেকে মনে করেন যে, বর্তমান বৃহৎ শিল্পের যুগে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের আর কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি অল্প সময়ে ও অল্প খরচে ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে। কিন্তু একথা সব সময়ে সত্য নহে। কুটিরশিল্পগুলির উপযোগিতা হ্রাস পাইলেও তাহাদের প্রয়োজনীয়তা একেবারেই নাই একথা বলা চলে না। তাই ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পগুলি এখনও বাঁচিয়া আছে।

প্রথমতঃ, বলা যায় যে, যে দেশে বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব, সে দেশে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠা করাই যুক্তিযুক্ত। কুটিরশিল্পে কম মূলধন প্রয়োজন হয়, অথচ বেশী লোক খাটান যায়। ভারতে মূলধনের একান্ত অভাব, তাই এদেশে বৃহৎ শিল্প অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠা দ্বারা বেকার সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠার জন্য অনেক মূলধন প্রয়োজন। সুতরাং ধনী ব্যক্তি ছাড়া সাধারণ লোক বৃহৎ শিল্পের মালিক হইতে পারে না। বৃহৎ শিল্পের সমগ্র মুনাফা মুষ্টিমেয় ধনীর হস্তে কেন্দ্রীভূত হয়। ফলে দেশে উৎকট ধনবৈষম্য দেখা দেয়। ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পের প্রসারের ফলে মালিকের সংখ্যা বেশী হইবে এবং প্রত্যেকের আয় কম হইবে। সুতরাং দেশে ধনবৈষম্য হ্রাস পাইবে।

তৃতীয়তঃ, কৃষিপ্রধান দেশে বিশেষ করিয়া ভারতে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পগুলির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। কৃষিকার্যের দীর্ঘ অবসরে কৃষকগণ কুটিরশিল্পের কাজ করিয়া তাহাদের আয় বৃদ্ধি করিতে পারে, ইহাতে তাহাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও রুচিবোধের উন্নতি হইবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, উৎপাদনের অনেক ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি লোকের রুচি মত চাহিদা পূরণ করিতে পারে না। কুটিরশিল্পগুলি ক্রেতার রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্য সরবরাহ করিয়া একদিকে যেমন দেশের পরিবর্তনশীল রুচির পরিচর্যা করিতে পারে অপর দিকে সেইরূপ দেশের শিল্পরুচি ও শিল্পপ্রতিভা রক্ষা করিতে পারে। এইজন্যই ভারত সরকার পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনাগুলির সাহায্যে এই শিল্পগুলিকে পুনর্জীবিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

সুতরাং দেখা যায়, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পগুলি ও বৃহৎ শিল্পগুলির মধ্যে কোন বিরোধের স্থান নাই। এই শিল্পগুলির উন্নতির জন্য প্রথমতঃ সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার বহুল প্রসার প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, সমবায় সমিতির সাহায্যে এই শিল্পগুলিকে ঋণদান ও শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়-ব্যবস্থা করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে। চতুর্থতঃ, এই শিল্পগুলিকে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদন প্রণালী শিখাইতে হইবে। পঞ্চমতঃ, শিল্পজাত দ্রব্যগুলি ন্যায্য-মূল্যে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে দেশে ও বিদেশে বিক্রয় কেন্দ্র ও প্রদর্শনী খুলিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

বিনিময় ও বাজার

(Exchange and Markets)

ধনবিজ্ঞানে বাজারের সংজ্ঞা—Definition of an Economic Market

ধনবিজ্ঞানে বাজার বলিতে কোন নির্দিষ্ট স্থান বুঝায় না, কোন দ্রব্যের বাজার বুঝায়, যেমন, পাটের বাজার, শেয়ার বাজার, সোনা-রূপার বাজার। ধনবিজ্ঞানে বাজারের অর্থ হইল এক বা একাধিক দ্রব্য, যাহার ক্রয়-বিক্রয়ে বহু-সংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করে এবং প্রতিযোগিতার ফলে বাজারে দ্রব্যটি একটিমাত্র দামে বিক্রয় হয়। সুতরাং অর্থনৈতিক অর্থে বাজারের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যথা, (১) দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিবার জন্য একদল ক্রেতা ও বিক্রেতা, (২) ক্রেতা-বিক্রেতাগণের ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা, (৩) প্রতিযোগিতার ফলে সমগ্র বাজারে একই দ্রব্যের একই মূল্য বর্তমান থাকে। তবে বাজারটি যদি বহুদূর-বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে হয়ত বাজারের বিভিন্ন কেন্দ্রে মূল্যের পার্থক্য থাকিতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন কেন্দ্রে মূল্যের এই পার্থক্যের কারণ হইল দ্রব্যটিকে এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করিবার অতিরিক্ত ব্যয়। মূল্য কোন ক্ষেত্রেই এই স্থানান্তর করিবার ব্যয় অপেক্ষা বেশী হইতে পারে না।

বাজারের আয়তন—Extent of the Market

প্রতিযোগিতার ব্যাপকতার উপর বাজারের প্রসার নির্ভর করে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা যদি স্বল্পপরিমিত স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে তাহাকে স্থানীয় বাজার (Local Market) বলা হয়। সাধারণতঃ, যে সমস্ত দ্রব্য পচনশীল, যথা, দুগ্ধ, তরিতরকারি প্রভৃতি, সে সমস্ত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতিযোগিতা স্থানীয় ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। মাদ্রাজ বা বোম্বাই হইতে দুগ্ধ বা তরিতরকারি আনিয়া কলিকাতার বাজারে বিক্রয় সম্ভব হয় না। সুতরাং এই দ্রব্যগুলির ক্রয়-বিক্রয় প্রতিযোগিতা শুধু কলিকাতার ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। দ্বিতীয়তঃ, প্রতিযোগিতা যখন বহুদূর-প্রসারিত হয় অর্থাৎ একটি দেশের সমস্ত অংশের ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে চলিতে থাকে, তখন তাহাকে জাতীয় বাজার (National Market) বলা হয়। সাধারণতঃ, যে সমস্ত দ্রব্য সহজে নষ্ট হয় না বা সহজে স্থানান্তরযোগ্য, যথা, চাউল, ডাইল প্রভৃতি, সে সমস্ত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দেশব্যাপী প্রতিযোগিতা চলে। তৃতীয়তঃ, এমন অনেক দ্রব্য আছে, যথা, পাট, গম, সোনা বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শেয়ার প্রভৃতি, যেগুলির ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে পৃথিবী-ব্যাপী প্রতিযোগিতা চলে সেই দ্রব্যগুলির বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার (International Market) বলা হয়। যোগাযোগ ও পরিবহন-ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বহু দ্রব্যের সংকীর্ণ বাজার বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে পরিণত হইয়াছে।

অর্থনৈতিক অর্থে বাজারকে আর একভাবে ভাগ করা হয়। সময়ের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বলা হয়, স্বল্প-মেয়াদী বাজার (Short-period Market) ও দীর্ঘ-মেয়াদী বাজার (Long-period Market)। মাছের বাজারকে স্বল্প-মেয়াদী বাজার বলা হয়, কারণ ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা স্বল্পকাল স্থায়ী হয়। এই বাজারে সরবরাহের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে—অল্প সময়ের মধ্যে সরবরাহ পরিবর্তন করা যায় না এবং এইজন্য মূল্যনির্ণয়ে সরবরাহ অপেক্ষা চাহিদার প্রভাব বেশী হয়। আর বাজার যদি দীর্ঘ-মেয়াদী হয় তাহা হইলে সরবরাহ পরিবর্তন করিবার সময় থাকে এবং অতিরিক্ত সরবরাহ করিবার ব্যয় মূল্যের উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। বাজারকে আবার চল্‌তি বাজার (Ready Market) ও ভবিষ্যৎ বাজার (Future Market) বলা হয়। চল্‌তি

বাজারে ক্রেতা তাহার ক্রীতদ্রব্য সঙ্গে সঙ্গে পায়, কিন্তু ভবিষ্যৎ বাজারে ক্রেতাকে দ্রব্যের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। ক্রয়ের চুক্তি বর্তমানে সম্পাদিত হইলেও ক্রেতাকে দ্রব্যটি পাইতে কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হয়।

বাজারের বিস্তৃতি কত দূর হইবে অর্থাৎ বাজার বড় হইবে কি ছোট হইবে তাহা অনেকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে। দ্রব্যটির চাহিদা যত ব্যাপক হয় বাজারের প্রসার তত বড় হয়। সোনা, রূপা, পাট, তূলা প্রভৃতির চাহিদা হইল সমগ্র পৃথিবীব্যাপী এবং সেইজন্য এই দ্রব্যগুলির বাজার হয় আন্তর্জাতিক। বাজারের বিস্তৃতি দ্রব্যটির স্থানান্তরযোগ্যতা ও স্থায়িত্বের উপরও নির্ভর করে। ইহা ছাড়া, দ্রব্যটি নমুনাযোগ্য কিনা অর্থাৎ দূরের ক্রেতা দ্রব্যটির নমুনা দেখিয়া যদি দ্রব্যটির গুণাগুণ বিচার করিতে পারে, তাহার উপরও বাজারের বিস্তৃতি নির্ভর করে। সোনা ও রূপার মধ্যে উপরি-উক্ত সব বৈশিষ্ট্যই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা স্থায়ী এবং ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে অধিকতর মূল্য বহন করে। সুতরাং ইহাদের বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার ধরা হয়। অপর পক্ষে ইটের আয়তনের তুলনায় ইহার মূল্য অনেক কম। সেইজন্য ইট স্থানান্তরযোগ্য নহে বলিয়া ইহার বাজার সাধারণতঃ স্থানীয় বাজার হয়।

প্রতিযোগিতা—Competition

ধনবিজ্ঞানে প্রতিযোগিতার অর্থ হইল যে, বাজারে একই দ্রব্য কিনিবার জন্য বহু ক্রেতা এবং বিক্রয় করিবার জন্য বহু বিক্রেতা আছে, এবং ক্রেতা ও বিক্রেতার ইচ্ছামত ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে কোন বাধা নাই। ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রতিযোগিতার ফলে একই দ্রব্যের বিভিন্ন মূল্য থাকিতে পারে না। এরূপক্ষেত্রে কোন বিক্রেতাই অপর বিক্রেতা অপেক্ষা অধিক মূল্যে কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে ক্রেতাগণ যে বিক্রেতার নিকট হইতে অল্পদরে দ্রব্যটি পাইবে তাহার নিকট হইতেই ক্রয় করিবে। এইরূপে প্রতিযোগিতার বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল : (১) বহু ক্রেতা ও বিক্রেতার উপস্থিতি, (২) বিক্রয়ার্থ আনীত দ্রব্যটি সমজাতীয় হইবে, (৩) ক্রেতা ও বিক্রেতা চল্‌তি বাজার-মূল্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত, সুতরাং প্রতিযোগিতার বাজারে ভেদমূলক দাম থাকিতে পারে না, (৪) ক্রেতা ও বিক্রেতা স্বাধীনভাবে ইচ্ছামত ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারে। এরূপ অবস্থাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতা (Perfect Competition) বলা হয়।

একচেটিয়া—Monopoly

বাজারে যখন বহু ক্রেতা কিন্তু অল্পসংখ্যক বিক্রেতা বা একজন মাত্র বিক্রেতা থাকে, এবং বিক্রেতার সংখ্যা কম বলিয়া বিক্রেতাগণের মধ্যে কম প্রতিযোগিতা তখন তাহাকে অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা বলা হয় (Imperfect Competition)। অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ক্রেতাগণের মধ্যে কম প্রতিযোগিতা থাকে এবং একজন মাত্র বিক্রেতা থাকিলে আদৌ কোন প্রতিযোগিতা থাকে না। বিক্রেতা তাহার মুনাফা বৃদ্ধির জন্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় ক্রেতার ক্রয়-স্বাধীনতা থাকে না। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রের মত ক্রেতা একজন বিক্রেতার নিকট হইতে দ্রব্যটি ক্রয় না করিয়া অন্য বিক্রেতার নিকট হইতে দ্রব্যটি ক্রয় করিতে পারে না। যখন বাজারে বহু ক্রেতা থাকে কিন্তু বিক্রেতা মাত্র একজন, তখন তাহাকে একচেটিয়া বাজার বলা হয়। কলিকাতায় বিদ্যুৎ-সরবরাহ মাত্র একটি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন। সুতরাং কলিকাতা বিদ্যুৎ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান একটি একচেটিয়া কারবার (Monopoly)। একচেটিয়া ব্যবসায় আবার নানা-প্রকারের হইতে পারে। যথা—

(ক) মূল্য-চুক্তি—**Pool.** একই দ্রব্যের স্থানীয় বিক্রেতাগণ পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা না করিয়া যাহাতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করিতে পারে, সেইজন্য তাহারা অনেক সময় দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে সাময়িক চুক্তি করে। এই চুক্তির ফলে ক্রেতাগণ কোন বিক্রেতার নিকট হইতেই কমমূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে না।

(খ) উৎপাদক-সংঘ—**Cartel.** অনেক সময় উৎপাদকগণ মিলিতভাবে একটি সংঘ গঠন করিয়া সেই সংঘের মাধ্যমে প্রত্যেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-পরিমাণ, দ্রব্যমূল্য ও বিক্রয় বাজার স্থির করে। উৎপাদিত দ্রব্যগুলি বিক্রয়-ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সংঘের দ্বারা পরিচালিত হয়। জার্মানীতে সর্বপ্রথম এই জাতীয় কারবার প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের দেশের শর্করা, চা প্রভৃতি শিল্পগুলি পূর্বে উৎপাদক-সংঘ দ্বারা পরিচালিত হইত। কলিকাতার বাস্ কোম্পানীগুলিও এইরূপ একটি সংঘের **(Bus Syndicate)** দ্বারা পরিচালিত হইত।

(গ) যৌথ-ব্যবসায়—**Trust.** একজাতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বা ব্যবসায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যখন সম্মিলিত হইয়া একই ব্যবস্থাপনার অধীনে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়, তখন তাহাকে যৌথ-ব্যবসায় বলা হয়। যৌথ-ব্যবসায় উৎপাদন-পরিমাণ ও দ্রব্যমূল্য উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করে।

বিনিময়-মূল্য—Value.

মূল্যতত্ত্ব আলোচনার পূর্বে ধনবিজ্ঞানে 'মূল্য' শব্দটি কি অর্থে ব্যবহার করা হয় জানা দরকার। মূল্য শব্দটি সাধারণতঃ দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা, ব্যবহারিক মূল্য (**Value-in-use**) ও বিনিময়-মূল্য (**Value-in-exchange**)। ব্যবহারিক মূল্যের অর্থ হইল দ্রব্যের উপযোগ। যখন বলা হয় যে, চা অপেক্ষা লবণ অধিকতর মূল্যবান অথবা স্বর্ণ অপেক্ষা লৌহ অধিকতর মূল্যবান, তখন মূল্য শব্দটি উপযোগ অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে 'মূল্য' শব্দটি কেবলমাত্র বিনিময়-মূল্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাধারণ অর্থে লৌহ স্বর্ণ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান হইলেও অর্থনৈতিক অর্থে লৌহ অপেক্ষা স্বর্ণ অধিকতর মূল্যবান। ধনবিজ্ঞানে মূল্যের অর্থ হইল বিনিময়-মূল্য অর্থাৎ একটি দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য দ্রব্যের যে পরিমাণ পাওয়া যায় তাহাই হইল সেই দ্রব্যের মূল্য। সুতরাং মূল্য বলিলে একটি দ্রব্যের ক্রয়-ক্ষমতা বুঝায়। যদি একটি ঘোড়ার বিনিময়ে দুইটি গরু পাওয়া যায়, তাহা হইলে একটি ঘোড়ার ক্রয়-ক্ষমতা বা বিনিময়-মূল্য হইল দুইটি গরু। একটি ঘোড়ার পরিবর্তে দুইটি গরু বিনিময়ের এই হারকে মূল্য (**Value**) বলা হয়। সুতরাং মূল্য বলিলে দুইটি দ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময়ের অনুপাত (**Ratio of exchange**) বুঝায়।

অর্থমূল্য বা দাম—Price

দ্রব্য মূল্য অর্থাৎ বিনিময়ের অনুপাত যখন অর্থদ্বারা পরিমাপ করা হয়, তখন তাহাকে 'অর্থমূল্য' বা 'দাম' বলা হয়। দ্রব্যের দাম সকল সময়েই অর্থের দ্বারা প্রকাশ করা হয়, কিন্তু বিনিময়-মূল্য অর্থ ব্যতীতও অন্য সমুদয় দ্রব্য দ্বারাই প্রকাশ করা যাইতে পারে। বিনিময়-মূল্য দুইটি দ্রব্যের বিনিময়ের অনুপাত প্রকাশ করে। সুতরাং সকল দ্রব্যের বিনিময়-মূল্য একসঙ্গে বাড়িতে পারে না, কারণ একটির বিনিময়ের অনুপাত বাড়িলেই অপরটির অনুপাত হ্রাস পায়। কিন্তু সব জিনিসেরই অর্থমূল্য একসঙ্গে বাড়িতে পারে। দাম প্রত্যেকটি জিনিসের স্বতন্ত্র অর্থমূল্য প্রকাশ করে এবং সেইজন্য দেশে অর্থপরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে সমস্ত জিনিসের অর্থমূল্য বৃদ্ধি পায় ও অর্থের পরিমাণ হ্রাস পাইলে সমস্ত জিনিসের দাম কমিয়া যায়।

প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মূল্য-নির্ধারণ—Price determination under Competition

কোন দ্রব্যের বাজারে যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে, তাহা হইলে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতার দ্বারা অর্থাৎ চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক প্রভাবের দ্বারা মূল্য নির্ধারিত হয়। ক্রেতার নিকট দ্রব্যটির উপযোগ আছে বলিয়া ক্রেতা দ্রব্যটির জন্য একটা মূল্য দিতে রাজী থাকে এবং দ্রব্যটি ক্রয় করিবার পূর্বে সে মনে মনে দ্রব্যটির উপযোগের ভিত্তিতে দ্রব্যটির একটি সর্বোচ্চ মূল্য ঠিক করে। এই সর্বোচ্চ মূল্যের উপর সে কখনও মূল্য দিবে না। কিন্তু দ্রব্য ক্রয়কালে সে সর্বোচ্চ অপেক্ষা কমমূল্য দিবার জন্য বিক্রেতার সহিত দর কষাকষি করে।

দ্রব্যের চাহিদা মিটাইবার জন্য দ্রব্যের সরবরাহ হয়। উৎপাদক বা বিক্রেতাগণ দ্রব্য সরবরাহ করে। ক্রেতার ন্যায় বিক্রেতাগণও দ্রব্য বিক্রয় করিবার পূর্বে মনে মনে দ্রব্যটির একটি সর্বনিম্ন মূল্য ঠিক করে, যে মূল্যের কমে তাহারা দ্রব্যটি বিক্রয় করিবে না। অবশ্য বিক্রেতাগণও চেষ্টা করে যে, ক্রেতার সহিত দর কষাকষি করিয়া যাহাতে সর্বনিম্ন মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে দ্রব্যটি বিক্রয় করিতে পারে। বিক্রেতার এই সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারিত হয় তাহার দ্রব্যটি উৎপাদন করিবার ব্যয়ের দ্বারা।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, চাহিদার অর্থাৎ ক্রেতার দিক দিয়া প্রত্যেকটি দ্রব্যের সহিত সর্বোচ্চ ক্রয়মূল্য এবং সরবরাহ অর্থাৎ বিক্রেতার দিক দিয়া একটি সর্বনিম্ন বিক্রয়মূল্য থাকে। যে মূল্যে দ্রব্যটির ক্রয়-বিক্রয় চলে, তাহা এই সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যে থাকে এবং চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার দ্বারা স্থির হয়। বাজার দর অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় মূল্য এই সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যে ওঠা-নামা করে, কিন্তু ইহার বাহিরে যাইতে পারে না। বিক্রেতাগণ বিক্রয় করিবার জন্য যতটা উদ্‌গ্রীব হয়, ক্রেতাগণ ক্রয় করিবার জন্য যদি তাহা অপেক্ষা বেশী উদ্‌গ্রীব হয়, তাহা হইলে বাজার দর ক্রেতার সর্বোচ্চ চাহিদা-মূল্যের সমান অথবা ইহার কাছাকাছি হয়। আবার, ক্রেতার ক্রয় করিবার ইচ্ছা অপেক্ষা বিক্রেতার বিক্রয় করিবার ইচ্ছা যদি বেশী হয়, তাহা হইলে বাজার-দর বিক্রেতার সর্বনিম্ন মূল্যের সমান বা ইহার কাছাকাছি হয়। এইরূপে ক্রেতা

বিক্রেতার দর কষাকষির মধ্য দিয়া অর্থাৎ চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক প্রভাবে মূল্য স্থিরীকৃত হয়।

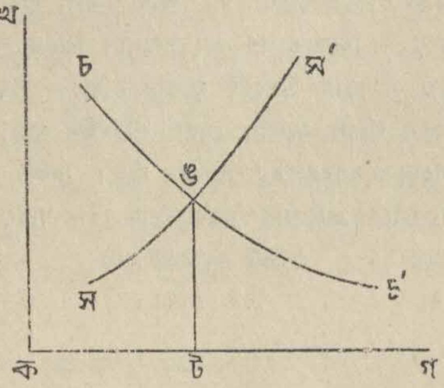
সাধারণতঃ, মূল্য বৃদ্ধি পাইলে ক্রেতাগণ কম পরিমাণ ক্রয় করে ও বিক্রেতাগণ অধিক পরিমাণ বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয়। আবার, মূল্য কমিলে ক্রেতাগণ অধিক পরিমাণে ক্রয় করে ও বিক্রেতাগণ কম পরিমাণ বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয়। সুতরাং চাহিদা ও সরবরাহ উভয়েই মূল্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত। চাহিদা ও সরবরাহের পরিবর্তন ঘটিলে মূল্যের যেরূপ পরিবর্তন ঘটে, মূল্যের পরিবর্তন ঘটিলেও তদ্রূপ চাহিদা ও সরবরাহের পরিবর্তন ঘটে। একটি উদাহরণ সাহায্যে মূল্য, চাহিদা ও সরবরাহের এই পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝান যাইতে পারে।

চাহিদার পরিমাণ	প্রতিটি কাপড়ের মূল্য	সরবরাহের পরিমাণ
৫০০ খানা	১০৲ টাকা	১,০০০ খানা
৬০০ "	৯ "	৮০০ "
৭০০ "	৮ "	৭০০ "
৯০০ "	৭ "	৫০০ "
১২,০০ "	৬ "	৪০০ "

উপরে চাহিদা ও সরবরাহের যে তালিকা দেওয়া হইল তাহাতে দেখা যায় যে, প্রতিটি কাপড়ের মূল্য ১০৲ টাকা হইতে ৯, ৮, ৭, ৬৲ টাকায় যতই কমিতেছে, চাহিদার পরিমাণ ততই বাড়িতেছে, কিন্তু সরবরাহের পরিমাণ ১,০০০ হইতে কমিতেছে। আবার, ঐ উদাহরণে যদি নীচুর দিক হইতে দেখা যায় তাহা হইলে প্রতিটি কাপড়ের মূল্য যখন ৬৲ টাকা হইতে ৭, ৮, ৯, ১০৲ টাকায় বাড়িয়া যাইতেছে তখন দাম বাড়িবার ফলে চাহিদার পরিমাণ কমিতেছে, কিন্তু সরবরাহের পরিমাণ বাড়িতেছে।

উপরের উদাহরণে আরও দেখা যাইতেছে যে, প্রতিটি কাপড়ের মূল্য যখন ৮৲ টাকা তখন বাজারের চাহিদা ও সরবরাহের সমতা হয় অর্থাৎ ৮৲ টাকা মূল্য হইলে ক্রেতাগণ যে পরিমাণ কাপড় ক্রয় করিতে ইচ্ছুক আর বিক্রেতাগণ যে পরিমাণ বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহা সমান হয়। মূল্য ৮৲ টাকার বেশী বা কম হইলে ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাণ সমান হয় না। সুতরাং কাপড়ের বাজার-মূল্য হইল ৮৲ টাকা, কারণ ঐ মূল্যে ক্রেতাগণ যে পরিমাণ কিনিতে চায় বিক্রেতাগণও সেই পরিমাণ বিক্রয় করিতে চায়। ক্রেতার দিক দিয়া ৮৲ টাকা হইল তাহার

সর্বোচ্চ ক্রয়মূল্য এবং বিক্রেতার দিক দিয়া ৮৲ টাকা হইল তাহার সর্বনিম্ন বিক্রয় মূল্য। এইজন্য এই মূল্যকে **স্থিতাবস্থা মূল্য** (**Equilibrium Price**) বলা হয়।



মূল্য-নির্ধারণতত্ত্বে মনে রাখিতে হইবে যে, চাহিদা ও সরবরাহের প্রতিক্রিয়ায় মূল্য স্থির হয়। কিন্তু চাহিদা ও সরবরাহ মূল্যনিরপেক্ষ নহে। মূল্যের পরিবর্তন ঘটিলেও চাহিদা ও সরবরাহের পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং চাহিদা, সরবরাহ ও মূল্য পরস্পর সম্পর্ক-যুক্ত।

উপরে যে রেখাচিত্র দেওয়া হইল তাহার **কখ** রেখা দ্বারা দ্রব্যমূল্য দেখান হইয়াছে ও **কগ** রেখা দ্বারা দ্রব্যের পরিমাণ দেখান হইয়াছে। **চচ´** হইল চাহিদার রেখা এবং **সস´** হইল সরবরাহের রেখা। **চচ´** ও **সস´** রেখা দুইটি **ঙ** বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যায় যে, মূল্য যখন **ঙট**, বিক্রেতাগণ তখন **কট** পরিমাণ বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক এবং ক্রেতাগণ ঐ মূল্যে ঐ পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছুক অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য যখন **ঙট** তখন সরবরাহ ও চাহিদা সমান হয় এবং যে মূল্যে চাহিদা ও সরবরাহ সমান হয়, তাহাকে স্থিতাবস্থা মূল্য বলা হয়।

বাজার দর ও স্বাভাবিক দর—Market price and Normal price

বাজার দরের অর্থ হইল কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন দ্রব্য বাজারে যে মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে দ্রব্যটির সরবরাহ সাধারণতঃ হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায় না। সুতরাং সরবরাহ অপরিবর্তিত থাকিলে বাজার-দর চাহিদার দ্বারা

বেশী প্রভাবিত হয়। ধরা যাউক, যদি কোন কারণে একদিন বাজারে মাছের চাহিদা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে মাছের দাম বৃদ্ধি পাইবে, কারণ সেইদিনের মত মাছের সরবরাহ আর বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। আবার মাছের চাহিদা কমিলে সেইদিন মাছের দাম কমিবে, কারণ, সেইদিন কমমূল্যে মাছ বিক্রয় না করিয়া বিক্রেতাগণ ভবিষ্যতে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিবার আশায় মাছ মজুত রাখিতে পারে না। মাছ ধরিবার ব্যয় যাহাই হউক না কেন, বিক্রেতাগণকে বাজারে চল্‌তি দামে সমগ্র পরিমাণ মাছ বিক্রয় করিতে হইবে। সেদিনকার মত চাহিদা ও সরবরাহের একটা স্থিতাবস্থায় সমস্ত সরবরাহ বিক্রীত হইবে। সুতরাং স্বল্প-মেয়াদী বাজারে সরবরাহ অপেক্ষা চাহিদাই মূল্য-নির্ধারণে বেশী প্রভাব বিস্তার করে।

একটি দ্রব্যের মূল্য যদি দীর্ঘকাল যাবৎ স্থির হইয়া থাকে, তাহাকে স্বাভাবিক দর বলা হয়। যে মূল্যে চাহিদা ও সরবরাহের দীর্ঘ-মেয়াদী সমন্বয় হয়, তাহাকে স্বাভাবিক দর বলে। বাজার-দর যেরূপ ক্রেতার উপযোগিতার দ্বারা স্থির হয়, স্বাভাবিক দর সেইরূপ বিক্রেতার উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। দীর্ঘ-মেয়াদে সরবরাহের পরিমাণ পরিবর্তন দ্বারা চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য করা সম্ভব বলিয়া স্বাভাবিক দর সাধারণতঃ উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। বাজার-দর চাহিদা ও সরবরাহের সাময়িক স্থিতাবস্থার দ্বারা স্থির হয়, আর স্বাভাবিক দর চাহিদা ও সরবরাহের স্থায়ী স্থিতাবস্থা দ্বারা স্থির হয়। সুতরাং বাজার দর হইল বাস্তব মূল্য আর স্বাভাবিক দর হইল অভিপ্রেত মূল্য অর্থাৎ যে মূল্য নির্দিষ্ট কালে চাহিদা ও সরবরাহের স্থায়ী স্থিতাবস্থায় হওয়া উচিত। কিন্তু বাজার দর সাধারণতঃ এই অভিপ্রেত মূল্যের কাছাকাছি ওঠা-নামা করে; কদাচিৎ এই অভিপ্রেত মূল্যের সমান হয়।

একচেটিয়া মূল্য—Monopoly Value

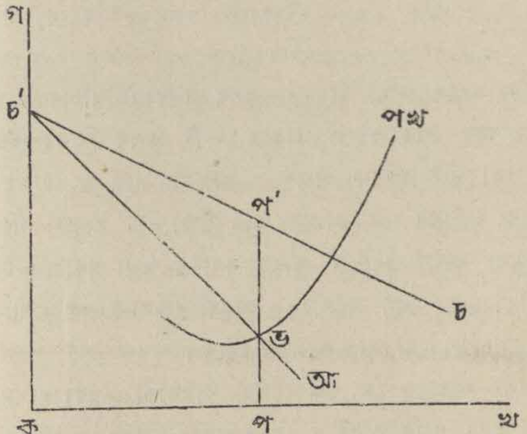
পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বহু ক্রেতা ও বহু বিক্রেতার সমাবেশ হয় এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা তাহাদের খুসীমত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারে। অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে একই বাজারে একই দ্রব্যের সাধারণতঃ বিভিন্ন মূল্য থাকিতে পারে না।

কিন্তু একচেটিয়া ব্যবসায়ে একজন বিক্রেতা বা একটি বিক্রেতা-সংঘ বাজারে একটি দ্রব্যের সমগ্র সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে। একচেটিয়া বাজারে প্রতিযোগিতার

কোন স্থান নাই। চাহিদার উপর একচেটিয়া ব্যবসায়ীর কোন নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা না থাকিলেও সমগ্র সরবরাহ তাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একচেটিয়া ব্যবসায়ীর প্রধান উদ্দেশ্য হইল সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা। এই উদ্দেশ্যে সে এরূপভাবে সরবরাহের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে যে, সে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করিতে পারে। একচেটিয়া ব্যবসায়ী অধিক পরিমাণ উৎপাদন করিতে পারে অথবা উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস করিতে পারে। যদি সে বাজারে অধিক পরিমাণ সরবরাহ করে, তাহা হইলে মূল্য হ্রাস পাইয়া তাহার মুনাফাও হ্রাস পায়। অপর পক্ষে, সে যদি বাজারে কম পরিমাণ সরবরাহ করে তাহা হইলে মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইতে পারে। ফলে তাহার মোট মুনাফা হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং একচেটিয়া ব্যবসায়ীর পক্ষে উপরি-উক্ত কোন পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা তাহার স্বার্থের অনুকূল নহে। সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করিবার উদ্দেশ্যে একচেটিয়া ব্যবসায়ী এরূপভাবে তাহার উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিবে যে, নিয়ন্ত্রণের ফলে সে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করিতে পারে। একচেটিয়া ব্যবসায়ী ঠিক সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবে, যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলে তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা ও প্রান্তিক আয় (Marginal revenue) সমান হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি কোন একচেটিয়া ব্যবসায়ী একটি দ্রব্যের প্রতিটি ২৲ টাকা হিসাবে ১৫টি দ্রব্য বিক্রয় করে তাহা হইলে তাহার মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইল ৩০৲ টাকা। যদি সে ১৬টি দ্রব্য প্রতিটি ১৸৶০ হিসাবে বিক্রয় করিতে পারে তাহা হইলে তাহার মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইবে ৩১৲ টাকা। এস্থলে তাহার প্রান্তিক আয় হইল (৩১—৩০) বা ১৲ টাকা। প্রান্তিক অর্থাৎ ষোড়শ দ্রব্যটির উৎপাদন-খরচা যদি প্রান্তিক আয় অর্থাৎ ১৲ টাকা হইতে কম হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে এই ষোড়শ সংখ্যক দ্রব্যটি উৎপাদন করা লাভজনক হয়। কিন্তু ষোড়শ সংখ্যক দ্রব্যটির উৎপাদন-খরচা যদি প্রান্তিক আয় অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে এই অতিরিক্ত মাত্রা উৎপাদন লাভজনক নহে। সেইজন্য সে ১৫টির অধিক দ্রব্য উৎপাদন করিবে না। কারণ, ১৫টি উৎপাদন করিলেই তাহার সর্বাধিক মুনাফা হয়। সুতরাং দেখা যায় যতক্ষণ পর্যন্ত একচেটিয়া ব্যবসায়ীর প্রান্তিক আয় তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা অপেক্ষা অধিক হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে উৎপাদন

বৃদ্ধি করিতে পারে, কারণ এই উৎপাদন-বৃদ্ধি দ্বারা তাহার মোট মুনাফা বৃদ্ধি পায়। যে পরিমাণ উৎপাদন করিলে তাহার প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা সমান থাকে, সে সেই পরিমাণের অধিক বা কম উৎপাদন করে না ; কারণ এই উভয় ক্ষেত্রেই তাহার মোট আয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়।



এই নক্সায় **চচ'** রেখা দ্বারা বিক্রেতা কত মূল্যে কত পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ করিতে সক্ষম তাহা বুঝান হইয়াছে। **আচ'** রেখাদ্বারা তাহার প্রান্তিক আয়ের পরিমাণ বুঝান হইয়াছে। **পখ** বক্ররেখা প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা সূচিত করে। প্রান্তিক খরচা রেখা ও প্রান্তিক আয় রেখা অর্থাৎ **পখ** রেখা ও **আচ'** রেখা **ভ** বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে দেখা যায় যে, যখন **কপ** পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ করা হয় তখন প্রান্তিক উৎপাদন-খরচা ও প্রান্তিক আয় সমান হয় এবং যখন **কপ** পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা হয় তখন মূল্য হইতেছে **পপ'**। যখন সে **কপ** পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ করিবে, তখনই তাহার সর্বাধিক মুনাফা হইবে। সুতরাং একচেটিয়া ক্ষেত্রে মূল্য হইল **পপ'**।

একচেটিয়া ব্যবসায়ী সর্বাধিক পরিমাণ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে কি উপায়ে দ্রব্যমূল্য স্থির করে তাহা আরও সরলভাবে প্রকাশ করা যায়। ধরা যাউক, একজন ব্যবসায়ী নূতন একধরণের ফাউন্‌টেন কলম বাজারে বাহির করিল। প্রতিটি কলমের উৎপাদন ব্যয় হইল ৫৲ টাকা। এখন ব্যবসায়ী কোন্ মূল্যে কলম বিক্রয় করিলে তাহার সর্বোচ্চ পরিমাণ লাভ হইবে দেখা যাউক।

প্রতি কলমের মূল্য	মোট বিক্রয় পরিমাণ	মোট বিক্রয়লব্ধ আয়	মোট ব্যয়	নীট মুনাফা
৮ টাকা	১০০	৮০০ টাকা	৫০০ টাকা	৩০০ টাকা
৭ ,,	২০০	১৪০০ ,,	১০০০ ,,	৪০০ ,,
৬ ,,	২৭৫	১৬৫০ ,,	১৩৭৫ ,,	২৭৫ ,,

উপরের উদাহরণে দেখা যায় যে, কলম ব্যবসায়ী যদি প্রতি কলমের দাম ৮৲ টাকা ধার্য করে তাহা হইলে তাহার ১০০টি কলম বিক্রয় হইয়া খরচ বাদ দিলে ৩০০ টাকা নীট মুনাফা থাকে। কলমের দাম ৭৲ টাকা ধার্য করিলে ৪০০ টাকা এবং ৬ টাকা ধার্য করিলে ২৭৫ টাকা নীট মুনাফা থাকে। সুতরাং সে সর্বোচ্চ মূল্য অর্থাৎ ৮ টাকা অথবা সর্বনিম্ন মূল্য অর্থাৎ ৬ টাকা ধার্য না করিয়া ৭ টাকা মূল্য ধার্য করিবে। কারণ, একমাত্র এই মূল্যে কলম বিক্রয় করিলে তাহার মুনাফার পরিমাণ সর্বাধিক হইবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, একচেটিয়া ব্যবসায়ী সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সরবরাহ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে তাহার খুসীমত মূল্য ধার্য করিতে পারে না।

একচেটিয়া ব্যবসায়ে বৈষম্যমূলক মূল্য—Price-discrimination under Monopoly.

অনেক সময় একচেটিয়া ব্যবসায়ী অধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে তাহার ক্রেতাগণের নিকট হইতে বিভিন্ন মূল্য আদায় করে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব নহে। বৈষম্যমূলক মূল্যের তিনটি প্রকার-ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

১। ব্যক্তিগত বৈষম্য—Personal discrimination.

এই ব্যবস্থার দ্বারা একচেটিয়া ব্যবসায়ী তাহার খরিদ্দারগণকে সামর্থ্যানুসারে বা দ্রব্যটির চাহিদার তীব্রতানুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া বিভিন্ন মূল্য আদায় করে। একই দ্রব্যের জন্য বিভিন্ন মূল্য ধার্য করা দৃষ্টিকটু বলিয়া অনেক সময় একচেটিয়া ব্যবসায়ী পণ্যদ্রব্যটির বহিরাবরণে একটু পরিবর্তন সাধন করিয়া বিভিন্ন পর্যায়ের দ্রব্য হিসাবে বাজারে বাহির করে। রেল ও ট্রাম কোম্পানী

যাত্রীসাধারণকে ২।৩ শ্রেণীতে ভাগ করিয়া ভ্রমণের সুবিধার কিছু তারতম্য করিয়া প্রথম শ্রেণীর যাত্রিগণের নিকট অধিক মাশুল আদায় করে। প্রথম শ্রেণীর ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী একই সময়ে তাঁহাদের গন্তব্য স্থলে পৌঁছিয়া থাকেন। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর যাত্রিগণ ভ্রমণকালে যে অতিরিক্ত সুখ-সুবিধা পাইয়া থাকেন তাহার তুলনায় তাঁহাদের অনেক বেশী মাশুল দিতে হয়। পুস্তক-প্রকাশকগণও অনেক সময় পুস্তকের দামী ও সস্তা সংস্করণ প্রকাশ করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রেতার নিকট হইতে বৈষম্যমূলক মূল্য আদায় করিয়া সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করেন।

২। ব্যবসায়গত বা দ্রব্যগত বৈষম্য—Trade or Use discrimination.

অনেক সময় আবার একচেটিয়া ব্যবসায়ী দ্রব্যটির বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন মূল্য ধার্য করিয়া থাকে। কলিকাতা বিদ্যুৎসরবরাহ প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ-প্রবাহের বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন মূল্য ধার্য করে। আলো ও পাখার জন্য যে হারে মূল্য দিতে হয়, বেতার যন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে তদপেক্ষা কম হারে মূল্য দেওয়া চলে।

৩। স্থানগত বৈষম্য—Place or Locality discrimination.

একচেটিয়া ব্যবসায়ী একই দ্রব্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে। স্থানগত বৈষম্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইল অল্প দরে বিদেশে বিক্রয় করা (Dumping)। অনেক সময় একই দ্রব্য একই সহরের অভিজাত অঞ্চলে অধিক মূল্যে ও অন্যত্র অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

একচেটিয়া ব্যাবসায়ীর মূল্য ধার্য করিবার ক্ষমতার সীমা—Limits to the price-fixing power of a Monopolist

তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, একচেটিয়া ব্যবসায়ীর বাজারে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকিলেও সে খুসীমত উচ্চমূল্য ধার্য করিয়া অত্যধিক লাভ করিতে পারে না। তাহার উচ্চমূল্য ধার্য করিবার ক্ষমতারও কয়েকটি সীমা আছে। প্রথমতঃ, সে যদি খুব বেশী মূল্য ধার্য করে তাহা হইলে বাজারে বিকল্প দ্রব্য (Substitutes) আমদানী হইয়া তাহার বিক্রয়-পরিমাণ হ্রাস পাইতে পারে। ফলে, তাহার লাভের পরিমাণও কম হইবে। দ্বিতীয়তঃ, দেশের মধ্যে কোন প্রতিযোগিতা না থাকিলেও তাহাকে বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে

পারে। তৃতীয়তঃ, খুব বেশী উচ্চমূল্য ধার্য করিয়া অস্বাভাবিক মুনাফা লাভ করিতে থাকিলে সরকার কর ধার্য করিয়া অথবা মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া মুনাফার পরিমাণ হ্রাস করিতে পারে। এই সমস্ত কারণে একচেটিয়া ব্যবসায়ী খুব বেশী মূল্য ধার্য করিয়া অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করিতে ইতস্ততঃ করে।

মূল্য-পরিবর্তন ও আয়-পরিবর্তন—Price Changes and Income Variations

মূল্যের পরিবর্তন ঘটিলে চাহিদারও পরিবর্তন ঘটে। মূল্য বৃদ্ধি পাইলে চাহিদার পরিমাণ কমিয়া যায়, কারণ যাহারা পূর্বে কম মূল্যে বেশী পরিমাণ কিনিত তাহারা বর্তমানে বেশী মূল্যে কম পরিমাণ কিনিবে এবং যাহারা পূর্বের মূল্যেই সামান্য কিনিত, বর্তমানে মূল্য বাড়িয়া যাওয়ায় তাহারা আদৌ কিনিবে না। সুতরাং গড়ে চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পায়। আবার মূল্য কমিলে চাহিদার পরিমাণ বাড়িয়া যায়, কারণ যাহারা পূর্বে মূল্য বেশী বলিয়া আদৌ কিনিত না, বর্তমানে কম মূল্যে তাহারা কিছু পরিমাণ কিনিবে এবং পূর্বের মূল্যে যাহারা কম কিনিত বর্তমানে মূল্য কম হওয়ার জন্য তাহারা বেশী পরিমাণ কিনিবে। সুতরাং মূল্য হ্রাস পাইলে মোট চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কমলা লেবুর দাম ১২ পয়সা জোড়া হইতে ২৫ পয়সা হইলে পূর্বে যাহারা দুই জোড়া কিনিত এখন তাহারা একজোড়া মাত্র কিনিবে, যাহারা পূর্বে একজোড়া কিনিত তাহারা একটিমাত্র কিনিবে এবং যাহারা একটি কিনিত তাহারা মোটেই কিনিবে না। আবার, দাম ২৫ পয়সা হইতে ১২ পয়সায় কমিলে যাহারা একজোড়া কিনিত তাহারা দু' জোড়া কিনিবে, যাহারা একটা কিনিত তাহারা একজোড়া কিনিবে এবং যাহারা মোটেই কিনিত না, তাহারাও কিছু কিছু কিনিবে।

আয়-পরিবর্তনের ফলেও চাহিদার পরিবর্তন ঘটে। আয় বাড়িলে লোকের ব্যয় করিবার শক্তি বাড়ে। ফলে চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই চাহিদা-বৃদ্ধি সবক্ষেত্রে সমান হয় না। ধনিগণের আয় বাড়িলে খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা খুব বেশী বাড়ে না, কারণ এই দ্রব্যগুলির উপর ব্যয় বৃদ্ধি করিয়াও তাহারা আর কোন নূতন উপযোগ পায় না। ধনিগণের আয় বৃদ্ধি পাইলে তাহারা সাধারণতঃ বিলাস দ্রব্য ও আরামপ্রদ দ্রব্যের উপর বেশী ব্যয় করে এবং এই দ্রব্যগুলির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অবশিষ্টাংশ ধনিগণ সঞ্চয় করে।

দরিদ্রের আয় বৃদ্ধি পাইলে খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর তাহারা বেশী ব্যয় করে, কারণ এই দ্রব্যগুলির উপর ব্যয় করিয়া তাহারা বাঁচিয়া থাকিবার মত জীবন-ধারণের মান বজায় রাখিতে পারে। সুতরাং দরিদ্রের আয় বৃদ্ধি পাইলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং আয় কমিলে তাহার জীবনধারণের জন্য ও কর্মক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায়।

সরবরাহ ও সরবরাহ-ব্যয় কিসের উপর নির্ভর করে—Factors governing supply price

একটি দ্রব্যের সরবরাহ এবং ইহার সরবরাহ-ব্যয় অনেকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, একটি দ্রব্যের সরবরাহ-পরিমাণ দ্রব্যটি উৎপাদন করিতে যে পরিমাণ খরচ হয়, তাহার উপর নির্ভর করে। উৎপাদন-ব্যয়-যদি বেশী হয়, তাহা হইলে সরবরাহের পরিমাণ হ্রাস পায়, আবার উৎপাদন খরচ কম হইলে সরবরাহ বেশী হয়। কাঁচামাল, উৎপাদনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যগুলির মূল্য, শ্রমিকের মজুরি প্রভৃতি যদি বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে উৎপাদন-ব্যয়ও বৃদ্ধি হয়। ফলে বাজারে যোগান-পরিমাণ হ্রাস পায়। দ্বিতীয়তঃ, নূতন আবিষ্কারের ফলে যদি উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতি হয়, তাহা হইলে নানাদিক দিয়া উৎপাদন-ব্যয় কমিয়া যায়। উৎপাদন-ব্যয় কমিলে সরবরাহ বেশী হয়। তৃতীয়তঃ, একটি দ্রব্যের সরবরাহ যোগাযোগ ও পরিবহন-ব্যবস্থার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। যোগাযোগ ও পরিবহন-ব্যবস্থার উন্নতি হইলে দূর অঞ্চল হইতে অল্পব্যয়ে দ্রব্য-সামগ্রী আমদানী করা সহজ হয়। এই ব্যবস্থার দ্বারা বিদেশ হইতেও যথেষ্ট পরিমাণে দ্রব্য আমদানী করিয়া সরবরাহ বৃদ্ধি করা যায়। চতুর্থতঃ, সরবরাহের পরিমাণ এবং সরবরাহ-মূল্য ব্যবসায়িগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় যে, ব্যবসায়িগণ মূল্য বৃদ্ধি করিয়া অধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। এজন্য প্রয়োজন হইলে তাহারা উৎপাদিত দ্রব্যের এক অংশ নষ্ট করিতেও দ্বিধা করে না। এইরূপে কৃত্রিম উপায়ে সরবরাহ-পরিমাণ হ্রাস করিয়া ব্যবসায়িগণ অধিক মুনাফা অর্জন করে। পঞ্চমতঃ, সরকার নানাকারণে কোন দ্রব্যের উৎপাদন-পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। অনেক সময় উৎপন্ন দ্রব্যের উপর কর ধার্য করিবার ফলে সরবরাহ-পরিমাণ হ্রাস

পায় এবং উৎপাদকগণ সরকার কর্তৃক ধার্য কর উৎপাদন-খরচার অঙ্গীভূত করিয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে। এই উপায়ে সরকার বিদেশী দ্রব্যের সরবরাহও নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। পরিশেষে বলা যায় যে, দেশে যদি বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আয়ের পার্থক্য হ্রাস পায়, তাহা হইলে দরিদ্রের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়া তাহাদের চাহিদা বৃদ্ধি করে। চাহিদা বাড়িলে স্বভাবতঃই যোগান বাড়ে। সুতরাং চাহিদা ও সরবরাহ দেশের ধনবণ্টন-ব্যবস্থার উপরও অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

প্রান্তিক উপযোগ, প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও মূল্য—Marginal Utility, Marginal Cost and Price.

মূল্যতত্ত্বের প্রথম কথা হইল যে, চাহিদার দিক দিয়া প্রান্তিক উপযোগ ও সরবরাহের দিক দিয়া প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়—এই উভয়ের পারস্পরিক প্রভাবে মূল্য নির্ধারিত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হইল যে, প্রান্তিক উপযোগ ও প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় কোন্ বিন্দুতে মূল্য নির্ধারিত হয়। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যে-বিন্দুতে ক্রেতার চাহিদা-মূল্য ও বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য সমান হয়, সেই বিন্দুতেই মূল্য নির্ধারিত হয় এবং ইহাকেই স্থিতাবস্থা মূল্য (Equilibrium price) বলা হয়। ক্রেতা একটি দ্রব্যের অধিক মাত্রা ক্রয় করিতে করিতে এমন একটি অবস্থায় উপনীত হয় যখন দ্রব্যটির শেষ মাত্রা ক্রয় করিয়া যে অতিরিক্ত সন্তোষ লাভ করে তাহা তাহার প্রদত্ত-মূল্যের সমান হয়। ইহার পর সে যদি দ্রব্যটির অতিরিক্ত আর এক মাত্রা ক্রয় করে, তাহা হইলে সে উক্ত অতিরিক্ত মাত্রা হইতে মূল্যাতিরিক্ত সন্তোষ পায় না, সুতরাং সে আর সে মাত্রা ক্রয় করিবে না। সুতরাং যে মাত্রা ক্রয় করা পর্যন্ত সে মূল্যাতিরিক্ত সন্তোষ পায়, সেই মাত্রাকে প্রান্তিক মাত্রা বা প্রান্তিক ক্রয় বলা হয়।

কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রান্তিক মাত্রা হইতে যে সন্তোষ বা উপযোগ পাওয়া যায়, সেই উপযোগের দ্বারাই যে মূল্য নির্ধারিত হয় তাহা নহে। প্রান্তিক উপযোগ প্রত্যক্ষভাবে শুধু ক্রেতার ক্রয়-ঔৎসুক্য সূচিত করিয়া পরোক্ষভাবে ক্রয়মূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তবে এ কথা সত্য যে, ক্রেতার চাহিদা মূল্যের পরিমাপক হইল প্রান্তিক উপযোগ—মূল্যের উপর মোট উপযোগের কোন প্রভাব নাই।

অপর পক্ষে বিক্রেতার বিক্রয়মূল্য তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় দ্বারা

নির্ধারিত হয়। সরবরাহের যে অংশ পর্যন্ত বিক্রয় করিলে উৎপাদকের উৎপাদন-ব্যয় চল্‌তি মূল্যের সমান হয়, সেই পর্যন্ত উৎপাদক বিক্রয় করিবে এবং তদতিরিক্ত বা তদপেক্ষা কম পরিমাণ উৎপাদন করিবে না। যে পরিমাণ উৎপাদন করিলে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা তাহার ব্যয় সংকুলান হয়, সেই পরিমাণ উৎপাদনকে প্রান্তিক উৎপাদন বলা হয় এবং এই প্রান্তিক উৎপাদন করিবার ব্যয়কে প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বলা হয়।

দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয় সেই বিন্দুতে, যে বিন্দুতে ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগ ও বিক্রেতার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় সমান হয়। ১২১ পৃষ্ঠার উদাহরণে দেখা যায় যে, মূল্য যখন ৮৲ টাকা তখন ক্রেতার চাহিদার পরিমাণ ও বিক্রেতার সরবরাহের পরিমাণ সমান হয়। ৮৲ টাকা মূল্য হইল ক্রেতার ক্রয়ের শেষ সীমা অর্থাৎ ৮৲ টাকা মূল্য হইলেই ৭০০টি দ্রব্য ক্রীত হইবে এবং অপর পক্ষে ৮৲ টাকা হইল বিক্রয়ের শেষ সীমা অর্থাৎ ৮৲ টাকা মূল্য হইলেই ৭০০টি দ্রব্য বিক্রীত হইবে। ক্রেতার (চাহিদার) দিক দিয়া ৮৲ টাকা ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগ সূচিত করে এবং বিক্রেতার (সরবরাহের) দিক দিয়া ৮৲ টাকা বিক্রেতার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় সূচিত করে। সুতরাং ৮৲ টাকা ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয়ের শেষ প্রান্ত এবং এই প্রান্তে দ্রব্যমূল্য চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক প্রভাবে স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। মূল্যের এই স্থিতাবস্থা প্রান্তিক উপযোগ ও প্রান্তিক উৎপাদন-খরচার প্রান্ত ব্যতীত অন্য কোথায়ও হইতে পারে না। সেইজন্য বলা হয় যে, প্রান্ত হইল সেই বিন্দু যে বিন্দুতে চাহিদা-মূল্য ও সরবরাহ-মূল্য সমান হইয়া স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই প্রান্তেই মূল্য নির্ধারিত হয়—কিন্তু এই প্রান্তদ্বারা মূল্য নির্ধারিত হয় না, কারণ, এই প্রান্তের অবস্থিতি পরিবর্তনশীল। চাহিদা ও সরবরাহের পরিবর্তনে এই প্রান্তের অবস্থিতিরও পরিবর্তন ঘটিতে পারে। এইজন্য মার্শাল বলিয়াছেন যে, "Marginal uses do not govern value, but are governed together with value by the conditions of demand and supply."

মূল্যনির্ধারণতত্ত্বের সময়-অনুযায়ী বিশ্লেষণের গুরুত্ব—Importance of the element of time in the Theory of value.

মূল্যনির্ধারণে চাহিদা ও যোগান—এই দুইটির কোন্‌টির প্রভাব অধিক সে

সম্পর্কে পূর্ববর্তী ধনবিজ্ঞানিগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ ছিল। ধনবিজ্ঞানী জেভন্‌সের মতে মূল্যনির্ধারণে চাহিদাই ইইল একমাত্র শক্তি, অপরপক্ষে রিকার্ডো যোগানের উপরই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক মার্শালই সর্বপ্রথম এই দুইটি মতের অসম্পূর্ণতা প্রমাণ করিয়া বলেন যে, চাহিদা ও যোগান এই উভয়ের প্রভাবেই মূল্য নির্ধারিত হয়। মূল্যনির্ধারণে সময়ের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করিয়া মার্শাল বলেন যে, চাহিদা বা যোগান এককভাবে মূল্য নির্ধারণ করে না। মূল্য উভয়ের প্রভাবেই নির্ধারিত হয়। তবে মূল্যনির্ধারণে চাহিদা ও যোগান—এই দুইটির আপেক্ষিক প্রভাব কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বেশী বা কম তাহা একমাত্র সময়ের ভিত্তিতে স্থির করা সম্ভব। স্বল্প-মেয়াদী বাজারে মূল্য-নিরূপণে চাহিদার প্রভাব বেশী, দীর্ঘ-মেয়াদী বাজারে যোগানের প্রভাব বেশী। মূল্যনিরূপণে চাহিদা ও যোগান কাহার প্রভাব কখন অধিক, তাহা একমাত্র সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। এইজন্য মার্শাল চাহিদা পরিবর্তিত হইলে যোগান পরিবর্তিত হইয়া পুনরায় স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হইবার সময়কে তিনভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটি কালে মূল্যনির্ধারণে চাহিদা ও যোগানের আপেক্ষিক প্রভাব বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মার্শাল নিম্নলিখিতভাবে সময়ের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন :—১। অতি স্বল্পকাল (Very short period), ২। স্বল্পকাল (Short period) ও ৩। দীর্ঘকাল (Long period)।

আসল কথা হইল যে, চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রভাবে মূল্য নির্ধারিত হয় এবং নির্ধারিত মূল্যে চাহিদা ও যোগান স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহার পর চাহিদা বা যোগানের যদি কোন পরিবর্তন ঘটে তাহা হইলে মূল্যেরও পরিবর্তন ঘটে। একটির পরিবর্তন ঘটিলে অন্যটির উপর তাহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। চাহিদার যদি পরিবর্তন ঘটে, তাহা হইলে যোগানও পরিবর্তিত হয় এবং নূতনভাবে চাহিদা ও যোগান স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু চাহিদা ও যোগানের এই নূতন স্থিতাবস্থায় আসিতে মূল্যেরও বহু পরিবর্তন ঘটে। কারণ চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেই সংগে সংগে যোগান বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। বর্ধিত চাহিদা পূরণের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হয় এবং যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, শ্রমিক প্রভৃতি উৎপাদনের অপরিহার্য উপাদানগুলি সংগ্রহ না করিয়া উৎপাদন-বৃদ্ধি সম্ভব নয়। এই কারণে উৎপাদন-বৃদ্ধি সময়সাপেক্ষ। এইজন্য চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে সংগে সংগে দাম বৃদ্ধি পায়। সুতরাং স্বল্পকালে মূল্যনির্ধারণে চাহিদার

প্রভাব অধিক। দীর্ঘ সময় পাইলে চাহিদা অনুযায়ী যোগান পরিবর্তন করা সম্ভব হয়, কিন্তু স্বল্প সময় হইলে চাহিদা অনুযায়ী 'যোগান পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না।

মূল্যের উপর উৎপাদন-বৃদ্ধির অনুপাতের প্রভাব—Influence of the Laws of Returns on value.

উৎপাদনের পরিমাণ সর্বক্ষেত্রে সমান হয় না এবং এই কারণে উৎপাদন-ব্যয় কোথায়ও বৃদ্ধি পায়, কোথায়ও সমানুপাতিক হয়, আর কোথায়ও বা উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কৃষিকার্য প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে গেলে উৎপাদন-ব্যয় শেষ পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায়। ইহাকে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-সূত্র বা ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয় বলা হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও উৎপাদন-ব্যয় উৎপাদন পরিমাণের সমানুপাতিক হয়, অর্থাৎ প্রতি অতিরিক্ত উৎপাদন-মাত্রার জন্য ব্যয় হ্রাস-বৃদ্ধি না পাইয়া সমান থাকে। ইহাকে সমানুপাতিক উৎপাদনের সূত্র (Law of Constant Returns) বলা হয়। শিল্প ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শিল্পে সাধারণতঃ দেখা যায় যে, অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগের ফলে শিল্পে সু-ব্যবস্থাপনা প্রবর্তিত হইয়া আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনাসম্পর্কিত ও বাহ্যিক কতকগুলি ব্যয়-সংকোচ (Internal and external economies) হয়। এই ব্যয়-সংকোচ জন্য শিল্প-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়। অর্থাৎ অতিরিক্ত মাত্রা উৎপাদনের খরচা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। এখন প্রশ্ন হইল যে, এই তিনটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য কি নীতিতে নির্ধারিত হইবে।

১। ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের ক্ষেত্রে মূল্যনির্ধারণ—Value under Increasing Cost.

ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদনে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন সূত্র প্রযোজ্য, উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে অতিরিক্ত মাত্রা উৎপাদন করিবার ব্যয় ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায়। প্রতি অতিরিক্ত মাত্রা উৎপাদনের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হয় অর্থাৎ প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে সরবরাহ বৃদ্ধি করা যায়, কিন্তু এই বর্ধিত সরবরাহের জন্য বর্ধিত হারে ব্যয় হয়। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে চাহিদার বৃদ্ধি হইলে মূল্য বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যবস্থায় মূল্য প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় (অর্থাৎ শেষ মাত্রা উৎপাদনের জন্য যে ব্যয় হয়) দ্বারা নির্ধারিত হয়।

২। সমানুপাতিক উৎপাদন-ব্যয়ের ক্ষেত্রে মূল্যনির্ধারণ—Value under Constant Costs.

যখন কোন দ্রব্যের উৎপাদন সমানুপাতিক উৎপাদন-ব্যয় অনুসারে হয় অর্থাৎ উৎপাদনের পরিমাণ-নিরপেক্ষভাবে প্রতি অতিরিক্ত মাত্রা উৎপাদনের ব্যয় সমানুপাতিক হয়, তখন প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস-বৃদ্ধি না পাইয়া সমান থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে মূল্যনির্ধারণে চাহিদার প্রভাবই অধিক হয় এবং শেষ পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় ও গড় উৎপাদন-ব্যয় সমান হয়। চাহিদার পরিবর্তন ঘটিলে সরবরাহের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিতে পারে, কিন্তু মূল্যের কোন পরিবর্তন ঘটে না।

৩। ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের ক্ষেত্রে মূল্যনির্ধারণ—Value under Increasing Returns or Diminishing Costs.

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয়ের ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ যতই বৃদ্ধি পায়, উৎপাদন-ব্যয়ও ততই হ্রাস পায় অর্থাৎ প্রতি অতিরিক্ত মাত্রা উৎপাদন করিবার ব্যয় কম হয়। সুতরাং কোন সু-পরিচালিত শিল্পে উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন-ব্যয় সর্বাধিক কম হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য কি নীতির দ্বারা নির্ধারিত হইবে, ইহাই হইল সমস্যা। দ্রব্যমূল্য যদি এই সু-পরিচালিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-ব্যয়ের (যাহা সর্বনিম্ন ব্যয়) দ্বারা নির্ধারিত হয়, তাহা হইলে এই ব্যবসায়ের অপেক্ষাকৃত কমদক্ষ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারে না। সুতরাং ক্রমবর্ধমান উৎপাদনজাত দ্রব্যবিক্রয়ের ক্ষেত্রে সু-পরিচালিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সর্বনিম্ন উৎপাদন-ব্যয়ের দ্বারা দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হইতে পারে না। অপর পক্ষে, সর্বাপেক্ষা কমদক্ষ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয়ের দ্বারাও মূল্য নির্ধারিত হইতে পারে না, কারণ এরূপ শিল্পপ্রতিষ্ঠান হয়ত আদৌ কোন মুনাফা অর্জন করিতে সক্ষম না হইতে পারে। সুতরাং প্রশ্ন

হইল যে, যে-সকল দ্রব্যের উৎপাদনক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-ব্যয় নীতি প্রযোজ্য, সে-সকল ক্ষেত্রে দীর্ঘ-মেয়াদী স্বাভাবিক দর কি নীতি অনুসারে স্থিরীকৃত হইবে, এই সমস্যা সমাধানের জন্য অধ্যাপক মার্শাল প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের (Representative Firm) কল্পনার সাহায্যে এই সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

সংক্ষিপ্তসার

বাজার

বাজার বলিতে ধনবিজ্ঞানে কোন নির্দিষ্ট স্থান বুঝায় না। বাজার বলিলে এক বা একাধিক দ্রব্য বুঝায় যাহার ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে এবং এই প্রতিযোগিতার ফলে দ্রব্যটির মূল্য সমান হয়। প্রতিযোগিতা যদি স্থানীয় ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহা হইলে তাহাকে স্থানীয় বাজার বলা হয়। প্রতিযোগিতার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাইলে তাহাকে জাতীয় বাজার ও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র যদি পৃথিবীব্যাপী প্রসারিত হয় তাহাকে আন্তর্জাতিক বাজার বলা হয়। আবার প্রতিযোগিতার স্থায়িত্বের দিক দিয়া অর্থাৎ সময়ের দিক দিয়া বাজারকে স্বল্প-মেয়াদী, দীর্ঘ-মেয়াদী বাজার বলা হয়।

বাজারের বিস্তৃতি দ্রব্যটির চাহিদার ব্যাপকতা, দ্রব্যটির নমুনা-যোগত্যা, স্থানান্তর-যোগ্যতা, স্থায়িত্ব প্রভৃতির উপর নির্ভর করে।

বিনিময়-মূল্য ও অর্থ-মূল্য

ব্যবহারিক মূল্য অর্থাৎ উপযোগ এবং বিনিময়-মূল্য এই দুইটি অর্থে 'মূল্য' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধনবিজ্ঞানে মূল্য শব্দটি বিনিময়-মূল্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। দুইটি দ্রব্যের বিনিময়ের অনুপাত যখন অর্থদ্বারা পরিমাপ করা হয়, তখন তাহাকে অর্থ-মূল্য বা দাম বলা হয়।

প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মূল্য-নির্ধারণ

একটি দ্রব্যের মূল্য দ্রব্যটির চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায়

নির্ধারিত হয়। দ্রব্য-ক্রয়কালে প্রত্যেক ক্রেতার দ্রব্যটির জন্য একটি সর্বোচ্চ মূল্য ঠিক থাকে এবং বিক্রেতারও বিক্রয়ের একটি সর্বনিম্ন মূল্য থাকে। ক্রেতা-বিক্রেতার দর-কষাকষির মধ্য দিয়া যখন ক্রেতার সর্বোচ্চ ক্রয়-মূল্য ও বিক্রেতার সর্বনিম্ন বিক্রয়-মূল্য সমান হয়, তখন এই মূল্যকে স্থিতাবস্থা মূল্য বলা হয়। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, মূল্য-নির্ধারণে চাহিদা ও সরবরাহের যেরূপ প্রভাব, চাহিদা ও সরবরাহের উপর মূল্যের সেইরূপ প্রভাব। মূল্য, চাহিদা ও সরবরাহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

সময় যদি কম হয়, তাহা হইলে দ্রব্যমূল্য প্রধানতঃ চাহিদার দ্বারা ঠিক হয়। কারণ অল্প সময়ের মধ্যে সরবরাহের পরিমাণ পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। আর সময় যদি দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে সরবরাহের পরিমাণ চাহিদা অনুসারে পরিবর্তন করা সম্ভব হয় এবং এরূপক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য প্রধানতঃ সরবরাহ দ্বারা নির্ধারিত হয়।

বাজার দর ও স্বাভাবিক দর

স্বল্প-মেয়াদে চাহিদা ও যোগানের সাময়িক সমতা হইয়া যে দাম ঠিক হয়, তাহাকে বাজার-দর বলে। দীর্ঘ-মেয়াদে চাহিদা ও যোগানের স্থায়ী সমতা হইয়া যে দাম ঠিক হয়, তাহাকে স্বাভাবিক দর বলে।

একচেটিয়া মূল্য

একচেটিয়া ব্যবসায়ে একজন বিক্রেতা বা কয়েকজন বিক্রেতা সমগ্র সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে। চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারিলেও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিয়া একচেটিয়া ব্যবসায়ী সর্বাধিক মুনাফা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করে। এরূপ ক্ষেত্রে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ী এরূপভাবে তাহার উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে যে, সে সর্বাধিক-মুনাফা লাভ করিতে পারে। সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিয়া সে এরূপভাবে মূল্য ধার্য করে যাহাতে তাহার সবচেয়ে বেশী লাভ হয়। অনেক সময়ে সর্বাধিক লাভের উদ্দেশ্যে একচেটিয়া ব্যবসায়ী একই দ্রব্যের বিভিন্ন মূল্য ধার্য করে।

মূল্য-পরিবর্তন ও আয়-পরিবর্তন

মূল্য কমিলে চাহিদা বাড়ে এবং মূল্য বাড়িলে চাহিদা কমে। আয় বাড়িলে

চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং আয় কমিলে চাহিদা হ্রাস পায়। আয়ের পরিবর্তনে চাহিদার যে পরিবর্তন ঘটে, তাহা সবক্ষেত্রে চাহিদার পরিমাণকে সমানভাবে প্রভাবিত করে না।

সরবরাহ কিসের উপর নির্ভর করে

সরবরাহ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে :

১। উৎপাদন-ব্যয়, ২। উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তন, ৩। যোগাযোগ ও পরিবহন-ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. What is meant by perfectly competitive market? Explain how the value of a commodity is determined in such a market. H. S. (Com.), 1960

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার কাহাকে বলে? পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মূল্য কিভাবে স্থির হয় তাহা আলোচনা কর।

উঃ—পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য কিভাবে স্থির হয়—ইহাই হইল আলোচ্য বিষয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলিতে আমরা বুঝি বাজারে বহু ক্রেতা ও বহু বিক্রেতা একই দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিতেছে এবং এই প্রতিযোগিতার ফলে বাজারে দ্রব্যটির একই মূল্য বর্তমান রহিয়াছে। বাজারে যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে তাহা হইলে চাহিদা ও যোগানের দ্বারা মূল্য নির্ধারিত হয়—শুধুমাত্র চাহিদা বা শুধুমাত্র যোগানের দ্বারা মূল্য স্থির হইতে পারে না। ক্রেতার দিক দিয়া তাহার চাহিদা-মূল্য নির্ভর করে ক্রেতার নিকট দ্রব্যটির উপযোগের দ্বারা। ক্রেতার নিকট দ্রব্যটির উপযোগ যত বেশী হইবে, ক্রেতা তত বেশী পরিমাণ দ্রব্য কিনিতে উৎসুক হইবে। কিন্তু দ্রব্যটির যোগান যদি বৃদ্ধি না হয় তাহা হইলে মূল্য বৃদ্ধি পাইবে—আবার যোগান যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে মূল্য কমিবে এবং এইরূপে মূল্য দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগের সমান হইবে। অপর পক্ষে দ্রব্যটির যোগান দ্রব্যটির উৎপাদন-ব্যয়ের উপর নির্ভর করে। চলতি দর যদি উৎপাদন-ব্যয়ের অধিক হয় তাহা হইলে উৎপাদক বেশী লাভের আশায় বেশী পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবে। কিন্তু বেশী উৎপাদনের ফলে মূল্য কমিবে ও শেষ পর্যন্ত মূল্য উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হইবে।

এইরূপে চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রভাবে মূল্য নির্ধারিত হয়। যে মূল্যে বাজারের সমগ্র চাহিদা মিটিবে ও সমগ্র যোগান বিক্রীত হইবে, সেই মূল্যকে স্থিতাবস্থা মূল্য (Equilibrium price) বলা হয়। এই মূল্যে ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগ ও বিক্রেতার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় সমান হয়।

দ্রব্যমূল্য চাহিদা ও যোগান—এই উভয়ের যুগ্ম প্রভাবে নির্ণীত হয়। তবে মূল্যের উপর চাহিদা ও যোগানের প্রভাব সব সময়ে সমান হয় না। যদি অল্প সময় ধরা যায়, অর্থাৎ যদি চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ হ্রাস-বৃদ্ধি করা না যায় তবে মূল্য-নির্ধারণে চাহিদার প্রভাব বেশী হয়। কিন্তু সময় দীর্ঘ হইলে জিনিসের যোগান হ্রাস-বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় এবং জিনিসের দাম জিনিসের সরবরাহ-(উৎপাদন) ব্যয়ের সমান হয়। সুতরাং দীর্ঘ সময়ে মূল্যের উপর সরবরাহের প্রভাব বেশী হয়।

2. What is the distinction between market value and normal value? Explain how normal value of a thing is determined in a competitive market.

H. S. (Com.), 1962

বাজার-দর ও স্বাভাবিক দরের পার্থক্য কর। বাজার-দর কিভাবে স্থির হয় আলোচনা কর।

উঃ—বাজারে নির্দিষ্ট সময়ে কোন একটি দ্রব্য যে মূল্যে বিক্রীত হয় তাহাকে বাজার দর বলা হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে যোগান সাধারণতঃ অপরিবর্তিত থাকে এবং যোগান অপরিবর্তিত থাকিলে চাহিদার প্রভাবে দ্রব্যটির যে মূল্য হয় তাহাই বাজার-দর। বাজার-দর দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়।

যে মূল্যে চাহিদা ও যোগানের দীর্ঘকালীন সমন্বয় হয়, তাহাকে স্বাভাবিক দর বলা হয়। স্বাভাবিক মূল্য সাধারণতঃ উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। সুতরাং বাজার-দর হইল বাস্তব মূল্য, আর স্বাভাবিক দর হইল অভিপ্রেত মূল্য অর্থাৎ যে মূল্য নির্দিষ্টকালে চাহিদা ও সরবরাহের স্থায়ী সমন্বয়ে নির্ধারিত হয়। বাজার-দর এই স্বাভাবিক দরের কাছাকাছি ওঠা-নামা করে, কদাচিৎ এই স্বাভাবিক মূল্যের সমান হয়।

3. What is monopoly? How is monopoly price determined?

H. S. (Hu.), Comp. 1961

একচেটিয়া ব্যবসায় কাহাকে বলে? একচেটিয়ার ক্ষেত্রে মূল্য কিভাবে স্থির হয়?

উঃ—যখন একটি লোক বা একটি প্রতিষ্ঠান কোন একটি দ্রব্যের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে, তখন তাহাকে একচেটিয়া কারবার বলা হয়। কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান হইল একচেটিয়া কারবারের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একচেটিয়া কারবারী যে মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করে তাহাকে একচেটিয়া মূল্য বলা হয়। একচেটিয়া কারবারী যোগান পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলেও চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। তাহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল সর্বোচ্চ লাভ করা। এইজন্য সে এরূপভাবে তাহার একচেটিয়া দ্রব্যটির মূল্য ধার্য করিবে যাহাতে তাহার সবচেয়ে বেশী লাভ হয়।

একচেটিয়া ব্যবসায়ী অধিক মূল্য ধার্য করিলে তাহার বিক্রয়ের পরিমাণ কমিয়া লাভের পরিমাণ কমিতে পারে, আবার অল্পমূল্য ধার্য করিলে বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িলেও লাভের পরিমাণ নাও বাড়িতে পারে। সুতরাং সে সর্বোচ্চ মূল্য ধার্য করিতে পারে না, আবার সর্বনিম্ন মূল্যও ধার্য করিতে পারে না। সে এরূপ মূল্য ধার্য করিবে যাহাতে তাহার লাভের অঙ্ক সবচেয়ে বেশী হয়—ক্রেতা সাধারণের সে দামে সুবিধা হউক আর অসুবিধা হউক।

4. Define a market. What are the conditions for a wide market for a commodity ? H. S. (Com.), 1962 Comp.

বাজারের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। বাজারের বিস্তৃতি কিসের উপর নির্ভর করে ?

উঃ—ধনবিজ্ঞানে বাজার বলিতে কোন নির্দিষ্ট স্থান বুঝায় না, কোন দ্রব্যের বাজার বুঝায়, যেমন পাটের বাজার, সোনা-রূপার বাজার। ধনবিজ্ঞানে বাজারের অর্থ হইল এক বা একাধিক দ্রব্য, যাহার ক্রয়-বিক্রয়ে বহু সংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে এবং এই প্রতিযোগিতার ফলে বাজারে দ্রব্যটি একটিমাত্র দামে বিক্রয় হয়। সুতরাং বাজারের বৈশিষ্ট্য হইল— ১। একদল ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকিবে, ২। ক্রেতা-বিক্রেতাগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকিবে, ৩। প্রতিযোগিতার ফলে বাজারের দ্রব্যটি একই দামে বিক্রয় হইবে, ৪। দ্রব্যটি সমজাতীয় হইবে।

কোন দ্রব্যের বাজারের আয়তন বড় বা ছোট হইতে পারে। বাজারের বিস্তৃতি দ্রব্যটির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির উপর নির্ভর করে।

১। চাহিদার সংকীর্ণতা বা ব্যাপকতা—যদি দ্রব্যটির চাহিদা দেশব্যাপী বা পৃথিবীব্যাপী হয়, তাহা হইলে সে সব দ্রব্যের, যেমন, পাট, সোনা-রূপার বাজার খুব বড় হয়, আবার তরি-তরকারির চাহিদা সংকীর্ণ স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে বলিয়া ইহার বাজার খুব ছোট (স্থানীয়) হয়।

২। দ্রব্যটি স্থায়ী বা পচনশীল—দুধের বাজার ছোট কারণ ইহা সহজেই নষ্ট হয়, কিন্তু সোনা-রূপার বাজার বড় কারণ এইগুলি সহজে নষ্ট হয় না।

৩। স্থানান্তরযোগ্যতা—কেবল ব্যাপক চাহিদা ও স্থায়িত্ব থাকিলেই দ্রব্যের বাজার বড় হয় না। ইট স্থানান্তর করা বহু ব্যয়সাধ্য বলিয়া দ্রব্যটির ব্যাপক চাহিদা ও স্থায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও ইহার বাজার নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে।

৪। নমুনা পাঠাইবার সম্ভাবনা—জিনিস কিনিবার পূর্বে ক্রেতা যদি জিনিসটির নমুনা দেখিয়া পছন্দ করিবার সুযোগ পায় তাহা হইলে দূর দেশের দ্রব্যও কেনা যায়। সুতরাং যে সমস্ত দ্রব্যের নমুনা ক্রেতাকে দেখান সম্ভব, সে সমস্ত দ্রব্যের বাজার বড় হয়। পাট, তুলা, গম প্রভৃতির নমুনা দেখিয়া আন্তর্জাতিক ক্রয়-বিক্রয় চলে।

অষ্টম অধ্যায়

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

(International Trade)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাহাকে বলে—What is International Trade

যখন বিভিন্ন দেশের মধ্যে দ্রব্যের বিনিময় হয়, তখন এই বিনিময়কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা একই দেশের অধিবাসী বলিয়া একই আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন। ক্রেতা ও বিক্রেতা যে অর্থের মাধ্যমে বিনিময়কার্য নিষ্পন্ন করে তাহাও একই সরকার কর্তৃক প্রচলিত অর্থ। সুতরাং পরিবর্তন করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী ও ভিন্ন ভিন্ন সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। ইহা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিবার জন্য বিনিময়-কার্যে অসুবিধা হয়।

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়, শ্রমবিভাগই হইল আভ্যন্তরীণ বিনিময়-কার্যের প্রধান কারণ। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন-ক্ষমতার আপেক্ষিক পার্থক্যের জন্যই আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রয়োজন হয়। মুচি যেরূপ দক্ষতার সহিত জুতা তৈয়ারী করিতে পারে, কৃষক সেরূপ দক্ষতার সহিত জুতা তৈয়ারী করিতে পারে না। অনুরূপভাবে মুচিও কৃষকের মত দক্ষতার সহিত ধান উৎপাদন করিতে পারে না। কাজেই মুচি জুতা তৈয়ারী করে ও কৃষক ধান উৎপাদন করে এবং পারস্পরিক বিনিময় দ্বারা উভয়ের চাহিদা মিটায়। অনুরূপভাবে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন-ক্ষমতার পার্থক্যের জন্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘটিয়া থাকে।

ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ—Territorial Division of Labour

সকল ব্যক্তিই যদি সমান দক্ষতার সহিত তাহাদের প্রয়োজনীয় সব দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারিত, তাহা হইলে দ্রব্য-বিনিময়ের কোন প্রয়োজন হইত না। অনুরূপভাবে সকল দেশেই যদি সমান সুবিধাজনক শর্তে সমস্ত দ্রব্য উৎপাদন করিতে

পারিত, তাহা হইলে আর দেশগুলির মধ্যে দ্রব্য-বিনিময়ের (আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের) কোন প্রয়োজন হইত না। ব্যক্তির ন্যায় প্রত্যেক দেশই কতকগুলি দ্রব্য-উৎপাদনে বিশেষ সুবিধার অধিকারী থাকে এবং এই বিশেষ সুবিধাগুলির জন্যই একটি দেশ অপর দেশ হইতে কম খরচায় ঐ দ্রব্যগুলি উৎপাদন করিতে পারে বলিয়া অন্যান্য দেশ উক্ত দ্রব্যগুলি ঐ দেশ হইতে ক্রয় করে। পাট-উৎপাদনে ভারতের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে এবং এই বিশেষ সুবিধাগুলির জন্য ভারতে পাট উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। এই কারণে অন্যান্য দেশগুলি ভারত হইতে কাঁচা পাট ও পাট-জাত দ্রব্য ক্রয় করে।

ইংলণ্ডের যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিবার বিশেষ সুবিধা আছে এবং এই সুবিধা-গুলির জন্য ইংলণ্ডে যন্ত্রপাতি নির্মাণের ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। এই কারণে ভারত ও অন্যান্য দেশ ইংলণ্ড হইতে যন্ত্রপাতি ক্রয় করে। সুতরাং মুচি যেরূপ জুতা তৈয়ারী এবং চাষী যেমন ধান উৎপাদন করে, ভারত সেইরূপ পাট উৎপাদন করে এবং ইংলণ্ড যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করে। এইরূপ ভৌগোলিক শ্রমবিভাগের ফলে ইংলণ্ড কম খরচায় ভারত হইতে খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল পায় এবং ভারতও ইংলণ্ড হইতে কম দরে যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে পারে। এই নীতিকে আপেক্ষিক উৎপাদন ব্যয়নীতি (Law of Comparative Cost) বলা হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে যে বাণিজ্য চলে তাহা প্রধানতঃ ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ভৌগোলিক শ্রমবিভাগের কারণ ঃ

ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশে যে উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, তাহার প্রধান কারণ হইল শ্রম ও মূলধনের দেশান্তরে গতিশীলতার অভাব। শ্রমিকগণ সাধারণতঃ বিদেশের নানা অনিশ্চয়তার জন্য বিদেশে যাইতে চায় না। মূলধনের মালিকও ঐ একই কারণে বিদেশে তাঁহার পুঁজি খাটাইতে ইচ্ছুক নহেন। শ্রম ও মূলধনের এই গতিশীলতার অভাবের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন দেশে একই দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয়ের পার্থক্য হয়। এই কারণে কোন দেশ কোন একটি দ্রব্যের উৎপাদনে অধিকতর সুবিধার অধিকারী, আর কোন দেশের তত সুবিধা নাই।

শ্রম ও মূলধনের গতিশীলতার অভাব ব্যতীত নৈসর্গিক কারণেও দেশগুলির

আপেক্ষিক উৎপাদন-দক্ষতার পার্থক্য হইতে পারে। কোন কোন দেশ আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত ও ভূমির বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশেষ বিশেষ কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে, আবার কোন কোন দেশ খনিজ পদার্থের প্রাচুর্যের কারণে নানা শিল্পজাত দ্রব্য-উৎপাদনে বিশেষ সুবিধার অধিকারী হইতে পারে। এই সমস্ত সুবিধা বা অসুবিধা এক দেশ হইতে অন্য দেশে স্থানান্তর করা যায় না বলিয়া দেশগুলির আপেক্ষিক সুবিধা বা অসুবিধাগুলি সমান থাকে এবং ভৌগোলিক ভিত্তিতে উৎপাদন-ব্যবস্থা চলিতে থাকে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা—Advantages of International trade

১। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বারা একটি দেশ ইহার প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিতে পারে। একটি দেশ নিজে যাহা উৎপাদন করিতে পারে না, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দ্বারা সেই দ্রব্য বিদেশ হইতে ক্রয় করিয়া নিজের অভাব পূরণ করিতে পারে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে অন্যান্য দেশগুলি ভারত ও পাকিস্তান হইতে পাট সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়।

২। যে দেশে কোন দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় অধিক, সে দেশ দেশের মধ্যে উক্ত দ্রব্য উৎপাদন না করিয়া স্বল্প ব্যয়ে অন্য দেশ হইতে উক্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারে।

৩। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য ভৌগোলিক শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে যে উৎপাদন-কার্য পরিচালিত হয়, তাহার ফলে প্রত্যেক দেশ সেই সেই দ্রব্যের উৎপাদনে তাহার শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ করে, যে যে দ্রব্যের উৎপাদনে তাহার সর্বাধিক সুবিধা আছে। এইরূপ ভৌগোলিক শ্রমবিভাগের ফলে প্রত্যেক দেশের শ্রম ও মূলধনের সর্বাধিক সু-ব্যবহার হয় এবং ইহার ফলে উৎপাদন-দক্ষতা বৃদ্ধি পাইয়া উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়।

৪। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে পৃথিবীব্যাপী প্রতিযোগিতা চলে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ফলে একই দ্রব্যের মূল্য সর্বত্র সমান হইবার প্রবণতা দেখা যায়। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য উৎপাদক সংঘ, যৌথ ব্যবসায় প্রভৃতি একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়া মূল্য-বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিত হয়।

৫। দুর্ভিক্ষের সময় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বারা যে দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য সহজলভ্য, সেখান হইতে খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশের জনগণের জীবনরক্ষা করা সম্ভব হয়।

৬। অর্থনৈতিক সুবিধা ছাড়াও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আরও কতকগুলি সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দেশগুলি পরস্পরের সংস্পর্শে আসে। এই পারস্পরিক সংস্পর্শের ফলে তাহাদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। তাহাদের মধ্যে দ্রব্যের আদান-প্রদান ব্যতীতও ভাবেরও আদান-প্রদান হয়। ফলে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাইয়া পারস্পরিক বিরোধের সম্ভাবনা দূর করে।

অসুবিধা—Disadvantage

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কতকগুলি সুবিধা থাকিলেও ইহা সম্পূর্ণরূপে দোষ-বিমুক্ত নহে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কতকগুলি অসুবিধাও দেখিতে পাওয়া যায় :—

১। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য একটি দেশের স্বয়ংসম্পূর্ণতা বিনষ্ট করে। ইহার ফলে একটি দেশ অপর একটি দেশের উপর এরূপভাবে নির্ভরশীল হয় যে, যুদ্ধ ঘটিলে বা অন্য কোন কারণে ঐ দেশের সহিত সম্পর্ক ছেদ হইলে আমদানী-কৃত অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যগুলির অভাবে প্রথম দেশটিকে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়।

২। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বারা বিদেশ হইতে দ্রব্য আমদানীর ফলে দেশীয় শিল্পগুলির প্রসার ঘটিতে পারে না। দেশীয় শিল্পগুলির প্রসার না হইলে স্থানীয় শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয় না। ফলে দেশে বেকার সমস্যা দেখা দেয়।

৩। অনেক সময় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বারা দেশে মদ্য প্রভৃতি নানা জাতীয় অনিষ্টকর দ্রব্যের আমদানী হয়। এই অনিষ্টকর দ্রব্যগুলি ব্যবহারের জন্য দেশের নৈতিক মানের অবনতি ঘটে।

৪। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে যে দেশ বিদেশ হইতে আমদানী করে, সে দেশ যে শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা নহে, যে দেশ বিদেশে রপ্তানী করে সে দেশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুনাফার আশায় অত্যধিক পরিমাণে রপ্তানী করিবার ফলে দেশের খনিজ, বনজ প্রভৃতি প্রকৃতিদত্ত সম্পদগুলি নিঃশেষিত হইয়া দেশের অর্থনৈতিক

ভিত্তি দুর্বল হইবার সম্ভাবনা থাকে। এতদ্ব্যতীত বিদেশের চাহিদার উপর নির্ভর করিয়াই উৎপাদন-কার্য প্রধানতঃ পরিচালিত হয়। কোন কারণে বিদেশী চাহিদা হ্রাস পাইলে অত্যুৎপাদন (over-production) সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়।

৫। অর্থনৈতিক অসুবিধা ব্যতীতও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আরও কতিপয় অসুবিধা পরিদৃষ্ট হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে ক্রয় ও বিক্রয় ব্যাপারে তীব্র প্রতিযোগিতা চলে। কাঁচামাল ক্রয় করিবার ও শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশগুলি নূতন নূতন বাজার অন্বেষণ করিতে গিয়া বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলে তাহার ফলে অনেক সময় যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠে।

বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত—Balance of Trade

একটি দেশ হইতে অপর দেশে যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী পাঠান হয় তাহাকে রপ্তানী (Export) বলা হয় এবং বিদেশ হইতে স্বদেশে যে সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী আনা হয় তাহাকে আমদানী (Import) বলা হয়। বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত বলিতে এই আমদানী ও রপ্তানীর পার্থক্য বুঝায়। একটি দেশ যদি অধিক পরিমাণ মূল্যের দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করে ও কম পরিমাণ মূল্যের দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করে তাহা হইলে সে দেশের আমদানীর মূল্য অপেক্ষা রপ্তানীর মূল্য বেশী হইয়া সে দেশ পাওনাদার হয়। আমদানী মূল্য অপেক্ষা রপ্তানী মূল্য বেশী হইলে তাহাকে **অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত** (Favourable Balance of Trade) বলা হয়। আর রপ্তানী মূল্য অপেক্ষা আমদানী মূল্য বেশী হইলে তাহাকে **প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত** (Adverse Balance of Trade) বলা হয়। প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত হইলে সে দেশ দেনাদার দেশে পরিণত হয়।

লেন-দেনের উদ্বৃত্ত—Balance of Payments

দুইটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য যখন পণ্যদ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানীতে সীমাবদ্ধ থাকে, তখন আমদানী ও রপ্তানীর এই তালিকা দৃশ্য বা প্রত্যক্ষ বাণিজ্য তালিকা (Visible Items of Trade) নামে অভিহিত হয়। কিন্তু দুইটি দেশের মধ্যে আদান-প্রদান শুধুমাত্র পণ্যদ্রব্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। পণ্যদ্রব্য ব্যতীতও দুইটি দেশের মধ্যে নানা প্রকারের লেন-দেন চলে। এই নানা প্রকারের লেন-দেনগুলি হইল :

১। বিদেশ হইতে গৃহীত মূলধনের আসল ও সুদ প্রদান, ২। বিদেশীয়গণকে দেশের কোন কার্যে নিযুক্ত করিলে তাহাদের বেতন ও পেন্সন প্রদান, ৩। বিদেশী জাহাজ ব্যবহার করিলে তাহার মাশুল প্রদান, ৪। বিদেশী ব্যাঙ্ক ও ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কার্য বাবদ অর্থপ্রদান, ৫। ভ্রমণ ও শিক্ষার জন্য বিদেশে গিয়া যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, ৬। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ অথবা অপর দেশকে সাহায্য বাবদ দেয় অর্থপরিমাণ।

পণ্যদ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী ব্যতীতও দুইটি দেশের মধ্যে উপরি-উক্ত নানা প্রকারের লেন-দেন হইয়া থাকে। পণ্যদ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানীর তালিকা ছাড়াও দুইটি দেশের মধ্যে উপরি-উক্ত দেনা-পাওনার যে হিসাব, তাহাকে অদৃশ্য বা পরোক্ষ বাণিজ্য তালিকা (Invisible Items of Trade) বলা হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, পণ্যদ্রব্যের মূল্য ব্যতীতও নানা কারণে দুইটি দেশের মধ্যে দেনা-পাওনা থাকিতে পারে। দেনা-পাওনার এই সমগ্র হিসাবের পার্থক্যকেই লেন-দেনের উদ্বৃত্ত (Balance of payments) বলা হয়। আর দুইটি দেশের মধ্যে এই সমগ্র পরিমাণ লেন-দেন শেষ পর্যন্ত সমান হইতেই হইবে। রপ্তানী দ্রব্য আমদানী অপেক্ষা যদি বেশী বা কম হয়, তাহা হইলে অন্য বাবদ দেনা-পাওনা দিয়া তাহা মিটান হয়।

আমদানী-রপ্তানীর সমতা—Equality of Exports and Imports

আমদানী-রপ্তানীর সমতা বলিলে এ-কথা বুঝায় না যে, সমগ্র রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য সমগ্র আমদানী দ্রব্যের মূল্যের সমান হইবে। আমদানী-রপ্তানীর সমতা বলিলে বুঝায় যে, একটি দেশের বিদেশে দেয় মোট টাকা ও বিদেশ হইতে প্রাপ্য মোট টাকার পরিমাণ শেষ পর্যন্ত সমান হইবে। কারণ একটি দেশ বিদেশের সহিত শুধু মাল কেনা-বেচা করে না। মাল কেনা-বেচা ছাড়াও আরও অনেক কারণে বিদেশের সহিত লেন-দেন চলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ভারত স্বাধীন হইবার পূর্বে ইংলণ্ডের সহিত ভারতের যে বাণিজ্য চলিত তাহা বিশ্লেষণ করিলে লেন-দেনের উদ্বৃত্ত সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণা হইতে পারে। তখন ভারতে দৃশ্য আমদানী তালিকা হইতে দৃশ্য রপ্তানী তালিকা বেশী হইলেও ভারতে কোন বাণিজ্য উদ্বৃত্ত থাকিত না। কারণ ভারত ইংলণ্ড হইতে যে পরিমাণ অদৃশ্য পণ্য আমদানী করিত তাহার মূল্য ভারত অনেক দৃশ্য রপ্তানীর দ্বারা শোধ করিত।

সেই সময় ভারতের দৃশ্য রপ্তানীগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত তালিকাগুলি ছিল, যথা, ১। ভারত হইতে ধান, পাট, তৈলবীজ, চামড়া প্রভৃতি কাঁচামাল। অদৃশ্য রপ্তানীর মধ্যে ছিল ইংরাজ ভ্রমণকারীদের ও ইংরাজ মিশনারীদের ভারতে ব্যয়িত অর্থপরিমাণ। অন্যদিকে ভারত ইংলণ্ড হইতে নিম্নলিখিত দৃশ্য ও অদৃশ্য পণ্য আমদানী করিত। দৃশ্য পণ্য: যন্ত্রপাতি, ঔষধ প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্য। অদৃশ্য পণ্য: ইংলণ্ড হইতে ভারতের গৃহীত ঋণ ও ঋণের সুদ, ভারতে নিযুক্ত ইংরাজ কর্মচারীদের বেতন, পেন্সন, বিলাতি কোম্পানীগুলির মুনাফা, ভারত-সচিবের ভারত-শাসন খাতে ব্যয়, বিলাতি জাহাজের মাশুল, বিলাতি ব্যাঙ্কের কমিশন, ভারতীয় ছাত্র ও অন্যান্য ভ্রমণকারীর বিলাতে ব্যয়। এইরূপে ভারত এত বেশী মূল্যের অদৃশ্য পণ্য বিলাত হইতে আমদানী করিত যে, প্রতি বৎসর ভারতকে বিপুল পরিমাণ মূল্যের দৃশ্য পণ্য দ্বারা বিলাত হইতে আমদানীকৃত অদৃশ্য পণ্যের মূল্য দিয়া লেন-দেনের সমতা রক্ষা করিতে হইত। বর্তমানে অবশ্য দেশ স্বাধীন হওয়ার ফলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ—Free Trade and Protection

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেশগুলি সাধারণতঃ দুইটি নীতি অনুসরণ করিয়া থাকে, যথা, (১) অবাধ বাণিজ্য নীতি ও (২) সংরক্ষণ নীতি।

১। অবাধ বাণিজ্য নীতি:

অবাধ বাণিজ্যের মূলনীতি হইল, একদেশ হইতে অন্য দেশে পণ্যদ্রব্য আমদানী-রপ্তানীর বিশেষ করিয়া আমদানীর কোন বাধা সৃষ্টি করা হয় না। এই নীতি অনুসারে দেশী ও বিদেশী পণ্যদ্রব্যের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা যায় না। সুতরাং দেশী দ্রব্যগুলিকে বিশেষ সুবিধা দান বা বিদেশী দ্রব্যগুলির ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি করা হয় না। অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করিলেও রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে দেশগুলি বিদেশী দ্রব্যের উপর সময় সময় যে শুল্ক ধার্য করে তাহা অবাধ বাণিজ্য নীতির বিরোধী বলিয়া ধরা হয় না। ইংলণ্ড অবাধ বাণিজ্য নীতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সমর্থক হইলেও বর্তমানে কিছু পরিমাণে এই নীতি পরিত্যাগ করিয়াছে।

২। সংরক্ষণ নীতি:

দেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশেষ সুবিধা দান করিবার উদ্দেশ্যে যখন বিদেশ-

জাত আমদানী পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য করা হয়, তখন এই নীতিকে সংরক্ষণ নীতি বলা হয়। জাতীয় শিল্পগুলির সংরক্ষণ ও উন্নয়নই হইল সংরক্ষণ নীতির মূল উদ্দেশ্য। বিদেশী প্রতিযোগিতা হইল দেশীয় শিল্পের উন্নতির প্রধান অন্তরায়। সুতরাং একমাত্র সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিয়া এই অন্তরায় দূর করা সম্ভব।

সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি—Forms of Protection

দেশী শিল্পগুলিকে বিদেশী প্রতিযোগিতার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ-নীতি নানাভাবে প্রযুক্ত হয়। সংরক্ষণের প্রধান পদ্ধতিগুলি হইল :

১। আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক ধার্য—Imposition of Customs Duties

এই ব্যবস্থানুসারে বিদেশ হইতে (ক) আমদানীকৃত পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য করা হয় (Import duties)। বিদেশী দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য করিতে হইলে বিশেষ বিবেচনা করা প্রয়োজন। শুল্কের পরিমাণ যদি খুব বেশী হয়, তাহা হইলে আমদানী বাণিজ্য হ্রাস বা একেবারে অন্তর্হিত হইতে পারে। অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য হইলে এবং দেশে যদি ঐ দ্রব্যের বিকল্প দ্রব্য না থাকে, তাহা হইলে অধিক হারে শুল্কধার্যের ফলে সরকারের আয় বাড়িলেও দেশীয় ক্রেতাগণ অধিক মূল্য দিতে বাধ্য হয়। দেশ হইতে যাহাতে দেশীয় শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বা শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী না হয় সে উদ্দেশ্যেও অনেক সময় (খ) রপ্তানী দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য করা হয় (Export Duties)। শুল্কের পরিমাণ যখন পণ্যদ্রব্যের ওজনের পরিমাপে ধার্য হয় তখন তাহাকে ওজন অনুসারে শুল্ক (*Specific duty*) বলা হয়। পণ্যদ্রব্যের মূল্য অনুসারে শুল্ক ধার্য করা হইলে তাহাকে মূল্যানুসারে শুল্ক (*Advalorem duty*) বলা হয়।

২। সরকার কর্তৃক অর্থসাহায্য—Bounties and Subsidies

অনেক সময় সরকার বিদেশী দ্রব্যের উপর কর স্থাপন না করিয়া দেশীয় শিল্পগুলিকে এককালীন অথবা তাহাদের উৎপাদন-পরিমাণের ভিত্তিতে অর্থসাহায্য করে। বিদেশী দ্রব্য যদি অত্যাবশ্যকীয় হয় অথবা দেশের সমগ্র চাহিদা পূরণের পক্ষে দেশে দ্রব্যটির উৎপাদন-পরিমাণ যথেষ্ট না হয়, তাহা হইলে বিদেশী দ্রব্যের উপর কর ধার্য করিলে দ্রব্যটির মূল্য বৃদ্ধি পাইতে পারে। এইজন্য বিদেশী দ্রব্যের উপর কর ধার্য না করিয়া দেশী শিল্পকে সাহায্য করা হয়। ভারতে শর্করা-শিল্প সরকারী অর্থসাহায্যে প্রসারলাভ করিতে সমর্থ হয়।

৩। ইহা ছাড়া, অনেক সময় বিদেশ হইতে আমদানীকৃত পণ্য-পরিমাণের একটা আনুপাতিক অংশকে বিনা শুল্কে দেশে আসিতে দেওয়া হয়। কিন্তু এই আনুপাতিক অংশের অতিরিক্ত পরিমাণ আমদানীর উপর শুল্ক ধার্য করা হয়।

সংরক্ষণ-নীতি কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে যতগুলি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তন্মধ্যে আমদানী ও রপ্তানী শুল্কই হইল সর্বাধিক প্রচলিত ব্যবস্থা।

অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে যুক্তি—Arguments in favour of Free Trade

১। অবাধ বাণিজ্যের ফলে দেশগুলির মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে প্রত্যেক দেশ যে যে শিল্পে তাহার বিশেষ উৎপাদন-দক্ষতা আছে, সেই সেই শিল্পে মূলধন ও শ্রম বিনিয়োগ করে। ইহাতে উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

২। উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়। প্রত্যেক দেশ অপর দেশ হইতে সস্তাদরে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। নিজ দেশে ঐ দ্রব্য উৎপাদন করিতে অধিক ব্যয় হইত।

৩। সংরক্ষণের ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং ক্রেতার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। সংরক্ষণের সুবিধা গ্রহণ করিয়া দেশে একচেটিয়া কারবার স্থাপিত হইয়া মূল্য-বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে। অবাধ বাণিজ্য এই সমস্ত অসুবিধা দূর করে।

সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি—Arguments in favour of Protection

১। জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার যুক্তি—**Arguments for national self-sufficiency**

একটি দেশের প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী নিজের দেশে উৎপন্ন না হইলে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয়। এই কারণে স্বাবলম্বী হইবার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করা অনেকে যুক্তিযুক্ত মনে করেন।

২। বিভিন্ন প্রকারের শিল্পগঠনের যুক্তি—**Diversification of Industries argument**

একটি দেশের স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য দেশের মধ্যে সর্বাধিক শিল্প সংগঠন করা প্রয়োজন। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, খনি, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি অর্থনৈতিক জীবনের অপরিহার্য বিষয়সমূহে প্রত্যেক দেশের স্বাবলম্বী হওয়া উচিত। সুতরাং নানাজাতীয় শিল্প গঠন করিবার জন্য সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করা সমর্থনযোগ্য।

৩। জাতীয় নিরাপত্তামূলক শিল্পের যুক্তি—Defence Industries argument

জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা অনেক সময় প্রয়োজন হয়। যুদ্ধ পরিচালনা করিবার জন্য লৌহ, ইস্পাত, বিদ্যুৎ, নানাজাতীয় য়্যাসিড প্রভৃতি শিল্প দেশের মধ্যে থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই শিল্পগুলির প্রসারের জন্যও সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করা যাইতে পারে।

৪। শিশুশিল্প সংরক্ষণ যুক্তি—Infant Industries argument

সংরক্ষণ-নীতির পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল **শিশুশিল্প সংরক্ষণ যুক্তি।** শিল্পের প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই যদি তাহাকে বিদেশের শক্তিশালী শিল্পগুলির অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়, তাহা হইলে শিশুশিল্পের প্রসারের সম্ভাবনা থাকে না। ভারত, পাকিস্তান, চীন প্রভৃতি শিল্পক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ ও অনগ্রসর দেশগুলিকে যদি আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশগুলির সহিত শিল্পক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিতে হয়, তাহা হইলে প্রতিযোগিতার অসামর্থ্যে ভারত প্রভৃতি দেশে কোনদিনই শিল্পোন্নতি হইতে পারে না। এজন্য যে সমস্ত শিল্প স্বল্পকালের মধ্যে উন্নতি লাভ করিতে পারে সেই সমস্ত শিল্পকে অসম প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে শিল্পপ্রতিষ্ঠার প্রথমাবস্থায় সংরক্ষণ-নীতি প্রয়োগ করা বিশেষ প্রয়োজন। শিশুশিল্প সংরক্ষণের মূলনীতি হইল "নবজাত শিশুকে পরিচর্যা কর, কিশোরকে রক্ষা কর এবং বয়স্ককে মুক্ত কর" ("Nurse the baby, protect the child and free the adult")। এই নীতির তাৎপর্য হইল যে, শিল্পের শৈশবাবস্থায় পূর্ণসংরক্ষণের প্রয়োজন, কারণ এই অবস্থায় শিল্পের প্রতিযোগিতা-সামর্থ্যের একান্ত অভাব থাকে। শিল্পটি যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়া উৎপাদন-সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তখন ইহাকে প্রতিযোগিতার কৌশল শিক্ষা দিবার জন্য সংরক্ষণের মাত্রা হ্রাস করা প্রয়োজন, নতুবা এই শিল্প কোনদিনই প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারিবে না। শেষ পর্যায়ে শিল্পটি যখন অভিজ্ঞতা ও শিল্পকৌশল সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হয়, তখন ইহাকে সংরক্ষণ-বিমুক্ত করিয়া প্রতিযোগিতার সম্মুখীন করা হয়।

এইরূপে সংরক্ষণ দ্বারা দেশীয় শিল্পগুলির উন্নতি সম্ভব হয়।

উপরি-উক্ত যুক্তিগুলি ব্যতীতও সংরক্ষণের পক্ষে নিম্নলিখিত আরও কয়েকটি যুক্তি দেখান হয়, কিন্তু এই যুক্তিগুলি খুব জোরালো নহে।

৫। মজুরি-বৃদ্ধির যুক্তি—Wages argument

সংরক্ষণের সাহায্যে দেশে শিল্পের প্রসার ঘটিলে, শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। ফলে মজুরির হার বৃদ্ধি পাইবে।

৬। বাণিজ্যের উদ্বৃত্তের যুক্তি—Balance of trade argument

সংরক্ষণের সাহায্যে আমদানী কমাইয়া রপ্তানী বৃদ্ধি করিতে পারিলে অনুকূল বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত পাওয়া যায়। ফলে দেশে অধিক ধনাগম হয়।

৭। কর্মসংস্থান যুক্তি—Employment argument

সংরক্ষণ দ্বারা আমদানী হ্রাস করিয়া রপ্তানী বৃদ্ধি করিতে পারিলে সংরক্ষিত শিল্পগুলির প্রসারলাভের ফলে দেশে শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি হয়। ইহাতে বেকার সমস্যার সমাধান হয়।

সংরক্ষণের বিপক্ষে যুক্তি—Arguments against Protection

১। সংরক্ষণের প্রধান অসুবিধা হইল যে, ইহার ফলে মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং দেশী ক্রেতার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়।

২। সংরক্ষিত শিল্পগুলি একবার সুবিধা পাইলে তাহাদের উৎপাদন-দক্ষতা বৃদ্ধি করিতে অবহেলা করে। ইহার ফলে শিল্পোন্নতি বাধা পায়।

৩। সংরক্ষণের ফলে অনেক সময় বড় বড় একচেটিয়া ব্যবসায়ের সৃষ্টি হয় এবং বিদেশী প্রতিযোগিতা না থাকার জন্য ইহারা সংঘবদ্ধ হইয়া দেশে মূল্যবৃদ্ধি করে। আমেরিকায় এই দোষটি বিশেষভাবে দেখা যায়।

৪। সংরক্ষণের ফলে ধনী ব্যবসায়িগণ অধিকতর ধনবান হন। ইহার ফলে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য বৃদ্ধি পায়।

৫। সংরক্ষণের ফলে বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ত হয়। ইহার ফলে বিরোধ ঘটে এবং কালক্রমে এই অর্থনৈতিক সম্পর্ক-জাত বিরোধ প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ ঘটায়।

ভারত সরকারের সংরক্ষণ-নীতি—Fiscal policy of the Government of India

ইংরাজ শাসনকালে ভারত সরকারের কোনরূপ নির্দিষ্ট বাণিজ্য-নীতি ছিল না। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের স্বার্থ অপেক্ষা ইংলণ্ডের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ভারতের বাণিজ্য-নীতি পরিচালিত হইত। ইংলণ্ডের স্বার্থের অনুকূল হইলেই

অন্যান্য দেশগুলি বিশেষ করিয়া বৃটিশ সাধারণতন্ত্র-ভুক্ত দেশগুলি এদেশে সুবিধা-জনক শর্তে বাণিজ্য করিতে পারিত। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ভারত সরকার ভারতের একটি স্বতন্ত্র বাণিজ্য-নীতির গুরুত্ব প্রথম অনুভব করিলেন। ভারতবাসী দেশের শিল্পোন্নতির জন্য সংরক্ষণেরই পক্ষপাতী ছিল। ১৯২২ সালে এ সম্পর্কে একটা মতামত দিবার জন্য ভারত সরকার একটি শিল্প কমিশন (Fiscal Commission) নিযুক্ত করেন। এই কমিশন ভারত সরকারকে বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ-নীতি অনুসরণ করিবার সুপারিশ করিলেও সম্পূর্ণ-ভাবে সংরক্ষণ-নীতি গ্রহণ করিবার সুপারিশ করে নাই। এইজন্য এই নীতিকে **বিচারমূলক সংরক্ষণ-নীতি (Discriminating protection)** বলা হয়।

কমিশন ভারতে সংরক্ষণ-নীতি গ্রহণ করিবার যুক্তিযুক্ততা অস্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলেন ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশে শিল্পোন্নয়নের জন্য ও শিশুশিল্প সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষণ একান্ত আবশ্যক। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষণ-নীতি প্রবর্তন করিলে মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া দেশী ক্রেতাগণের উপর শুল্কের ভার পড়িবে। এজন্য কমিশন সকল শিল্পকে নির্বিচারে সংরক্ষণের সুবিধা না দিয়া বিশেষ বিশেষ শিল্পে সংরক্ষণ দিবার সুপারিশ করেন। কোন্ কোন্ শিল্পগুলি সংরক্ষণ পাইতে পারে তাহা স্থির করিবার ভার কমিশন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত তিনজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি শুল্ক সমিতির (Tariff Board) হস্তে ন্যস্ত করিবার সুপারিশ করেন। কমিশনের মতে, যে যে শিল্প নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ করিতে সক্ষম একমাত্র সেই শিল্পগুলিই সংরক্ষণ দাবী করিতে পারিবে।

প্রথম শর্ত হইল যে, সংরক্ষণের জন্য দাবীদার শিল্পটি এরূপ হইবে যে, শিল্পোন্নতির জন্য ইহার যথেষ্ট প্রাকৃতিক সুবিধা আছে, যথা, প্রচুর কাঁচামাল, কর্মদক্ষ শ্রমিক, সস্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি পাইবার সম্ভাবনা, শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বিস্তৃত দেশী বাজার ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ, দেশের স্বার্থের দিক দিয়া দেখিতে গেলে যে সমস্ত শিল্পের প্রসার কাম্য অথচ সংরক্ষণ ব্যতীত যাহার উন্নয়নের কোন সম্ভাবনা নাই। তৃতীয়তঃ, শিল্পটি এরূপ হইবে যে, ভবিষ্যতে সংরক্ষণমুক্ত হইলেও বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইবে।

কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ভারত সরকার চিনি, লৌহ-ইস্পাত, কাগজ, সিমেন্ট, দেশলাই ও গুরু রাসায়নিক শিল্পগুলিকে সংরক্ষণের সুবিধা দিয়াছিলেন।

ইহার ফলে চিনি-শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি হয় এবং ভারত শুধু দেশের চাহিদা মিটাইতে সমর্থ হয় নাই—বিদেশেও ভারতের কিছু চিনি রপ্তানী হইত। ১৯৫০ সালে এই শিল্পটিকে সংরক্ষণমুক্ত করা হয়। ইহা ছাড়া, লৌহ-ইস্পাত, কাগজ ও দেশলাই-শিল্পও সংরক্ষণের সুবিধা পাইয়া বিশেষ প্রসারলাভ করিতে পারিয়াছে। ১৯৪৭ সাল হইতে লৌহ-ইস্পাত ও কাগজ-শিল্প হইতে সংরক্ষণ উঠাইয়া লওয়া হয়।

নূতন সংরক্ষণ-নীতি—New Fiscal Policy

বিচারমূলক সংরক্ষণ-নীতি গ্রহণ করিবার ফলে দেশে কিছু পরিমাণ শিল্পোন্নতি ঘটিলেও মূল শিল্পগুলির ও সহায়ক শিল্পগুলির সম্প্রসারণ হয় নাই। সামগ্রিকভাবে দেশের শিল্পোন্নতির উদ্দেশ্যে ভারতের জাতীয় সরকার ১৯৪৯-৫০ সালে আর একটি কমিশন (কৃষ্ণমাচারী কমিশন) নিযুক্ত করেন। এই কমিশনের সুপারিশমত বর্তমান বাণিজ্য-নীতি পরিচালিত হইতেছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কমিশন শিল্পগুলিকে তিনভাগে ভাগ করিয়াছে, যথা, ১। প্রতিরক্ষামূলক শিল্প (Defence industries), ২। বুনিয়াদী ও মূল শিল্প (Basic and key industries) ও ৩। অন্যান্য শিল্প (Other industries)।

অস্ত্র, গোলা-বারুদ প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ নির্মাণ-শিল্পগুলিকে কমিশন প্রথম পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। এই প্রতিরক্ষামূলক শিল্পগুলি সম্পর্কে কমিশনের অভিমত হইল যে, ইহাদিগকে যথোপযুক্ত সংরক্ষণ দিতেই হইবে। লৌহ-ইস্পাত প্রভৃতি শিল্পগুলি হইল মূল শিল্প। এইগুলি জাতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত মূল শিল্পকেও প্রয়োজনমত সংরক্ষণ দিতে হইবে এবং সংরক্ষণের মাত্রা ও পদ্ধতি শুল্ক সমিতি স্থির করিবে। অন্যান্য শিল্পগুলি তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত। এই শিল্পগুলিও সংরক্ষণের দাবী করিতে পারে এবং এই শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ দিতে হইলে শুল্ক সমিতির নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হইবে। (ক) সংরক্ষণপ্রার্থী শিল্পটির পক্ষে প্রসারের স্বাভাবিক কি কি সুবিধা আছে, ইহার উৎপাদন-ব্যয় কি পরিমাণ হইবে এবং একটি সম্ভাব্য সময়ের মধ্যে সংরক্ষণ বা অন্য কোনপ্রকার সরকারী সাহায্য ব্যতীত স্বাবলম্বী হইতে পারে কিনা? (খ) কিংবা শিল্পটির উন্নতি জাতীয় স্বার্থবৃদ্ধির সহায়ক কিনা এবং সংরক্ষণের ব্যয়ভার জনসাধারণের উপর অত্যধিক বেশী হয় কি না?

উপরি-উক্ত শর্তগুলি বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করিলে শিল্প সমিতি তৃতীয় পর্যায়ের যে-কোন শিল্পকে সংরক্ষণ দিতে পারেন। ইহাই ভারত সরকারের বর্তমান সংরক্ষণ-নীতি।

সংক্ষিপ্তসার

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

দুইটি দেশের মধ্যে যখন বাণিজ্য চলে তখন তাহাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। এরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা বিভিন্ন দেশবাসী হয় এবং বিভিন্ন মুদ্রা-ব্যবস্থার জন্য আন্তর্জাতিক ক্রয়-বিক্রয়ের অর্থের বিনিময় প্রয়োজন হয়।

ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ

বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রমিক ও মূলধনের গতিশীলতার অভাব এবং নৈসর্গিক সুবিধা-অসুবিধার জন্য ভৌগোলিক শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে উৎপাদন-কার্য পরিচালিত হয়। এইজন্য দেশগুলির মধ্যে উৎপাদন-ব্যয়ের আপেক্ষিক পার্থক্য হয় এবং ইহার ফলে বাণিজ্য চলে।

বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত ও লেন-দেনের উদ্বৃত্ত

আমদানীকৃত ও রপ্তানীকৃত দ্রব্যসমূহের মূল্যের পার্থক্য বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত বলিয়া অভিহিত হয়। আমদানী-মূল্য অপেক্ষা রপ্তানী-মূল্য বেশী হইলে তাহাকে অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বলা হয়, আবার রপ্তানী-মূল্য অপেক্ষা আমদানী-মূল্য বেশী হইলে তাহাকে প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বলা হয়। দুইটি দেশের মধ্যে পণ্যদ্রব্য ছাড়াও আরও অনেকপ্রকার আদান-প্রদান হয়, যথা, ঋণ-গ্রহণ ও প্রদান, সুদ-প্রদান, জাহাজের মাশুল, ব্যাঙ্কের কমিশন, ক্ষতিপূরণ বা দান ইত্যাদি। দুইটি দেশের দেনা-পাওনাও এই সমগ্র হিসাবকে লেন-দেনের হিসাব বলা হয়।

অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ-নীতি

অবাধ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করা হয় না। একমাত্র রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন কারণে আমদানী ও রপ্তানীর উপর কোনপ্রকার শুল্ক ধার্য করা হয় না।

সংরক্ষণ-নীতির ক্ষেত্রে রপ্তানী বিশেষ করিয়া আমদানীর উপর শুল্ক ধার্য করা হয়। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল বিদেশী দ্রব্যের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেশীয় শিল্পের উন্নতি করা। বিদেশী দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য করিয়া অথবা দেশী শিল্পকে অর্থসাহায্য করিয়া সংরক্ষণ-নীতি বলবৎ করা হয়।

অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে যুক্তি

১। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ফলে ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ সম্ভব হয় এবং প্রত্যেক দেশই এই শ্রমবিভাগের স্থবিধা পায়, ২। উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, ৩। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি

১। জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার যুক্তি, ২। জাতীয় নিরাপত্তামূলক শিল্পের যুক্তি, ৩। বিভিন্ন প্রকার শিল্প-গঠনের যুক্তি, ৪। শিশুশিল্প সংরক্ষণ যুক্তি।

সংরক্ষণের বিপক্ষে যুক্তি

১। মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া ক্রেতার অস্থবিধা হয়, ২। শিল্পোন্নতি বাধা পায়, ৩। একচেটিয়া কারবার সৃষ্টি হয়, ৪। আয়-বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।

ভারত সরকারের সংরক্ষণ-নীতি

১৯২২ সালে পূর্বতন সরকার সংরক্ষণ-নীতি সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশন ভারতে বিচারমূলক সংরক্ষণ-নীতি গ্রহণের জন্য স্থপারিশ করেন। এই নীতি অনুসারে সব শিল্পকে নির্বিচারে সংরক্ষণের স্থবিধা না দিয়া চিনি, কাগজ, সিমেন্ট, লৌহ-ইস্পাত প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ শিল্প সংরক্ষিত করা হয়। এই আংশিক সংরক্ষণ-নীতি গ্রহণের ফল সন্তোষজনক হয় নাই। বর্তমান ভারত সরকার ১৯৪৯-৫০ সালে আর একটি নূতন কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশন ভারতের জাতীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দেশে যাহাতে দ্রুত শিল্পোন্নতি হয়, সেজন্য বিশেষ করিয়া নিরাপত্তামূলক শিল্পগুলিকে এবং বুনিয়াদী ও মূল শিল্পগুলিকে সব রকম সাহায্য করিবার স্থপারিশ করিয়াছেন। অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনমত সংরক্ষণ দিবার পক্ষে সরকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই স্থপারিশের উপর ভিত্তি করিয়াই ভারত সরকারের বর্তমান সংরক্ষণ-নীতি গঠিত হইয়াছে।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. Explain the basis of international trade. What are the advantages and disadvantages of foreign trade. H. S. (Com.), Comp. 1961

বৈদেশিক বাণিজ্যের ভিত্তি ব্যাখ্যা কর।

বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা কর।

উঃ—সকল দেশই যদি সমান সুবিধাজনক শর্তে সমস্ত দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারিত, তাহা হইলে আর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কোন প্রয়োজন হইত না। ব্যক্তির ন্যায় প্রত্যেক দেশই কতকগুলি দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষ সুবিধার অধিকারী থাকে এবং এই বিশেষ সুবিধাগুলির জন্য একটি দেশ অপেক্ষা কম খরচায় ঐ দ্রব্যগুলি উৎপাদন করিতে পারে বলিয়া অন্যান্য দেশগুলি ঐ দেশ অপর দেশ হইতে ক্রয় করে। ভারতে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা আছে বলিয়া ভারতে ধান, পাট, চা প্রভৃতি উৎপাদনের ব্যয় কম। কিন্তু যন্ত্রপাতি প্রভৃতি তৈয়ারী করা সম্ভব হইলেও দক্ষ শ্রমিক ও যন্ত্রবিশেষজ্ঞের অভাবে এইগুলির উৎপাদন ব্যয় বেশী পড়ে। এইজন্য ভারত কৃষিজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করিয়া সেই দেশগুলি হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী করে। ফলে উভয় দেশই লাভবান হয়। সুতরাং শ্রম-বিভাগ ও বিশেষজ্ঞতা হইল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি।

সুবিধা—১। দেশে যাহা উৎপাদন করা যায় না, বিদেশ হইতে তাহা আমদানী করা যায়। এইরূপে ইংলণ্ড ভারত হইতে পাট পায়, ভারত ইংলণ্ড হইতে ঔষধ, যন্ত্রপাতি পায়।

২। বৈদেশিক বাণিজ্যের সাহায্যে ভিন্ন দেশ হইতে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করা যায়। ভারতে যন্ত্রপাতি নির্মাণে ব্যয় বেশী বলিয়া ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়।

৩। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে প্রত্যেক দেশ সেই সেই দ্রব্য উৎপাদন করে যে যে দ্রব্যের উৎপাদনে তাহার সবচেয়ে বেশী সুবিধা আছে। এই শ্রম-বিভাগ নীতির ভিত্তিতে উৎপাদন কার্য পরিচালিত হয় বলিয়া প্রত্যেক দেশের উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৪। বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়—ইহার ফলে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়।

অসুবিধা—১। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য একটি দেশের স্বয়ংসম্পূর্ণতা বিনষ্ট করিয়া দেশকে পরমুখাপেক্ষী করে এবং যুদ্ধের সময় সম্পর্কচ্ছেদের ফলে দেশটির অসুবিধা হয়।

২। বিদেশ হইতে দ্রব্য আমদানীর ফলে দেশীয় শিল্পের প্রসার হয় না। ফলে দেশে বেকার-সমস্যা দেখা যায়।

৩। বিদেশ হইতে মদ প্রভৃতি অনেক অনিষ্টকর দ্রব্যও আমদানী হয়।

৪। বিদেশে রপ্তানী করিয়া অধিক লাভের আশায় অনেক সময় দেশের খনিজ, বনজ প্রভৃতি সম্পদগুলির অপচয় হয়। ফলে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়।

৫। বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে অনেক সময় দেশগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলে। এই প্রতিযোগিতা শেষ পর্যন্ত বিধ্বংসী যুদ্ধে পরিণত হয়।

2. What is meant by balance of trade. Distinguish between balance of trade and balance of payments.

বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত বলিতে কি বুঝ ? বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত ও লেন-দেনের উদ্বৃত্তের পার্থক্য কি ?

উঃ—স্বদেশ হইতে বিদেশে যত মূল্যের দ্রব্য পাঠান হয় (রপ্তানী-মূল্য) তাহা হইতে বিদেশ হইতে আনীত দ্রব্যের মূল্য (আমদানী মূল্য) বাদ দিয়া যে উদ্বৃত্ত থাকে তাহাকে বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত বলা হয়। ভারত যদি কোন বৎসরে ১০ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে, আর ৭ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী করে তাহা হইলে (১০−৭)=৩ কোটি টাকা ভারতের বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত হইবে। রপ্তানী মূল্য অপেক্ষা আমদানী মূল্য কম হইলে তাহাকে অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বলা হয়, আর আমদানী মূল্য রপ্তানী মূল্য অপেক্ষা বেশী হইলে তাহাকে প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বলা হয়।

দুইটি দেশের মধ্যে যে সমস্ত দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী হয় সেই সমস্ত দ্রব্যের তালিকাকে প্রত্যক্ষ বাণিজ্য তালিকা বলা হয় কিন্তু দুই দেশের মধ্যে এই প্রত্যক্ষ বাণিজ্য তালিকাভুক্ত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় ছাড়াও আরও অনেক বাবদ লেন-দেন হয়। যেমন, বাণিজ্যের জন্য বিদেশী জাহাজ ব্যবহারের মূল্য, বিদেশী ব্যাঙ্ক বা বীমা কোম্পানীর লভ্যাংশ, বিদেশী ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধ, ইত্যাদি বাবদও দুইটি দেশের মধ্যে লেন-দেন হয়। পণ্য-দ্রব্যের আদান-প্রদান ছাড়াও এই কারণে দুইটি দেশের মধ্যে যে লেনদেনের হিসাব রাখা হয় তাহাকে অদৃশ্য বা পরোক্ষ বাণিজ্য তালিকা বলা হয়। দুই দেশের মধ্যে দেনা-পাওনার এই সমগ্র হিসাবের পার্থক্যকেই দৃশ্য ও অদৃশ্য লেন-দেনের উদ্বৃত্ত বলা হয়। আর দুইটি দেশের মধ্যে এই লেন-দেনের উদ্বৃত্ত শেষ পর্যন্ত সমান হইতেই হইবে।

3. On what grounds would you justify the present policy of protection of industries of the Government of India ? H. S. (Com.) 1960

কি কি কারণে ভারত সরকার কর্তৃক অনুসৃত সংরক্ষণ-নীতি তুমি সমর্থন কর ?

উঃ—বৃটিশ শাসনকালে ভারত সরকারের কোন নির্দিষ্ট সংরক্ষণ নীতি ছিল না। শাসক জাতির স্বার্থের জন্যই ভারতের শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালিত হইত। ইহার ফলে প্রথম মহাযুদ্ধ কাল পর্যন্ত ভারতে শিল্পের কোন উন্নতি হয় নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে সংরক্ষণ-নীতির সাহায্যে ভারতে শিল্পোন্নয়নের পক্ষে শক্তিশালী জনমত গঠন হওয়ার ফলে ভারত সরকার এ বিষয়ে অবহিত হন এবং শিল্পের উন্নতির জন্য উপায় স্থির করিবার উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ভারতে প্রথম বিচারমূলক সংরক্ষণ-নীতি (Discriminating Protection) গ্রহণ করা হয়। ইহার ফলে লৌহ-ইস্পাত, চিনি, কাগজ প্রভৃতি কয়েকটি শিল্পকে সংরক্ষণের আওতায় আনা হয়। কিন্তু এই নীতি এরূপ সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল যে, ইহার সাহায্যে ব্যাপকভাবে দেশে শিল্পের উন্নতি সম্ভব হয় নাই।

দেশ স্বাধীন হইবার পর ১৯৪৮ সালে জাতীয় সরকার সর্বপ্রথম তাঁহাদের শিল্পনীতি ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রাক্কালে নূতন শিল্পনীতি ঘোষিত হয়। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৯ সালে জাতীয় সরকার একটি নূতন কমিশন (কৃষ্ণমাচারী কমিশন) নিয়োগ করেন। এই কমিশন কর্তৃক

নির্ধারিত নীতিই হইল ভারত সরকারের বর্তমান সংরক্ষণ নীতি। ইহার উদ্দেশ্য হইল উন্নয়নমূলক। প্রথমতঃ, প্রতিরক্ষামূলক ও যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। এই সংরক্ষণ নীতি সমর্থনযোগ্য, কারণ এই নীতির সাহায্যে ভারত তাহার নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, মূল ও ভারী শিল্পগুলিকে, যথা, লৌহ-ইস্পাত, বিদ্যুৎ প্রভৃতি শিল্পগুলিকে যথাসম্ভব সংরক্ষণ দেওয়া হইয়াছে। এই সংরক্ষণ নীতিও সমর্থনযোগ্য, কারণ মূল ও ভারী শিল্পগুলির উন্নতি না হইলে দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতি তথা বেকার সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। অন্যান্য শিল্পগুলিকে নানা বিষয় বিবেচনা করিয়া প্রয়োজন অনুসারে সংরক্ষণ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায় যে, ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত সংরক্ষণ নীতির মূল উদ্দেশ্য হইল জাতীয় উন্নতি —সুতরাং সমর্থনযোগ্য।

4. Explain the chief arguments in favour of protection. Describe briefly the policy of protection adopted by the Government of India at present. H. S. (Com.) 1962 Comp.

Or

What do you understand by Protection ? Mention some of the arguments in favour of the policy of protection.

সংরক্ষণ নীতির পক্ষে প্রধান যুক্তিগুলির অবতারণা কর। ভারত সরকার কর্তৃক অনুসৃত বর্তমান সংরক্ষণ নীতি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উঃ—দেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশেষ সুবিধা দান করিবার উদ্দেশ্যে যখন বিদেশজাত আমদানী-পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য করা হয় অথবা বিদেশী দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য না করিয়া দেশী শিল্পগুলিকে অর্থ সাহায্য করা হয়, তখন এই নীতিকে সংরক্ষণ নীতি বলা হয়। জাতীয় শিল্পগুলির সংরক্ষণ ও উন্নয়নই হইল এই নীতির মূল উদ্দেশ্য।

সংরক্ষণের পক্ষে অনেকগুলি যুক্তি দেখান হয়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রধান ও সমর্থনযোগ্য :

১। জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার যুক্তি :

ভিন্নদেশের উপর নির্ভরশীল না হইয়া স্বাবলম্বী হইবার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করা সঙ্গত বলিয়া অনেকে মনে করেন।

২। প্রতিরক্ষামূলক শিল্প সংরক্ষণের যুক্তি :

দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধাস্ত্র প্রভৃতি নির্মাণ শিল্পগুলির জন্য সংরক্ষণ প্রয়োজন।

৩। বিভিন্ন প্রকারের শিল্প গঠনের যুক্তি :

কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, খনি, ব্যাংক প্রভৃতি অর্থ নৈতিক জীবনের অপরিহার্য বিষয়সমূহে প্রত্যেক দেশের স্বাবলম্বী হওয়া উচিত। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে নানাজাতীয় শিল্প গঠনের জন্য সংরক্ষণ নীতি সমর্থনযোগ্য।

৪। শিশু-শিল্প সংরক্ষণ যুক্তি :

শিল্পে অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে শিল্পোন্নত দেশগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করা সম্ভব নয়।

সুতরাং অনুন্নত দেশগুলির শিল্পের শৈশবাবস্থায় তাহাদিগকে সংরক্ষণের সাহায্যে লালন-পালন করিতে হইবে এবং এইরূপে শিশু-শিল্পটি প্রতিযোগিতা সক্ষম হইলে ক্রমশঃ সংরক্ষণের মাত্রা হ্রাস করিয়া শেষ পর্যায়ে শিল্পটিকে সংরক্ষণ-মুক্ত করিতে হইবে। ভারতের ক্ষেত্রে এই যুক্তি বিশেষভাবে প্রযোজ্য

ভারত সরকারের বর্তমান সংরক্ষণ নীতি ১৯৪৯-৫০ সালে নিযুক্ত কৃষ্ণমাচারী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হয়। এই কমিশন ভারতের জাতীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দেশে যাহাতে দ্রুত শিল্পোন্নতি হয়, সে জন্য বিশেষ করিয়া নিরাপত্তামূলক শিল্পগুলিকে এবং মূল ও ভারী শিল্পগুলিকে সব রকম সাহায্য করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনমত সংরক্ষণ দিবার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়াই ভারত সরকারের বর্তমান সংরক্ষণ নীতি গঠিত হইয়াছে।

3. Define Free Trade. State briefly the arguments for Free Trade.

H. S. (Com.), 1963

অবাধ বাণিজ্যের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে যুক্তিগুলি সংক্ষেপে বিবৃত কর।

উঃ—অবাধ বাণিজ্য বলিতে বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক যে বাণিজ্য চলে তাহার মধ্যে কোন রূপ বাধা না থাকা। এই ব্যবস্থায় এক দেশ হইতে অন্য দেশে দ্রব্য বিনিময়ের উপর কোন রূপ শুল্ক ধার্য করা হয় না। এই নীতি অনুসারে দেশী ও বিদেশী পণ্যের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয় না। সুতরাং দেশী দ্রব্যগুলিকে বিশেষ সুবিধা দান বা বিদেশী দ্রব্যগুলির ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি করা হয় না। অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করিলেও দেশগুলি বিদেশী দ্রব্যের উপর সময় সময় যে শুল্ক ধার্য করে তাহা অবাধ বাণিজ্য-নীতির বিরোধী বলিয়া ধরা হয় না।

অবাধ বাণিজ্যের কতকগুলি সুবিধা আছে। সুবিধাগুলি নিম্নে দেওয়া হইল :—

প্রথমতঃ, অবাধ বাণিজ্যের ফলে দেশগুলির মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে শ্রম বিভাগ নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেক দেশ যে যে শিল্পে তাহার উৎপাদন দক্ষতা আছে, সেই সেই শিল্পে মূলধন ও শ্রম বিনিয়োগ করে। ইহাতে উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। প্রত্যেক দেশ অপর দেশ হইতে সস্তাদরে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। নিজ দেশে ঐ দ্রব্য উৎপাদন করিতে অধিক ব্যয় হয়।

তৃতীয়তঃ, কোন দেশ অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করিলে সেই দেশে সংরক্ষণের সুবিধা গ্রহণ করিয়া একচেটিয়া স্থাপিত হইয়া মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। ইহাতে ক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, অবাধ বাণিজ্যের ফলে পূর্ণ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি পাইয়া উপাদানগুলির সর্বাধিক সু-ব্যবহার হয়। শেষ পর্যন্ত দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায় এবং ক্রেতা সাধারণ স্বল্পমূল্যে উৎকৃষ্ট সামগ্রী পাইতে পারে।

4. Define International Trade and point out its advantages

H. S. (Com.), 1963

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সংজ্ঞা নির্দেশ কর এবং ইহার সুবিধাগুলি দেখাও।

উঃ—যখন বিভিন্ন দেশের মধ্যে দ্রব্যের বিনিময় হয়, তখন এই বিনিময়কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা একই দেশের অধিবাসী বলিয়া একই আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন। ক্রেতা ও বিক্রেতা যে অর্থের মাধ্যমে বিনিময়কার্য নিষ্পন্ন করে তাহাও একই সরকার কর্তৃক প্রচলিত অর্থ। সুতরাং পরিবর্তন করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী ও ভিন্ন ভিন্ন সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। ইহা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিবার জন্য বিনিময়-কার্যে অসুবিধা হয়।

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়, শ্রমবিভাগই হইল আভ্যন্তরীণ বিনিময়-কার্যের প্রধান কারণ। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন-ক্ষমতার আপেক্ষিক পার্থক্যের জন্যই আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রয়োজন হয়। মুচি যেরূপ দক্ষতার সহিত জুতা তৈয়ারী করিতে পারে, কৃষক সেরূপ দক্ষতার সহিত জুতা তৈয়ারী করিতে পারে না। অনুরূপভাবে মুচিও কৃষকের মত দক্ষতার সহিত ধান উৎপাদন করিতে পারে না। কাজেই মুচি জুতা তৈয়ারী করে ও কৃষক ধান উৎপাদন করে এবং পারস্পরিক বিনিময় দ্বারা উভয়ের চাহিদা মিটায়। অনুরূপভাবে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন-ক্ষমতার পার্থক্যের জন্যই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘটিয়া থাকে।

সুবিধা

১। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বারা একটি দেশ ইহার প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিতে পারে। একটি দেশ নিজে যাহা উৎপাদন করিতে পারে না, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দ্বারা সেই দ্রব্য বিদেশ হইতে ক্রয় করিয়া নিজের অভাব পূরণ করিতে পারে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে অন্যান্য দেশগুলি ভারত ও পাকিস্তান হইতে পাট সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়।

২। যে দেশে কোন দ্রব্যের উৎপাদন-খরচা অধিক সে দেশ দেশের মধ্যে উক্ত দ্রব্য উৎপাদন না করিয়া স্বল্প ব্যয়ে অন্য দেশ হইতে উক্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারে।

৩। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য ভৌগোলিক শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে যে উৎপাদন-কার্য পরিচালিত হয়, তাহার ফলে প্রত্যেক দেশ সেই সেই দ্রব্যের উৎপাদনে তাহার শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ করে, যে যে দ্রব্যের উৎপাদনে তাহার সর্বাধিক সুবিধা আছে। এইরূপ ভৌগোলিক শ্রমবিভাগের ফলে প্রত্যেক দেশের শ্রম ও মূলধনের সর্বাধিক সু-ব্যবহার হয় এবং ইহার ফলে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়া উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়।

৪। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে পৃথিবীব্যাপী প্রতিযোগিতা চলে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ফলে একই দ্রব্যের মূল্য সর্বত্র সমান হইবার প্রবণতা দেখা যায়। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য উৎপাদক সংঘ, যৌথ ব্যবসায় প্রভৃতি একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়া মূল্য-বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিত হয়।

৫। দুর্ভিক্ষের সময় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বারা যে দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য সহজলভ্য, সেখান হইতে খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করিয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশের জনগণের জীবনরক্ষা করা সম্ভব হয়।

৬। অর্থনৈতিক সুবিধা ছাড়াও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আরও কতকগুলি সুবিধা দেখিতে

পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দেশগুলি পরস্পরের সংস্পর্শে আসে। এই পারস্পরিক সংস্পর্শের ফলে তাহাদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। তাহাদের মধ্যে দ্রব্যের আদান-প্রদান ব্যতীতও ভাবের আদান-প্রদান হয়। ফলে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাইয়া পারস্পরিক বিরোধের সম্ভাবনা দূর করে।

নবম অধ্যায়

অর্থ

(Money)

অর্থের উৎপত্তি—Origin of Money

আদিম যুগে মানুষ অর্থের ব্যবহার জানিত না। এখনও বনে-জঙ্গলে ও মরুপ্রদেশে অনেক জাতি আছে যাহারা অর্থ ব্যবহার করে না। তাহা হইতে স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে তাহারা কি করিয়া কেনা-বেচা করে। মানুষ যখন অর্থের ব্যবহার জানিত না, তখন তাহারা প্রত্যক্ষভাবে **দ্রব্য-বিনিময় (Barter)** করিয়া অভাব মিটাইত। কৃষক ধানের বিনিময়ে তাঁতির নিকট হইতে কাপড় সংগ্রহ করিত এবং এইরূপে পারস্পরিক পরিশ্রমলব্ধ দ্রব্যের আদান-প্রদানের সাহায্যে তাহারা প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিত।

দ্রব্য-বিনিময়ের অসুবিধা—Difficulties of Barter

দ্রব্য-বিনিময়ের কতকগুলি অসুবিধা ছিল :

১। পারস্পরিক অভাবের সামঞ্জস্যের অভাব—

২। মূল্য নির্ধারণের মানের অভাব—

৩। ভাগ করিবার মানের অভাব—

১। প্রথমতঃ, পারস্পরিক অভাবের সামঞ্জস্য না হইলে দ্রব্য বিনিময় করা যাইত না। কৃষকের কাপড়ের প্রয়োজন হইলেও তাঁতির ধানের প্রয়োজন না হইলে সে ধানের পরিবর্তে কাপড় বিনিময় করিতে রাজী হইত না।

২। দ্বিতীয়তঃ, এরূপ ক্ষেত্রে কত ধানের পরিবর্তে একখানা কাপড় পাওয়া যাইতে পারে তাহারও কোন নির্দিষ্ট বিনিময় হার ছিল না।

৩। তৃতীয়তঃ, অনেক দ্রব্যই ভাগ না করিয়া বিনিময় করা যাইত না, অথচ ভাগ করিলে দ্রব্যটির উপযোগ নষ্ট হইত।

ভাল অর্থের গুণাবলী—Qualities of good money

প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বিনিময় ব্যবস্থার এই অসুবিধাগুলি দূর করিবার জন্য অর্থের সৃষ্টি হয় এবং স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুগুলি তাহাদের স্থায়িত্ব, সহজবহন-যোগ্যতা, নমনীয়তা ও বিভাজ্যতা গুণগুলির জন্য বিনিময়ের বাহন হিসাবে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। স্বর্ণ ও রৌপ্য—শুধু দীর্ঘস্থায়ী নয়, ইহাদিগকে সহজেই একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া যায়। স্বর্ণ ও রৌপ্য গলান যায় এবং ইহার ফলে ইহাদিগকে নানা মূল্যের মুদ্রায় পরিবর্তিত করা যায়। সব গম বা সব হীরা একরকম নহে, কিন্তু সব খাঁটি সোনা ও রূপা একই ধরণের। সুতরাং অন্যান্য দ্রব্য অপেক্ষা সোনা ও রূপার মুদ্রাগুলিকে লোকে সহজে চিনিতে পারে। একমাত্র সোনা ও রূপা ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্য বা ধাতুগুলিতে উপরি-উক্ত গুণগুলি নাই। তাই এই দুইটি ধাতুই অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

অর্থের সংজ্ঞা—Definition of Money

এখন প্রশ্ন হইল অর্থ কাহাকে বলে? সাধারণতঃ অর্থ বলিতে লোকে ধাতু-নির্মিত টাকা-পয়সা ও কাগজী নোট বুঝে। কিন্তু সব টাকা-পয়সা বা কাগজী নোটকে অর্থ বলা যায় না। পাকিস্তানের একটা আনি বা দুয়ানি ভারতে চলে না; ইহা দ্বারা কোন দ্রব্যই ক্রয় করা চলে না। আবার, দেশী মুদ্রাও যদি খুব পুরাতন হয় তাহাও কেহ না লইতে পারে। অর্থ বলিতে আমরা সেই সমস্ত বিনিময়ের বাহনকে বুঝি যাহা সকলেই গ্রহণ করে এবং যাহার সাহায্যে ক্রয়-বিক্রয় ও দেনা-পাওনা শোধ হয়। অর্থের এই সংজ্ঞানুসারে একখানি চেক্ বা হুণ্ডি অর্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না, কারণ লোকে চেক্ লইতে অস্বীকার করিতে পারে এবং তাহাকে চেক্ লইতে আইনতঃ বাধ্যও করা যায় না। কিন্তু পাঁচটি টাকা বা পাঁচ টাকার একখানি নোট লইতে কেহ অস্বীকার করিতে পারে না

অর্থের কাজ—Functions of Money

১। বিনিময়ের বাহন—Medium of exchange

প্রত্যক্ষভাবে দ্রব্য-বিনিময়ের অসুবিধাগুলি দূর করিবার উদ্দেশ্যেই অর্থের ব্যবহার আরম্ভ হয়। অর্থ সব সময়েই লোকে গ্রহণ করিতে রাজি থাকে, সেইজন্য অর্থসাহায্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিতে কোন অসুবিধা হয় না। তাঁতি ধানের পরিবর্তে কাপড় দিতে অস্বীকার করিলেও অর্থের পরিবর্তে কাপড় দিতে অস্বীকার করে না। কারণ অর্থ দ্বারা সে তাহার প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারে। সুতরাং অর্থের সাহায্যে একে অপরের দ্রব্য পাইতে পারে।

২। মূল্যের পরিমাপক—Measure of value

অর্থ দ্বারাই দ্রব্য ও কাজের মূল্য পরিমাপ করা হয় এবং প্রকাশ করা হয়। দুইটি দ্রব্যের বিনিময়ের হার একমাত্র অর্থমূল্যের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়। চাউল, কাপড়, গরু, মোটর গাড়ী প্রভৃতির বিনিময়-মূল্য অর্থ দ্বারা পরিমাপ ও প্রকাশ করা হয়।

৩। সঞ্চয়ের বাহন—Store of value

জিনিসপত্রের দাম সচরাচর বাড়ে-কমে কিন্তু অর্থের মূল্য মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে। এইজন্য লোকে সঞ্চয় করিতে হইলে দ্রব্য সঞ্চয় না করিয়া অর্থ সঞ্চয় করে, কারণ সে জানে যে প্রয়োজন হইলে যে-কোন সময়ে অর্থের বিনিময়ে সে সকল দ্রব্যই পাইতে পারে। দ্রব্যগুলি ভবিষ্যতে নষ্ট হইতে পারে কিন্তু অর্থ দ্বারা সে সবই পাইতে পারে।

৪। স্থগিত আদান-প্রদানের বাহন—Standard of deferred payment

অর্থের আর একটি কাজ হইল, দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ করা। লোকে বর্তমানে যে মূল্য ধার দেয় ভবিষ্যতে সেই মূল্য ফিরিয়া পাইবে এই আশা করে। অর্থের মূল্য অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বলিয়া বর্তমান মূল্যের সহিত অর্থ ভবিষ্যৎ মূল্যের সংযোগ সাধন করে। এইজন্য বর্তমানে অর্থ ধার করিয়া বা ধারে দ্রব্য ক্রয় করিয়া ভবিষ্যতে অর্থের মাপকাঠিতে ধার শোধ বা দ্রব্যমূল্য শোধ করা সহজ হয়।

অর্থের কাজ ইংরেজীতে নিম্নলিখিত দুইটি পংক্তির সাহায্যে বুঝান হইয়াছে।

Money is a matter of functions four,
A medium, a measure, a standard, a store.

মুদ্রা মান—Monetary Standard

বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত মুদ্রামান প্রচলিত আছে সে সম্পর্কে ধারণা করিতে হইলে দেশে যে বিভিন্ন ধরণের মুদ্রা প্রচলিত থাকে সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা প্রয়োজন। একটা দেশে প্রামাণিক বা মান মুদ্রা ও প্রতীক মুদ্রা থাকিতে পারে। এই মুদ্রা বিহিত অর্থ বলিয়া পরিগণিত হইতেও পারে আবার নাও পারে।

প্রামাণিক মুদ্রা—Standard Money

একটি দেশে বিনিময়ের মান হিসাবে যে মুদ্রা ব্যবহৃত হয়, তাহাকে মান মুদ্রা বা প্রামাণিক মুদ্রা বলা হয়। এই মুদ্রায় সব হিসাবপত্র রাখা হয়। প্রামাণিক মুদ্রার অর্থমূল্য এই মুদ্রাস্থিত ধাতব মূল্যের সমান হয়। সুতরাং প্রামাণিক মুদ্রা গলাইয়া ধাতু হিসাবে বিক্রয় করিলে কোন লাভ হয় না। প্রামাণিক মুদ্রার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা অসীম বিহিত মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং এজন্য পাওনাদার তাহার প্রাপ্য পাওনা এই মুদ্রায় গ্রহণ করিতে বাধ্য। প্রামাণিক মুদ্রার প্রচলন সাধারণতঃ অবাধ মুদ্রাঙ্কন-ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত হয়। জনসাধারণ তাহাদের সোনা বা রূপা টাকশালে লইয়া গেলে সরকার আনীত ধাতু উপযুক্ত পরিমাণ মুদ্রায় পরিবর্তিত করিয়া দেয়। প্রামাণিক মুদ্রা সাধারণতঃ স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় ধাতু দ্বারা নির্মিত হইতে পারে। ভারতের টাকা, ইংলণ্ডের পাউণ্ড স্টার্লিং, আমেরিকার ডলার প্রভৃতি প্রমাণিক মুদ্রার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রতীক মুদ্রা—Token Money

প্রতীক মুদ্রার সাহায্যে সাধারণতঃ ছোট-খাট আর্থিক আদান-প্রদান চলে। ইহা নিকেল, তামা, দস্তা প্রভৃতি কম মূল্যবান ধাতু দ্বারা নির্মিত হয়। এই মুদ্রার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার মুদ্রা-মূল্য ধাতব মূল্য অপেক্ষা বেশী। ইহা সসীম বিহিত মুদ্রা হিসাবে ধরা হয় অর্থাৎ পাওনাদার এই মুদ্রার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক তাহার পাওনা অর্থপরিশোধ বাবদ গ্রহণ করিতে আইনতঃ বাধ্য নহে। প্রতীক মুদ্রার অবাধ মুদ্রাঙ্কন-ব্যবস্থা থাকে না। ভারতে ২৫ পয়সা, ১০ পয়সা, ৫ পয়সা প্রভৃতি ও ইংলণ্ডের শিলিং, পেন্স প্রভৃতি হইল প্রতীক মুদ্রা।

বিহিত অর্থ—Legal tender Money

বিহিত অর্থ বলিতে সেই সমস্ত অর্থ বুঝায় যাহা সরকার কর্তৃক বিহিত বলিয়া

ঘোষিত হইবার ফলে পাওনাদারগণ এই অর্থে তাহাদের পাওনা লইতে আইনতঃ বাধ্য। বিহিত অর্থে পাওনা মূল্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু একটি দেশে প্রচলিত সব অর্থই বিহিত অর্থ নহে। চেক্ বিহিত অর্থ নহে, কাজেই লোকে ইহা লইতে অস্বীকার করিতে পারে। বিহিত অর্থ আবার অসীম বিহিত অর্থ (Unlimited legal tender money) ও সসীম বিহিত অর্থ (Limited legal tender money) হইতে পারে। যে অর্থ পাওনাদার যে কোন পরিমাণ লইতে বাধ্য তাহাকে অসীম বিহিত অর্থ বলা হয়, যথা, ভারতের টাকা, ইংলণ্ডের পাউণ্ড স্টার্লিং, মার্কিণ দেশের ডলার। যে অর্থে পাওনাদার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক লইতে বাধ্য নহে তাহাকে সসীম বিহিত মুদ্রা বলা হয়। ভারতের ২৫ পয়সা, ১০ পয়সা প্রভৃতি হইল সসীম বিহিত অর্থ, কারণ এই অর্থে কোন পাওনাদার এক টাকা পরিমাণের অধিক গ্রহণ না করিতেও পারে।

ভারতের টাকা—The Indian Rupee

ভারতের টাকা দেশের মধ্যে প্রামাণিক মুদ্রা হিসাবে চলে। কিন্তু ইহা প্রামাণিক অর্থ নহে, ইহা প্রতীক মুদ্রা। কারণ প্রামাণিক মুদ্রার সব বৈশিষ্ট্য ভারতের টাকায় নাই। প্রামাণিক মুদ্রার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহার মুদ্রা-মূল্য ও ধাতব মূল্য সমান। কিন্তু ভারতের টাকায় এক টাকা মূল্যের রৌপ্য ত নাই-ই, অধিকন্তু বর্তমানে প্রচলিত টাকায় আদৌ কোন রৌপ্য আছে কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের টাকায় অবাধ মুদ্রাঙ্কন-ব্যবস্থা নাই। এই মুদ্রাঙ্কন-ব্যবস্থা একমাত্র সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। বিদেশী পাওনাদারগণের ঋণ এই মুদ্রায় পরিশোধ করা যায় না। ভারতের টাকা ভারতে বিনিময়ের মান হিসাবে ও অসীম বিহিত মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং ইহাই হইল ইহার প্রামাণিক মুদ্রার একমাত্র নিদর্শন। স্থতরাং ভারতের টাকায় প্রামাণিক ও প্রতীক উভয় মুদ্রার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

কাগজী টাকার প্রকারভেদ—Different forms of Paper money

সকল দেশেই বর্তমানে কাগজী টাকা-পয়সার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। কাগজী টাকা-পয়সাকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা,

(ক) প্রতিনিধিত্বমূলক কাগজী টাকা—Representative Paper Money

প্রবর্তিত কাগজী টাকার সমপরিমাণ মূল্যের ধাতু যখন গচ্ছিত রাখা হয় তখন এই কাগজী টাকাকে প্রতিনিধিত্বমূলক কাগজী টাকা বলা হয়। যদি ৫০ লক্ষ মূল্যের কাগজী টাকা বাজারে চালু করা হয় এবং ঐ পরিমাণ মূল্যের স্বর্ণ ও রৌপ্য তহবিলে রাখা হয়, তাহা হইলে এই ৫০ লক্ষ কাগজী টাকাকে প্রতিনিধিত্বমূলক কাগজী টাকা বলা যাইতে পারে।

(খ) পরিবর্তনীয় কাগজী টাকা—Convertible Paper Money.

যখন কাগজী অর্থ ধাতব মুদ্রায় পরিবর্তনযোগ্য হয়, তখন তাহাকে পরিবর্তনীয় কাগজী টাকা বলা হয়। এই ব্যবস্থায় কাগজী টাকার অধিকারিগণ তাহাদের ইচ্ছামত কাগজী টাকা ধাতব মুদ্রায় পরিবর্তন করিতে পারে এবং যে কর্তৃপক্ষ এই কাগজী টাকা প্রবর্তন করেন তাঁহারা কাগজী টাকা মুদ্রায় পরিবর্তিত করিতে অংগীকারাবদ্ধ থাকেন। ভারতে প্রচলিত ১০, ৫, ২ টাকা প্রভৃতি মূল্যের কাগজী টাকা পরিবর্তনীয় কাগজী টাকার উদাহরণ।

(গ) অপরিবর্তনীয় কাগজী টাকা—Inconvertible Paper Money.

যখন কাগজী টাকার পরিবর্তে ধাতব টাকা পাওয়া যায় না, তখন এই কাগজী টাকা অপরিবর্তনীয় কাগজী টাকা বলিয়া অভিহিত হয়। অপরিবর্তনীয় কাগজী টাকা প্রবর্তিত হইবার সময় হইতেই অপরিবর্তনীয় বলিয়া ঘোষিত হইতে পারে অর্থাৎ সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক যাহারা এই জাতীয় টাকা চালু করে তাহারা ইহার পরিবর্তে ধাতব মুদ্রা দিতে প্রথম হইতেই কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না। ভারত সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ১৲ টাকার নোট, বিলাতের পাউণ্ড, স্টার্লিং এই জাতীয় কাগজী টাকা।

অনেক সময় আবার পরিবর্তনীয় কাগজী টাকা কর্তৃপক্ষের ধাতব মুদ্রা দিবার অক্ষমতাহেতু ক্রমশঃ অপরিবর্তনীয় হইতে পারে।

কাগজী টাকার সুবিধা—Advantages of Paper Money

১। সহজ বহনযোগ্যতা, বিভাজ্যতা, সহজে চিনিবার সুবিধা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট টাকার প্রায় সব বৈশিষ্ট্যই কাগজী টাকায় দেখিতে পাওয়া যায়। ধাতব মুদ্রা অপেক্ষা কাগজী টাকার আদান-প্রদান করা অধিক সুবিধাজনক বলিয়া বর্তমানে কাগজী টাকার ব্যবহার প্রসার লাভ করিয়াছে।

২। কাগজী টাকা তৈয়ারী করিবার ব্যয়ও অনেক কম। খনি হইতে

ধাতু উত্তোলন করিয়া সেই ধাতুকে পরিস্রুত করিয়া নির্দিষ্ট ওজনের ও বিশুদ্ধতার ভিত্তিতে নানাজাতীয় মুদ্রায় রূপান্তরিত করা বহুল ব্যয়সাপেক্ষ। সে তুলনায় কাগজী টাকা অর্থাৎ নোট ছাপাইবার খরচ অতি নগণ্য। সুতরাং নোট ব্যবহারের ফলে যে অনেক ব্যয়সঙ্কোচ হয় ইহা অনস্বীকার্য।

৩। টাকা-পয়সা প্রতিনিয়তই হস্তান্তরিত হইতেছে। এই হস্তান্তরের ফলে বহুপরিমাণ ধাতু ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া জাতীয় অপচয় ঘটে। কাগজী টাকা ব্যবহার করিলে এই সকল মূল্যবান ধাতব মুদ্রার ব্যবহার-জনিত ক্ষয়-ক্ষতি নিবারিত হয়।

৪। কাগজী মুদ্রা ব্যবহারের ফলে যে পরিমাণ মূল্যের ধাতব মুদ্রা সঞ্চয় হয় তাহা বিদেশে ধার দিলে সুদ পাওয়া যায় বা অন্য নানা উৎপাদন-কার্যে ব্যবহার করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।

৫। নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রগুলি ধাতব মুদ্রার অভাবে কাগজী টাকা চালু করিয়া তাহাদের ব্যয় সংকুলান করিতে পারে।

৬। কাগজী মুদ্রা প্রচলনের ফলে দেশের অর্থপরিমাণকে চাহিদা অনুপাতে পরিবর্তন করা সম্ভবপর হইয়াছে। দেশের অর্থপরিমাণ যদি শুধুমাত্র ধাতব মুদ্রায় পরিচালিত হইত তাহা হইলে ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারের ফলে দেশে অর্থের চাহিদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও প্রয়োজনীয় ধাতুর অভাবে অর্থপরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হইত না। কাগজী মুদ্রা প্রচলনের ফলে অর্থের চাহিদা ও যোগানের সামঞ্জস্য বিধান করা সহজসাধ্য হইয়াছে। যদিও কাগজী অর্থের পরিবর্তে ধাতু গচ্ছিত রাখিতে হয় তথাপি এই গচ্ছিত ধাতুর পরিমাণ প্রবর্তিত কাগজী অর্থমূল্য পরিমাণ অপেক্ষা কম হয়।

অসুবিধা—Disadvantages

১। কাগজী টাকার একটি অসুবিধা হইল যে, ব্যবহারের ফলে ইহার ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাবনা অত্যধিক।

২। কাগজী টাকার প্রধান অসুবিধা হইল যে, এই ব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা থাকে। অল্প খরচে ও অল্প আয়াসে নোট ছাপান যায় বলিয়া আপৎ-কালে শাসনকর্তৃপক্ষ ব্যয় সংকুলান করিবার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করেন। দেশে যদি ধাতব মুদ্রা প্রচলিত থাকে তাহা হইলে উপযুক্ত পরিমাণ ধাতু না থাকিলে সরকার তাহার খুশীমত মুদ্রা চালু করিতে পারে না। কিন্তু কাগজী

টাকার ক্ষেত্রে সরকার উপযুক্ত পরিমাণ ধাতু গচ্ছিত না রাখিয়াও নোট প্রবর্তন করিতে পারে। অতিরিক্ত পরিমাণ নোট প্রবর্তনের ফলে সরকারের পক্ষে নোটগুলি ধাতব মুদ্রায় পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। নোটের জন্য যে পরিমাণ ধাতু জমা থাকে তাহা নিঃশেষিত হইলে অবশিষ্ট নোটগুলি অপরিবর্তনীয় হইয়া পড়ে। নোটগুলিকে ধাতব মুদ্রায় রূপান্তরিত করিবার দায়িত্ব না থাকিলে সরকার খুসীমত নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে। অত্যধিক পরিমাণ নোট চালু হওয়ার ফলে মুদ্রাস্ফীতি অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা যায়। আর মুদ্রাস্ফীতির চরম পরিণতি হইল মূল্যবৃদ্ধি।

৩। কাগজী টাকার আর একটি অসুবিধা হইল যে, ইহা একমাত্র দেশের মধ্যেই চালু হইতে পারে, বিদেশে এই টাকার দ্বারা লেন-দেন সম্ভব নয়। বিদেশীগণ দ্রব্যমূল্য বা ঋণশোধ বাবদ স্বর্ণ লইতে আপত্তি করে না, কিন্তু কাগজী টাকা তাহারা গ্রহণ করে না। সুতরাং কাগজী টাকা প্রচলিত হইলে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাহত হয়।

ঐচ্ছিক অর্থ—Optional Money

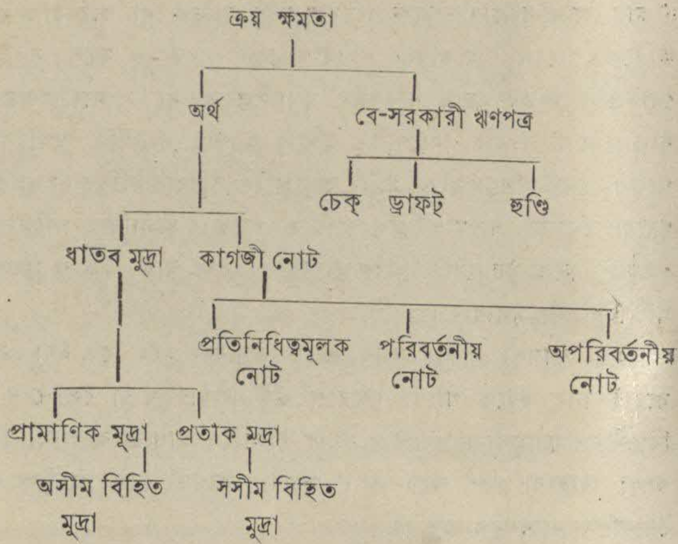
ঐচ্ছিক অর্থ বলিতে বিনিময়ের সেই সমুদয় মাধ্যমকে বুঝায় যাহা বিহিত অর্থ বলিয়া পরিগণিত না হইলেও সাধারণতঃ ঋণ-পরিশোধ ও অন্যান্য লেন-দেন ব্যাপারে গৃহীত হয়। ঐচ্ছিক অর্থ দ্বারা ব্যাঙ্ক নোট, চেক্, হুণ্ডি প্রভৃতি নানা-জাতীয় ঋণপত্র (credit money) বুঝায়।

আদিষ্ট অর্থ—Fiat Money

যে অর্থ সরকারী আদেশের জন্য লোকে গ্রহণ করে তাহাকে আদিষ্ট অর্থ বলা হয়। কাগজী টাকা আদিষ্ট অর্থের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কাগজী টাকার নিজস্ব কোন মূল্য নাই, কিন্তু সরকারী আদেশের জন্যই লোকে এইগুলি অর্থরূপে ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। প্রতীক মুদ্রাকেও আদিষ্ট অর্থ বলা যাইতে পারে, কা: ইহার মুদ্রামূল্য অপেক্ষা ধাতব মূল্য কম হওয়া সত্ত্বেও লোকে সরকারী আদেশের জন্য এইগুলি গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

অর্থের প্রকারভেদ—Different Kinds of Money

অর্থ বা ক্রয়ক্ষমতাকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যাইতে পারে :



একধাতুমান—Monometalism

দেশের প্রামাণিক অর্থ যখন স্বর্ণ অথবা রৌপ্য একটি ধাতুর দ্বারা নির্মিত হয় এবং এই প্রামাণিক মুদ্রার মূল্য সাধারণতঃ ইহার ধাতব মূল্যের দ্বারা নির্ধারিত হয়, তখন ইহাকে এক ধাতুমান মুদ্রা-ব্যবস্থা বলা হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে বহুদিন পর্যন্ত রৌপ্যমান চালু ছিল এবং ইংলণ্ডে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত স্বর্ণমান চালু ছিল।

স্বর্ণমান—Gold Standard

স্বর্ণমান বলিতে এরূপ একটি মুদ্রা-ব্যবস্থা বুঝায়, যে ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট হারে বিহিত মুদ্রা স্বর্ণে পরিবর্তিত করা যায়। এই ব্যবস্থায় অর্থমূল্য স্বর্ণমূল্য দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং স্বর্ণের মূল্য পরিবর্তনের সহিত অর্থের মূল্য পরিবর্তিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে স্বর্ণমান চালু ছিল। স্বর্ণমান মুদ্রা-ব্যবস্থায় স্বর্ণমুদ্রা চালু থাকে বলিয়া ইহাকে স্বর্ণমুদ্রামান (Gold Currency Standard) বলা হইত।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে স্বর্ণমান-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এই সময়ে যে স্বর্ণমান

চালু হয় তাহাতে বাজারে কোন স্বর্ণমুদ্রা চালু ছিল না। কাগজী নোট ও প্রতীক মুদ্রা বিহিত অর্থ হিসাবে বাজারে চালু থাকিত এবং এই নোট ও প্রতীক মুদ্রাগুলি একটি নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণপিণ্ডে (ধাতুতে) পরিবর্তিত হইত। এইজন্য এই মুদ্রা-ব্যবস্থাকে **স্বর্ণধাতুমান (Gold Bullion Standard)** বলা হইত। স্বর্ণমানের আর একটি পরিবর্তিত রূপ হইল **স্বর্ণ বিনিময়মান—(Gold Exchange Standard)**। স্বর্ণ ধাতুমানে দেশের বিহিত মুদ্রা, নোট ও প্রতীক মুদ্রায় গঠিত হইলেও কর্তৃপক্ষ এক নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করিত, কিন্তু স্বর্ণ বিনিময়মানে দেশের বিহিত অর্থ স্বর্ণধাতুতে পরিবর্তিত না করিয়া পূর্বনির্ধারিত হারে বিভিন্ন দেশের স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রায় পরিবর্তিত করা হইত। সুতরাং স্বর্ণ মুদ্রামানে স্বর্ণমুদ্রা চালু থাকিত, স্বর্ণধাতুমানে স্বর্ণমুদ্রা চালু না থাকিলেও স্বর্ণ ধাতুহিসাবে পাওয়া যাইত, কিন্তু স্বর্ণ বিনিময়মানে আর্থিক লেনদেনে মুদ্রা বা ধাতুহিসাবেও স্বর্ণের ব্যবহার হয় না।

স্বর্ণমানের প্রধান সুবিধা হইল যে, দেশে স্বর্ণপরিমাণ না বাড়িলে অন্য কোন কারণে মুদ্রাস্ফীতি হইয়া মূল্যবৃদ্ধি হইতে পারে না। বিভিন্ন দেশের স্বর্ণমুদ্রাস্থিত ধাতুর মূল্যের অনুপাতে বৈদেশিক বিনিময়ের হার স্থির হয় বলিয়া এই ব্যবস্থায় বিনিময়-হারের বিশেষ পরিবর্তন হইতে পারে না।

কিন্তু এই ব্যবস্থার অসুবিধা হইল যে, ইহা চালু রাখা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। এই ব্যবস্থায় বৈদেশিক বিনিময়-হারের উপর বেশী জোর দেওয়া হয় বলিয়া আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরের স্থায়িত্ব নষ্ট হয়।

দ্বি-ধাতুমান—Bi-Metallism

দ্বি-ধাতুমান মুদ্রা-ব্যবস্থার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ, স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় মুদ্রাই বাজারে প্রামাণিক মুদ্রারূপে চালু থাকে। দ্বিতীয়তঃ, উভয় মুদ্রাই বাজারে অসীম বিহিত মুদ্রা বলিয়া পরিগণিত হয় ও উভয়ের দ্রব্যমূল্য ধাতব মূল্যের সমান হয়। তৃতীয়তঃ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ের একটি নির্দিষ্ট হার স্থির করিয়া দেওয়া হয় ও ইহাদের অবাধ মুদ্রাঙ্কন থাকে।

দ্বি-ধাতুমানের আর একটি প্রকার-ভেদকে অসম্পূর্ণ দ্বি-ধাতুমান (Limping Bi-metallism) বলা হয়। এই ব্যবস্থায় প্রামাণিক মুদ্রা স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় ধাতুর তৈয়ারী হয় এবং উভয় মুদ্রাই অসীম বিহিত মুদ্রা হিসাবে চালু থাকে, কিন্তু

স্বর্ণের অবাধ মুদ্রাঙ্কন থাকিলেও রৌপ্যের মুদ্রাঙ্কন সরকার ইচ্ছামত পরিচালিত করেন অর্থাৎ রৌপ্যের অবাধ মুদ্রাঙ্কন-ব্যবস্থা থাকে না।

দ্বি-ধাতুমানের সুবিধা হইল যে, প্রামাণিক মুদ্রা হিসাবে দুইটি ধাতুর ব্যবহার হয় বলিয়া একটি ধাতু দুষ্প্রাপ্য হইলেও অপর ধাতুনির্মিত মুদ্রার পরিমাণ-বৃদ্ধি দ্বারা সমগ্র মুদ্রা-পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া মূল্যস্তর অপরিবর্তিত রাখা সম্ভব হয়। দ্বিতীয়তঃ, যে দেশে দ্বি-ধাতুমান প্রচলিত থাকে সে দেশ স্বর্ণমান ও রৌপ্যমান উভয় দেশের সহিত অনায়াসে বাণিজ্য করিতে পারে। আর্থিক আদান-প্রদানের সুবিধার ফলে বহির্বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

দ্বি-ধাতুমানের প্রধান অসুবিধা হইল যে, এই ব্যবস্থায় স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় মুদ্রা বাজারে চালু থাকে বলিয়া লোকে অধিক মূল্যবান অর্থ সঞ্চয় করে। ফলে, বাজারে শুধু নিকৃষ্ট অর্থ চালু থাকে।

গ্রেসামের নিয়ম—Gresham's Law

ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সমসাময়িক টমাস্ গ্রেসাম্ নামক এক ব্যক্তি টাকা-পয়সা সম্পর্কে এই নিয়মটির ব্যাখ্যা করেন বলিয়া ইহাকে গ্রেসামের নিয়ম বলা হয়। এই নিয়ম অনুসারে বলা হয় যে, বাজারে যদি একই সঙ্গে ভাল টাকা-পয়সা ও খারাপ টাকা-পয়সা চালু থাকে, তাহা হইলে খারাপ টাকা-পয়সা ভাল টাকা-পয়সাকে বাজার হইতে বিতাড়িত করিবে (Bad money tends to drive good money out of circulation), অর্থাৎ বাজারে শুধু খারাপ টাকা-পয়সাই চলিতে থাকিবে—ভাল টাকা-পয়সা আর বাজারে চালু থাকিবে না।

এখন প্রশ্ন হইল যে, এই ভাল-খারাপ টাকা-পয়সা কাহাকে বলে? একটা দেশে ধাতব মুদ্রা, পুরাতন ও নূতন মুদ্রা এবং কাগজী টাকা চালু থাকে। যখন বহুদিন পূর্বে নির্মিত ক্ষয়প্রাপ্ত মুদ্রা ও নূতন মুদ্রা পাশাপাশি বাজারে চলিতে থাকে, তখন নূতন মুদ্রাকে ভাল বলা হয়, কারণ এই মুদ্রার কোন ক্ষয় হয় নাই। ইহাতে পূর্ণ ওজনের ধাতু থাকে। আর পুরাতন মুদ্রাকে খারাপ মুদ্রা বলা হয় তাহার কারণ হইল বহু ব্যবহারের ফলে ইহা ক্ষয় পাইয়া ইহার ধাতুপরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং নূতন মুদ্রার তুলনায় পুরাতন মুদ্রাকে খারাপ বলা হয় এবং গ্রেসামের নিয়ম অনুসারে পুরাতন মুদ্রার দ্বারাই লোকে আদান-প্রদান করে ও নূতন মুদ্রা অন্তর্হিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, বাজারে একসঙ্গে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা চালু

থাকিলে স্বর্ণের উচ্চতর মূল্যের জন্য স্বর্ণমুদ্রা ভাল মুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রাকে খারাপ মুদ্রা বলা হয় ও গ্রেসামের নিয়ম অনুসারে বাজারে শুধু রৌপ্যমুদ্রা চালু থাকে। তৃতীয়তঃ, ধাতবমুদ্রা ও কাগজী টাকা একসঙ্গে চলিতে থাকিলে ধাতব মুদ্রার তুলনায় কাগজী নোট খারাপ টাকা বলিয়া গণ্য হইবে এবং বাজারে শুধু ইহাই প্রচলিত থাকিবে।

ভাল টাকার প্রচলন তিনটি কারণে বাধা পায়। প্রথম কারণ হইল জমানো অভ্যাস (Hoarding)। আমরা প্রত্যেকেই ভাল টাকা কাছে রাখিয়া খারাপ টাকার দ্বারা আদান-প্রদান করি। ট্রামে, বাসে উঠিয়া আমরা পুরাতন ঘসা দশ পয়সা, পঁচিশ পয়সা প্রভৃতি চালাইতে চেষ্টা করি। ইহার ফলে খারাপ টাকা একজনের হাত হইতে অপরের হাতে যায় অর্থাৎ বাজারে চালু থাকে, আর ভাল টাকার ব্যবহার বন্ধ হয়।

দ্বিতীয়তঃ, গলানর জন্য (Melting) অনেক ভাল টাকা বাজার হইতে অন্তর্হিত হয়। নূতন টাকার ওজন বেশী। ইহা গলালেই পুরাতন টাকা অপেক্ষা বেশী মূল্যের ধাতু পাওয়া যায় বলিয়া স্যাকরাগণ নূতন মুদ্রা গলাইয়া অলংকার প্রস্তুত করে।

তৃতীয়তঃ, বিদেশী পাওনা শোধ করিতেও (Foreign payment) অনেক ভাল মুদ্রা দেশ হইতে বাহিরে যায়। বিদেশীগণ দেশী মুদ্রায় মূল্য গ্রহণ করে না, কারণ এক দেশের টাকা অন্য দেশে চলে না। এইজন্য ভাল মুদ্রা গলাইয়া যে সোনা-রূপা পাওয়া যায় তাহা দ্বারা বিদেশী ঋণ শোধ করিতে হয়। এই তিনটি কারণে ভাল মুদ্রার প্রচলন ক্রমশঃ বন্ধ হয়।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, সব অবস্থায় এই নিয়মটি কার্যকরী হয় না। প্রথমতঃ, যদি দেশের লোকে খারাপ টাকা লইতে অস্বীকার করে তাহা হইলে খারাপ টাকার প্রচলন বন্ধ হইয়া শুধু ভাল টাকাই চালু থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ, যদি একটি দেশের ভাল এবং খারাপ মুদ্রা-সমেত সমগ্র অর্থপরিমাণ সে দেশের আর্থিক প্রয়োজনের তুলনায় কম বা ঠিক সমান হয়, তাহা হইলেও ভাল এবং খারাপ মুদ্রা উভয়েই চালু থাকিবে অর্থাৎ খারাপ মুদ্রা ভাল মুদ্রাকে হটাইতে পারিবে না।

পরিচালিত মুদ্রা-ব্যবস্থা বা কাগজীমান—Managed Money or Paper Standard

এই ব্যবস্থায় দেশের অর্থ-সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একটি নির্ধারিত পরিকল্পনানুযায়ী দেশের অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। দেশের বিহিত অর্থ প্রতীক মুদ্রা ও কাগজী নোট লইয়া গঠিত হয়। স্বর্ণমূল্যের সহিত এই অর্থের একটি সম্পর্ক সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হইলেও এই বিহিত অর্থের মূল্য স্বর্ণমূল্যের উপর নির্ভরশীল নহে; বিহিত অর্থের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আভ্যন্তরীণ মূল্য ঠিক রাখে, ইহার জন্য কোন স্বর্ণ তহবিল রাখিবার প্রয়োজন হয় না। বিদেশী ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করিয়া বা বিনিময় সমতা রক্ষা করিবার জন্য তহবিল সৃষ্টি করিয়া এই ব্যবস্থায় বৈদেশিক বিনিময়-হার স্থির রাখিবার চেষ্টা করা হয়।

এই ব্যবস্থার সুবিধা হইল যে, প্রত্যেক দেশ স্বাধীনভাবে তাহার মুদ্রা-ব্যবস্থা নিজ সুবিধামত পরিচালিত করিতে পারে। ইহা পরিচালনা করিবার জন্য কোনরূপ ব্যয়-বহুল স্বর্ণতহবিল রাখিবারও প্রয়োজন হয় না।

ভারতের বর্তমান মুদ্রা-ব্যবস্থা—Present Monetary System of India

ভারতে বর্তমানে পরিচালিত মুদ্রা-ব্যবস্থা চালু আছে। ভারতে চালু বিহিত অর্থকে একটি নির্দিষ্ট হারে বৈদেশিক মুদ্রার সহিত বিনিময় করা চলে। ইংলণ্ডের স্টার্লিং মুদ্রার সহিত ভারতের টাকার বিনিময়ের হার হইল ১ টাকা = ১শি. ৬পে.।

ভারতের টাকা ভারতে প্রামাণিক মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে ইহাতে প্রায় কোন রৌপ্য নাই। ইহা ছাড়া, ভারত সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত এক টাকার নোটও অসীম বিহিত মুদ্রা হিসাবে বাজারে চালু আছে। ছোটখাট ক্রয়-বিক্রয় ও লেন-দেনের জন্য ৫০, ২৫, ১০, ৫ ও এক পয়সা ব্যবহৃত হয়। এইগুলি হইল প্রতীক মুদ্রা। ভারতে এক টাকার কাগজী নোট ভারত সরকার প্রবর্তন করেন। ইহা অপরিবর্তনীয় অর্থ (Inconvertible Money)। এক টাকার উপরে ২৲, ৫৲, ১০৲, ১০০৲ টাকার নোট রিসার্ভ ব্যাঙ্ক চালু করে। ১৯৫৬ সালের 'রিসার্ভ ব্যাঙ্ক সংশোধন আইন'-এর বলে রিসার্ভ ব্যাঙ্কের প্রচলন বিভাগ (Issue Department) ১১৫ কোটি টাকা মূল্যের সোনা ও ৮৫ কোটি টাকা মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা ও ঋণ-পত্র জমা রাখিয়া

যে কোন মূল্য পরিমাণ কাগজী নোট প্রচলন করিতে পারে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের (International Monetary Fund) সহিত ভারতের বিনিময়কার্য চলে।

মূল্যস্তর

(The General Price level)

অর্থের মূল্য—Value of Money

অর্থের মূল্য বলিলে সাধারণতঃ অর্থের ক্রয়-ক্ষমতা বুঝায় অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য বা কাজ পাওয়া যায়। এক একক অর্থ যে পরিমাণ দ্রব্য বা কাজ কিনিতে পারে, তাহা দ্রব্যটির মূল্যের উপর নির্ভর করে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা কম পরিমাণ দ্রব্য বা কাজ কেনা যায়, আবার দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইলে, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দ্বারা বেশী পরিমাণ দ্রব্য কেনা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অর্থের ক্রয়-ক্ষমতা বা অর্থমূল্যের এবং দ্রব্যমূল্যের সম্পর্ক বিপরীত-মুখী। অর্থমূল্য বৃদ্ধি পাইলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়, দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইলে অর্থমূল্য বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য বিভিন্ন হয় এবং বিভিন্নভাবে দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তন ঘটে। এখন প্রশ্ন হইল যে, অর্থমূল্য কেন পরিবর্তিত হয়?

অর্থের পরিমাণতত্ত্ব—Quantity Theory of Money

অর্থের মূল্য উহার পরিমাণ বা সরবরাহের উপর নির্ভর করে। অন্যান্য দ্রব্যের মূল্যের ন্যায় অর্থের মূল্যও ইহার চাহিদা ও সরবরাহের উপর নির্ভর করে। অর্থের পরিমাণতত্ত্ব অনুসারে বলা হয় যে, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে অর্থের সরবরাহ বৃদ্ধি পাইলেই মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইবে এবং অর্থের সরবরাহ হ্রাস পাইলেই মূল্যস্তর হ্রাস পাইবে। অর্থের চাহিদা বলিলে অর্থের বিনিময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য ও কাজ পাওয়া যায় তাহার সমষ্টিকে বুঝায়। অর্থের নিজস্ব কোন উপযোগ নাই। অর্থের সরবরাহ বলিলে বুঝা যায় কোন নির্দিষ্ট সময়ে দেশে যে-পরিমাণ ক্রয়-ক্ষমতা বা বিনিময়ের বাহন ক্রয়-বিক্রয়ে ও নানারকম লেন-দেনে ব্যবহৃত হয়। অর্থের পরিমাণ শুধুমাত্র বিহিত অর্থপরিমাণকে বুঝায় না। অর্থের সরবরাহ

আবার অর্থের প্রচলন-ক্ষিপ্রতার (Velocity of circulation of money) উপর নির্ভর করে। এক একক অর্থ যদি পাঁচটি আদান-প্রদান করে তাহা হইলে তাহাকে পাঁচটি অর্থের সমান ধরিতে হইবে। বিহিত অর্থ ব্যতীতও ঋণগত অর্থ (credit money) অর্থাৎ চেক প্রভৃতির দ্বারাও ক্রয়-বিক্রয় ও অন্য আর্থিক আদান-প্রদান হয়। এই ঋণগত অর্থও সমগ্র অর্থ-পরিমাণের একটি অংশ। এই ঋণগত অর্থেরও আবার প্রচলন-ক্ষিপ্রতা (Velocity of circulation of credit) আছে। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি সমাজের সমগ্র অর্থপরিমাণ নির্ভর করে বিহিত অর্থপরিমাণ × বিহিত অর্থের প্রচলন-ক্ষিপ্রতা + ঋণগত অর্থ × ঋণগত অর্থের প্রচলন-ক্ষিপ্রতা।

অর্থের পরিমাণতত্ত্ব অনুসারে বলা হয় যে, স্বল্প-মেয়াদে বিহিত অর্থের প্রচলন-ক্ষিপ্রতা, ঋণগত অর্থ ও ইহার প্রচলন-ক্ষিপ্রতা এবং দ্রব্যাদির পরিমাণ সাধারণতঃ পরিবর্তিত হয় না। সুতরাং বিহিত অর্থপরিমাণের উপরই অর্থমূল্য নির্ভর করে।

ধনবিজ্ঞানী ফিসার এই তত্ত্বটিকে একটি সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন—

$$\text{ম} = \frac{\text{অপ্র} + \text{ঋপ্র}'}{\text{স}} \left(P = \frac{MV + M'V'}{T} \right)$$

উপরি-উক্ত সমীকরণে ব্যবহৃত অক্ষরগুলির তাৎপর্য হইল :

ম = মূল্যস্তর (Price level = P)

অ = বিহিত অর্থ (Legal tender money = M)

প্র = অর্থের প্রচলন-ক্ষিপ্রতা (Velocity of circulation of money = V)

ঋ = ঋণগত অর্থ (Credit money = M′)

প্র = ঋণগত অর্থের প্রচলন-ক্ষিপ্রতা (Velocity of circulation of credit = V′)

স = মোট সামগ্রীর পরিমাণ (Volume of trade = T)

মূল্যস্তর পরিমাপ করিবার উপায়—সূচক সংখ্যা—Measurement of changes in the general price level—Simple index numbers

অর্থের মূল্যের পরিবর্তন অর্থাৎ হ্রাস-বৃদ্ধি পরিমাপ করিবার জন্য সূচক সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন দ্রব্যের গড়পড়তা দামের শতকরা কত পরিবর্তন হইয়াছে তাহা স্থির করাকেই সূচক সংখ্যা বলা হয়। সূচক সংখ্যা প্রস্তুত

করিবার জন্য (১) প্রথমতঃ, একটি বিশেষ বৎসর অথবা নির্দিষ্ট কালকে ভিত্তি-বৎসর (Base year) হিসাবে ধরিতে হয়। (২) দ্বিতীয়তঃ কতকগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে হয় এবং (৩) এই নির্বাচিত দ্রব্যগুলির চল্তি দর সংগ্রহ করিতে হয়। (৪) পরবর্তী কালে অর্থাৎ যে সময়ের অর্থ-মূল্যের পরিবর্তন জানিতে চাওয়া হয় তখন ঐ ঐ দ্রব্যের দামের ভিত্তি-বৎসরের দামের সহিত শতকরা কত পরিবর্তন হইয়াছে তাহার তুলনা করা হয়। (৫) সর্ব-শেষে এই পরবর্তী কালের দ্রব্যমূল্যের সমষ্টিকে দ্রব্য-সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে ঐ সময়ের গড়পড়তা দাম পাওয়া যায়। এই সংখ্যাই হইল সূচক সংখ্যা। ভিত্তি-কালের সূচক সংখ্যা হইতে যদি এই সংখ্যা বেশী হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, অর্থমূল্য হ্রাস পাইয়াছে অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। আবার পরবর্তী কালের সূচক সংখ্যা যদি কম হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, অর্থমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইয়াছে। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটির দ্বারা সূচক সংখ্যার ধারণা স্পষ্টতর করা যাইতে পারে।

দ্রব্য	ভিত্তি বৎসর (১৯৩৮)		পরবর্তী কাল (১৯৪৫)	
	মূল্য		মূল্য	
চাউল প্রতি মণ	৫৲	১০০	১৫৲	৩০০
ডাইল "	৩৲	১০০	৬৲	২০০
লবণ "	১।০	১০০	৩৷০	২৫০
কাপড় প্রতি জোড়া	৪৲	১০০	৮৲	২০০
মোট দর		৪০০ ÷ ৪		৯৫০ ÷ ৪
গড় দর		১০০		২৩৭·৫

উপরের দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, ১৯৩৮ সালে দ্রব্যগুলির গড়পড়তা দর ছিল ১০০, ১৯৪৫ সালের গড়পড়তা দর হইল ২৩৭·৫। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ভিত্তি-বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৪৫ সালে দ্রব্যমূল্যের গড়-পড়তা দর (২৩৭·৫—১০০) বা ১৩৭·৫ বৃদ্ধি পাইয়াছে অর্থাৎ অর্থের মূল্য ঐ পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।

সূচক সংখ্যার সুবিধা—Utility of Index numbers

সূচক সংখ্যার সাহায্যে একাধিক উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। প্রথমতঃ,

ইহার সাহায্যে দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তন পরিমাপ করা যায়। জীবনযাত্রার ব্যয়ের হ্রাস-বৃদ্ধিও সূচক সংখ্যার সাহায্যে স্থির করা যায়। ইহা ছাড়া, সূচক সংখ্যার সাহায্যে শ্রমিকের মজুরি, আমদানী-রপ্তানী, কর্মসংস্থান প্রভৃতির পরিবর্তনের পরিমাপ করা যায়। সূচক সংখ্যার সাহায্যে নির্ধারিত মূল্য-পরিবর্তনের ভিত্তিতে শ্রমিকের মজুরির পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায়। বিভিন্ন সময়ে একই শ্রেণীর লোকের অর্থনৈতিক অবস্থার তারতম্য এবং ঋণ-দাতা ও ঋণ-গ্রহীতার সম্পর্কও সূচক সংখ্যার সাহায্যে নির্ণয় করা যায়।

মুদ্রাস্ফীতি—Inflation

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলেই সাধারণতঃ তাহাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। কিন্তু ইহা সব সময়ে সত্য নহে। মুদ্রাস্ফীতি ব্যতীতও অন্যান্য নানা কারণে মূল্য বৃদ্ধি পাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া গেলে বা মজুরির হার বৃদ্ধি পাইলে দ্রব্যমূল্য বাড়িতে পারে, কিন্তু এই জাতীয় মূল্য-বৃদ্ধিকে মুদ্রাস্ফীতি-জনিত মূল্যবৃদ্ধি বলা সমীচীন নহে। সরকার যদি বাজারে অধিক পরিমাণে অর্থ চালু করে তাহা হইলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। লোকের কর্ম-সংস্থানের উদ্দেশ্যে উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য সরকার যখন বেশী পরিমাণে অর্থ সৃষ্টি করে তখন মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে পারে না। কারণ, মুদ্রাস্ফীতির ফলে বেকারের সংখ্যা কমিয়া যায় এবং উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া অর্থপরিমাণের সহিত সমতা আনয়ন করে। কিন্তু এই পূর্ণ কর্মসংস্থানের পরও যদি সরকার বাজারে আরও অধিক নূতন অর্থ চালু করে, তাহা হইলে প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি ঘটে এবং দ্রব্যমূল্য ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে। এই অবস্থায় মূল্যবৃদ্ধির কারণ হইল যে, মুদ্রাস্ফীতির ফলে আর নূতন কর্মসংস্থান দ্বারা উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। মুদ্রাস্ফীতির ফলে লোকের আর্থিক আয় বাড়ে। আর্থিক আয় বাড়িলেই ব্যয়ও বাড়ে। কিন্তু উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইলে দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ বাড়িতে পারে না। কাজেই দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বাড়িয়াই যায়।

আবার যখন মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস পায় অথচ দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ সমান থাকে তখন লোকের আর্থিক আয় কমিবার ফলে ব্যয়-পরিমাণও হ্রাস পায়। ফলে মূল্য হ্রাস পায়। এই অবস্থাকে মূল্যহ্রাস (মুদ্রা-কুঞ্চন—Deflation) বলে।

মুদ্রাস্ফীতির কারণ—Causes of Inflation

নানা কারণে মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিতে পারে। অর্থের পরিমাণতত্ত্ব আলোচনা-কালে দেখা গিয়াছে যে, অর্থের মূল্য অর্থের চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে। অর্থের চাহিদা মোট বিক্রয়ের জন্য মজুত দ্রব্যসামগ্রীর উপর নির্ভর করে এবং এই অর্থের পরিমাণ মোট বিহিত অর্থ ও ঋণগত অর্থের পরিমাণ ও এই উভয়ের প্রচলন-ক্ষিপ্রতার উপর নির্ভর করে। সুতরাং অর্থের বিনিময়ে বিক্রয়ার্থ মোট সামগ্রী-পরিমাণ, মোট অর্থপরিমাণ ও উহার প্রচলন-ক্ষিপ্রতার পরিবর্তন ঘটিলেই মূল্যের পরিবর্তন ঘটিবে। বিক্রয়ার্থে মজুত দ্রব্যপরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিয়া যদি অর্থপরিমাণ বা ইহার প্রচলন-ক্ষিপ্রতা অথবা ঋণগত অর্থপরিমাণ বা ইহার প্রচলন-ক্ষিপ্রতা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে মূল্য বৃদ্ধি পাইবে, আবার এইগুলি হ্রাস পাইলে মূল্য কমিবে। অপর পক্ষে, অর্থপরিমাণ ও অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে যদি বিক্রয়ার্থ দ্রব্যপরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে মূল্য হ্রাস পাইবে এবং দ্রব্যপরিমাণ হ্রাস পাইলে মূল্য বৃদ্ধি পাইবে।

মূল্য-পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া—Effects of Price changes

মুদ্রাস্ফীতির ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং ইহার ফলে বিভিন্ন লোকের অবস্থা বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়। দাম বাড়িলে কাহারও হয়ত লাভ হয়, আবার কাহারও হয়ত লোকসান হয়। মুদ্রাস্ফীতির ফলে সমাজের বিভিন্ন লোকের অবস্থা কি হয় তাহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

১। দেনাদার ও পাওনাদার (Debtor and Creditor)—মুদ্রাস্ফীতির ফলে মূল্য বৃদ্ধি পাইলে দেনাদারের লাভ হয় এবং পাওনাদার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ দেনাদার সমান পরিমাণ অর্থ প্রদান করিলেও মূল্য-বৃদ্ধির ফলে পাওনাদার ঐ টাকায় পূর্বাপেক্ষা কম জিনিস কিনিতে পারে। মূল্য যখন কমে তখন পাওনাদারের লাভ হয়, কারণ সে একই পরিমাণ অর্থ দ্বারা বেশী পরিমাণ দ্রব্য কিনিতে পারে।

২। মজুর (Wage-earner)—মূল্য বৃদ্ধি পাইলে মজুর শ্রেণীর সবচেয়ে বেশী কষ্ট হয়। কারণ মূল্য-বৃদ্ধির সহিত তাহাদের মজুরি বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং একই পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া তাহারা কম পরিমাণ দ্রব্য পায়। তবে মূল্য-বৃদ্ধির সময় সাধারণতঃ শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারলাভ করে। ফলে শ্রমিকেরা বেশী কাজ পায়—বেকার হইবার ভয় থাকে না। মূল্য হ্রাস পাইলে শ্রমিকদের

সুবিধা হয়। তাহারা একই পরিমাণ অর্থে বেশী পরিমাণ দ্রব্য কিনিতে পারে। তবে মূল্য হ্রাসের ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য কমিয়া যায়, ফলে বেকার হইবার সম্ভাবনা থাকে।

৩। নির্দিষ্ট আয়ের লোক (Persons with fixed income)—শিক্ষক, কেরাণী, সরকারী কর্মচারী প্রভৃতি যাহারা মাসে নির্দিষ্ট হারে বেতন পায়, মূল্য-বৃদ্ধির সময় তাহাদের বিশেষ অসুবিধা হয়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলেও তাহাদের বেতন বৃদ্ধি হয় না। মূল্য হ্রাস হইলে এই সকল শ্রেণীর সুবিধা হয়।

৪। শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী (Industrialists and Businessmen)—মূল্য বৃদ্ধি পাইলে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সাধারণতঃ লাভবান হয়। কারণ জমি বা বাড়ীর খাজনা, শ্রমিকের মজুরি, যন্ত্রপাতির মূল্য প্রভৃতি উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পায় না, অথচ উৎপাদিত দ্রব্য বেশী দামে তাহারা বিক্রয় করিতে পারে। সুতরাং তাহাদের মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। মূল্য হ্রাস পাইলে এই শ্রেণী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৫। করদাতা (Tax-payer)—মূল্য বৃদ্ধি পাইলে করদাতার করভার লাঘব হয়। কারণ মূল্য-বৃদ্ধিকালে অর্থের বিনিময়ে কম জিনিসপত্র পাওয়া যায়। সুতরাং করদাতা যে পরিমাণ কর দেয় তাহাতে তাহার কম ত্যাগস্বীকার করিতে হয়। যখন ৫৲ টাকা চাউলের মণ, তখন ৫৲ টাকা কর দিতে হইলে লোকে ভাবে যে, এই ৫৲ টাকায় একমণ চাউল কেনা যাইত। কিন্তু চাউলের মণ যখন ২০৲ টাকা, তখন ৫৲ টাকা কর দেওয়ার সময় সে ভাবে যে, এই টাকায় ১০ সের চাউল পাওয়া যাইত। আবার মূল্য হ্রাস পাইলে করভার বেশী হয়।

মুদ্রাস্ফীতি-নিরোধের উপায়—Measure for Combating Inflation

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বিক্রয়ার্থ মজুত দ্রব্যের পরিমাণ যদি অপরিবর্তিত থাকে এবং অর্থের সরবরাহ যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে মূল্য বাড়ে। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ করিতে হইলে অর্থের সরবরাহ যাহাতে না বাড়ে তাহা করা দরকার ; এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা হয়। উপায়গুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা,—

১। আর্থিক ব্যবস্থা—Monetary measures

আর্থিক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হইল অর্থের পরিমাণ হ্রাস করিয়া দ্রব্যমূল্য কমানো। অর্থপরিমাণ কমিলে লোকের আয়-পরিমাণ কমিবে। ইহার ফলে ব্যয়ের পরিমাণ

কমিয়া মূল্যবৃদ্ধি হইতে পারিবে না। একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকই হইল সেই দেশের অর্থ-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকর্তা। মুদ্রাস্ফীতি ঘটিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকের বাট্টার হার বৃদ্ধি করিয়া বা খোলা-বাজারী কারবার করিয়া ব্যাংক-সৃষ্ট অর্থপরিমাণ কমাইয়া মুদ্রাস্ফীতিজনিত মূল্যবৃদ্ধি নিরোধ করিতে পারে।

২। রাজস্ব সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা—Fiscal measures

রাজস্ব সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা বালতে সরকারী আয়-ব্যয় সংক্রান্ত ব্যবস্থা বুঝায়। এ সম্পর্কে সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিতে পারেন।

(ক) সরকারী ব্যয়-সংকোচ—Reduction in Public expenditure

যুদ্ধজনিত ব্যয় ব্যতীত সরকার অন্য সময়ে ইহার ব্যয় হ্রাস করিয়া অর্থপরিমাণ কমাইতে পারেন। ইহার ফলে মূল্য হ্রাস পায়।

(খ) কর স্থাপন—Increased Taxation

সরকার উচ্চহারে করস্থাপন করিয়া জনসাধারণের উদ্বৃত্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রচলিত অর্থপরিমাণ কমাইতে পারেন।

(গ) জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ—Public Borrowing

সরকার জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ করিয়া অর্থপরিমাণ হ্রাস করিতে পারেন।

(ঘ) বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ও স্বল্প সঞ্চয়—Compulsory Savings and Small Savings

মুদ্রাস্ফীতিজনিত মূল্যবৃদ্ধি নিরোধ উদ্দেশ্যে সরকার উচ্চ আয়ের লোকদের সঞ্চয় করিতে বাধ্য করিয়া ব্যক্তিগত আয়ের ব্যয়যোগ্য পরিমাণ কমাইতে পারেন। আবার স্বল্প আয়ের লোকদের নানাভাবে সঞ্চয়ে প্রলুব্ধ করিয়া তাহাদের ব্যয়যোগ্য আয়-পরিমাণ কমাইয়া মূল্যবৃদ্ধি নিরোধ করিতে পারেন।

৩। অন্যান্য ব্যবস্থা—Other Measures

(ক) উৎপাদন-বৃদ্ধি—Increase in production

উৎপাদন বিশেষ করিয়া ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া সরকার মুদ্রাস্ফীতিজনিত মূল্যবৃদ্ধি নিরোধ করিতে পারেন।

(খ) মজুরি-নিয়ন্ত্রণ—Control of Wages

মজুরি-বৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিলে মূল্যস্তরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মজুরিবৃদ্ধি নিরোধ করিতে পারিলে মূল্যবৃদ্ধি রদ করা যায়।

(গ) মুদ্রা অবৈধকরণ—Demonitisation

প্রচলিত কাগজী টাকার কিয়দংশ নষ্ট করিয়া বা নূতন মুদ্রা-ব্যবস্থা চালু করিয়া মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ করা যায়।

(ঘ) মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ ব্যবস্থা—Price Control and Rationing

মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির পরিমাণ বরাদ্দ করিয়া লোকের ব্যয়-পরিমাণ কমান যায়। ফলে মূল্যবৃদ্ধি বাধা পায়।

(ঙ) নগদ জমা আটক রাখা—Blocking or Freezing Liquid Assests

অর্থের মালিকগণ যাহাতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া ব্যয় বৃদ্ধি করিতে না পারেন সেই উদ্দেশ্যে সরকার অনেক সময় ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ আটক রাখেন।

ভারতে মূল্যস্তর—Price level in India

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ হইতেই ভারতে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে থাকে এবং এখনও পর্যন্ত এই মুদ্রাস্ফীতি বর্তমান রহিয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সাল হইতে বর্তমানে কি পরিমাণ মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছে তাঁহা আমাদের অত্যাবশ্যকায় খাদ্যদ্রব্য চাউলের মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ হইতে কিছু ধারণা করা যায়। ১৯৩৮-৩৯ সালে এক মণ উৎকৃষ্ট চাউলের মূল্য ৪৷৹ হইতে ৫৲ টাকা ছিল। এখন সেই চাউলের মূল্য ২৮৲ হইতে ৩২৲ টাকা। এক জোড়া ডিমের দাম তখন কলিকাতা সহরেই ৩ পয়সা (বর্তমান ৫ পয়সা) ছিল। এখন তাহার দাম অন্ততপক্ষে ৫০ পয়সা। এক সের সরিষার তৈলের মূল্য ছিল ॥৴৹ আনা, আর এখন ২.৫০ পয়সা। এক মণ কয়লা যাহা ঐ সময়ে ॥৴৹ আনায় পাওয়া যাইত এখন তাহার দাম ২.৫০ পয়সা। সুতরাং মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ সহজেই অনুমান করা যায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানী ও জাপানের সহিত যুদ্ধ পরিচালনা করিবার জন্য ভারতকে একটি প্রধান ঘাঁটি করা হয়। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও অন্যান্য মিত্রশক্তির জন্য ভারতে অতিরিক্ত অর্থ সৃষ্টি করা হয়। মিত্রশক্তিবর্গের যুদ্ধ পরিচালনা-সংক্রান্ত ব্যয়নির্বাহের জন্যই এই মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। যুদ্ধের সময়ে যে হারে মুদ্রাপরিমাণ বৃদ্ধি পায়, সে হারে উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য লোকাভাব ঘটে, বহু জমি চাষের অযোগ্য হয়। ইহার ফলে উৎপাদন হ্রাস পায়। ফলে মুদ্রাস্ফীতি গুরুতর আকার ধারণ করে। যুদ্ধের সময়ে কালোবাজারী ব্যবসায় বৃদ্ধি পাইয়া অনেকক্ষেত্রে চোরাকারবারিগণ

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিয়া কৃত্রিমভাবে মূল্য বৃদ্ধি করে। ভারতে মুদ্রাস্ফীতির আর একটি কারণ হইল ১৯৪৯ সালে ভারত সরকার কর্তৃক মুদ্রামূল্য হ্রাস (Devaluation)। ইহার ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরিশেষে বলা যায় যে, যুদ্ধের পর ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারগুলির আয় অপেক্ষা ব্যয়াধিক্য ঘটিতে থাকে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে সরকার যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তাহার ব্যয়নির্বাহের জন্য ঘাটতি অর্থসংস্থান নীতি অনুসরণ করা হয়। ইহার ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে ভারতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়াছে।

গৃহীত প্রতিকার-ব্যবস্থা—Anti-inflationary measures

মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ করিবার জন্য ভারত সরকার নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। বাজারে চালু অর্থপরিমাণ কমাইবার জন্য সরকার আয়কর, অতিরিক্ত মুনাফাকর, ও ঊর্ধ্ব আয়করের হার বৃদ্ধি করিয়াছেন। সরকার অনেক রপ্তানী দ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইয়া সেই দ্রব্যগুলিকে দেশী বাজারে বিক্রয় করিতে বাধ্য করিয়া জিনিসের সরবরাহ-বৃদ্ধি দ্বারাও মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের প্রয়াস পাইয়াছেন। জনসাধারণের ব্যয় করিবার ক্ষমতা যাহাতে হ্রাস পায় এই উদ্দেশ্যে সরকার জনসাধারণকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করেন। পোস্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক ও ডিফেন্স সার্টিফিকেটে অর্থ-বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য সরকার জনসাধারণকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করেন। মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে রিসার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হারও বৃদ্ধি করা হয় এবং ১৯৫৬ সালের রিসার্ভ ব্যাঙ্ক সংশোধনী আইন অনুযায়ী তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে রিসার্ভ ব্যাঙ্কে আমানত-পরিমাণ চারগুণ বেশী রাখিতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা রিসার্ভ ব্যাঙ্ককে দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও চাউল, চিনি, সরিষার তৈল প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী ও বস্ত্র প্রভৃতির বরাদ্দ ঠিক করিয়াও সরকার মুদ্রাস্ফীতিজনিত মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করেন। ইদানীং সরকার বাধ্যতামূলক সঞ্চয়েরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থাগুলি অবলম্বিত হওয়ার ফলে মূল্যস্তর কিছু হ্রাস পায়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মূল্যস্তর হ্রাস পায় নাই, বরঞ্চ বৃদ্ধি পাইতেছে।

সংক্ষিপ্তসার

অর্থ

বহু পূর্বে মানুষ অর্থের ব্যবহার জানিত না। তখন দ্রব্যের পরিবর্তে দ্রব্য-

বিনিময় হইত। দ্রব্যবিনিময়-ব্যবস্থার কতকগুলি বিশেষ অসুবিধা ছিল। এই অসুবিধাগুলি দূর করিবার উদ্দেশ্যে অর্থের আবিষ্কার হয় এবং সোনা, রূপা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুগুলি অর্থহিসাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে।

অর্থের সংজ্ঞা ও কাজ

ধনবিজ্ঞানে অর্থ বলিতে আমরা বিনিময়ের সেই সমস্ত মাধ্যমকে বুঝি যাহা সকলে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে এবং যাহার দ্বারা দেনা-পাওনা শোধ হয়। অর্থ (১) বিনিময়ের বাহন, (২) মূল্যের পরিমাপক, (৩) সঞ্চয়ের বাহন, (৪) স্থগিত আদান-প্রদানের মান হিসাবে কাজ করে।

মুদ্রামান

মুদ্রা-ব্যবস্থা এক-ধাতুমান বা দ্বি-ধাতুমান হইতে পারে। দেশের প্রামাণিক অর্থ যদি এক ধাতুতে তৈয়ারী হয় তাহা এক-ধাতুমান এবং দুই ধাতু দ্বারা তৈয়ারী হইলে তাহাকে দ্বি-ধাতুমান বলা হয়। দ্বি-ধাতুমানে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় মুদ্রার অবাধ মুদ্রাঙ্কন থাকে এবং উভয় মুদ্রাই অসীম বিহিত মুদ্রা বলিয়া পরিগণিত হয়।

প্রামাণিক ও প্রতীক মুদ্রা

বিনিময়ের মান হিসাবে যে মুদ্রা ব্যবহৃত হয়, তাহাকে প্রামাণিক মুদ্রা বলা হয়। ইহার মুদ্রামূল্য ধাতব মূল্যের সমান হয় ও ইহার অবাধ মুদ্রাঙ্কন থাকে। প্রতীক মুদ্রার মুদ্রামূল্য ইহার ধাতব-মূল্য অপেক্ষা অধিক হয়। ইহা সসীম বিহিত মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং ইহার অবাধ মুদ্রাঙ্কন থাকে না।

যে অর্থে পাওনাদারগণ তাহাদের পাওনা লইতে বাধ্য, তাহাকে বিহিত মুদ্রা বলা হয়।

ভারতের টাকা

ভারতের টাকা ভারতের মধ্যে প্রামাণিক মুদ্রা হিসাবে চালু থাকিলেও প্রকৃত-পক্ষে ইহা প্রামাণিক মুদ্রা নহে। ধাতব মূল্য অপেক্ষা ইহার মুদ্রামূল্য বেশী এবং ইহার অবাধ মুদ্রাঙ্কন নাই।

স্বর্ণমান

স্বর্ণমান হইল এক-ধাতুমান। স্বর্ণমানের বৈশিষ্ট্য হইল যে, স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন

থাকে এবং স্বর্ণমুদ্রাই দেশের প্রামাণিক মুদ্রা বলিয়া পরিগণিত হয়। পরবর্তী কালে যে স্বর্ণমানের প্রচলন হয় তাহাতে দেশের প্রামাণিক মুদ্রার মূল্য স্বর্ণমূল্যের সহিত সম্পর্কিত থাকিলেও দেশের মধ্যে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল না।

কাগজীমান

আধুনিক কালে দেশের বিহিত অর্থ প্রতীক মুদ্রা ও কাগজী নোট লইয়া গঠিত হয়। এই অর্থের মূল্য স্বর্ণের উপর নির্ভর করে না এবং ইহার জন্য কোন স্বর্ণ তহবিল রাখিতে হয় না। এইজন্য ইহাকে কাগজীমান বলে। ভারতে বর্তমানে কাগজীমান প্রচলিত আছে।

অর্থের মূল্য

অর্থমূল্য বলিলে সাধারণতঃ অর্থের ক্রয়-ক্ষমতা বুঝায় অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থ যে পরিমাণ দ্রব্য বা কাজ কিনিতে পারে। অর্থমূল্য ও দ্রব্যমূল্য বিপরীতমুখী। অর্থমূল্য বৃদ্ধি পাইলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায় এবং অর্থমূল্য হ্রাস হইলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়।

অর্থের পরিমাণতত্ত্ব

অর্থের পরিমাণতত্ত্ব অনুসারে অর্থের মূল্য প্রচলিত অর্থপরিমাণের উপর নির্ভর করে। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে অর্থের পরিমাণ অনুসারে অর্থের মূল্য বিপরীত মুখে পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ অর্থের পরিমাণ যদি দ্বিগুণ হয় তাহা হইলে অর্থের মূল্য অর্ধেক হয় এবং দ্রব্যমূল্য দ্বিগুণ হয়, আবার অর্থের পরিমাণ যদি অর্ধেক হয় তাহা হইলে অর্থের মূল্য দ্বিগুণ হয় এবং দ্রব্যমূল্য অর্ধেক হয়।

সূচক সংখ্যা

অর্থের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি সূচক সংখ্যার দ্বারা নির্ণয় করা যায়। অর্থের মূল্য স্থির করিবার জন্য বিভিন্ন দ্রব্যের যে গড়পড়তা দাম ঠিক করা হয়, তাহাকে সূচক সংখ্যা বলে। সূচক সংখ্যার সাহায্যে দ্রব্যমূল্য পরিবর্তনের পরিমাণ, জীবনযাত্রার ব্যয়ের পরিবর্তন ও মজুরির পরিবর্তন-পরিমাণ পরিমাপ করা যায়।

মুদ্রাস্ফীতি ও ইহার কুফল

যখন বিক্রয়ার্থ মজুত দ্রব্যের অর্থাৎ বিনিময়ের মাধ্যমের পরিমাণের চাহিদার

তুলনায় অর্থপরিমাণ এরূপভাবে বৃদ্ধি পায়, যাহার ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, তখন তাহাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

মুদ্রাস্ফীতির ফলে মূল্যবৃদ্ধি হয় এবং আয়ের তুলনায় ব্যয়বৃদ্ধিতে দরিদ্র লোকের অসুবিধা হয়। নির্দিষ্ট আয়ের লোক ও মজুর শ্রেণীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়, কিন্তু ব্যবসায়ী, দেনাদার ও করদাতার সুবিধা হয়। ফলে সমাজে অসম ধন-বণ্টন ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়।

মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের উপায়

(১) সরকার কর্তৃক উচ্চহারে কর-স্থাপন, (২) ঋণ-গ্রহণ, (৩) ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ আটক রাখা, (৪) মূল্য-নিয়ন্ত্রণ, (৫) উৎপাদন-বৃদ্ধি ইত্যাদি।

ভারতে মুদ্রাস্ফীতির কারণ

১। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তিবর্গের যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য অর্থপরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া, ২। চোরাবাজারী কারবারের প্রসার, ৩। মুদ্রামূল্য হ্রাস, ৪। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সার্থক করিবার জন্য ঘাট্‌তি ব্যয়।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. What are the difficulties of barter-exchange? Explain how they can be removed by the introduction of money?

H. S. (Com.) 1962, Comp.

দ্রব্য-বিনিময়ের অসুবিধাগুলি কি কি? এই অসুবিধাগুলি অর্থ প্রবর্তনের সাহায্যে কি-ভাবে দূর করা যায়?

উঃ—মানুষ যখন অর্থের ব্যবহার জানিত না, তখন তাহারা প্রত্যক্ষভাবে দ্রব্য-বিনিময় করিত। কৃষক ধানের পরিবর্তে তাঁতির নিকট হইতে কাপড় সংগ্রহ করিত এবং তাঁতি কাপড়ের পরিবর্তে ধান লইত। এইরূপে পারস্পরিক পরিশ্রমলব্ধ দ্রব্যের আদান-প্রদানের সাহায্যে তাহারা প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিত।

কিন্তু দ্রব্য-বিনিময়ের কতকগুলি অসুবিধা ছিল।

প্রথম অসুবিধা হইল পারস্পরিক অভাবের অসামঞ্জস্য। কৃষকের কাপড়ের প্রয়োজন হইলেও তাঁতির ধানের প্রয়োজন না হইলে সে ধানের পরিবর্তে কাপড় বিনিময় করিতে রাজী হইতে পারে না। সুতরাং পারস্পরিক অভাবের সামঞ্জস্য না হইলে দ্রব্য-বিনিময় করা যায় না।

দ্বিতীয় অসুবিধা ছিল মূল্য-নির্ধারণের নির্দিষ্ট মানের অভাব। অভাবের সামঞ্জস্য হইলেও

কত ধানের পরিবর্তে একখানি কাপড় পাওয়া যাইতে পারে তাহারও কোন নির্দিষ্ট বিনিময়-হার ছিল না।

তৃতীয়তঃ, ভাগ করিবার মানের অভাবের জন্যও দ্রব্য-বিনিময় অনেক সময় সম্ভব হইত না। অনেক দ্রব্য ভাগ না করিয়া বিনিময় করা যাইত না, অথচ ভাগ করিলে দ্রব্যটির উপযোগ নষ্ট হইত।

এই অসুবিধাগুলি দূর করিবার উদ্দেশ্যে অর্থের প্রবর্তন হয়। অর্থ বিনিময়ের বাহন, সুতরাং অর্থের সাহায্যে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, অর্থ দ্বারা দ্রব্য ও কাজের মূল্য পরিমাপ করা যায়। সুতরাং অর্থ দ্রব্যমূল্য স্থির করিয়া বিনিময়ের সাহায্য করে। তৃতীয়তঃ, অর্থ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের সাহায্য করে ও ধার শোধ করিতে সাহায্য করে।

2. Define money. What are its functions ? H. S. (Com.) 1961, Comp.
অর্থ কাহাকে বলে ? অর্থের কার্যাবলী আলোচনা কর।

উঃ—অর্থের কাজ দিয়া অর্থের সংজ্ঞা স্থির হয়। যে বস্তুই অর্থের কাজ করে তাহাকে অর্থ বলা হয় (Money is what money does)। অর্থ বলিতে আমরা সেই সমস্ত জিনিস বুঝি যাহা সকলে সব সময়ে গ্রহণ করে ও যাহার সাহায্যে ক্রয়-বিক্রয় ও দেনা-পাওনা শোধ হয়। অর্থের এই সংজ্ঞানুসারে একটি পাকিস্তানী মুদ্রা বা একখানি দেশী চেক্ অর্থ নয়, কারণ লোকে এই উভয় অর্থ লইতে অস্বীকার করিতে পারে এবং তাহাকে এই অর্থ গ্রহণ করিতে বাধ্য করা যায় না। সুতরাং অর্থের বৈশিষ্ট্য হইল ইহার (১) সর্বজনগ্রাহ্যতা, (২) আইন-সিদ্ধ মর্যাদা ও (৩) দেনা-পাওনা মিটাইবার ক্ষমতা।

অর্থ কি, তাহা অর্থের কার্যাবলী আলোচনা করিলে বুঝা যায়। অর্থের প্রথম কাজ হইল ইহা বিনিময়ের বাহন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অর্থের সাহায্যে এক দ্রব্য বা এক কাজের পরিবর্তে অপর দ্রব্য বা অপর কাজ পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, অর্থের সাহায্যেই দ্রব্য ও কাজের মূল্য পরিমাপ ও প্রকাশ করা হয়। চাউল, কাপড়, গরু, মোটরগাড়ী প্রভৃতির বিনিময়-মূল্য অর্থ দ্বারা পরিমাপ ও প্রকাশ করা হয়। তৃতীয়তঃ, অর্থ সঞ্চয়ের বাহন হিসাবে কাজ করে। দ্রব্যমূল্য সাধারণতঃ বাড়ে-কমে, কিন্তু অর্থের মূল্য মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে। তাই লোকে সঞ্চয় করিতে হইলে দ্রব্য সঞ্চয় না করিয়া অর্থ সঞ্চয় করে, কারণ লোকে জানে অর্থ অন্যান্য দ্রব্যের মত নষ্ট হয় না এবং যে কোন সময়ে অর্থের পরিবর্তে অন্য দ্রব্য পাওয়া যায়। চতুর্থতঃ, অর্থ স্থগিত আদান-প্রদানের মান হিসাবে কাজ করে। বর্তমানে অর্থ ধার করিয়া বা ধারে দ্রব্য ক্রয় করিয়া ভবিষ্যতে অর্থের মাধ্যমেই ধার শোধ বা দ্রব্যমূল্য শোধ করে।

3. Describe the advantages of money. H. S. (Hu), Comp. 1961
অর্থের সুবিধা বর্ণনা কর।

উঃ—অর্থের প্রবর্তনে দ্রব্য-বিনিময় ব্যবস্থার (Barter System) যে অসুবিধাগুলি ছিল তাহা দূর হইয়াছে। বর্তমানে অর্থের সাহায্যে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যায়। অর্থ দ্রব্যমূল্য স্থির করিয়া বিনিময়ের সাহায্য করে। অর্থ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ে সাহায্য করে এবং ধার শোধ করিতে সাহায্য করে।

প্রথম প্রশ্নের দ্বিতীয় ভাগের উত্তর দ্রষ্টব্য।

4. Explain the Quantity Theory of value of money.
H. S. (Com.) 1960, Comp.

অর্থের পরিমাণতত্ত্ব বিশদভাবে বুঝাইয়া দাও।

Or

State briefly the Quantity theory of money. H. S. (Com.) 1965

অর্থের পরিমাণতত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উঃ—অর্থপরিমাণ পরিবর্তনের ফলে মূল্যস্তরের পরিবর্তন ঘটে। দেশের সরকার যদি কোন কারণে অর্থপরিমাণ বৃদ্ধি করেন তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্য-পরিমাণ বাড়ে না। অর্থপরিমাণ বাড়িবার ফলে লোকের হাতে বেশী টাকা আসে এবং দ্রব্য-পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইলে লোকে একই পরিমাণ জিনিসের জন্য বেশী পরিমাণ টাকা ব্যয় করিবে। ফলে, টাকার পরিমাণ বাড়িলেই দ্রব্যমূল্য বাড়িবে। অপর পক্ষে যখন টাকার পরিমাণ কমে, কিন্তু জিনিসের পরিমাণ যদি ঠিক থাকে বা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে একই পরিমাণ জিনিসের জন্য বা বেশী পরিমাণ জিনিসের জন্য কম পরিমাণ টাকা ব্যয় হইবে। সুতরাং টাকার পরিমাণ কমিলে দ্রব্যমূল্যও কমিবে।

অর্থের পরিমাণের সহিত মূল্যস্তরের সম্পর্ক বুঝাইবার জন্য অর্থের পরিমাণতত্ত্বের অবতারণা করা হয়। এই তত্ত্বে বলা হয় যে, অন্যান্য দ্রব্যের মূল্যের ন্যায় অর্থের মূল্যও ইহার চাহিদা ও সরবরাহের দ্বারা নির্ধারিত হয়। বিনিময়ের উদ্দেশ্যে দ্রব্যের পরিমাণ বাড়িলেই অর্থের চাহিদা বাড়ে। দ্রব্যের পরিমাণ আবার সমগ্র উৎপাদনের উপর নির্ভর করে এবং এই সমগ্র উৎপাদন সহসা পরিবর্তিত হয় না। অর্থের চাহিদা অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে দ্রব্যের চাহিদা অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও অপরিবর্তিত থাকিতে পারে। সুতরাং অর্থের চাহিদা যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে অর্থমূল্য অর্থের পরিমাণ অর্থাৎ অর্থের সরবরাহের দ্বারা নির্ণীত হইবে। অর্থের পরিমাণ যদি দ্বিগুণ হয় তাহা হইলে অর্থমূল্য অর্ধেক হইবে ও দ্রব্যমূল্য দ্বিগুণ হইবে; অপর পক্ষে অর্থের পরিমাণ অর্ধেক হইলে অর্থমূল্য দ্বিগুণ হইবে ও দ্রব্যমূল্য অর্ধেক হইবে। ধরা যাউক, যদি ৩০টি দ্রব্য বিক্রয়ার্থ থাকে আর ৩০টি মুদ্রা থাকে তাহা হইলে প্রত্যেকটি দ্রব্য এক একক অর্থে বিক্রীত হইবে। দ্রব্যের পরিমাণ যদি অপরিবর্তিত থাকে, আর অর্থ পরিমাণ যদি দ্বিগুণ অর্থাৎ ৬০ হয় তাহা হইলে একটি জিনিস কিনিতে এক একক অর্থের পরিবর্তে দুই একক অর্থ ব্যয় হইবে, অর্থাৎ অর্থের মূল্য কমিবে, কিন্তু জিনিসটির দাম বাড়িবে। অপর পক্ষে জিনিসের পরিমাণ ঠিক থাকিয়া যদি অর্থের পরিমাণ কমে অর্থাৎ ৩০এর স্থলে ১৫টি মুদ্রা হয়, তাহা হইলে মুদ্রার মূল্য বাড়িবে, কিন্তু জিনিসের মূল্য কমিবে।

ফিসার নিম্নলিখিত সমীকরণ দ্বারা অর্থের পরিমাণ ও মূল্যস্তরের সম্পর্ক বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

$$P=\frac{MV+M'V'}{T}$$

এখানে P = মূল্যস্তর, M = বিহিত অর্থপরিমাণ

V = বিহিত অর্থের প্রচলন-ক্ষিপ্রতা, M′ = ঋণগত অর্থ

V'=ঋণগত অর্থের গতিবেগ, T=বিনিময় দ্রব্য পরিমাণ। স্বল্প মেয়াদে V, M', V' ও T পরিবর্তিত হয় না। এইগুলি পরিবর্তিত না হইলে অর্থপরিমাণ যেভাবে পরিবর্তিত হইবে মূল্যস্তরও সেইভাবে পরিবর্তিত হইবে।

5. What is inflation ? What are its evils ? H. S. (Com.) 1961

মুদ্রাস্ফীতি কাহাকে বলে ? ইহার দোষগুলি আলোচনা কর।

6. How will a period of rising prices affect the following groups in the population :—

(a) Farmers ; (b) Wage-earners and (c) Teachers.

H. S. (Hu.) Comp. 1960

মূল্যবৃদ্ধিকালে নিম্নলিখিত শ্রেণীর লোকের অবস্থা কিরূপ হয় :—

(ক) কৃষক ; (খ) শ্রমিক ও (গ) শিক্ষক।

উঃ—অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। অর্থপরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে পারে না। কিন্তু যে হারে উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তদপেক্ষা বেশী হারে যদি অর্থপরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। মুদ্রাস্ফীতির ফলে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায়। সরকার যদি উৎপাদন পরিমাণের তুলনায় ক্রমাগত বেশী পরিমাণ অর্থ সৃষ্টি করিতে থাকেন তাহা হইলে মূল্যস্তর ক্রমাগত বাড়িবে ও ইহার ফলে উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগ-ব্যবস্থায় জটিলতা সৃষ্টি হইয়া অর্থ নৈতিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

মূল্যবৃদ্ধির ফল :—

১। দেনাদার লাভবান হয়, পাওনাদার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২। মজুরশ্রেণীর অবস্থা খারাপ হয়, কেননা দ্রব্যমূল্য যে হারে বাড়ে মজুরি সে হারে বাড়ে না। কিন্তু এই সময়ে মূল্যবৃদ্ধির ফলে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার হয় ও শ্রমিকের চাহিদা বাড়ে। ফলে শ্রমিকেরা কাজ পায়।

৩। ব্যবসায়ী লাভবান হয়। সস্তায় উৎপাদনের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া সে বেশী দামে বিক্রয় করে।

৪। স্থির আয়ের লোকের ক্ষতি হয়, যেমন শিক্ষক শ্রেণী। মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহাদের বেতন বৃদ্ধি না পাইলে তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হন।

৫। করদাতার করভার লাঘব হয়।

৬। কৃষক—মূল্যবৃদ্ধি পাইলে কৃষিজাতদ্রব্যেরও মূল্যবৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে কৃষকদের লাভ পায়।

7. What is paper money ? What are the advantages and disadvantages of paper money ? H. S. (Com.) 1962, Comp.

কাগজী টাকা কাহাকে বলে ? ইহার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি কি কি ?

উঃ—দেশের সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন নির্ধারিত পরিমাণ ধাতু গচ্ছিত রাখিয়া নোট প্রচলন করেন তখন এই নোটকে কাগজী টাকা বলা হয়। কাগজী টাকা সরকারী আদেশে চালু

থাকে। কাগজী টাকা ধাতব মুদ্রায় পরিবর্তন করা যাইতে পারে, আবার অপরিবর্তনীয়ও হইতে পারে। ভারতে ২৲ ৫৲ ১০৲ টাকার নোট পরিবর্তনীয়, কিন্তু ১৲ টাকার নোট অপরিবর্তনীয়।

সুবিধা :—

১। সহজ বহনযোগ্যতা, বিভাজ্যতা ও সহজে চিনিবার সুবিধা হইল কাগজী টাকার প্রধান গুণ।

২। তৈয়ারী করিবার ব্যয় ও ধাতব মুদ্রা তৈয়ারীর ব্যয় অপেক্ষা কম।

৩। কাগজী টাকা ব্যবহার করিলে ধাতব মুদ্রার ব্যবহার-জনিত ক্ষয়-ক্ষতি নিবারিত হয়।

৪। কাগজী মুদ্রা ব্যবহার করিলে ধাতব মুদ্রা অন্য উৎপাদন কার্যে বিনিয়োগ করা যায়।

৫। নব প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রগুলি কাগজী টাকার সাহায্যে তাহাদের ব্যয় নির্বাহ করিতে পারে।

৬। কাগজী মুদ্রা প্রচলনের ফলে দেশের অর্থ পরিমাণকে চাহিদা অনুপাতে হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায়।

অসুবিধা :—

১। কাগজী টাকার অসুবিধা হইল যে, ব্যবহারের ফলে ইহারা অত্যধিক ক্ষয়-ক্ষতি হয়।

২। এই ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হইল যে, সহজে নোট ছাপান যায় বলিয়া মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতে পারে।

৩। দেশের বাহিরে কাগজী টাকায় লেন-দেন সম্ভব নয়।

8. Summarise the functions of Money. What are the different kinds of money in India today ? C. U. (Com.) 1964

অর্থের কার্যকারিতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ভারতে বর্তমানে কয় প্রকারের অর্থ প্রচলিত আছে ?

উঃ । অর্থের প্রথম কাজ হইল ইহা বিনিময়ের বাহন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যক্ষভাবে দ্রব্য বিনিময়ের অসুবিধাগুলি দূর করিবার উদ্দেশ্যেই অর্থের ব্যবহার আরম্ভ হয়। অর্থ সব সময়ে লোকে গ্রহণ করিতে রাজী থাকে, সেইজন্য অর্থ সাহায্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও কাজ সংগ্রহ করা যায়।

অর্থের দ্বিতীয় কাজ হইল মূল্যের পরিমাপক হিসাবে কাজ করা। অর্থের দ্বারাই দ্রব্য ও কাজের মূল্য পরিমাপ ও প্রকাশ করা হয়। দুইটি দ্রব্যের বিনিময়ের হার একমাত্র অর্থমূল্যের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়।

তৃতীয়তঃ, অর্থ সঞ্চয়ের বাহন হিসাবে কাজ করে। জিনিসপত্রের দাম সচরাচর বাড়ে-কমে কিন্তু অর্থের মূল্য মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে। এইজন্য সঞ্চয় করিতে হইলে লোকে দ্রব্য সঞ্চয় না করিয়া অর্থ সঞ্চয় করে, কারণ সে জানে যে, প্রয়োজন হইলে যে-কোন সময়ে সে অর্থের বিনিময়ে সকল দ্রব্য পাইতে পারে।

চতুর্থতঃ, অর্থ স্থগিত আদান-প্রদানের বাহন হিসাবে কাজ করে। অর্থের একটি কাজ হইল দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ করা। লোকে বর্তমানে যে মূল্যে ধার দেয় ভবিষ্যতে সেই মূল্য ফিরিয়া পাইবে এই আশা করে। অর্থের মূল্য অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বলিয়া বর্তমান মূল্যের সহিত অর্থ ভবিষ্যৎ

মূল্যের সংযোগ সাধন করে। অর্থের কাজ ইংরেজীতে নিম্নলিখিত দুইটি পংক্তির সাহায্যে বুঝান হইয়াছে।

"Money is a matter of functions four
A medium, a measure, a standard, a store"

ভারতে বর্তমানে পরিচালিত মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ভারতে চালু বিহিত অর্থকে একটি নির্দিষ্ট হারে বৈদেশিক মুদ্রার সহিত বিনিময় করা চলে। ভারতের টাকা ভারতে প্রামাণিক মুদ্রা বলিয়া ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে এই টাকা ১০০ পয়সার সমান। ইহা ছাড়া, ৫০, ২৫, ১০, ৫, ৩, ২ ও ১ পয়সার ধাতব মুদ্রা প্রচলিত আছে। ভারতে কাগজী অর্থও প্রচলিত আছে। ১০০০৲, ১০০৲, ১০৲, ৫৲ ও ২৲ টাকার নোট রিসার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক চালু হয়। ভারত সরকার স্বয়ং ১৲ টাকার নোট প্রবর্তন করেন। এই নোট অপরিবর্তনীয় কিন্তু রিসার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক চালু নোট পরিবর্তনীয়।

দশম অধ্যায়

ঋণ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা

(Credit and Banking)

ঋণের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য—Nature and characteristics of credit

ক্রেডিট্ (credit) শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল বিশ্বাস। ধনবিজ্ঞানে এই শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ঋণদাতার যদি ঋণগ্রহীতার সততা ও ঋণপরিশোধ করিবার ক্ষমতার উপর আস্থা থাকে, তাহা হইলে এই সততা ও ঋণপরিশোধ ক্ষমতাকেই ঋণগ্রহীতার ক্রেডিট্ বলা যাইতে পারে এবং ক্রেডিটের বলেই ঋণগ্রহীতা ভবিষ্যতে প্রত্যর্পণ করিবার প্রতিশ্রুতিতে বর্তমানে অপরের মূল্যবান দ্রব্য অথবা অর্থ ব্যবহার করিতে পারে। ধারে দুই প্রকারের কারবার হইতে পারে। প্রথমতঃ, ভবিষ্যতে মূল্য প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতিতে বর্তমানে দ্রব্যের বিক্রয় হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ভবিষ্যতে পরিশোধ করিবার অংগীকারে বর্তমানে টাকা ধার করা যায়। নগদ কারবারের সহিত ধারের কারবারের প্রধান পার্থক্য হইল যে, নগদ কারবারে নগদ মূল্য দিয়া তৎক্ষণাৎ দ্রব্য ক্রয় করা যায় এবং মূল্য প্রদান ও দ্রব্যপ্রাপ্তির সংগে সংগেই কারবারটি সমাপ্ত হয়। কিন্তু ধারের কারবারের দ্রব্যটি নগদ মূল্যে বিক্রীত হয় না। বিক্রয়-সময়ের পরে ভবিষ্যতে দ্রব্যমূল্য প্রদান করা হয়, সুতরাং বিক্রয়-কার্য ও মূল্য প্রদানের মধ্যে

কিছু সময় অতিবাহিত হয়। এইরূপ কারবার ক্রেতা ও বিক্রেতার, দেনাদার ও পাওনাদারের পারস্পরিক সততা ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। সুতরাং ঋণের বৈশিষ্ট্য হইল (১) বিশ্বাস ও (২) সময়।

ঋণপত্র—Credit Instruments

যখন ধারে অর্থাৎ ভবিষ্যতে ক্রীতদ্রব্যের মূল্য দিবার প্রতিশ্রুতিতে ক্রয়-বিক্রয় কার্য পরিচালিত হয় তখন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের শর্ত সম্পর্কে একটা চুক্তি হয়। এই লিখিত চুক্তিপত্রই ঋণপত্র নামে অভিহিত হয়। এই ঋণ-পত্রগুলির বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহারা হস্তান্তরযোগ্য (transferable) এবং একই ঋণপত্র একাধিকবার কারবারে ব্যবহৃত হইতে পারে। চেক, ড্রাফ্‌ট, হুণ্ডি প্রভৃতি ঋণপত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। **ক** দ্রব্য বিক্রয় করিয়া **খ**-এর নিকট হইতে যে হুণ্ডির বলে বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য আদায় করিতে পারে, সেই হুণ্ডির দ্বারা **ক** **গ**-এর নিকট তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারে।

ঋণপত্রের প্রকার-ভেদ—Different types of Credit Instruments

ঋণপত্রের নানা প্রকার-ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় :—

১। প্রতিশ্রুতি-পত্র—Promissory Note.

প্রতিশ্রুতি-পত্র হইল একটি অংগীকার-পত্র। কোন ব্যক্তি বিনা শর্তে চাহিবামাত্র অথবা একটা নির্ধারিত সময়ে ধার পরিশোধ করিবার জন্য যে লিখিত অংগীকার করে, তাহাকে প্রতিশ্রুতি-পত্র বলা হয়। যদি প্রতিশ্রুতি-পত্র সম্পাদনকারীর সততা ও ঋণপরিশোধ করিবার ক্ষমতা সন্দেহাতীত হয়, তাহা হইলে এইরূপ প্রতিশ্রুতি-পত্র হস্তান্তরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

২। হুণ্ডি—Bill of Exchange.

হুণ্ডি হইল একটি আজ্ঞাপত্র। বিক্রেতা দ্রব্য বিক্রয় করিয়া একটি নির্ধারিত সময়ে বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য প্রদান করিবার জন্য ক্রেতার উপর যে লিখিত আদেশ প্রদান করে, তাহাকে হুণ্ডি বলা হয়। যে ব্যক্তি মূল্য প্রদানের জন্য আদেশপত্রে স্বাক্ষর করে অর্থাৎ বিক্রেতা, তাহাকে হুণ্ডিদাতা (Drawer) বলা হয়। যাহার নামে হুণ্ডি কাটা হয় তাহাকে দেনাদার (Drawee) বলা হয়। হুণ্ডিতে লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী যে ব্যক্তিকে বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য প্রদান করিতে হয়, তাহাকে পাওনাদার (Payee) বলা হয়।

পরিশোধ করিবার সময়ের ব্যাপকতার দিক দিয়া হুণ্ডিকে তিনভাগে ভাগ করা হয় ; যথা, (ক) অবিলম্বে-দেয় হুণ্ডি (Sight bill), (খ) স্বল্প-মেয়াদী হুণ্ডি (Short bill) ও (গ) দীর্ঘ-মেয়াদী হুণ্ডি (Time bill)।

যে হুণ্ডি দেনাদারের নিকট উপস্থিত করিবামাত্র দেনা পরিশোধ করিতে হয়, তাহাকে অবিলম্বে-দেয় হুণ্ডি বলা হয়। হুণ্ডিতে লিখিত মূল্য যখন বিক্রয়ের ৭ দিন, বা ১৫ দিন পরে আদায় করা হয়, তখন তাহাকে স্বল্প-মেয়াদী হুণ্ডি বলা হয়। আর, বিক্রয়ের ১ মাস, ২ মাস বা ৩ মাস পরে মূল্য দেয় হইলে, তাহাকে দীর্ঘ-মেয়াদী হুণ্ডি বলা হয়। হুণ্ডিকে আবার দেশীয় (Internal) অথবা বিদেশীয় (Foreign) হুণ্ডি বলা হয়। দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে আদেশপত্র ব্যবহৃত হয় তাহাই হইল দেশীয় হুণ্ডি, কিন্তু ক্রেতা ও বিক্রেতা যদি ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী হয় তাহা হইলে এই আজ্ঞাপত্র বিদেশী আজ্ঞাপত্র বলিয়া অভিহিত হয়। বিদেশী আজ্ঞাপত্র সাধারণতঃ দীর্ঘ-মেয়াদী হয় অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য ২।৩ মাস সময় দেওয়া হয়।

প্রতিশ্রুতি-পত্র ও হুণ্ডির মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ, প্রতিশ্রুতি-পত্র হইল পরিশোধ করিবার একটি লিখিত অংগীকার, আর হুণ্ডি হইল বিক্রেতা কর্তৃক ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য ক্রেতার উপর একটি আদেশ। দ্বিতীয়তঃ, প্রতিশ্রুতি-পত্র শুধুমাত্র দেনাদার ও পাওনাদারের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। দেনাদার হইল অংগীকারাবদ্ধ ব্যক্তি এবং পাওনাদার অংগীকার পূরণের দাবীদার। অপরপক্ষে হুণ্ডির ক্ষেত্রে বিক্রেতা অর্থাৎ যে হুণ্ডি কাটে এবং ক্রেতা অর্থাৎ যাহার উপর হুণ্ডি কাটা হয় ব্যতীতও একজন তৃতীয় পক্ষ থাকিতে পারে। এই তৃতীয় পক্ষ হইল পাওনাদার অর্থাৎ যাহাকে দ্রব্যমূল্য প্রদান করিতে হয়।

৩। চেক—Cheque.

চেক হুণ্ডির মতই একটি লিখিত আজ্ঞাপত্র। ব্যাঙ্কের আমানতকারী চেকে উল্লিখিত ব্যক্তি অথবা চেক-বহনকারী ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ চাহিবামাত্র দিবার নির্দেশ দিয়া যে আজ্ঞাপত্র দেয়, তাহাকে চেক বলা হয়। চেক আজ্ঞাপত্র হইলেও ইহার বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা ব্যক্তি কর্তৃক অর্থাৎ আমানতকারী কর্তৃক ব্যাঙ্কের উপর প্রদত্ত হয় এবং চেক ব্যাঙ্কে উপস্থিত করিলেই চেকে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ ব্যাঙ্ককে দিতে হয়। কিন্তু চেক সর্বজনগ্রাহ্য অর্থ নহে।

ইহা বিহিত অর্থ বলিয়া পরিগণিত হয় না এবং চেক দ্বারা মূল্য প্রদান সম্পূর্ণ আদান-প্রদান নহে। সুতরাং চেক বিহিত অর্থ নহে।

৪। ড্রাফ্‌ট্—Draft.

একটি ব্যাঙ্ক অপর ব্যাঙ্কের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থপ্রদান করিবার জন্য যে আজ্ঞাপত্র দেয়, তাহকে ড্রাফ্‌ট্ বলা হয়।

৫। ব্যাঙ্ক পরিচালিত নোট—Bank Notes.

চাহিবামাত্র বিহিত মুদ্রায় নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতিতে ব্যাঙ্ক যে কাগজী অর্থ চালু করে, তাহাকে ব্যাঙ্ক নোট বলা হয়। বর্তমানে একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্য কোন ব্যাঙ্ক এই ক্ষমতার অধিকারী নহে।

৬। সরকারী নোট—Government Notes.

সরকারও অনেক সময় নোট প্রবর্তন করে, কিন্তু এই নোটগুলি সর্বত্র বিহিত মুদ্রা হিসাবে প্রচলিত থাকে।

৭। খাতায় লিখিত দেনা-পাওনার হিসাব—Book Credit.

ব্যবসায়িগণ যখন ধারে বিক্রয় করে অথবা ব্যাঙ্ক অগ্রিম ঋণ দান করে তখন এই বিক্রয় ও ঋণের হিসাব খাতায় লিখিত হয়। এই লিখিত হিসাব দেনাদার কর্তৃক স্বাক্ষরিত না হইলেও আইনসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়।

এতদ্ব্যতীত বড় বড় কোম্পানীর শেয়ারগুলিও ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য বলিয়া ঋণ-পত্রের পর্যায়ভুক্ত হয়।

ব্যাঙ্ক কর্তৃক চালু ঋণপত্র ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কর্তৃক চালু ঋণপত্র—Bank Credit and Commercial Credit

চেক, ড্রাফ্‌ট্ প্রভৃতি হইল ব্যাঙ্ক কর্তৃক চালু ঋণপত্র। এই ঋণপত্র দ্বারা চাহিবামাত্র ব্যাঙ্ক কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের বাধ্যবাধকতা সূচিত হয়। চেক বা ড্রাফ্‌ট্ সব সময়েই ব্যাঙ্কের উপর প্রদত্ত হয়। চেক বা ড্রাফ্‌টে উল্লিখিত অর্থপরিমাণ আমানতকারী ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থপরিমাণের সমান যে-কোন পরিমাণ অর্থ হইতে পারে। চেক বা ড্রাফ্‌ট্ ব্যাঙ্কে উপস্থিত করিবামাত্রই দেয়।

অপরপক্ষে ব্যবসায়িগণ যে ঋণপত্র চালু করে তাহার ব্যবহার সাধারণতঃ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এইগুলি প্রতিশ্রুতি-পত্র, হুণ্ডি বা দেনা-পাওনার হিসাব-খাতা বলিয়া পরিচিত। যখন কোন শিল্পজাত দ্রব্যের

উৎপাদক পাইকার ক্রেতাকে ধারে বিক্রয় করে অথবা পাইকার খুচরা বিক্রেতাকে ধারে বিক্রয় করে, বা কোন ব্যবসায়ী সাধারণ ক্রেতাকে ধারে বিক্রয় করে, তখন এই ঋণপত্রগুলি ব্যবহৃত হয়। এই ঋণপত্রগুলি সাধারণতঃ চেক বা ড্রফ্‌টের মত উপস্থিত করা মাত্রই দিতে হয় না। এই ঋণপত্রগুলি আদান-প্রদানের মধ্যে একমাস হইতে তিন মাসের মত সময় অতিবাহিত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য অতিরিক্ত বা ধার করা টাকার পরিমাণের অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ এই জাতীয় ঋণপত্রে উল্লিখিত হইতে পারে না।

সুতরাং উভয় জাতীয় ঋণপত্রের মধ্যে পার্থক্যগুলি নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে :

১। চেক ব্যাঙ্কের উপর প্রদত্ত হয় কিন্তু হুণ্ডি এক ব্যক্তি (বিক্রেতা) কর্তৃক অপর ব্যক্তির (ক্রেতার) উপর প্রদত্ত হয়।

২। চাহিবামাত্র চেকের টাকা দেয় কিন্তু হুণ্ডির টাকা হয় দর্শনমাত্র (at sight) অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তে দিতে হয়।

৩। চেকের দ্বারা আদান-প্রদান সাধারণতঃ দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে অপর পক্ষে হুণ্ডির দ্বারা দেশী ও বিদেশী উভয়বিধ আদান-প্রদান সম্ভব।

৪। চেকের দ্বারা দেশী মুদ্রায় আদান-প্রদান হয় কিন্তু হুণ্ডির মারফৎ দেশী ও বিদেশী উভয় মুদ্রারই আদান-প্রদান চলিতে পারে।

৫। চেক দ্বারা দেয় অর্থ ব্যাঙ্কের হিসাবে দেওয়া চলে (crossed cheque) কিন্তু হুণ্ডি এভাবে ব্যবহার করা চলে না।

৬। চেকের টাকা সময়মত আদায় না করিলেও চেকদাতা অর্থ দিবার দায় হইতে নিষ্কৃতি পায় না অর্থাৎ যত সময় না পর্যন্ত চেকগ্রহীতা চেক ভাঙ্গাইয়া অর্থ সংগ্রহ করে তত সময় পর্যন্ত চেকদাতার ঋণ পরিশোধিত হয় না, অপর-পক্ষে হুণ্ডিদাতা যদি সময়মত অর্থাৎ হুণ্ডিতে উল্লিখিত মেয়াদ অন্তে হুণ্ডি গ্রহীতার নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ না করে তাহা হইলে হুণ্ডিগ্রহীতা ও তাহার জামিনদার দায় হইতে মুক্তি পায়।

ঋণের সুবিধা—Advantages of Credit

১। ধার মূলধনের উপযোগ বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থার সহায়তা

করে। ধার-করা মূলধন দক্ষ ও উদ্যমশীল ব্যবসায়িগণকে ঝুঁকিপূর্ণ নূতন ব্যবসায়ে অনুপ্রাণিত করে।

২। ধারদ্বারা মূলধন উদ্যমহীন মূলধনের মালিকের নিকট হইতে উদ্যমশীল ও দক্ষ ব্যবসায়ীর নিকট হস্তান্তরিত হয়। এই শেষোক্ত ব্যক্তিগণ ধারের সম্যক সদ্ব্যবহার দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারে।

৩। চেক, হুণ্ডি প্রভৃতি ঋণপত্রগুলি ধাতব মুদ্রার ব্যবহারজনিত অপচয় নিবারণ করিয়া বিনিময়ের একটি সুবিধাজনক মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

৪। মূলধন-সঞ্চয় ও মূলধন-বিনিয়োগের উপর ধারের অসীম প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ঋণ লেন-দেনের প্রতিষ্ঠানগুলি জনসাধারণকে মূলধন-সঞ্চয়ে ও মূলধন-বিনিয়োগে উৎসাহিত করে।

৫। দূর দেশের সহিত আদান-প্রদানের ও বৃহৎ পরিমাণে আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে যে অসুবিধা ও অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হইতে হয় তাহা অতি সহজেই অল্প সময়ে এবং অধিকতর নিরাপত্তার সহিত ঋণপত্র দ্বারা সম্পন্ন করা যায়।

ঋণের অসুবিধা—Disadvantages of Credit

১। লোকে যখন ভোগ বা অপচয় উদ্দেশ্যে ধার করে, তখন তাহারা ক্রমশঃই অমিতব্যয়ী হয় এবং অমিতব্যয়িতা অর্থনৈতিক দুর্গতির একটি প্রধান কারণ।

২। উৎপাদন-ক্ষেত্রে সহজে ধার পাইবার ক্ষমতা উৎপাদককে নানারূপ অনিশ্চয়তাপূর্ণ উদ্যমে প্ররোচিত করে। ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।

৩। ধারের প্রধান অসুবিধা হইল যে, যদি কর্তৃপক্ষ অধিক পরিমাণে ঋণপত্র চালু করে বা ব্যাঙ্কগুলি সহজেই ধার দেয় তাহা হইলে মুদ্রাস্ফীতি অবশ্যম্ভাবী এবং ইহার ফলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে ও অন্যান্য আনুষংগিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

৪। অনেক ধনবিজ্ঞানী বলেন যে, ব্যাঙ্ক কর্তৃক অতিরিক্ত পরিমাণ ধার দিবার ফলেই ব্যবসায় চক্র (Trade cycle) উপস্থিত হয়।

ঋণ ও মূলধন—Credit and Capital

মূলধন বলিতে সাধারণতঃ যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা ও উৎপাদনের অন্যান্য সহায়ক সামগ্রী বুঝায়। এই অর্থে ধার মূলধন বলিয়া পরিগণিত

হইতে পারে না। ধারদ্বারা মূলধনের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ধারের প্রধান কার্যকারিতা হইল যে, যাহারা মূলধনের যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিতে পারে না ধারদ্বারা হস্তান্তরিত হইয়া তাহাদের সেই মূলধন যোগ্য ব্যক্তির অধীনে আসে এবং যথোপযুক্তভাবে প্রযুক্ত হইয়া উৎপাদন-বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। কিন্তু এ স্থলে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধার যদি শুধুমাত্র ভোগের জন্য ব্যয় করা হয় তাহা হইলে এই ধার উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারে না। ধার একজনের মূলধন অপরের নিকট হস্তান্তরিত করে, সুতরাং ইহার দ্বারা মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় না, কে মূলধন ব্যবহার করিবে ধারদ্বারা শুধুমাত্র তাহাই নির্ধারিত হয়। চেক, ড্রাফ্‌ট্, হুণ্ডি প্রভৃতি ঋণপত্রগুলি মূলধনের প্রতিনিধিমাত্র, তাহারা নিজস্বভাবে মূলধন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এই ঋণপত্রগুলি প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনে সাহায্য করিতে পারে না, কিন্তু এইগুলির দ্বারা উৎপাদনের যে সমস্ত সহায়ক সামগ্রী সংগ্রহ করা যায় তাহারই উৎপাদনে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। সুতরাং শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ধার কখনও মূলধন হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে না, কিন্তু ধার অতিরিক্ত পরিমাণ মূলধন সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে।

মূল্যের উপর ঋণের প্রভাব—Influence of Credit on Price

মূল্যের উপর ধারের প্রভাব সম্পর্কে নানা মত দেখিতে পাওয় যায়। মিল্ বলেন যে, ধারদ্বারা ক্রয়ক্ষমতার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, সুতরাং বিহিত অর্থের ন্যায় ধারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে মূল্যও বৃদ্ধি পায়। বিহিত অর্থ দ্বারা যেরূপ ক্রয় করা যায়, ধারদ্বারাও তদ্রূপ ক্রয় করা যায়; সুতরাং বিহিত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে যেরূপ মূল্য বৃদ্ধি পায়, ধারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও অনুরূপভাবে মূল্য বৃদ্ধি পায়।

অপরপক্ষে ওয়াকার বলেন যে, মূল্যের উপর ধারের আদৌ কোন প্রভাব নাই। কারণ এই বাকী লেন-দেনগুলি শেষ পর্যন্ত শোধ হইয়া যায়। সুতরাং শেষ পর্যন্ত এই ধারের জন্য কোন নূতন ক্রয়ক্ষমতার সৃষ্টি হয় না। ধার শুধু অর্থ-মূল্য প্রদানের সময় স্থগিত রাখে।

মূল্যের উপর ধারের প্রভাব সম্পর্কে মিল্ ও ওয়াকার যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। অর্থ শুধু ক্রয়-

ক্ষমতা নহে, ইহার দ্বারা ঋণ পরিশোধও করা যায়। কিন্তু ধারদ্বারা শুধু ক্রয় করা যায়, ঋণ পরিশোধ করা যায় না। ধার পরিশোধ করিবার নিমিত্ত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিহিত অর্থ জমা রাখিতে হয় এবং এই গচ্ছিত অর্থ ক্রয়কার্যের জন্য ব্যয় করা যায় না। ধারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে ক্রয়ক্ষমতার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া একদিকে যেরূপ মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়, অপর দিকে সেইরূপ ধার শোধ করিবার জন্য গচ্ছিত অর্থ ক্রয়কার্যের জন্য না পাওয়ার ফলে ক্রয়ক্ষমতার পরিমাণ হ্রাস পায় ও মূল্যহ্রাসের প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু ধারে যে পরিমাণ লেন-দেন হয়, ধার পরিশোধ করিবার জন্য গচ্ছিত অর্থ-পরিমাণ তদপেক্ষা কম, কারণ ধারের দ্বারা যে পরিমাণ লেন-দেন হয় তাহার সবটাই অর্থ দ্বারা পরিশোধ করা হয় না। এই লেন-দেনের একটা অংশ সব সময়ই অপরিশোধিত থাকিয়া যায়। এই অপরিশোধিত ধারের পরিমাণে মূল্য বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ধারে যে পরিমাণ লেন-দেন হয়, সে পরিমাণে মূল্যবৃদ্ধি হয় না, শুধুমাত্র অপরিশোধিত ধারের পরিমাণে মূল্যবৃদ্ধি পায়। অর্থ-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে মূল্যের উপর তাহার যেরূপ সমানুপাতিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, ধার-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে মূল্যের উপর তাহার প্রভাব তদপেক্ষা কম।

ব্যাঙ্ক—Banks

আধুনিক যুগে মানুষের অর্থ নৈতিক জীবনে ব্যাঙ্কের গুরুত্ব অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। টাকা-পয়সার আদান-প্রদানে, ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে ব্যাঙ্কের কার্যকারিতা সকলেই অনুভব করে। প্রাচীনকালে সঞ্চিত অর্থের নিরাপত্তা রক্ষা করা ব্যতীত এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অন্য কোন উপযোগ লোকে অনুভব করিতে পারে নাই। ব্যাঙ্ক কি এবং জাতীয় জীবনে ইহার কতখানি গুরুত্ব তাহা ইহার কার্যের তালিকা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। সাধারণভাবে বলিতে গেলে ব্যাঙ্ক হইল এক জাতীয় প্রতিষ্ঠান, যাহা টাকা-পয়সার লেন-দেন লইয়া কার্য করে। এ কথাটি একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝা দরকার। যাহার বেশী টাকা-পয়সা আছে সে উদ্বৃত্ত অর্থ নিরাপদে রাখিবার উদ্দেশ্যে ও সুদ পাইবার আশায় ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখে। ইহার কারণ হইল অর্থের মালিকের বিশ্বাস আছে যে, সে চাহিবামাত্রই ব্যাঙ্ক তাহার গচ্ছিত অর্থ ফেরত দিবে। ব্যাঙ্ক আবার অপরের এই গচ্ছিত অর্থ চাষী, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী প্রভৃতিকে ধার দেয়, কারণ, ব্যাঙ্কের

বিশ্বাস আছে যে, এই দেনাদারগণ ঠিক সময়মত ধার শোধ দিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ব্যাঙ্কের সমগ্র কারবার বিশ্বাসের (credit) উপর প্রতিষ্ঠিত।

ব্যাঙ্কের কাজ—Functions of Banks

আধুনিক ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ হইল ১। জনসাধারণের টাকা জমা রাখা। যাহাদের উদ্বৃত্ত অর্থ আছে তাহারা ব্যাঙ্কে জমা রাখে। ব্যাঙ্ক টাকা জমা রাখিয়া তাহাদের একখানি পাস বই ও টাকা তুলিবার জন্য চেক বই বা অনুরূপ কিছু দেয়, যাহার সাহায্যে আমানতকারী তাহার প্রয়োজনমত টাকা তুলিতে পারে। ব্যাঙ্কের আমানতগুলিকে (Deposits) তিন ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম হইল স্থায়ী আমানত (Fixed deposits)। আমানতকারিগণ ১, ২ বা ৪ বৎসরের মত একটা নির্দিষ্ট কালের জন্য ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিবার প্রতিশ্রুতি দেন। এই টাকা নির্দিষ্ট সময় অন্তে তোলা যায় এবং ইহার জন্য আমানতকারী একটা নির্ধারিত হারে সুদ পান। দ্বিতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক সঞ্চয়ী আমানত (Savings deposits) রাখিতে পারে। এই আমানতের বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার একটি নির্দিষ্ট অংশ আমানতকারী প্রতি সপ্তাহে তুলিতে পারে। কিন্তু অবশিষ্টাংশ তুলিতে হইলে পূর্বে ব্যাঙ্ককে জানাইতে হয়। সঞ্চয়ী আমানতের জন্যও ব্যাঙ্ক হইতে অল্প হারে সুদ পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক চল্‌তি আমানতও (Current deposits) রাখে। চল্‌তি আমানতের টাকা যে-কোন সময়ে তোলা যায় এবং এজন্য আমানতকারী ব্যাঙ্ক হইতে কোন সুদ পায় না। অনেক সময় কোন কোন ব্যাঙ্ক ইহার পরিচিত বিশিষ্ট মক্কেলগণকে ধার দিয়া সেই ধারের টাকায় আমানত (Credit deposit) সৃষ্টি করে।

২। ধার দেওয়া হইল ব্যাঙ্কের দ্বিতীয় কার্য। আমানতকারিগণের নিকট হইতে ব্যাঙ্ক যে টাকা জমা রাখে এবং ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রয় দ্বারা লব্ধ অর্থের একটা প্রধান অংশ ব্যাঙ্ক উপযুক্ত বন্ধক রাখিয়া ধার দেয়। স্বর্ণ প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্ক টাকা ধার দিতে পারে, অথবা ভাল ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বন্ধক রাখিয়া ধার দিতে পারে। কিংবা বিশ্বাসী মক্কেলগণকে উপযুক্ত ব্যক্তিগত জামিনে অগ্রিম ধার দিতে পারে। জমা রাখিবার জন্য আমানতকারিগণকে যে হারে ব্যাঙ্ককে সুদ দিতে হয়, ব্যাঙ্ক অপর লোককে ধার দিবার সময় তাহা অপেক্ষা অধিক হারে সুদ ধার্য করে। ইহাতে ব্যাঙ্কের লাভ হয়।

৩। ব্যাঙ্ক কাগজী নোট বা চেক সৃষ্টি করিয়া অর্থপরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে। বর্তমানে একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই নোট সৃষ্টি করিয়া থাকে। অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলি চেক প্রবর্তন করিয়া আমানতকারিগণকে দেয় এবং চেকের সাহায্যে তাহারা দেনা-পাওনা মিটাইতে পারে।

৪। বৈদেশিক বিনিময়ের ক্ষেত্রেও ব্যাঙ্ক বিভিন্ন দেশের মধ্যে দেনা-পাওনা মিটাইয়া দেয়। একদেশের অর্থ ব্যাঙ্ক কর্তৃক অন্যদেশের অর্থে পরিবর্তিত হয়।

৫। ইহা ছাড়া, ব্যাঙ্ক অন্য নানা কাজ করে। মক্কেলগণের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যাঙ্ক তাহাদের জীবন-বীমার টাকা কিস্তিমত দেয়, শেয়ার প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয় করে এবং মক্কেলের অন্যত্র পাওনা টাকা আদায় করে। ব্যাঙ্ক উইল বা দানপত্রের অছি হিসাবে কাজ করে এবং মক্কেলগণের অলঙ্কার, দলিলপত্র প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য গচ্ছিত রাখে।

ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উপযোগ—Utility of Banks

ব্যাঙ্কের উপরি-প্রদত্ত কার্য-তালিকা আলোচনা করিলে জাতীয় জীবনে এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বুঝা যায়। ব্যাঙ্ক নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়া ও সুদ প্রদান করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করে। সুতরাং পরোক্ষভাবে ব্যাঙ্ক জনসাধারণকে সঞ্চয় করিতে উৎসাহিত করে। যে দেশে ব্যাঙ্কের অভাব সেখানে সঞ্চয়ের পরিমাণও কম। ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংগৃহীত অর্থ কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রযুক্ত হইয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করে। এইরূপে ব্যাঙ্ক মূলধনের মালিক ও শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিয়া সঞ্চিত অর্থের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। ব্যাঙ্ক না থাকিলে মূলধনের মালিক তাহার মূলধন উপযুক্তভাবে বিনিয়োগ করিতে পারিত না, অন্যদিকে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী মূলধনের অভাবে তাহাদের কর্মদক্ষতার সু-ব্যবহার করিতে পারিত না। ইহা ছাড়া, ব্যাঙ্ক নোট, চেক প্রভৃতি ঋণপত্র সৃষ্টি দ্বারা দেশের অর্থ-পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদনে সাহায্য করে। উৎপাদন-কার্যে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় একমাত্র বিহিত অর্থদ্বারা সে প্রয়োজন সংকুলান হইত না। সুতরাং ব্যাঙ্কসৃষ্ট অর্থের অভাবে উৎপাদন-কার্য প্রসার লাভ করিতে পারিত না। ব্যাঙ্ক চাষী, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী প্রভৃতি উৎপাদকগণকে যে পরিমাণে অর্থ সাহায্য করিতে

পারে, সরকারের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। সুতরাং সুপরিচালিত ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান সহায়ক বলা যাইতে পারে।

বিভিন্ন ধরণের ব্যাঙ্ক—Different Kinds of Banks

বর্তমান যুগে ব্যাঙ্কের কাজ এত প্রসারলাভ করিয়াছে যে, কোন একটি ব্যাঙ্কের পক্ষে সব রকম কাজ করা সম্ভব নয়। এইজন্য বিশেষ বিশেষ কাজের উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, শিল্প-সহায়ক ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক, বিনিময় ব্যাঙ্ক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক—Commercial Banks

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যৌথমূলধনী কারবারের ভিত্তিতে সাধারণতঃ গঠিত হয়। এই ব্যাঙ্কগুলি জনসাধারণের উদ্বৃত্ত অর্থ জমা রাখিয়া আমানত সৃষ্টি করে এবং শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের চল্‌তি কারবারের জন্য স্বল্প-মেয়াদে ধার দেয়। এই ব্যাঙ্কগুলি নগদ অর্থ জমা রাখিয়াও আমানত সৃষ্টি করিতে পারে অথবা অন্যের জমা টাকা শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীকে ধার দিয়া সেই ধারের টাকা দিয়াও আমানত সৃষ্টি করিতে পারে। ইহারা হুণ্ডির বিনিময়ে অথবা দ্রব্যের বিনিময়ে কিংবা ব্যক্তিগত জামিনে ধার দিয়া থাকে। তবে ২৷৩ মাসের অধিক দিনের জন্য টাকা ধার দেয় না। ইহারা এরূপভাবে টাকা ধার দেয় যে, চাহিবামাত্র বা এক সপ্তাহ বা পনের দিন অন্তে টাকা ফেরৎ পাওয়া যায়। ব্যাঙ্ক ইহার অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারে যে, দৈনন্দিন লেন-দেনে ইহার কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ রাখিয়া বাকী টাকা ব্যাঙ্ক স্বর্ণ প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য বা হুণ্ডি বা ভাল ভাল কোম্পানীর শেয়ার বন্ধক রাখিয়া ধার দেয়, যাহাতে প্রয়োজন হইলে ব্যাঙ্ক ধার-দেওয়া অর্থ যে-কোন সময়ে ফেরত পাইতে পারে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কখনই দীর্ঘমেয়াদের জন্য ধার দেয় না অথবা একই ব্যক্তি বা একই প্রতিষ্ঠানকে এককালীন অধিক ধার দেয় না। বাড়ীঘর বা খনি প্রভৃতি স্থাবর সম্পত্তি যাহা সহজে বিক্রয়যোগ্য নহে তাহা বন্ধক রাখিয়াও টাকা ধার দেয় না।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক—Central Bank

আধুনিককালে সকল দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সৃষ্টি হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই

হইল সমগ্র দেশের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল এবং অর্থসম্পর্কিত ব্যাপারের কর্তা। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অংশীদারী কারবারের ভিত্তিতে গঠিত হইতে পারে বা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের সমবায়ে গঠিত হইতে পারে। আজকাল প্রায় সব দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছে।

কার্য—Functions

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান কার্য হইল বিহিত অর্থপরিমাণ ও বাজারে চালু বিনিময়ের অন্যান্য মাধ্যম নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেশের আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর ও বৈদেশিক বিনিময়ের হার স্থির রাখা। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং এই ক্ষমতাগুলি হইল :

১। নোট-প্রচলন ক্ষমতা (Note issue)—পূর্বে নোট-প্রচলন ক্ষমতা প্রায় সকল ব্যাঙ্কের ছিল। এই অবস্থায় নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া মুদ্রাস্ফীতি ঘটিত। বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই হইল একমাত্র নোট-প্রচলন ক্ষমতার অধিকারী এবং এইজন্য সমস্ত দেশে এক জাতীয় নোট চালু থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রবর্তিত নোট জনসাধারণের মনে আস্থা আনিতে পারে।

২। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ জনসাধারণ-সম্পর্কিত কোন কাজ করে না। এই ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে (Acts as Banker's Bank)। অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির আমানতী অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হয় এবং দরকার হইলে অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার করিতে পারে। দেশের অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতাও বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির শেষ পর্যায়ের ঋণদাতা হিসাবে কাজ করে।

৩। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকার-প্রবর্তিত অন্যান্য প্রতীক মুদ্রাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া চালু রাখে (Controls the issue of Coins)।

৪। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারের ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে (Acts as a Banker to the Government)। সরকারী সমস্ত আদান-প্রদান এই ব্যাঙ্কের মাধ্যমেই হয় এবং সরকারের সমস্ত অর্থ এখানে জমা থাকে। এই ব্যাঙ্ক সরকারী হিসাবপত্র রাখে এবং সরকারী ঋণ-গ্রহণ ও ঋণ-পরিশোধ করে।

৫। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে নির্দিষ্ট হারে বিদেশী মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করে (Controls exchange rate)।

৬। ঋণ-নিয়ন্ত্রণ করা (Credit Control) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একটি প্রধান কার্য। দেশের সমগ্র অর্থপরিমাণ-নিয়ন্ত্রণের অধিকারী হইল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলি ধার দিয়া অতিরিক্ত অর্থসৃষ্টি দ্বারা যাহাতে দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইতে না পারে, তজ্জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজার কারবার, নগদ জমার অনুপাতের পরিবর্তন, বাছাই করিয়া ধার নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি উপায়গুলি অবলম্বন করে।

৭। ইহা ছাড়া, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিকাশী ঘরের (Clearing House) কার্য করিয়া অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির পারস্পরিক দেনা-পাওনা সহজেই পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা করে।

ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা—Banking System in India

ভারতে দেশীয় পদ্ধতিতে ব্যাঙ্কের কার্য বহুদিন পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে এ সম্পর্কে শ্রেষ্ঠিগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যাঙ্কের কার্য সম্পর্কে বাংলার জগৎ শেঠের নাম ভারত-বিখ্যাত হইয়াছিল। ইংরেজ শাসনকালে উনবিংশ শতাব্দী হইতেই আধুনিক পদ্ধতিতে ভারতে প্রথম ব্যাঙ্কের কার্য আরম্ভ হয়, কিন্তু এখনও পর্যন্ত ভারত ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে অনুন্নত। বর্তমানে ভারতে নিম্নলিখিত ব্যাঙ্কগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

১। রিসার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া—Reserve Bank of India

রিসার্ভ ব্যাঙ্ক হইল ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। ১৯৩৪ সালের রিসার্ভ ব্যাঙ্ক আইনানুসারে ১৯৩৫ সালে এই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ব্যাঙ্কের মূলধন হইল ৫ কোটি টাকা এবং যৌথ-মূলধনী কারবারের ভিত্তিতে ১০০৲ টাকা মূল্যের প্রত্যেকটি শেয়ার বাজারে বিক্রয় করিয়া এই মূলধন সংগ্রহ করা হয়। ১৯৪৮ সালে এই ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ করা হয়। এখন ভারত সরকারই হইল সব শেয়ারের মালিক। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন গভর্ণর, দুইজন ডেপুটি গভর্ণর, দশজন সাধারণ সদস্য ও একজন সরকারী কর্মচারী লইয়া এই ব্যাঙ্কের একটি পরিচালক সমিতি গঠিত হইয়াছে। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও দিল্লীতে চারিটি শাখা সমিতি আছে। গভর্ণর ব্যাঙ্কের প্রধান কর্মসচিব হইলেও চারিটি স্থানীয় সমিতির হস্তে কিছু কিছু কার্যভার দেওয়া হইয়াছে।

রিসার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় এবং দেশের সমগ্র ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা ও মুদ্রানীতি পরিচালিত করে। রিসার্ভ ব্যাঙ্ক যাহাতে ইহার কাজ দক্ষতার সহিত নিষ্পন্ন করিতে পারে সেজন্য ইহাকে কতকগুলি ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

কার্য—Functions

প্রথমতঃ, একমাত্র রিসার্ভ ব্যাঙ্কই ভারতে কাগজী নোট প্রবর্তন করিতে পারে। ১৯৫৬ সালের আইন পাস হইবার পূর্বে মোট চালু নোটের শতকরা অন্ততঃ ৪০ ভাগ স্বর্ণ এবং বাকী অংশ স্টার্লিংএ ও সরকারী ঋণপত্র, রৌপ্যমুদ্রা প্রভৃতিতে রাখিতে হইত। ১৯৫৭ সালের সংশোধনী আইনের বলে বর্তমানে ১১৫ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ ও ৮৫ কোটি টাকা মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা বা ঋণপত্র জমা রাখিয়া উহা যে-কোন পরিমাণ কাগজী নোট প্রচলন করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে। যে সমস্ত ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিলে মোট পাঁচলক্ষ টাকা আছে তাহারা এই ব্যাঙ্কের সদস্য হইতে পারে এবং এই ব্যাঙ্কগুলিকে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক (Scheduled Banks) বলা হয়। প্রত্যেক তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক ইহার স্থায়ী আমানতের ২ ভাগ ও চল্‌তি আমানতের ৫ ভাগ রিসার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিতে বাধ্য। প্রয়োজন হইলে রিসার্ভ ব্যাঙ্ক তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির আমানতের পরিমাণ ৫ হইতে ২০ ও ২ হইতে ৮ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারে। তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি তাঁহাদের প্রয়োজনের সময় রিসার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ধার করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি তাহাদের উদ্বৃত্ত অর্থ এই ব্যাঙ্কে জমা রাখে এবং সরকারী প্রতিনিধি হিসাবে রিসার্ভ ব্যাঙ্কই সমস্ত সরকারী আদান-প্রদান করে। রিসার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারের জন্য ঋণ তোলে ও ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে। চতুর্থতঃ, এই ব্যাঙ্ক বিদেশী বিনিময়-হারও নিয়ন্ত্রিত করে। টাকা প্রতি ১ শি. ৬ পে. হিসাবে বিলাতি অর্থ স্টার্লিং ক্রয়-বিক্রয় করে। ডলার ও অন্যান্য দেশের মুদ্রাও নির্দিষ্ট হারে বিনিময় করে। পঞ্চমতঃ, কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও দিল্লী এই চারিটি কেন্দ্রের মধ্যে ইহা চেক বিনিময় করে। ষষ্ঠতঃ, এই ব্যাঙ্কের একটি কৃষিঋণ বিভাগ (Agricultural Credit Department) আছে। কৃষকদিগকে ঋণ দেওয়া সম্পর্কে এই বিভাগ

নীতি নির্ধারণ করে। ইহা ছাড়া রিসার্ভ ব্যাঙ্ক আমানত রাখিতে পারে, কিন্তু কোন সুদ দেয় না। কতকগুলি বিশেষ শর্তে ইহা টাকা ধারও দিতে পারে।

রিসার্ভ ব্যাঙ্কের কাজ দুইটি বিভাগ দ্বারা সম্পাদিত হয়, যথা, নোট-প্রচলন বিভাগ (Issue Department) ও ব্যাঙ্কিং বিভাগ (Banking Department)।

২। ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক—State Bank of India

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতের বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতার তিনটি প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক একত্রিত করিয়া ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া নামে একটি বৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক গঠিত হয়; ইহা ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের শীর্ষস্থানীয় ছিল। এই ব্যাঙ্কের আমানত পরিমাণ ছিল ২০০ কোটি টাকারও বেশী। ইহার বিদেশে অনেকগুলি শাখা ছিল এবং যে সমস্ত জায়গায় রিসার্ভ ব্যাঙ্কের শাখা ছিল না, সে সমস্ত জায়গায় এই ব্যাঙ্ক সরকারী ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করিত।

১৯৫৪ সালে ভারত সরকার সর্বভারতীয় গ্রাম-ঋণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটির সুপারিশক্রমে ১৯৫৫ সালে একটি আইন পাস করিয়া ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়; ইহার নূতন নাম হইল স্টেট্ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া।

ব্যাঙ্কের মূলধন-পরিমাণ হইল ২০ কোটি টাকা। সরকার পূর্বের অংশীদারগণের শেয়ারের মূল্য পরিশোধ করিয়া দিয়া বর্তমানে সমস্ত শেয়ারের মালিক হইয়াছেন। ২০ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি কেন্দ্রীয় সমিতির উপর ইহার পরিচালনার ভার ন্যস্ত আছে; গ্রাম-ঋণদান করিবার সু-ব্যবস্থার উদ্দেশ্যেই এই ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছে। টাকা আমানত রাখা, ধার দেওয়া প্রভৃতি সাধারণ ব্যাঙ্ক-সম্পর্কিত কাজ ছাড়াও এই ব্যাঙ্কের প্রধান কার্য হইল কৃষিঋণব্যবস্থার উন্নতি করা। এই উদ্দেশ্যে আগামী পাঁচ বৎসরে এই ব্যাঙ্কের গ্রামাঞ্চলে ৪০০ শাখা স্থাপন করিতে হইবে। ১৯৬০ সালের মধ্যে ৪২৯ শাখা স্থাপিত হইয়াছে।

৩। ভারতীয় যৌথ-মূলধনী ব্যাঙ্ক—Joint Stock Banks of India

এই ব্যাঙ্কগুলি পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতে উনবিংশ শতাব্দী হইতে ভারতে গঠিত হইতে থাকে। বর্তমানে ভারতে এই ব্যাঙ্কের সংখ্যা চারিশতের অধিক। এই ব্যাঙ্কগুলি যৌথ মূলধনের ভিত্তিতে শেয়ার বিক্রয় করিয়া গঠিত হইয়াছে। যে সমস্ত যৌথ-মূলধনী ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল পরিমাণ ৫ লক্ষ

টাকার অধিক তাহারা রিসার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা মাত্র ৯০টি।

এই ব্যাঙ্কগুলি সাধারণতঃ আমানত লয় ও ধার দেয়। ইহা ছাড়া, ইহারা ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় সম্পর্কিত অন্য নানাবিধ কার্য করিয়া থাকে।

৪। বৈদেশিক বিনিময় ব্যাঙ্ক—Foreign Exchange Banks

এই ব্যাঙ্কগুলি বিদেশী মূলধনে গঠিত এবং ইহাদের কাজ বিদেশীয়গণ কর্তৃক পরিচালিত হয়। আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যে অর্থ লেন-দেন করাই হইল ইহাদের প্রধান কাজ। ইহা ছাড়াও, এই ব্যাঙ্কগুলি ভারতীয়গণের আমানত রাখে ও বৈদেশিক বাণিজ্যরত ব্যবসায়িগণকে ধার দেয় এবং ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত অন্য নানাবিধ কাজ করে। ইহাদের বিপুল মূলধন ও ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়-সংক্রান্ত উচ্চতর অভিজ্ঞতার সহিত ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। এই বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির প্রতিযোগিতা ভারতের ব্যাঙ্কগুলির প্রসারে বাধা সৃষ্টি করিতেছে। ন্যাশনাল্ গ্রীণলেস্ ব্যাংক, টমাস্ কুক, হংকং য়্যাণ্ড সাংহাই ব্যাঙ্ক প্রভৃতি হইল এই জাতীয় বিদেশী ব্যাঙ্ক। ভারতে এইরূপে প্রায় ১৫।১৬টি বিদেশী ব্যাঙ্ক কাজ করিতেছে। এই ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানত-পরিমাণ হইল ১৮৫ কোটি টাকারও অধিক। এই ব্যাঙ্কগুলি ভারতের বৈদেশিক বিনিময়-সংক্রান্ত সমস্ত মুনাফাই পাইয়া থাকে।

৫। শিল্প-সহায়ক ব্যাঙ্ক—Industrial Banks

ভারত শিল্পে অনগ্রসর দেশ। ইহার প্রধান কারণ হইল শিল্পপ্রতিষ্ঠান-গঠন ও পরিচালনা-কার্যে দীর্ঘকালের জন্য যে পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করিতে হয় সে পরিমাণ দীর্ঘ-মেয়াদী ধার ভারতে পাওয়া যায় না। শেয়ার বিক্রয় করিয়া যৌথ-মূলধনী কারবারের ভিত্তিতে এত অধিক মূলধন সংগ্রহ করা যায় না। আবার দেশে যে সমস্ত ব্যাঙ্ক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান আছে তাহারা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দিতে চায় না। শিল্পের জন্য মূলধন সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৯৪৮ সালে একটি আইন পাস করিয়া **শিল্প ঋণ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান (Industrial Finance Corporation)** স্থাপন করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠান ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত মূলধন হইল ১০ কোটি টাকা। ভারত সরকার রিসার্ভ ব্যাঙ্ক, তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি, বীমা-কোম্পানী, সমবায় ব্যাঙ্কগুলি, বিনিয়োগ ট্রাস্ট প্রভৃতি ইহার শেয়ার ক্রয়

করিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান নূতন বড় বড় শিল্পগঠনের জন্য বা পুরাতন শিল্পগুলির সম্প্রসারণের জন্য দীর্ঘ-মেয়াদে (২০ বৎসর পর্যন্ত) ঋণদান করিতে পারে। ১৯৬১ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান বস্ত্র, চিনি, কাগজ, সিমেন্ট, মোটর-যান প্রভৃতি শিল্পে প্রায় ১০৫.৮২ কোটি টাকা ধার দিয়াছে।

ছোট ও কুটিরশিল্পগুলিকে অর্থ সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালে রাজ্য ঋণ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান আইন পাস হয়। এই আইনের ভিত্তিতে পাঞ্জাব, বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ, প্রভৃতি রাজ্যে **রাজ্য ঋণ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান (State Finance Corporation)** গঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা রাজ্য সরকার-গুলির নিয়ন্ত্রণাধীন। এইা ছাড়া, **শিল্পঋণ ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান (Industrial Credit and Investment Corporation)** এবং **জাতীয় শিল্পোন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (National Industrial Development Corporation)** নামে আরও দুইটি ঋণ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। প্রথম প্রতিষ্ঠানের অনেক শেয়ার ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বিক্রয় হইয়াছে। ভারত সরকার ও বিশ্বব্যাঙ্কের নিকট হইতেও এই প্রতিষ্ঠান অনেক ধার পাইয়াছে। বে-সরকারী ক্ষেত্রে মাঝারি ধরণের শিল্পগুলিকে ধার দিবার জন্য ১২.৫ কোটি টাকা মূলধন লইয়া গঠিত এইটি **পুনঃ ঋণ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান (Re-finance Corporation)** স্থাপন করা হইয়াছে। ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে অর্থ ও তাহাদের উন্নতির জন্য অন্য নানাবিধ সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সালে ১০ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া গঠিত **জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান (National Small Industries Corporation)** স্থাপিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে সাহায্য করিয়াছে।

৬। সমবায় ব্যাঙ্ক—Co-operative Credit Banks

ভারতের চাষী ও কুটিরশিল্পিগণকে স্বল্প-মেয়াদী ঋণ সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। সমবায় ব্যাঙ্কগুলি ঋণদান ও অ-ঋণদান উভয় প্রকারের হইতে পারে।

৭। জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক—Land Mortgage Banks

কৃষিকার্যে লাঙ্গল, বলদ, সার প্রভৃতি ক্রয় করিবার জন্য যেরূপ চল্‌তি খরচের প্রয়োজন হয়, সেচব্যবস্থা প্রভৃতি জমির স্থায়ী উন্নতিকর কার্যের জন্য তদ্রূপ দীর্ঘ-

মেয়াদী ঋণের প্রয়োজন হয়। সমবায় ব্যাঙ্কগুলি স্বল্প-মেয়াদে স্বল্প পরিমাণ ধার দিতে পারে। কৃষিকার্যের স্থায়ী উন্নতির জন্য দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ সরবরাহের উদ্দেশ্যে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

এই ব্যাঙ্কগুলি জমি বন্ধক রাখিয়া কৃষকগণকে দীর্ঘদিনের জন্য ঋণ প্রদান করে। পুরাতন ঋণ পরিশোধ, জমির স্থায়ী উন্নতি এবং নূতন জমি কিনিবার জন্য এই ব্যাঙ্ক বন্ধকী জমির মূল্যের অর্ধেক ধার দিয়া থাকে। প্রাথমিক জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি সমবায় ভিত্তিতে গঠিত হইতে পারে আবার যৌথ-মূলধনী ভিত্তিতে গঠিত হইতে পারে অথবা এই উভয় পদ্ধতির সহযোগেও গঠিত হইতে পারে। ভারতের প্রাথমিক জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি সমবায় ভিত্তিতে গঠিত হইলেও কেন্দ্রীয় জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি এই উভয় পদ্ধতির সংমিশ্রণে গঠিত হইয়াছে।

ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক গঠিত হইলেও বোম্বাই ও মাদ্রাজ ব্যতীত অন্য কোন রাজ্যে ইহা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই। এদেশের ব্যাঙ্কগুলি সাধারণতঃ পুরাতন ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য অধিক পরিমাণ ধার দেয়। জমির স্থায়ী উন্নতিকল্পে এখনও পর্যন্ত এই ব্যাঙ্কগুলি বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই।

৮। দেশীয় ব্যাঙ্ক—Indigenous Banks

ভারতের দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি পুরাতন ভারতীয় পদ্ধতিতেই আজ পর্যন্ত তাহাদের লেন-দেনের কারবার পরিচালিত করিতেছে। বিভিন্ন স্থানে এই ব্যাঙ্কগুলি বিভিন্ন নামে পরিচিত, যথা, মহাজন, শেঠ, সাহুকর, চেটি প্রভৃতি। এই ব্যাঙ্কগুলি ব্যক্তিগত বা পারিবারিক মালিকানা ও পরিচালনাধীন হইয়া থাকে এবং অনেক সময় বংশপরম্পরাক্রমে চলিতে থাকে। ইহারা নিজেদের টাকা ধার দেয় এবং অনেক সময় আমানত রাখে, কিন্তু ব্যাঙ্কের মত আমানতকারীকে চেক দেয় না। এই ব্যাঙ্কগুলি হুণ্ডি কাটে এবং দেশীয় ব্যাঙ্কের হুণ্ডী সর্বত্র গৃহীত হয়। ইহারা শহরে ও মফঃস্বলে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ও ছোট ছোট শিল্পগুলিকে টাকা ধার দেয়। ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া আছে, কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রয়োজনীয় সমগ্র অর্থপরিমাণের প্রায় ৮৭ ভাগই ইহারা সরবরাহ করিয়া থাকে।

৯। ভারত সরকারের ব্যাঙ্কিং কার্য—Government of India as a Banker

ভারত সরকার নিজেও ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত অনেক কাজ করে। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল 'পোস্ট আফিস সঞ্চয় ব্যাঙ্ক' পরিচালনা করা। ইহা ছাড়া, কৃষকগণকে তাকাবি ঋণদান, ক্ষুদ্রশিল্প সংরক্ষণের জন্য অগ্রিম ঋণদান প্রভৃতি ব্যাঙ্ক-সম্পর্কিত কার্যও করিয়া থাকে।

ভারতে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের ত্রুটি—Defects of Indian Banking

আমাদের দেশে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় অতি ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। মফঃস্বলের কথা ছাড়িয়া দিলেও ছোট ছোট এমন অনেক শহর আছে যেখানে আদৌ কোন ব্যাঙ্ক নাই। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, আমাদের দেশের লোকের এখনও পর্যন্ত ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের প্রতি কোন আগ্রহ জন্মে নাই। ইংলণ্ডে মাথাপিছু আমানতি জমার পরিমাণ হইল ৯৭৩৲ টাকা, আর ভারতে মাথাপিছু আমানতি জমার পরিমাণ হইল মাত্র ২৩৲ টাকা। অবশ্য এজন্য ভারতের লোকের চির-দারিদ্র্য কিছু পরিমাণে দায়ী। ইংলণ্ডে প্রতি দশ লক্ষ লোকের জন্য ২২৯টি ব্যাঙ্ক আর ভারতে প্রতি দশ লক্ষে মাত্র ১৫.৫টি করিয়া ব্যাঙ্ক আছে। আর এই ব্যাঙ্কগুলিও শুধু বড় বড় শহরগুলিতে অবস্থিত। ভারতের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের আর একটি ত্রুটি হইল যে, অন্যান্য দেশে যেরূপ নানা জাতীয় ব্যাঙ্ক, যথা, শিল্প-সহায়ক ব্যাঙ্ক, জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আছে, ভারতে তাহা নাই। ভারতে ব্যাঙ্কের সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য এবং ইহাদের মূলধন-পরিমাণ ও সংরক্ষিত তহবিল-পরিমাণও খুব স্বল্প। ব্যাঙ্কগুলির আয়তন ক্ষুদ্র ও নানাস্থানে শাখা-প্রশাখা বিস্তারের প্রথা আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায় না। ব্যাঙ্কের পরিচালক-গণের অনভিজ্ঞতাও ভারতের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের প্রসারের আর একটি অন্তরায়। বর্তমানে রিসার্ভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সরকার ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠা ও ব্যাঙ্ক-পরিচালনা সম্পর্কে এত কঠোর বিধিনিষেধ প্রবর্তন করিয়াছেন যে, তাহার দ্বারা ভারতে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের প্রসার অনেক পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। তবে সুখের বিষয় সম্প্রতি মফঃস্বল অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের শাখা বিস্তার করিবার ব্যবস্থা করিয়া সরকার এদেশে ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের উন্নতির কিছু চেষ্টা করিতেছেন।

নিকাশী ঘর—Clearing House

নিকাশী ঘরকে প্রকৃতপক্ষে ব্যাঙ্ক বলিয়া অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, জনসাধারণের সহিত নিকাশী ঘরের কোন সম্পর্ক নাই—ইহা জনসাধারণের টাকা আমানত রাখে না বা জনসাধারণকে টাকা ধার দেয় না।

নিকাশী ঘর হইল স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলির একটি কেন্দ্রীয় কার্যালয়। এই কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিগণ প্রতিদিন সমবেত হইয়া তাঁহাদের চেক-বিনিময় ও হিসাব স্থির করিয়া পারস্পরিক দেনা-পাওনা আদান-প্রদান করেন। "A clearing house is a general organization of the banks of a given place, having for its main purpose the offsetting of cross-obligations in the form of cheques." প্রত্যেক ব্যাঙ্কই প্রতিদিন অন্য ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ আদায় করিবার জন্য মক্কেলের নিকট হইতে কিছু সংখ্যক চেক পাইয়া থাকে। এইরূপে প্রত্যেক ব্যাঙ্ক অন্য ব্যাঙ্ক হইতে আদায় করিবার জন্য কিছু সংখ্যক চেক পায় এবং এই প্রত্যেক ব্যাঙ্ক হইতে আদায় করিবার জন্য অপরাপর ব্যাঙ্কগুলিও কিছু সংখ্যক চেক পাইয়া থাকে। সুতরাং সকল ব্যাঙ্কই একদিকে যেরূপ পাওনাদার অপরদিকে সেইরূপ দেনাদার। এখন এই সমস্ত ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সমবেত হইয়া চেকের মারফতে তাঁহাদের দেনা-পাওনার হিসাব করেন। ধরা যাউক যে, নিকাশী ঘরের হিসাবে দেখা গেল সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার জন্য যে-সমস্ত চেক পাইয়াছে তাহার অর্থপরিমাণ হইল ৫,০০০ টাকা, আবার ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার জন্য যে-সমস্ত চেক পাইয়াছে তাহার অর্থ-পরিমাণ হইল ৫,২০০ টাকা। নিকাশী ঘরে এই উভয় ব্যাঙ্কের দেনা-পাওনার হিসাব হইয়া দেখা গেল যে, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নিকট মাত্র ২০০৲ টাকা বেশী পাইবে। এরূপক্ষেত্রে উভয় ব্যাঙ্কের মধ্যে কার্যতঃ কোন আর্থিক আদান-প্রদান না হইয়া সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ককে মাত্র অতিরিক্ত পাওনা দুই শত টাকা প্রদান করে। উভয় ব্যাঙ্কের দেনা ও পাওনার সমতার জন্য ঋণের বেশীর ভাগ অর্থাৎ ৫,০০০৲ টাকার আদান-প্রদানের কোন প্রয়োজন হয় না। উপরি-উক্ত উদাহরণে মাত্র দুইটি ব্যাঙ্কের দেনা-পাওনা উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নিকাশী ঘরে স্থানীয় সমুদয়

ব্যাঙ্কেরই পারস্পরিক দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত পারস্পরিক দেনা-পাওনার ভিত্তিতে হিসাব-নিকাশ করিলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ পরিমাণ দেনা-পাওনাই শোধ হইয়া যায়। অতি অল্পপরিমাণ দেনা-পাওনাই অর্থ দ্বারা পরিশোধ করিবার প্রয়োজন হয়। যে অল্পপরিমাণ দেনা-পাওনা অপরিশোধিত থাকে তাহাও অর্থে প্রদান না করিয়া চেক দ্বারা প্রদান করা হয় এবং সমস্ত ব্যাঙ্কেরই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে একটা আমানত থাকে বলিয়া চেক দ্বারা অন্য ব্যাঙ্কগুলির এই আদান-প্রদান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মারফতেই করা হয়। দিনের শেষে যে ব্যাঙ্ক দেনাদার হয় সেই ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আমানত হইতে ঐ দেনার পরিমাণ অর্থ বাদ দিয়া পাওনাদার ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে যে আমানত থাকে তাহাতে জমা করা হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, নিকাশী ঘর প্রবর্তনের ফলে টাকা-পয়সা বহন করিবার বা স্থানান্তর করিবার আর প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মারফতে হিসাবপত্রের পরিবর্তন সাধন করিয়া কোটী কোটী টাকার দৈনিক আদান-প্রদান সম্ভব হইয়াছে। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই সাধারণতঃ নিকাশী ঘরের কার্য পরিচালনা করে।

সংক্ষিপ্তসার

ধার শোধ করিবার সততা ও ক্ষমতাকে ক্রেডিট্ বলা হয়। সুতরাং সমস্ত বাকী কারবার ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার পারস্পরিক বিশ্বাসের মনোভাবের উপর নির্ভর করে। এই বিশ্বাসের বলেই ভবিষ্যতে মূল্য দিবার প্রতিশ্রুতিতে একজনে অপরের মূল্যবান দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারে।

ঋণপত্রের প্রকারভেদ—

ঋণের আদান-প্রদান কতকগুলি নিদর্শনপত্রের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। এইগুলিকে ঋণপত্র বলা হয়। ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সাধারণতঃ এই ঋণপত্র-গুলি সৃষ্টি করে।

প্রতিশ্রুতি পত্র, হুণ্ডি, চেক, ড্রাফ্‌ট্ প্রভৃতি হইল এই ঋণপত্র। ঋণের সুবিধা হইল যে, ইহা (১) মূলধনের উপযোগ বৃদ্ধি করে, (২) মূলধন যোগ্য ব্যবসায়ীর নিকট হস্তান্তরিত করে, (৩) ধাতব মুদ্রার ক্ষয়-ক্ষতি নিবারণ করে ও (৪) মূলধন-সঞ্চয়ে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে।

ঋণের অসুবিধা হইল যে, ইহা (১) ভোগে প্রযুক্ত হইলে মূলধনের অপচয় ঘটে, (২) সহজে ধার পাইবার সুবিধা উৎপাদনে অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি করে, (৩) ধারদ্বারা মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় এবং (৪) ব্যবসায়-চক্র উপস্থিত হয়।

ঋণ ও মূলধন—

ঋণ ও মূলধন একার্থবোধক নহে। ধারদ্বারা মূলধনের উপর কর্তৃত্ব সৃষ্টি হয় এবং উৎপাদনের সহায়ক উপাদানগুলি সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু মূলধন বৃদ্ধি পায় না। ধারদ্বারা মূলধন হস্তান্তরিত হইয়া উপযুক্ত ব্যবসায়ী দ্বারা উৎপাদনে প্রযুক্ত হইয়া অতিরিক্ত মূলধন সৃষ্টি করে।

মূল্যের উপর ঋণের প্রভাব—

অর্থ ক্রয় করিতে পারে এবং ঋণ পরিশোধ করিতে পারে—ইহা উভয় ক্ষমতারই অধিকারী। কিন্তু ধার শুধু ক্রয় করিতে পারে, ঋণ পরিশোধ করিতে পারে না। ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। ধার দ্বারা-ক্রয়কার্য হইলে ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়া মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা হয়, কিন্তু ধার পরিশোধ করিবার জন্য যে অর্থ প্রয়োজন তাহা ক্রয়কার্যে প্রযুক্ত হইতে পারে না বলিয়া ক্রয়ক্ষমতার পরিমাণ হ্রাস হওয়ার ফলে মূল্য হ্রাস হয়। কিন্তু যে পরিমাণ ধার করা হয় সে পরিমাণ পরিশোধ হয় না। সব সময়েই একটা অপরিশোধিত পরিমাণ ধার থাকিয়া যায় এবং এই অপরিশোধিত ধারের পরিমাণে মূল্য বৃদ্ধি পায়।

ব্যাঙ্ক ও ইহার কাজ

ব্যাঙ্ক এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যাহার প্রধান কার্য হইল জনসাধারণের অর্থ জমা রাখা এবং ধার দেওয়া। ইহা ছাড়া, ব্যাঙ্ক কাগজী অর্থ সৃষ্টি করে, বিদেশের সহিত টাকার বিনিময় করে এবং মক্কেলের সুবিধার জন্য অন্য কার্য করিয়া থাকে।

ব্যাঙ্কের প্রকারভেদ—

১। সেভিংস ব্যাঙ্কগুলি সাধারণতঃ টাকা আমানত রাখে কিন্তু ধার দেয় না। ২। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের সমগ্র ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার উপর কর্তৃত্ব করে এবং সমগ্র অর্থপরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া আভ্যন্তরীণ মূল্য ও বৈদেশিক বিনিময়ের হার অপরিবর্তিত রাখিতে চেষ্টা করে। ৩। কৃষিব্যাঙ্ক দুই জাতীয় হইতে পারে, যথা, সমবায় ব্যাঙ্ক ও জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক। ইহারা যথাক্রমে স্বল্প-মেয়াদী ও দীর্ঘ-মেয়াদী

ঋণ দান করে। ৪। বিনিময় ব্যাঙ্কগুলি প্রধানতঃ এক দেশের অর্থ অন্য দেশের অর্থে পরিবর্তিত করিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যের লেন-দেনে সাহায্য করে। ৫। শিল্প-সহায়ক ব্যাঙ্কগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার জন্য দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ দান করে। ৬। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি চল্‌তি ব্যবসায়-বাণিজ্যে স্বল্প-মেয়াদী ঋণ দান করে।

নিকাশী ঘর—

ব্যাঙ্কগুলির পারস্পরিক দেনা-পাওনা আর্থিক আদান-প্রদান না করিয়াও নিকাশী ঘরের মাধ্যমে পরিশোধিত হয়। ব্যাঙ্কগুলির প্রতিনিধিগণ একত্র মিলিত হইয়া তাহাদের সমগ্র দেনা ও পাওনার হিসাব করেন। দেনা ও পাওনার পরিমাণ সমান হইলে কোনপ্রকার আর্থিক আদান-প্রদান করিতে হয় না। দেনা-পাওনার পার্থক্য হইলে চেক দ্বারা ঐ পার্থক্য-পরিমাণের আদান প্রদান হয়। নিকাশী ঘরের কার্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত হয়। প্রত্যেক ব্যাঙ্কেরই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে একটা জমা থাকে। চেকদ্বারা ব্যাঙ্কগুলির পারস্পরিক আদান-প্রদান হয়, তাহাও অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের জমার সহিত শুধু যোগ বা বিয়োগ করা হয়। এইজন্য নিকাশী ঘরের সাহায্যে অর্থের আদান-প্রদান না করিয়া পারস্পরিক দেনা-পাওনা শোধ হয়।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. Explain the term 'credit'. Mention some important credit instruments and discuss their utility. [H. S. (Com.), 1961]

ক্রেডিট্ শব্দটির ব্যাখ্যা কর। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঋণপত্রের উল্লেখপূর্বক উহাদের উপযোগ আলোচনা কর।

উঃ—বর্তমান যুগে ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষেত্রে আর্থিক আদান-প্রদানের একটা প্রধান অংশ ঋণের সাহায্যে পরিচালিত হয়। 'ক্রেডিট্' শব্দটির অর্থ হইল বিশ্বাস এবং ঋণের মাধ্যমে যে আদান-প্রদান চলে তাহাকে বিশ্বাসের কারবার বলা চলে। ঋণদাতার যদি ঋণ গ্রহীতার সততা ও ঋণ-পরিশোধ করিবার ক্ষমতার উপর আস্থা থাকে, তাহা হইলে এই সততা ও ঋণপরিশোধ করিবার ক্ষমতাকেই ঋণগ্রহীতার 'ক্রেডিট' বলা যাইতে পারে। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই ঋণগ্রহীতা ভবিষ্যতে প্রত্যর্পণ করিবার অঙ্গীকারে বর্তমানে অপরের মূল্যবান দ্রব্য অথবা অর্থ ব্যবহার করিতে পারে। ইহা ছাড়া, ঋণের কারবারে সময়ের (বর্তমানে গ্রহণ ও ভবিষ্যতে প্রদান) প্রশ্ন জড়িত আছে। সুতরাং (১) বিশ্বাস ও (২) সময়—হইল ঋণের কারবারের দুইটি বৈশিষ্ট্য।

ঋণের আদান-প্রদান মৌখিক প্রতিশ্রুতি বা লিখিত প্রতিশ্রুতির সাহায্যে পরিচালিত হইতে পারে। লিখিত প্রতিশ্রুতিগুলিকে ঋণপত্রে (Credit Instrument) বলা হয়। এইগুলি ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সাধারণতঃ সৃষ্টি করে। প্রতিশ্রুতি পত্র (Promisory Note), হুণ্ডি (Bill of Exchange), খাতায় লিখিত দেনা-পাওনার হিসাব (Book-credit) প্রভৃতি ব্যবসায়িগণ চালু করে। চেক (cheque) ও ড্রাফট্ (Draft) ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। ঋণের আদান-প্রদান এই সমুদয় নিদর্শন পত্রের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

ধারের প্রধান সুবিধা হইল যে, ঋণপত্রের মাধ্যমে মূলধন উদ্যমহীন মূলধনের মালিকের নিকট হইতে দক্ষ ব্যবসায়ীর নিকট হস্তান্তরিত হইয়া মূলধনের উপযোগ বৃদ্ধি করে। দ্বিতীয়তঃ, ঋণপত্রগুলি ধাতব মুদ্রার ব্যবহার জনিত ক্ষয়-ক্ষতি নিবারণ করে। তৃতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ঋণ লেন-দেনের প্রতিষ্ঠানগুলি জনসাধারণকে মূলধন সঞ্চয়ে ও মূলধন বিনিয়োগে উৎসাহিত করে। চতুর্থতঃ, ঋণ-পত্রের সাহায্যে দূর দেশের সহিত আদান-প্রদান ও বৃহৎ পরিমাণের আদান-প্রদান অল্প সময়ে সহজে ও নিরাপত্তার সহিত সম্পাদন করা যায়।

2. State and explain the functions of a Central Bank in a modern banking organisation. [H. S. (Com.), 1960 Comp]

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যাবলী আলোচনা কর।

উঃ—একটি দেশে সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে ব্যাঙ্ক সকল ব্যাঙ্কের শীর্ষদেশে অবস্থান করে তাহাকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণ ব্যাঙ্কের ন্যায় কাজ করা ব্যতীতও বিশেষ কতকগুলি কাজ করে যাহা অন্যান্য ব্যাঙ্ক করিতে পারে না। এইজন্যই দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রাধান্য ও গুরুত্ব দেখা যায়।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান কার্য হইল মূল্যস্তর ঠিক রাখা। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যাহাতে ইহার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিতে পারে তজ্জন্য ইহাকে নিম্নলিখিত কাজগুলির ভার দেওয়া হইয়াছে :—

১। একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই কাগজী নোট চালু করিতে পারে।

২। দেশের মধ্যে নানা জাতীয় মুদ্রা চালু করে।

৩। সরকারী ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে—সরকারের টাকা জমা রাখা, সরকারকে ধার দেওয়া, সরকারী ঋণ তোলা ও শোধ দেওয়া।

৪। অন্যান্য ব্যাঙ্কের বন্ধু, পরামর্শদাতা ও নিয়ন্ত্রণকর্তা হিসাবে কাজ করে।

৫। বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের কাজ করে।

৬। অনেক সময় অন্যান্য ব্যাঙ্কের নিকাশীঘর (Clearing House) হিসাবে কাজ করে।

3. What are the functions of a Bank. How are these functions benificial to the people in a country ? [H. S. (Com.) 1962]

ব্যাঙ্কের কার্য কি কি ? এই কাজগুলি জনসাধারণের পক্ষে কিভাবে হিতকর হয় ?

উঃ—ব্যাঙ্ক হইল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাহা ধার দিবার উদ্দেশ্যে ধার করে (borrows to

lend)। ব্যাঙ্ক জনসাধারণের নিকট হইতে উদ্বৃত্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া (ধার লইয়া) অন্য লোককে ধার দেয়। ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ হইল :—

১। আমানত রাখা—আমানত দুই প্রকারের—চলতি ও মেয়াদী।

২। ধার দেওয়া—সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া বা শেয়ার, হুণ্ডি প্রভৃতি জামিন রাখিয়া।

৩। কাগজী নোট চালু করা—ইহা একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ। অন্যান্য ব্যাঙ্ক চেক প্রবর্তন করিয়া আমানতকারিগণকে দেয় ও চেকের সাহায্যে তাহারা দেনা-পাওনা মিটাইতে পারে।

৪। বিভিন্ন দেশের মধ্যে দেনা-পাওনা মিটাইয়া দেয়।

৫। বিবিধ কার্য—মক্কেলগণের প্রতিনিধি হিসাবে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে, পাওনা টাকা আদায় করে, মূল্যবান দ্রব্য গচ্ছিত রাখে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা প্রভূত সাহায্য করে। ভাল ব্যাঙ্ক থাকিলে লোকের সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি বাড়ে—ইহাতে দেশে মূলধন বৃদ্ধি পায়। ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংগৃহীত ক্ষুদ্র পরিমাণ অর্থ একত্রিত হইয়া বহু পরিমাণ মূলধন হয় যাহা ব্যাঙ্ক কৃষক, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী প্রভৃতিকে ধার দিয়া অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করে। সুতরাং ব্যাঙ্ক মূলধনের মালিক ও শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিয়া সঞ্চিত মূলধনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। ব্যাঙ্ক নোট, চেক প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া চাষী, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণকে উৎপাদন কার্যের জন্য যে পরিমাণ অর্থ সাহায্য করিতে পারে, সরকারের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। এই কারণে সু-পরিচালিত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা না থাকিলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হইতে পারে না।

4. Describe the different types of banks which exist in India.

H. S. (Com) 1965.

ভারতে অবস্থিত বিভিন্ন জাতীয় ব্যাঙ্কগুলির বিবরণী দাও।

উঃ—ভারতে সাধারণতঃ দুই জাতীয় ব্যাঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়। মহাজন, সাহুকর, চেট্টি প্রভৃতি দেশীয় প্রথায় লগ্নী কারবার করেন এবং দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষেত্রে ইঁহারা বিশেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেন। হুণ্ডির সাহায্যে সাধারণতঃ ইঁহারা লেন-দেন পরিচালনা করেন।

বর্তমানে ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা বলিতে পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতে পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলিকে বুঝায়। এই ব্যাঙ্কগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল।

১। রিসার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া—Reserve Band of India-রিসার্ভ ব্যাংক হইল ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। ১৯৩৪ সালের আইনানুসারে ১৯৩৫ সালের যৌথ মূলধনী কারবারের ভিত্তিতে এই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ১৯৪৯ সালে সরকার ইহাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া ইহার সকল শেয়ার ক্রয় করেন এবং ইহার পরিচালনা ভারও গ্রহণ করেন। রিসার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় এবং দেশের সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ও মুদ্রানীতি পরিচালিত করে। এই ব্যাঙ্ক নোট প্রচলন করিবার একমাত্র অধিকারী। ইহা অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করে, সরকারের ব্যাঙ্কারের কাজ করে। বিদেশী বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করে ও কৃষি ঋণ দান সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করে।

২। ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক—State Bank of India-১৯৫৫ সালে সর্বভারতীয় গ্রাম ঋণ অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ ক্রমে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়৷ ইহার নূতন নাম হয়, স্টেট্ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া। সরকারই হইলেন ইহার বর্তমান মালিক। ইহার পরিচালনা ভার ২০ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি কেন্দ্রীয় সমিতির হস্তে ন্যস্ত। আমানত রাখা, ধার দেওয়া প্রভৃতি সাধারণ ব্যাঙ্কিং কাজ ছাড়াও কৃষিঋণ ব্যবস্থার উন্নতি করা ইহার অন্যতম প্রধান কার্য।

৩। ভারতীয় যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্ক—Joint Stock Banks of India. এই ব্যাঙ্কগুলি যৌথ-মূলধনের ভিত্তিতে শেয়ার বিক্রয় করিয়া গঠিত হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কগুলি সাধারণতঃ আমানত লয়, ধার দেয় ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ করে।

৪। বৈদেশিক বিনিময় ব্যাঙ্ক—Foreign Exchange Banks. এই ব্যাঙ্কগুলি বিদেশী মূলধনে গঠিত। আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যে অর্থ লেন-দেন করা ইহাদের প্রধান কাজ। ইহা ছাড়াও, এই ব্যাঙ্কগুলি ভারতীয়গণের আমানত রাখে ও বৈদেশিক বাণিজ্যরত ব্যবসায়িগণকে ধার দেয় এবং ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত অন্য কাজ করে।

৫। সমবায় ব্যাঙ্ক—Co-operative Banks. ভারতে কৃষক ও কুটির শিল্পগুলিকে স্বল্প মেয়াদী ঋণ সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে সমবায় ব্যাঙ্ক কাজ করে।

৬। জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক—Land Mortgage Banks. কৃষিকার্যের স্থায়ী উন্নতির জন্য দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ সরবরাহের উদ্দেশ্যে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক কাজ করে।

৭। ভারত সরকারও পোষ্ট অফিস সঞ্চয় ব্যাঙ্ক পরিচালনা করেন। ইহা ছাড়াও কৃষকগণকে ঋণ দান, ক্ষুদ্র শিল্প সংরক্ষণের জন্য অগ্রিম ঋণদান প্রভৃতি ব্যাঙ্কিং কাজ করেন। বর্তমানে শিল্প উন্নয়নের জন্য শিল্প ঋণ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান (Industrial Finance Corporation), শিল্প-ঋণ ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান (Industrial Credit and Investment Corporation), জাতীয় শিল্পোন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (National Industrial Development Corporation) প্রভৃতি গঠন করিয়াছেন।

একাদশ অধ্যায়

বণ্টন

(Distribution)

বণ্টন বা জাতীয় আয় বিভাগ—Distribution

ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা এই চারিটি উৎপাদনের উপাদানের সাহায্যে জাতীয় আয়ের সৃষ্টি হয়। উপাদানগুলির প্রত্যেকটি উৎপাদন-কার্যে সাহায্য করে এবং এইজন্য ইহাদের প্রত্যেকটির চাহিদা হয়। উৎপাদনের উপাদানগুলির বিক্রেতা হইল স্বয়ংই সেই উপাদানটি অথবা উপাদানটির মালিক। ভূমি ও মূলধনের

মালিক এই দুইটি উপাদানের বিক্রেতা। শ্রমিক নিজেই তাহার শ্রম বিক্রয় করে। এই উপাদানগুলির ক্রেতা হইল ব্যবস্থাপক—যিনি এই তিনটি উপাদান একত্রিত করিয়া ইহাদের সহযোগে উৎপাদন-কার্য পরিচালনা করেন। উৎপাদনের উপাদানগুলির জন্য ব্যবস্থাপকের যে চাহিদা, তাহা নিছক তাহার নিজের জন্য চাহিদা নহে। সমাজের বিভিন্ন অভাব পূরণের জন্য ব্যবস্থাপক উৎপাদনের উপাদানগুলি ক্রয় করেন। সুতরাং দেখা যায় সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদেই ব্যবস্থপনা-সমেত সমস্ত উপাদানের চাহিদার সৃষ্টি হয় এবং সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবস্থাপকই অন্যান্য উপাদানগুলি সংগ্রহ করেন এবং উৎপাদিত ধন উপাদানগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেন। জমির মালিক খাজনা পায়, শ্রমিক মজুরি পায়, মূলধনের মালিক সুদ পায় এবং ব্যবস্থাপক স্বয়ং মুনাফা পাইয়া থাকেন।

এখন প্রশ্ন হইল কি নীতিতে উৎপাদিত ধন অর্থাৎ জাতীয় আয় উপাদানগুলির মধ্যে ভাগ করা হয়। খাজনা, মজুরি, সুদ প্রভৃতি হইল জাতীয় আয়ের অংশ। জাতীয় আয় সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে বলিয়া ভূমি, মূলধন ও শ্রমের চাহিদা হয়। উৎপাদনে সাহায্য করিবার জন্য একদিকে যেরূপ এই উপাদানগুলির চাহিদা হয়, অপর দিকে তেমনি চাহিদা মিটাইবার জন্য এই উপাদানগুলির সরবরাহ থাকা চাই—নতুবা চাহিদা ও যোগানের সামঞ্জস্য হইতে পারে না। সুতরাং ভূমি, শ্রম, মূলধন প্রভৃতি জাতীয় আয়ের কি অংশ তাহাদের কার্যের মূল্য হিসাবে পাইবে, তাহা প্রত্যেকটি উপাদানের চাহিদা ও সরবরাহের দ্বারা নির্ধারিত হইবে। যদি কোন একটি উপাদানের অধিকতর উপযোগের জন্য ইহার চাহিদা বৃদ্ধি পায় ও সেই অনুপাতে সরবরাহ অপ্রচুর হয়, তাহা হইলে সেই উপাদানটির কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাইয়া উপাদানটি জাতীয় আয়ের বেশী পরিমাণ পাইবে। শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতির ফলে শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে মজুরি বৃদ্ধি পায়। আবার, শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে মজুরি কমিয়া যায়। শ্রমিক নিযুক্ত করিবার সময় প্রত্যেক ব্যবস্থাপকই বিচার করেন যে, নিযুক্ত শ্রমিক কর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্যমূল্য ও শ্রমিককে দেয় মজুরি সমান কি না। ব্যবস্থাপক তত সময় পর্যন্তই নূতন শ্রমিক নিযুক্ত করেন, যত সময় পর্যন্ত প্রত্যেক শ্রমিক মজুরির সমান মূল্যের দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে। দ্রব্য উৎপাদন করিবার অন্যান্য খরচ বাদ দিয়া দ্রব্যটি হইতে প্রাপ্ত মূল্য যদি মজুরি অপেক্ষা বেশী হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থাপক

নূতন শ্রমিক নিযুক্ত করিবেন। ইহাতে তাঁহার মুনাফা বেশী হইবে। কিন্তু অধিক শ্রমিক নিয়োগের ফলে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন হ্রাস পায়। ব্যবস্থাপক ঠিক তত সময় পর্যন্ত নূতন শ্রমিক নিযুক্ত করেন, যত সময় পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন প্রত্যেক শ্রমিকের মজুরির সমান না হয়। বেশী শ্রমিক নিযুক্ত হইবার ফলে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন হ্রাস পাইতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তাহা মজুরির সমান হয়।

খাজনা, সুদ প্রভৃতিও জাতীয় আয়ের অন্যান্য অংশ। ইহাদের ক্ষেত্রেও ঐ একই নীতিতে খাজনা ও সুদ নির্ধারিত হয়। সঞ্চয় বেশী হইলে মূলধনের সরবরাহ বৃদ্ধি পায়, ফলে সুদ কমিয়া যায়। আবার, সঞ্চয় হ্রাস পাইলে মূলধনের সরবরাহ কমিয়া যায়, ফলে সুদ বাড়ে। এইভাবে জাতীয় আয় উৎপাদনের উপাদানগুলির মধ্যে বন্টিত হয়।

উপাদানের আয়—Factor-income

ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা এই চারিটি হইল উৎপাদনের প্রধান উপাদান। এই চারিটি উপাদানের সাহায্যে একটি দেশের সমগ্র ধন উৎপাদিত হয় এবং উৎপাদিত ধন পারিশ্রমিক হিসাবে এই চারিটি উপাদানের মধ্যে বন্টিত হয়। ভূমির আয়কে খাজনা বলা হয়, শ্রমিক মজুরি পায়, মূলধনের মালিক সুদ পায় এবং ব্যবস্থাপক স্বয়ংই মুনাফা গ্রহণ করেন। সুতরাং খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা হইল এই উপাদানগুলির আয়। প্রত্যেকটি উপাদান উৎপাদন-কার্যে সাহায্য করে বলিয়া একটি পারিশ্রমিক পায়। এই পারিশ্রমিক হইল উপাদানটির আয়। খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা হইল এই আয়। উৎপাদনে সাহায্য করিবার পারিশ্রমিক হইলেও প্রত্যেক আয়ের কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য প্রত্যেকটি আয় অপর আয় হইতে পৃথক এবং সেই কারণে প্রত্যেকটি আয়ের পৃথক্ আলোচনা হওয়া দরকার।

মজুরি—Wages

উৎপাদনের উপাদান হিসাবে শ্রমিককে তাহার কাজের জন্য যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, তাহাকে মজুরি বলা হয়। ধনবিজ্ঞানে 'মজুরি' শব্দটি একটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে সমস্ত শ্রমিক তাহাদের শারীরিক বা মানসিক শক্তি

প্রয়োগ করিয়া উৎপাদনকার্যে সাহায্য করে, তাহারই সমগ্র জাতীয় আয়ের একটা অংশ মজুরি হিসাবে পাইয়া থাকে। মজুরি জাতীয় আয়ের একটা অংশ। জাতীয় আয়ের একটা অংশ হইলেও খাজনা, সুদ প্রভৃতি জাতীয় আয়ের অন্যান্য অংশগুলির সহিত মজুরির কিছু পার্থক্য দেখা যায়। বিভিন্ন জমির খাজনার মধ্যে যেরূপ পার্থক্য দেখা যায়, সাধারণতঃ বিভিন্ন শ্রেণীর মজুরির মধ্যে সে পরিমাণ পার্থক্য দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, খাজনার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া অতি সামান্য হইতে পারে, কিন্তু মজুরির পরিমাণ হ্রাস পাইলেও শ্রমিকের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ অপেক্ষা কম হইতে পারে না। সুদের সহিত তুলনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুদের একটি স্বাভাবিক হার আছে এবং প্রতিযোগিতা থাকিলে একই বাজারে সাধারণতঃ সুদের হার সমান হয়, কিন্তু একই বাজারে মজুরির হারের পার্থক্য দেখা যায়। ব্যবস্থাপকের মুনাফা অনিশ্চিত কিন্তু মজুরি হ্রাস পাইলেও ইহা নিশ্চিত আয়।

কাজ হিসাবে মজুরি ও সময় হিসাবে মজুরি—Piece-Wage and Time-Wage

দুইটি হিসাবে সাধারণতঃ মজুরি দেওয়া হয়। যখন কাজের মাত্রা ঠিক করিয়া প্রত্যেক মাত্রার জন্য কি পরিমাণ মজুরি দেওয়া হইবে তাহা স্থির হয়, তখন ইহাকে কাজের হিসাবে মজুরি বলা হয়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ দর্জির মজুরি কাজের মাপে স্থির হয়। প্রত্যেকটি জামা কাটা ও সেলাইয়ের জন্য দর্জির একটা মজুরি নির্ধারিত হয় এবং এই নির্ধারিত মজুরির ভিত্তিতে সে যতগুলি জামা তৈয়ারী করে সে সেইমত মজুরি পায়। অনেক সময় কয়লার খনি ও চা-বাগানের কাজেও এই হিসাবে মজুরি দেওয়া হয়।

সময়ের মাপে মজুরি দেওয়ার অর্থ হইল একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে (প্রতিদিন বা প্রতি সপ্তাহ অথবা প্রতি মাস কাজ করিয়া) মজুরি দেওয়া হয়। দৈহিক শ্রমের জন্য সাধারণ শ্রমিকগণ সময়ের মাপে অর্থাৎ রোজ প্রতি বা হপ্তা প্রতি মজুরি পায়। উচ্চস্তরের সুদক্ষ কর্মিগণ মাস প্রতি বেতন পায়। শ্রমিকেরা সাধারণতঃ সময়ের হিসাবে মজুরি পাইতে চায়, অপরপক্ষে মালিকগণ কাজের হিসাবে মজুরি দিতে পছন্দ করে।

আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত বা সামগ্রিক মজুরি—Nominal or Money Wage and Real Wage

শ্রমিকগণ তাহাদের কাজের প্রতিদান হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ পায়, তাহাকে আর্থিক মজুরি বলা হয়। আর্থিক মজুরি, শ্রমিককে যে পরিমাণ অর্থ দেওয়া হয়, তাহা দ্বারা মাপ করা হয়। যদি কোন শ্রমিক দৈনিক ছয় ঘণ্টা কাজ করিয়া তাহার কাজের মূল্য হিসাবে দুই টাকা পায়, তাহা হইলে এই দুই টাকা হইল তাহার আর্থিক মজুরি। কিন্তু অর্থের দ্বারা শ্রমিকের প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায় না। সেইজন্য প্রকৃত বা সামগ্রিক মজুরির কল্পনা করা হয়। শ্রমিক তাহার আয়ের বিনিময়ে যে সমস্ত দ্রব্য কিনিতে পারে এবং কাজ করিয়া আনুষঙ্গিক অন্যান্য যে সমস্ত সুখ-সুবিধা পাইয়া থাকে, তাহাদের সমষ্টিকেই প্রকৃত বা সামগ্রিক মজুরি বলা হয়। শ্রমিকগণের আসল অবস্থা জানিতে হইলে তাহাদের সামগ্রিক মজুরির পরিমাণ জানিতে হইবে। শ্রমিকগণও শুধুমাত্র আর্থিক মজুরির পরিমাণ দ্বারা কাজে আকৃষ্ট হয় না। কাজে নিযুক্ত হইবার পূর্বে তাহারা কাজের অন্যান্য সুবিধা ও অসুবিধার বিষয় বিবেচনা করে।

শ্রমিকের প্রকৃত অবস্থা তাহার প্রকৃত মজুরির পরিমাণের উপর নির্ভর করে। শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি-পরিমাণ অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি কত তাহা জানিতে হইলে তাহাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য কত তাহা জানিতে হইবে। শ্রমিকের আর্থিক মজুরি বেশী হইলেও চাউল, ডাইল, লবণ, কাপড় প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের আর্থিক মজুরি দ্বারা কম পরিমাণ দ্রব্য কিনিতে পারে। জিনিসের দাম কমিলে তাহারা বেশী পরিমাণ দ্রব্য কিনিতে পারে। বর্তমানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পাইলেও দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির তুলনায় মজুরি-বৃদ্ধি অতি সামান্যই হইয়াছে। সুতরাং আর্থিক মজুরি বাড়িলেও সে হিসাবে তাহাদের প্রকৃত মজুরি বাড়ে ত' নাই বরঞ্চ কমিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃত মজুরির পরিমাণ কাজের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। কাজটি যদি কঠিন হয় যাহাতে জীবনীশক্তি নষ্ট হয় অথবা কাজটি যদি অরুচিকর হয় বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নিষ্পন্ন করিতে হয়, তাহা হইলে আর্থিক মজুরির পরিমাণ বেশী হইলেও প্রকৃত মজুরির পরিমাণ কম হয়। রেলের ইঞ্জিনচালকের বেতন সমজাতীয় শ্রমিকের বেতন অপেক্ষা

অনেক বেশী হইলেও তাহার কাজ বেশী কষ্টসাধ্য এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর। ইঞ্জিনচালক একাদিক্রমে ১০।১৫ বৎসরের অধিক কাজ করিতে পারে না, তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। কিন্তু সাধারণ মোটরগাড়ীর চালক ইঞ্জিনচালক অপেক্ষা কম বেতন পাইলেও তাহার কাজ অপেক্ষাকৃত কম কষ্টসাধ্য এবং কম পীড়াদায়ক। সে ইঞ্জিনচালক অপেক্ষা বেশী দীর্ঘজীবী হয় এবং তাহার বেতন কম হইলেও সে বেশীদিন যাবৎ কাজ করিয়া গড়ে বেশী আয় করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, কাজের স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতার উপরও প্রকৃত মজুরির পরিমাণ নির্ভর করে। সাময়িক কালের জন্য যে সব কাজ পাওয়া যায় তাহার বেতন বেশী হইলেও দীর্ঘদিন বেকার থাকিতে হয়। সুতরাং আর্থিক মজুরির পরিমাণ অধিক হইলেও প্রকৃত মজুরির পরিমাণ কম। চতুর্থতঃ, অতিরিক্ত আয়ের সম্ভাবনা থাকিলে, সে কাজের আর্থিক মজুরি কম হইলেও প্রকৃত মজুরি বেশী। কাজের সময়ের দীর্ঘতা যদি কম হয়, তাহা হইলে শ্রমিকগণ প্রচুর অবসর পায় এবং এই অবসর সময়ে তাহারা অন্য নানা উপায়ে আয় বৃদ্ধি করিতে পারে। সাধারণতঃ স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণের কাজের সময়ের দীর্ঘতা অপেক্ষাকৃত অনেক কম বলিয়া তাঁহারা গৃহ-শিক্ষকতা করিয়া, পুস্তক-প্রণয়ন প্রভৃতি কার্য করিয়া তাঁহাদের পারিশ্রমিকের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারেন। সুতরাং আর্থিক মজুরির পরিমাণ সম-পর্যায়ের অন্যান্য বৃত্তি হইতে কম হইলেও তাঁহাদের প্রকৃত মজুরির পরিমাণ বেশী।

ইহা ছাড়া, কাজ শিখিবার খরচা, কাজের ঝুঁকি ও দায়িত্ব, কাজের সামাজিক মর্যাদা প্রভৃতির দ্বারাও প্রকৃত মজুরি নির্ধারিত হয়। ব্যারিস্টার হইতে গেলে শিক্ষার ব্যয় অনেক বেশী পড়ে। সুতরাং সাধারণ উকিল অপেক্ষা ব্যারিস্টারের আয় বেশী হইলেও তাঁহার প্রকৃত মজুরি বেশী বলা চলে না। ব্যারিস্টারি পেশা চালাইবার আনুষঙ্গিক ব্যয়ও উকিলের ব্যয় অপেক্ষা অধিক। মোটর গাড়ীর চালক অপেক্ষা এরোপ্লেন-চালকের আর্থিক মজুরি বেশী হইলেও এরোপ্লেন-চালকের ঝুঁকির তুলনায় তাহার সামগ্রিক মজুরি বেশী বলা যায় না। পরিশেষে কাজের আনুষঙ্গিক সুখ-সুবিধার ভিত্তিতেই প্রকৃত মজুরির পরিমাপ হয়। রেলের কাজে বিনা ভাড়ায় বাসগৃহ, বিনামূল্যে পোশাক, বিনাখরচায় রেলভ্রমণ প্রভৃতি সুবিধাগুলি পাওয়া যায়, যাহা অন্য কাজে পাওয়া যায় না। সুতরাং রেলকর্মীদের আর্থিক মজুরির পরিমাণ কম হইলেও প্রকৃত মজুরির পরিমাণ বেশী।

সুতরাং শ্রমিকগণের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিতে হইলে অথবা বিভিন্ন দেশের বা বিভিন্ন কালের শ্রমিকগণের জীবনযাত্রার মানের তুলনা করিতে হইলে, তাহা আর্থিক মজুরির পরিমাণ দ্বারা সম্ভব হয় না। একমাত্র প্রকৃত মজুরির ভিত্তিতে শ্রমিকগণের আসল অবস্থা জানা সম্ভব হয়।

মজুরি-নির্ধারণ নীতি—Principles determining Wages

শ্রমিকের মজুরি কি নীতিতে স্থির হয় এ সম্পর্কে পূর্বে মতভেদ ছিল। অনেক ধনবিজ্ঞানী মনে করিতেন যে, শ্রমিকের খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যে খরচ হয় তাহা দ্বারাই মজুরির পরিমাণ স্থির হয়। এই নীতি অনুসারে মজুরি নির্ধারিত হইলে, তাহাকে জীবন-ধারণোপযোগী মজুরি বলা হয়।

জীবন-ধারণোপযোগী মজুরি—Subsistence Theory of Wages

এই নীতি অনুসারে শ্রমিকের শ্রমকে একটি সাধারণ দ্রব্যের সহিত তুলনা করিয়া বলা হয় যে, একটি দ্রব্যের মূল্য যেরূপ দ্রব্যটির প্রান্তিক উৎপাদন খরচার দ্বারা নির্ধারিত হয়, শ্রমের মূল্যও অর্থাৎ মজুরিও সেইরূপ ইহার প্রান্তিক উৎপাদন-খরচার দ্বারা স্থির হয়। শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় হইল পরিবারসহ শ্রমিকের জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার ন্যূনতম ব্যয়। মজুরি যদি জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার খরচ অপেক্ষা বেশী হয়, তাহা হইলে শ্রমিকগণ বিবাহ করিয়া সন্তান-সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে। ফলে, শ্রমিক-সংখ্যা বেশী হইবে এবং ইহার ফলে মজুরির পরিমাণ কমিবে। মজুরির পরিমাণ কমিলে শ্রমিকের অবস্থা খারাপ হইবে। অনেক শ্রমিক খাদ্যাভাবে মারা যাইবে এবং বিবাহ না করিবার ফলে শ্রমিক-সংখ্যা হ্রাস পাইবে। শ্রমিক-সংখ্যা হ্রাস পাইলে পুনরায় মজুরি বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপে মজুরির পরিমাণ, জীবনের সর্বনিম্ন মান বজায় রাখিবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা কম হইতে পারে না।

বর্তমানে এই মতটি অসার বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, কারণ শ্রমিকগণ এখন আর জীবনধারণের সর্বনিম্ন মানের জন্য প্রয়োজনীয় মজুরি পাইলে সন্তুষ্ট হয় না। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে শ্রমিকগণের জীবনযাত্রার মানের অনেক উন্নতি হওয়ার ফলে মজুরির হারও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ছাড়া বলা যায়, মজুরি বৃদ্ধি পাইলে যে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। জীবনযাত্রার মান

উচ্চ রাখিবার জন্য অনেক সময় শ্রমিকগণ মজুরি বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও পোষ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করে না।

জীবনযাত্রার মান ও মজুরি—Standard of Living and Wages

অনেকে বলেন যে, শ্রমিকের মজুরি তাহার জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার জন্য যে পরিমাণ মজুরির প্রয়োজন, তাহা দ্বারা স্থির হয়। জীবনযাত্রার মান বলিতে শুধু বাঁচিয়া থাকার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা বুঝায় না। খাদ্য, বস্ত্র ও বাসগৃহ ব্যতীত কর্মক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য পুষ্টিকর খাদ্য, উত্তম বস্ত্র ও বাসগৃহ, শিক্ষালাভের সুবিধা, চিত্তবিনোদনের জন্য অবসর ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকা একান্ত আবশ্যক। শ্রমিকগণ এই জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ পারিশ্রমিক না পাইলে কাজে নিযুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, জীবনযাত্রার মান শুধু উচ্চ হইলেই মজুরি বেশী হইতে পারে না। জীবনযাত্রার মান উচ্চ হওয়ার ফলে শ্রমিকের কর্মক্ষমতা যদি বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে কর্মক্ষমতা-বৃদ্ধির ফলে তাহার উৎপাদন ক্ষমতাও বাড়ে। একমাত্র কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাইলেই শ্রমিক অধিক পরিমাণ মজুরি পাইতে পারে। সুতরাং জীবনযাত্রার মান পরোক্ষভাবে শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করিয়া তাহার মজুরি-বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি না পাইয়া শুধু জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি করিলেই মজুরি-বৃদ্ধি হইতে পারে না। জীবনযাত্রার মান অন্যভাবেও মজুরি-বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। জীবনযাত্রার মান উচ্চ হইলে সাধারণতঃ শ্রমিকগণ জীবনযাত্রার এই উচ্চমান বজায় রাখিবার জন্য পরিবার-সংখ্যা বৃদ্ধি করে না। জন্মের হার কমিলে শ্রমিক-সংখ্যা হ্রাস পায়, ফলে মজুরির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা নীতি—Marginal Productivity Theory of Wage

আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ বলেন যে, অন্যান্য দ্রব্যমূল্য যেভাবে স্থির হয়, শ্রমের মূল্যও অর্থাৎ মজুরিও ঠিক সেইভাবে স্থির হয়। অন্যান্য দ্রব্যমূল্যের ন্যায় মজুরিও শ্রমিকের চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে নির্ধারিত হয়। অন্যান্য দ্রব্যের যেরূপ ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে, শ্রমেরও তদ্রূপ ক্রেতা ও বিক্রেতা আছে। শ্রমের ক্রেতা হইল ব্যবস্থাপক, আর বিক্রেতা হইল স্বয়ংই শ্রমিক। একটি দ্রব্যের উপযোগ আছে বলিয়াই ক্রেতা যেরূপ দ্রব্যটি ক্রয় করে,

উৎপাদনে শ্রমেরও উপযোগ আছে বলিয়া তদ্রূপ ব্যবস্থাপক শ্রমিক নিয়োগ করে। দ্রব্যমূল্য যেরূপ দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগের সমান হয়, শ্রমের মূল্য অর্থাৎ মজুরিও তদ্রূপ শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতার দ্বারা নির্ধারিত হয়। একজন শ্রমিক নিয়োগ করিলে মোট উৎপাদন যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, সেই পরিমাণ হইল শেষ নিযুক্ত শ্রমিকের উৎপাদন। ধর, কোন কারখানায় ৫০ জন শ্রমিক নিযুক্ত করিলে ২৫০৲ টাকা মূল্যের দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। ইহার পর যদি আর একজন অতিরিক্ত শ্রমিক অর্থাৎ সর্বসমেত ৫১ জন শ্রমিক নিযুক্ত হয়; তাহা হইলে উৎপাদন-পরিমাণ হয় ২৬০৲ টাকা মূল্যের দ্রব্য। তাহা হইলে একজন অতিরিক্ত শ্রমিক নিযুক্ত করিবার ফলে উৎপাদন-পরিমাণ (২৬০—২৫০) ১০৲ টাকা বৃদ্ধি পাইল। ইহাই হইল শেষ নিযুক্ত শ্রমিকের অর্থাৎ একপঞ্চাশৎ শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন-পরিমাণ। শ্রমিকের মজুরি এই প্রান্তিক উৎপাদন-পরিমাণের (১০৲ টাকার) সমান হইবে। মজুরির হার যদি শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন-পরিমাণের অর্থাৎ ১০৲ টাকার কম হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থাপক অধিক-সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত করিবে, কারণ শ্রমিক যে পরিমাণ উৎপাদন করিবে, তাহাকে তাহার বাজার মূল্যের সমান পরিমাণ মজুরি হিসাবে দিতে হইবে। এইরূপ শ্রমিকের মজুরি যত সময় পর্যন্ত তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-পরিমাণের সমান না হয়, তত সময় পর্যন্ত ব্যবস্থাপক শ্রমিক নিয়োগ করিবে, ফলে শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে, এবং মজুরির পরিমাণও বাড়িবে। কিন্তু মজুরি যদি শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন-পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হয় অর্থাৎ ১০৲ টাকার বেশী হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থাপক আর শ্রমিক নিযুক্ত করিবে না। কারণ ইহাতে তাহার লোকসান হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক শ্রমিক-নিয়োগ বন্ধ রাখিবে। ফলে, শ্রমিকের চাহিদা কমিবে ও মজুরির হারও কমিবে। সুতরাং মজুরি শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন-পরিমাণের সমান হইবে—ইহার বেশী বা কম হইতে পারে না।

চাহিদার দিক দিয়া শ্রমিকের মজুরি তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু সরবরাহের দিক দিয়া কি পরিমাণ মজুরি হইলে শ্রমিকগণ কাজ করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহার উপরও মজুরির হার কিছু পরিমাণে নির্ভর করে। শ্রমিক এককভাবে মালিকের সহিত দর কষাকষি করিতে না পারিলেও সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে কাজের শর্ত লইয়া ব্যবস্থাপকের সহিত দর কষাকষি করে। কাজটির গুরুত্ব ও দায়িত্বের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপকের সহিত তাহাদের মজুরির পরিমাণ

সম্পর্কে দর কষাকষি হইয়া উভয় পক্ষ যে পরিমাণ মজুরি দিতে এবং লইতে রাজী হয়, তাহা হইল মজুরির চল্‌তি হার। সুতরাং দেখা যায় যে, দ্রব্যমূল্যের ন্যায় মজুরির একটা সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন হার আছে এবং শ্রমের চাহিদা ও সরবরাহ অনুসারে এই হার কখনও বেশী কখনও কম হয়। শ্রমিকের চাহিদা বাড়িলে বা সরবরাহ কমিলে মজুরির হার বেশী হইয়া এই সর্বোচ্চ সীমার কাছাকাছি হইবে, আবার চাহিদা কমিলে বা সরবরাহ বাড়িলে মজুরির হার কমিয়া এই সর্বনিম্ন সীমার কাছাকাছি হইবে। সুতরাং শ্রমিকের চাহিদা ও সরবরাহের দ্বারা মজুরি স্থির হয়।

মজুরির হারের পার্থক্যের কারণ—Causes of the difference in Wage-rates

বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত শ্রমিক বিভিন্ন হারে মজুরি পায়। সকল কাজে একই হারে মজুরি হয় না। মজুরির এই পার্থক্যের কারণ কি? একই বাজারে একই দ্রব্যের বিভিন্ন মূল্য হইতে পারে না। ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের প্রতিযোগিতার ফলে দ্রব্যমূল্য সমান হয়। কিন্তু মজুরির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন কাজে ভিন্ন ভিন্ন মজুরি। রিক্সা-চালক ও মোটর-চালক, রাজ-মিস্ত্রী ও সাধারণ-মিস্ত্রী, বাড়ীর চাকর ও মেথর ইহারা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন হারে মজুরি পায়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যদি কোন কাজে অন্য কাজ অপেক্ষা বেশী মজুরি হয়, তাহা হইলে অল্প মজুরির কাজ হইতে বেশী মজুরির কাজে লোক চলিয়া আসে এবং ইহার ফলে চাহিদা ও সরবরাহের প্রভাবে মজুরির হার সমান হইতে থাকে। কিন্তু কোন কারণে যদি এক কাজ হইতে অন্য কাজে যোগদান করিবার বাধা থাকে, তাহা হইলে অবশ্য মজুরির পার্থক্য থাকিবেই। সুতরাং দেখা যায় যে, প্রতিযোগিতার অভাবেই অর্থাৎ শ্রমিকের গতিশীলতার বাধাই হইল মজুরির পার্থক্যের প্রধান কারণ। এইজন্য উকিল, শিক্ষক, ডাক্তার প্রভৃতি রিক্সা-ওয়ালা অপেক্ষা অধিক মজুরি পায়। কারণ রিক্সা-ওয়ালা ইচ্ছা করিলেই উচ্চ মজুরির কাজে যোগদান করিতে পারে না। কিন্তু সমান প্রতিযোগিতা থাকিলেও অর্থাৎ রিক্সা-ওয়ালা শিক্ষক হইতে পারিলেও মজুরির পার্থক্য থাকিবে; সমান সুযোগ-সুবিধা থাকিলেও পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য মজুরির পার্থক্য থাকিবে।

১। বিভিন্ন ধরণের কাজ সমান রুচিকর বা আনন্দদায়ক নহে বলিয়া (Agreeableness or disagreeableness) কোন কোন কাজে বেশী লোক আকৃষ্ট হয়, আবার কোন কোন কাজে কম লোক আকৃষ্ট হয়। যে কাজগুলি কষ্টসাধ্য ও সামাজিক দৃষ্টিতে হীন বলিয়া মনে হয়, সে বৃত্তিগুলিতে শ্রমিক আকর্ষণ করিতে হইলে সাধারণতঃ উচ্চহারে মজুরি দিতে হয়। এজন্য কসাইয়ের মজুরি অন্যান্য সমজাতীয় কাজের মজুরি অপেক্ষা বেশী।

২। বৃত্তিশিক্ষার ব্যয়ের পার্থক্যের জন্য (Expenses of training) মজুরির পার্থক্য হয়। ব্যারিষ্টার হইতে গেলে বিলাত যাইতে হয় এবং সেজন্য অনেক সময়ক্ষেপ ও ব্যয় করিতে হয়। কাজেই ব্যারিস্টারের সংখ্যা কম। চাহিদার তুলনায় যোগান কম হইলে মজুরি বেশী হয়।

৩। কাজটির স্থায়িত্বের উপরও (Constancy or inconstancy of the occupation) মজুরির পরিমাণ নির্ভর করে। যে কাজ বৎসরে বারমাস করা যায়, কোন সময়ে বেকার হইবার সম্ভাবনা থাকে না, সে সকল কাজের জন্য অপেক্ষাকৃত কম মজুরিতে লোক পাওয়া সম্ভব। আবার ঋতুগত কাজের জন্য শ্রমিককে বেশী মজুরি দিতে হয়, কারণ শ্রমিক সারা বৎসর ধরিয়া উপার্জন করিতে পারে না। কাজেই এই সকল ঋতুগত পেশায় কম লোক যোগদান করে।

৪। যে কাজে ঝুঁকি ও দায়িত্ব (Risk and responsibility) যত বেশী, সে কাজে তত কম লোক আকৃষ্ট হয়। সুতরাং বেশী মজুরি না হইলে লোক পাওয়া যায় না। এরোপ্লেন-চালকের মাহিনা বেশী, কারণ গুরুতর ঝুঁকির জন্য অল্প লোকই এদিকে আকৃষ্ট হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব অন্যান্য শিক্ষকের দায়িত্ব অপেক্ষা অনেক বেশী। চাহিদার তুলনায় এরূপ দায়িত্ব বহন করিবার যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের অভাবহেতু বেশী মাহিনা না হইলে একাজে উপযুক্ত লোক পাওয়া দুষ্কর।

৫। যে সমস্ত কাজে ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা (Future prospect) আছে, সে সমস্ত কাজে অধিক লোক যোগদান করিতে ইচ্ছুক হয়। বেতন-বৃদ্ধির সম্ভাবনা, অবসর গ্রহণ করিবার পর পেন্সন পাইবার আশা, চাকুরির স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার জন্য বেশী লোক সরকারী চাকুরিতে আকৃষ্ট হয় ও কম বেতনে কাজ করিতে ইচ্ছুক হয়।

৬। ইহা ছাড়াও, কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতার পার্থক্যের কারণেও মজুরির

পার্থক্য হইতে পারে। কিন্তু কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতার পার্থক্যের উপর বেশী জোর দেওয়া ঠিক নয়। সমান সুযোগ-সুবিধা পাইলে এই পার্থক্য অনেক পরিমাণে দূর করা সম্ভব হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতিভেদ, উত্তরাধিকার আইন প্রভৃতি কতকগুলি মনুষ্য-সৃষ্ট উপায়ে মানুষে মানুষে এই পার্থক্য স্থায়ী করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এমন অনেক পেশা আছে, যাহাতে দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর লোক প্রবেশ করিবার কল্পনাও করিতে পারে না। বৃটিশ শাসনকালে উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারী ও দেশীয় কর্মচারীর মধ্যে বেতনের পার্থক্য ছিল। এই পার্থক্য ভারতীয়গণের কম যোগ্যতার পরিচায়ক ছিল না, পরন্তু ইহা শাসকশ্রেণীর ক্ষমতার পরিচায়ক ছিল। গরীবের ছেলের পক্ষে বড় ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার বা সেনা-বিভাগে উচ্চ পদে নিযুক্ত হওয়া দুরাশামাত্র, কারণ এই পেশাগুলির শিক্ষা-ব্যয় এত অধিক যে, দরিদ্রের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। সুতরাং সমান সুযোগ-সুবিধা পাইলে প্রধানতঃ উপরি-উক্ত কারণগুলির জন্যই মজুরির পার্থক্য থাকিবে।

ভারতে মজুরির হার—Rate of wage in India

ভারতে প্রচলিত মজুরির হার অন্যান্য অনেক দেশের মজুরির হার অপেক্ষা অনেক কম। ভারতে কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় এত বেশী যে, তাহারা অনেক সময় নামমাত্র মজুরিতে কাজ করিতে বাধ্য হয়। সংখ্যাধিক্য ছাড়াও কৃষি-শ্রমিকের কম মজুরির আর একটি কারণ হইল যে, ইহারা কৃষিকার্যের সময় কাজ পায়, অন্য সময় বেকার থাকে। কাজেই ইহাদের বাৎসরিক গড় আয় অতি কম। অধিকাংশ কৃষি-শ্রমিকই অজ্ঞ এবং দক্ষতাহীন। শিল্প-শ্রমিকদের ন্যায় ইহাদের কোন সঙ্ঘ নাই, কাজেই জমির মালিকগণ ইহাদের দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন।

ভারতের শিল্প-শ্রমিকগণ অপেক্ষাকৃত অধিক হারে মজুরি পাইয়া থাকে। ইদানীং শিল্প-শ্রমিকগণ মালিকগণের সহিত দর কষাকষি করিয়া তাহাদের স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য শ্রমিক সঙ্ঘ গঠন করিয়াছে এবং সেই সঙ্ঘগুলি সরকারী অনুমোদন লাভ করিয়াছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে মালিকের সহিত মজুরির হার ও কাজের অন্যান্য শর্তসম্পর্কে আপোষ না হইলে তাহারা মালিককে সময়মত জানাইয়া ধর্মঘট করিতে পারে। এইরূপে শ্রমিক সঙ্ঘের মাধ্যমে সমবেতভাবে তাহারা মজুরির হার বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে।

দেশের সরকারও শ্রমিকগণের স্বার্থরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার শ্রমিক-কল্যাণ আইন প্রবর্তন করিয়াছেন। সরকার আইন পাস করিয়া শ্রমিকগণ যাহাতে ন্যায্য মজুরি ও সর্বনিম্ন মজুরি পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে শ্রমিকগণের মধ্যে মুনাফাভাগের ব্যবস্থাও প্রবর্তন করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু ভারতের শ্রমিকের প্রধান ত্রুটি হইল তাহার দক্ষতার অভাব। শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করিয়া তাহার উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি না করিতে পারিলে স্থায়িভাবে মজুরি-বৃদ্ধি সম্ভব নয়।

ভারতে মজুরির হারের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন হারে মজুরি প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রমিকের স্থানান্তর গমনের অনিচ্ছা, গৃহকাতর প্রকৃতি, বিভিন্নস্থলে দ্রব্যমূল্যের পার্থক্য, সঙ্ঘবদ্ধতার অভাব প্রভৃতি কারণের জন্যই মজুরির পার্থক্য হয়।

সুদ—Interest

সুদের সংজ্ঞা—Definition of Interest

দেনাদার পাওনাদারের নিকট হইতে টাকা বর্জ করিয়া পাওনাদারকে মাসে মাসে বা বৎসরে আসল টাকা ছাড়াও যে অতিরিক্ত টাকা দেয়, তাহাকে সুদ বলে। প্রাচীনকালে সুদ গ্রহণ করা গর্হিত কার্য বলিয়া পরিগণিত হইত। বর্তমানে সুদ লওয়া আর দোষের কাজ বলিয়া গণ্য হয় না। কারণ, পাওনাদার কষ্ট করিয়া অর্থ সঞ্চয় করে এবং সঞ্চিত অর্থের অধিকার সে সাময়িকভাবে দেনাদারকে দেয়। পাওনাদার যে সময়ের জন্য দেনাদারকে টাকা ধার দেয়, সে সময়ের জন্য পাওনাদার আর সে অর্থ নিজে খরচ করিতে পারে না। সুতরাং নগদ অর্থ কাছছাড়া করিবার জন্য সে একটা প্রতিদান আশা করে এবং এই প্রতিদান না পাইলে সে সঞ্চয় করিতে উৎসাহী না হইতে পারে। বর্তমানে দেনাদারও এই ধার করা অর্থ কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি উৎপাদন-কার্যে নিযুক্ত করিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি করে। সুতরাং দেনাদারের পক্ষেও এই অতিরিক্ত উৎপাদন হইতে একটা অংশ সুদ হিসাবে পাওনাদারকে দিতে কষ্ট হয় না। সুতরাং অপরের সঞ্চিত অর্থ ধার করিলে ধার করা টাকার জন্য পাওনাদারকে যে অতিরিক্ত আর্থিক মূল্য দিতে হয়, তাহাই হইল সুদ।

মোট সুদ ও নীট্ সুদ—Gross and Net Interest

টাকা ধার করিলে পাওনাদারকে দেনাদার শতকরা মাসিক বা বার্ষিক হারে যে অতিরিক্ত অর্থ দেয়, সাধারণতঃ তাহাকে সুদ বলে। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে 'সুদ' কথাটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয় এবং এইজন্য অনেক ক্ষেত্রেই দেনাদার পাওনাদারকে যে অতিরিক্ত অর্থ দেয় তাহাকে ধনবিজ্ঞানের অর্থে নিছক সুদ বলা যায় না। কারণ, অনেক সময় টাকা ধার দিলে টাকা ফেরৎ না-পাইবার আশঙ্কা থাকে, আবার টাকা আদায় করিবার জন্য অনেক হাঙ্গামা করিতে হয়। ধার যদি দীর্ঘদিনের জন্য দেওয়া হয়, তাহা হইলে পাওনাদারকে টাকা ফেরৎ পাইতে বেশীদিন অপেক্ষা করিতে হয়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে ধার দেওয়ার ঝুঁকি বেশী, টাকা ফেরৎ পাইবার জন্য হাঙ্গামার সম্ভাবনা থাকে বা দীর্ঘ-মেয়াদী ধার হয়, সে সমস্ত ক্ষেত্রে পাওনাদার তাহার টাকা হাতছাড়া করিবার ক্ষতিপূরণ অর্থাৎ সুদ ছাড়াও দেনাদারের নিকট ঝুঁকি ও হাঙ্গামার জন্য অতিরিক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দাবী করে এবং এই অতিরিক্ত পরিমাণ প্রতিদান না পাইলে সে টাকা ধার দেয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ব্যাঙ্ক যে ধার দেয়, সেজন্য ব্যাঙ্ক কোন ঝুঁকি গ্রহণ করে না। উপযুক্ত জামিন রাখিয়াই ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য টাকা ধার দেয়। সুতরাং টাকা আদায়ের জন্য ব্যাঙ্কের কোন ঝুঁকি বা হাঙ্গামা সহ্য করিতে হয় না। সুতরাং যে সমস্ত ধারে কোন ঝুঁকি বা হাঙ্গামা নাই, সেই সমস্ত ধারের জন্য দেনাদার পাওনাদারকে নির্দিষ্ট হারে যে প্রতিদান দেয় তাহাকে নীট্ সুদ বা খাঁটি সুদ বলা হয়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে ধার দিলে ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা ও হাঙ্গামা বেশী, সে সমস্ত ক্ষেত্রে পাওনাদার খাঁটি সুদ ছাড়াও এই ঝুঁকি ও হাঙ্গামা সহ্য করিবার ক্ষতিপূরণ বাবদ একটা অতিরিক্ত পরিমাণ দাবী করে। নীট্ সুদ ও ক্ষতিপূরণ বাবদ এই অতিরিক্ত অর্থ পরিমাণ লইয়া মোট সুদ গঠিত হয়। মোট সুদের হার নীট্ সুদের হার অপেক্ষা বেশী হয়। আমাদের দেশে মহাজন ও কাবুলিওয়ালার সুদের হার ব্যাঙ্কের হার অপেক্ষা বেশী, কারণ মহাজন ও কাবুলিওয়ালা মোট সুদ আদায় করে, ব্যাঙ্ক নীট্ সুদ আদায় করে।

সুদের হারের তারতম্য—Difference in the rates of Interest

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, কি কারণে একই জায়গায় বিভিন্ন হারে সুদ হয়। ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ধার লইলে শতকরা ৪-৫৲ টাকা

সুদের হারে ধার পাওয়া যায় অথচ কাবুলিওয়ালা এই ঋণের জন্য শতকরা ২৫-৩০৲ টাকা সুদ দাবী করে। সুদের হারের এই পার্থক্যের প্রধান কারণ হইল ঋণ সম্পর্কিত ঝুঁকি ও হাঙ্গামা। কাবুলিওয়ালা বিনাবন্ধকে অপরিচিত লোকজনকে টাকা ধার দেয়। যাহারা কাবুলিওয়ালার নিকট হইতে টাকা ধার লয় তাহারা নিতান্ত অভাবগ্রস্ত এবং ধার শোধ করিবার ক্ষমতাও অনেক ক্ষেত্রে থাকে না। অনেকের কাবুলিওয়ালাকে ফাঁকি দিবার মতলবও থাকে। টাকা আদায় করিতেও কাবুলিওয়ালার অনেক হাঙ্গামা করিতে হয়। সে দশজনকে ধার দিলে তাহার মধ্যে হয়ত দুই-একজনে তাহাকে ফাঁকি দেয়। এককথায় কাবুলিওয়ালা টাকা ধার দিয়া যে পরিমাণ ঝুঁকি, হাঙ্গামা ও অনিশ্চয়তা বহন করে, ব্যাঙ্ক তাহার শতাংশের এক অংশও গ্রহণ করে না। সুতরাং অত্যধিক ঝুঁকি ও হাঙ্গামার জন্য ব্যাঙ্কের সুদ অপেক্ষা কাবুলিওয়ালা ও মহাজনের সুদের হার বেশী হয়।

আবার দেখা যায় ভারত সরকার যে কম হারে সুদ দিয়া টাকা ধার করিতে পারে, গ্রাম্য চাষীরা তত কম সুদে কাহারও নিকট হইতে টাকা ধার পায় না। সরকার শতকরা ৩-৪৲ টাকা হারে সুদের অঙ্গীকারে বহু কোটি টাকা ধার পাইতে পারে, কিন্তু চাষী শতকরা ২০৲ টাকা হারে সুদ দিতে অঙ্গীকার করিলেও তাহার পক্ষে কর্জ পাওয়া কষ্টসাধ্য।

একই কারণে এক্ষেত্রেও সুদের হারের পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সরকার টাকা ধার লইলে আসল টাকা মারা যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই, ইহা সকলেই জানে। সরকারের নিকট হইতে নিয়মিতভাবে সুদ পাওয়া যায়। সুতরাং সরকারকে ধার দিলে আদৌ কোন ঝুঁকি বা হাঙ্গামা নাই বলিয়া সকলেই ধার দিতে প্রস্তুত। আর চাষীর অবস্থা খারাপ। তাহার আয় শুধু কম নয়—ইহা অনিশ্চিতও বটে। মামলা-মোকদ্দমা করিয়া সম্পত্তি ক্রোক না দিয়া এ টাকা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদায় হয় না। কাজেই চাষীকে ধার দিলে এই ধারের ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা ও হাঙ্গামা অত্যধিক বলিয়া লোকে অত্যধিক হারে সুদ দাবী করে। চাষী যদি উপযুক্ত জামিন রাখিয়া ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা ধার করিতে পারিত, তাহা হইলে তাহাকে চড়া সুদ দিতে হইত না।

সুদের হার কিভাবে স্থির হয়—How is the rate of Interest determined?

সুদ হইল অন্যের সঞ্চিত মূলধন ব্যবহার করিবার মূল্য এবং দ্রব্যমূল্যের ন্যায়

সুদও মূলধনের চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে স্থির হয়। লোকে মূলধন প্রয়োগ করিয়া অধিক পরিমাণ উৎপাদন করিতে পারে এবং মূলধনের এই উৎপাদিকা-শক্তির জন্য মূলধনের চাহিদা হয়। আবার কিছু পরিমাণ ঋণ লোকে ভোগ-ব্যবহারের জন্য বা অনুৎপাদক কার্যের জন্য গ্রহণ করে। দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ যেরূপ দ্রব্যটির মূল্যের উপর নির্ভর করে, যে-কোন উদ্দেশ্যে ধার করা হউক না কেন, মূলধনের চাহিদাও সেইরূপ সুদের হারের উপর নির্ভর করে। সুদের হার বেশী হইলে মূলধনের চাহিদা কম হয়, সুদের হার কম হইলে চাহিদা বেশী হয়।

ঋণ-দাতাগণ মূলধন সরবরাহ করে। সরবরাহ-পরিমাণ সঞ্চয়-পরিমাণের উপর নির্ভর করে। দেশের সমগ্র সঞ্চয়-পরিমাণ লোকের সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা ও সঞ্চয় করিবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা আবার লোকের দূরদর্শিতা, পারিবারিক স্নেহ, সঞ্চয়ের সুযোগ, সঞ্চয়ের নিরাপত্তা প্রভৃতি অবস্থার উপর নির্ভর করে। সঞ্চয়-পরিমাণ আবার সুদের হারের উপর নির্ভর করে। সুদের হার বেশী হইলে সাধারণতঃ সঞ্চয়-পরিমাণ বাড়ে, সুদের হার কমিলে সঞ্চয়-পরিমাণ কমে। সুতরাং মূলধনের চাহিদা ও সরবরাহের ভারসাম্যের বিন্দুতে সুদের হার স্থির হয়। একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় যে হারে সুদ হইলে মূলধনের মোট সরবরাহ মোট চাহিদার সমান হয়, সেই হারকে সেই অবস্থার নির্ধারিত সুদের হার বলা হয়। একটি উদাহরণ দ্বারা সুদের হার চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় কিভাবে ঠিক হয় তাহা বুঝান হইল ঃ

মূলধনের চাহিদা-পরিমাণ	সুদের হার	মূলধনের সরবরাহ-পরিমাণ
১ লক্ষ টাকা	৫ টাকা হার	২ লক্ষ টাকা
১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা	৪ „	১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
২ লক্ষ টাকা	৩ „	১ লক্ষ টাকা

উপরে যে উদাহরণটি দেওয়া হইল তাহাতে দেখা যায় যে, সুদের হার যখন ৫৲ টাকা, তখন চাহিদা অপেক্ষা সরবরাহ বেশী। আবার সুদের হার যখন ৩৲ টাকা তখন চাহিদা অপেক্ষা সরবরাহ কম। কিন্তু সুদের হার যখন ৪৲ টাকা, তখন মোট মূলধন সরবরাহের পরিমাণ মোট চাহিদার পরিমাণের সমান। সুতরাং সুদের হার ৪৲ টাকা হইবে।

কেইন্‌সের মতে সুদ সঞ্চয়-পরিমাণ বা মূলধনের উৎপাদন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে না। তাঁহার মতে লোকে কত টাকা ধার দিতে ও লইতে চায় তাহার উপর সুদের হার নির্ভর করে। লোকের নগদ টাকার প্রতি একটা আসক্তি থাকে। কারণ নগদ টাকা হাতে থাকিলে নগদ টাকার মালিক নানা দিক দিয়া অনেক সুবিধা পায়। এই সুবিধাগুলির জন্য সে নগদ টাকা হাত ছাড়া করিতে চায় না। টাকা ধার দিলে টাকা হাত ছাড়া হয় এবং ধার দেওয়া টাকা নিজের হাতে থাকিলে যে সুবিধাগুলি পাওয়া যাইত তাহা আর পাওয়া যায় না। সুতরাং যাহার হাতে টাকা আছে তাহাকে ধার দিবার উদ্দেশ্যে প্রলুব্ধ করিবার জন্য দেনাদারকে অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়। এই অতিরিক্ত টাকাই হইল সুদ।

ভারতের সুদের হার—Rate of Interest in India

ভারতে সঞ্চয়-পরিমাণ খুব কম বলিয়া এখানে মূলধনের সরবরাহ চাহিদার তুলনায় নিতান্ত নগণ্য। মূলধনের স্বল্পতার জন্য আমাদের দেশে সুদের হার যে বেশী হইবে ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। মূলধনের অভাব-হেতুই আমাদের দেশের অধিকাংশ শিল্প-প্রতিষ্ঠান বিদেশী মূলধনের সাহায্যে গঠিত হইয়াছে।

ভারতে প্রচলিত সুদের হারের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, এখানে বিভিন্ন ঋণ-দাতা বিভিন্ন হারে সুদ আদায় করে এবং বিভিন্ন ঋণগ্রহীতা বিভিন্ন হারে সুদ দিতে বাধ্য হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ভারতের পল্লী অঞ্চলে ধার পাইবার সুবিধার একান্ত অভাব। একমাত্র গ্রাম্য মহাজনই প্রায় সমগ্র পরিমাণ মূলধন সরবরাহ করে—তাহার আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই বলিলেও চলে। চাষী ও ছোট ছোট ব্যবসায়ী যাহারা ধার লয়, তাহাদের ধার সময়মত পরিশোধ করিবার সামর্থ্যও নাই। এই সমস্ত লোকজনকে ধার দিলে আদায় করিতে অনেক ঝুঁকি ও হাঙ্গামা বহন করিতে হয়। এই কারণে মহাজনেরা বেশী হারে সুদ আদায় করে। সরকারকে ধার দেওয়ার ক্ষেত্রে সুদের হার খুব কম হয়। কারণ সকলেই সরকারকে ধার দিতে উৎসুক। কাজেই ঋণ-দাতাগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। বিনা কষ্টে নির্ধারিত হারে নিয়মিত সুদ এবং সময়মত আসল টাকা ফেরত পাইবার জন্য সকলেই অল্প সুদে সরকারকে টাকা ধার দেয়। কাজেই সরকার অল্প সুদে টাকা ধার পায় যাহা কৃষকের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নহে।

খাজনা—Rent

খাজনার সংজ্ঞা—Definition of Rent

সাধারণতঃ 'খাজনা' শব্দটি একটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাড়ী, গাড়ী, যন্ত্রপাতি, জমি-জায়গা প্রভৃতি সাময়িকভাবে ব্যবহার করিবার জন্য ইহাদের মালিককে যে মূল্য দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাকেই সাধারণতঃ খাজনা বলা হয়। কিন্তু ধনবিজ্ঞানে 'খাজনা' শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

জমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা হইতে যে আয় হয়, তাহাকে খাজনা বলা হয়। গাড়ী, বাড়ী, কল-কারখানা হইতে যে আয় হয় সাধারণ ভাষায় সেই আয়গুলিকে খাজনা বলা হইলেও সে আয়গুলি প্রকৃত খাজনা নহে। কারণ, খাজনার উৎস হইল জমি, খনি প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পত্তি, আর বাড়ী, গাড়ী প্রভৃতি হইল মনুষ্য-সৃষ্ট দ্রব্য। খাজনা শুধু প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার হইতে পাওয়া যায়। সাধারণ ভাষায় যাহাকে খাজনা বলা হয়, তাহা নিছক খাজনা নহে। ভাড়াটিয়া বাড়ীর মালিককে খাজনা বাবদ যে পরিমাণ অর্থ দেয় তাহা শুধু খাঁটি খাজনা নহে। খাঁটি খাজনা ছাড়াও এই প্রদত্ত অর্থের একটি অংশ জমির মালিক জমিতে গৃহনির্মাণ করিবার জন্য যে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন তাহার সুদ বাবদ ধরিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, জমির উন্নতির জন্য মালিক যে পরিমাণ ব্যয় করিয়াছেন এবং যে ঝুঁকি গ্রহণ করিয়াছেন তাহার মুনাফাও মোট খাজনার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং মোট খাজনা হইতে জমিতে মালিক কর্তৃক নিযুক্ত মূলধনের সুদ ও মালিকের জমি-সম্পর্কিত পরিশ্রম ও ঝুঁকি গ্রহণের মূল্য বাদ দিলে নীট বা খাঁটি খাজনা পাওয়া যায়।

রিকার্ডোর খাজনা-তত্ত্ব—Ricardian Theory of Rent

ইংরাজ ধনবিজ্ঞানী ডেভিড রিকার্ডো খাজনা-তত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা করেন। তাঁহার মতে খাজনা হইল জমির উৎপন্ন পরিমাণের সেই অংশ, যে অংশ জমির আদিম ও অবিনশ্বর ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে দেওয়া হয়। ("Rent is that portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the use of the original and indestructible powers of the soil.")

রিকার্ডোর খাজনা-তত্ত্ব নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা

যাউক, পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুগণ পশ্চিমবঙ্গে স্থানাভাবের কারণে আন্দামান দ্বীপে বসতি স্থাপন আরম্ভ করিল। প্রথম দলে ৫০০ শত উদ্বাস্তু আন্দামান দ্বীপে বসতি স্থাপন করিল এবং চাহিদার তুলনায় আন্দামানে জমি এত বেশী পরিমাণ আছে যে, উদ্বাস্তুগণ নিজেরা যে যাহার খুসীমত বাছিয়া সবচেয়ে ভাল জমি দখল করিয়া চাষবাস আরম্ভ করিল। চাহিদার তুলনায় জমি অফুরন্ত বলিয়া জমি ব্যবহারের জন্য কাহাকেও কোন মূল্য (খাজনা) দিতে হইল না। আন্দামানে উদ্বাস্তুগণ ভালভাবে আছে জানিতে পারিয়া আরও বহু উদ্বাস্তু দলে দলে সেখানে বসতি স্থাপন করিবার ফলে কিছুদিন পরে সেখানকার প্রথম শ্রেণীর সব জমি দখল হইয়া গেল। ইহার পর যে সমস্ত উদ্বাস্তু আন্দামানে গেল তাহারা প্রথম শ্রেণীর জমি না পাইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষবাস আরম্ভ করিল। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি কম উর্বর বলিয়া একই পরিমাণ শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি হইতে প্রথম শ্রেণীর জমি অপেক্ষা কম পরিমাণ ফসল পাওয়া যাইতে লাগিল। জনসংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় ফসলের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার ফলে ফসলের দাম বাড়িয়া গেল। ফসলের দাম বাড়িয়া যাওয়ার ফলে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করিবার জন্য অধিক ব্যয় সংকুলানও হইতে লাগিল। এইরূপে যখন জনসংখ্যা আরও বাড়িল, খাদ্যদ্রব্যের চাহিদাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িল। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি ফুরাইয়া গেলে তৃতীয় শ্রেণীর জমির চাষ আরম্ভ হইল। তৃতীয় শ্রেণীর জমি কম উর্বর বলিয়া একই পরিমাণ মূলধন ও শ্রম প্রয়োগ করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর জমিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি অপেক্ষা কম ফসল পাওয়া গেল। কিন্তু ফসলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য ফসলের মূল্য বাড়িয়া যাওয়ায় তৃতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করিবার খরচও সংকুলান হইল।

এখন ধরা যাউক, প্রথম শ্রেণীর জমিতে ১০৲ টাকা ব্যয় করিয়া ২০/০ মণ ফসল পাওয়া যায়, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি কম উর্বর বলিয়া ১০৲ টাকা ব্যয়ে ১৫/ মণ পাওয়া যায়। তাহা হইলে প্রথম শ্রেণীর মণ প্রতি উৎপাদন-ব্যয় হইল ৫০ পয়সা, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মণ প্রতি উৎপাদন-ব্যয় হইল ৬৫ পয়সা। বাজারে উৎপন্ন ফসলের মূল্য দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির উৎপাদন-খরচ দ্বারা স্থির হইবে, নতুবা দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ হইবে না। সুতরাং একই পরিমাণ ব্যয় করিয়া প্রথম শ্রেণীর জমিতে ৫/ মণ পরিমাণ উদ্বৃত্ত ফসল পাওয়া গেল। এই উদ্বৃত্ত ফসল হইল খরচার অতিরিক্ত আয়। এই অতিরিক্ত আয়কে (Surplus over cost of

production) খাজনা বলা হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করিয়া শুধু উৎপাদন-ব্যয় সংকুলান হয়, কোন উদ্বৃত্ত থাকে না। এইজন্য এই জমিকে প্রান্তিক জমি বলা হয় এবং এই প্রান্তিক জমির কোন খাজনা থাকে না। জনসংখ্যা বাড়িয়া গেলে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা আরও বেশী হয়। তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি ফুরাইয়া গেলে লোকে বাধ্য হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর জমি এবং তৃতীয় শ্রেণীর জমি শেষ হইলে চতুর্থ শ্রেণীর জমি চাষ করিয়া খাদ্যদ্রব্যের বর্ধিত চাহিদা পূরণ করে। যখন তৃতীয় শ্রেণীর জমি একই খরচায় চাষ হয়, তখন তৃতীয় শ্রেণীর উৎপন্নের পরিমাণ দ্বিতীয় অপেক্ষা কম হয়। তৃতীয় শ্রেণীর জমিতে ১০৲ টাকা ব্যয় করিলে ১০/ মণ ফসল পাওয়া যায় এবং মণ প্রতি উৎপাদন-ব্যয় হয় ১৲ টাকা। এরূপ ক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণীর তুলনায় দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি উৎকৃষ্টতর বলিয়া পরিগণিত হয় এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির উদ্বৃত্ত হয় ৫/ মণ এবং এই উদ্বৃত্তই হইল দ্বিতীয় শ্রেণীর খাজনা এবং তৃতীয় শ্রেণীর তুলনায় প্রথম শ্রেণীর উদ্বৃত্ত হয় ১০/ মণ। এরূপে যখন তিন শ্রেণীর জমি চাষ করা হয়, তখন তৃতীয় শ্রেণীর জমিকে প্রান্তিক জমি বলা হয় এবং প্রান্তিক জমির উৎপাদন-ব্যয়ের যে অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর জমি হইতে পাওয়া যায়, ধনবিজ্ঞানে সেই উদ্বৃত্তকেই খাজনা বলা হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, যতই নিকৃষ্ট শ্রেণীর জমি চাষ হইতে থাকে, উৎকৃষ্ট জমির উদ্বৃত্ত পরিমাণ ততই বাড়িতে থাকে এবং উৎকৃষ্ট জমিগুলির খাজনার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

রিকার্ডোর খাজনা-তত্ত্বের সমালোচনা—Criticism of the Ricardian Theory of Rent

রিকার্ডোর খাজনা-তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রথমতঃ বলা যায় যে, তিনি খাজনার কারণ সম্পর্কে জমির যে আদিম ও অবিনশ্বর শক্তির কথা বলিয়াছেন তাহা সত্য নহে। কারণ দীর্ঘদিন ধরিয়া একই জমি চাষ করিলে ইহার উর্বরতা-শক্তি নষ্ট হয়। মানুষ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে চাষবাসের উন্নতি করিয়া জমির উৎপাদিকা-শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করে। সুতরাং জমির নিজস্ব উৎপাদন-ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। কিন্তু এই বিরুদ্ধ সমালোচনাসত্ত্বেও বলা যায় যে, জমির অবস্থানের সুবিধা, রাসায়নিক উপাদান, আবহাওয়া প্রভৃতি প্রকৃতিদত্ত বৈশিষ্ট্য-গুলি ইহার অবিনশ্বর ক্ষমতা বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, রিকার্ডো যে পদ্ধতিতে জমি চাষের কথা বলিয়াছেন, তাহা সর্বত্র

ঠিক নহে। তাঁহার মতে ভাল জমি আগে চাষ হয় এবং ভাল জমি না পাওয়া গেলে পরে খারাপ জমি চাষ হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভাল জমি চাষ হওয়ার আগেই খারাপ জমি চাষ হয়। দূরত্বের জন্য অনেক সময় লোকে বাড়ীর নিকটে অবস্থিত খারাপ জমি চাষ করে। সুতরাং রিকার্ডোর মতবাদ ভ্রান্ত। এই সমালোচনার বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, ভাল জমি বলিতে রিকার্ডো শুধু উর্বর জমির কথা বলেন নাই, ভাল জমি বলিতে তিনি উর্বর ও অবস্থানের দিক দিয়া সুবিধাজনক জমির কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং খাজনা-নির্ধারণে জমির উর্বরতা ও অবস্থানের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন।

খাজনার কারণ—Causes of Rent

জমি প্রকৃতির দান। মানুষ ইহা সৃষ্টি করে নাই। তবে কেন জমির ব্যবহারের মূল্য বাবদ খাজনা দিতে হয় এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে জাগিতে পারে। খাজনা দিবার প্রধান কারণ হইল যে, জমির সরবরাহ নিতান্ত সীমাবদ্ধ এবং সব জমির উর্বরতা-শক্তি ও অবস্থানের সুবিধা সমান নহে। কাজেই চাহিদার তুলনায় ভাল জমির সরবরাহ একান্তরূপে অপ্রচুর। এইজন্যই ফসল উৎপাদন করিবার বা গৃহ-নির্মাণের উদ্দেশ্যে বহুলোক যখন জমি চায়, তখন জমির মালিক তাহাদের নিকট হইতে একটা মূল্য আদায় করিয়া থাকে। এই মূল্যই খাজনা নামে অভিহিত হয়। চাহিদার তুলনায় জমি যদি অফুরন্ত হইত, তাহা হইলে খাজনা দিতে হইত না।

দ্বিতীয়তঃ, আরও একটি কারণে খাজনার উদ্ভব হয়। একই জমি অধিক ব্যয়ে চাষবাস করিলে যদি ক্রমাগত অধিক পরিমাণ ফসল পাওয়া যাইত, তাহা হইলে লোকে শুধু ভাল জমি অধিক ব্যয়ে চাষ করিয়া তাহাদের ফসলের বর্ধিত চাহিদা পূরণ করিতে পারিত। কিন্তু জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধি কার্যকরী হওয়ার ফলে একখণ্ড জমি অধিক ব্যয়ে চাষ করিলেও উৎপন্ন ফসল-বৃদ্ধির হার ক্রমশঃই কমিতে থাকে। ফলে উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া যায়। সুতরাং উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য বাধ্য হইয়াই অন্য জমি চাষ করিতে হয়। নূতন জমি চাষ করিতে গেলে জমির মালিককে জমি-ব্যবহারের মূল্য অর্থাৎ খাজনা দিতে হয়, কারণ জমির পমিমাণ চাহিদা অনুযায়ী বৃদ্ধি করা যায় না।

অর্থনৈতিক খাজনা ও চুক্তিদ্বারা নির্ধারিত খাজনা—Economic Rent and Contract Rent

জমির মালিক তাহার নিজের জমি নিজে চাষ করিয়া খরচ-খরচা বাদ দিয়া যে অতিরিক্ত আয় পায়, তাহাকে অর্থনৈতিক খাজনা বলা হয়। এই খাজনা হইল উৎপাদকের খরচাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত (producer's surplus)। দুই খণ্ড জমির প্রতি খণ্ড ১০৲ টাকা ব্যয়ে চাষ করিলে প্রথম জমিতে ২০/ মণ ও দ্বিতীয় জমিতে ১৫/ ফসল পাওয়া গেলে, প্রথম জমির উদ্বৃত্ত ফসলের পরিমাণ হইল ৫/ মণ। এই ৫/ মণ বা ইহার বাজার মূল্যকে অর্থনৈতিক খাজনা বলা হয়। কিন্তু জমির মালিক যদি নিজে জমি চাষ না করিয়া প্রজাকে ঐ জমি বিলি করে, তাহা হইলে প্রজা ও জমির মালিকের মধ্যে দর কষাকষি হইয়া প্রজা কর্তৃক যে পরিমাণ মূল্য জমির মালিককে প্রদত্ত হয়, তাহাকে চুক্তির দ্বারা নির্ধারিত খাজনা বলা হয়। দ্রব্যমূল্যের ন্যায় জমি-ব্যবহারের এই মূল্যও চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক প্রভাব দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু চুক্তির দ্বারা নির্ধারিত খাজনা-পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থনৈতিক খাজনা-পরিমাণের বেশী হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে প্রজাকে জমির খরচাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত অর্থাৎ অর্থনৈতিক খাজনা অপেক্ষাও অধিক পরিমাণ জমির মালিককে চুক্তির দ্বারা নির্ধারিত খাজনা হিসাবে দিতে হইবে। উপরের উদাহরণ অনুসারে প্রথম শ্রেণীর জমিতে ৫/ মণ উদ্বৃত্ত থাকে। সুতরাং প্রজা কখনই এই ৫/ মণের অধিক খাজনা হিসাবে দিতে পারে না। জমির মালিক চেষ্টা করে যাহাতে সে এই উদ্বৃত্তের সবটাই খাজনা হিসাবে পায় এবং প্রজা চেষ্টা করে যাহাতে সে এই উদ্বৃত্তের বেশী পরিমাণ নিজে উপভোগ করিতে পারে। যদি বেশীসংখ্যক প্রজা কমসংখ্যক জমির মালিকের নিকট হইতে জমি লইবার জন্য প্রতিযোগিতা করে, তাহা হইলে জমির মালিক উদ্বৃত্তের সর্বোচ্চ পরিমাণ খাজনা হিসাবে পাইতে পারে। আবার, প্রজা অপেক্ষা জমির মালিক যদি জমি বিলি করিতে অধিক উদ্গ্রীব হয়, তাহা হইলে জমির উদ্বৃত্ত আয়ের অধিকাংশ প্রজা পাইতে পারে এবং মালিক কম পরিমাণ পায়।

খাজনার সহিত মূল্যের সম্পর্ক—Rent in relation to Price

রিকার্ডোর মতে খাজনা ফসলের দামের উপর নির্ভর করে, ফসলের দাম খাজনা-পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। তাঁহার মতে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যকে

প্রান্তিক জমির উৎপাদন-খরচার সমান হইতে হয়। বাজার মূল্য যদি প্রান্তিক জমির উৎপাদন-খরচার সমান না হয়, তাহা হইলে প্রান্তিক জমির চাষ বন্ধ হয়। ফলে, চাহিদার তুলনায় যোগান হ্রাস পায় এবং দ্রব্যমূল্যও বাড়ে। দ্রব্যমূল্য বাড়িলে পুনরায় প্রান্তিক জমির চাষ সম্ভব হয়। সুতরাং দ্রব্যমূল্য সাধারণতঃ প্রান্তিক জমির উৎপাদন-ব্যয়ের কম হইতে পারে না। প্রান্তিক জমির চাষ করিয়া কোন উদ্বৃত্ত থাকে না, শুধু উৎপাদন-খরচা সংকুলান হয়। উদ্বৃত্ত না থাকার ফলে প্রান্তিক জমির কোন খাজনা হয় না। প্রান্তিক জমির উৎপাদন-খরচার দ্বারা মূল্য স্থির হয়। প্রান্তিক জমির কোন উদ্বৃত্ত নাই, সুতরাং খাজনা নাই। যেহেতু খাজনা (উদ্বৃত্ত) উৎপাদন-খরচার অংশ নহে, সেইহেতু মূল্যেরও অংশ হইতে পারে না। খাজনা উৎকৃষ্ট জমির উদ্বৃত্ত উৎপন্ন হইতে দেওয়া হয়। সুতরাং খাজনা দেওয়া হয় বলিয়া মূল্য বেশী হইতে পারে না। মূল্য বেশী হইলে খরচাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত বেশী হয়। ফলে খাজনাও বাড়ে।

শহরাঞ্চলে গৃহনির্মাণের জমির খাজনা—Urban Site Rent

শহরাঞ্চলে বাড়ী তৈয়ারী করিবার জন্য যে জমির প্রয়োজন হয়, তাহার খাজনা জমির উর্বরতার উপর নির্ভর করে না। গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে জমির অবস্থানের সুবিধা-অসুবিধার ভিত্তিতেই খাজনা স্থির হয়। জমি যে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় সেই উদ্দেশ্যের সহায়ক সুবিধাগুলি বর্তমান থাকিলে সে জমির খাজনা তত বেশী হয়। বাসগৃহের জন্য জমির খাজনা আবাস-স্থলের সুবিধার (যথা, প্রশস্ত রাজপথ, প্রচুর আলো-হাওয়া পাওয়ার সম্ভাবনা, বিদ্যালয়, বাজার, পোস্ট অফিস ও যানবাহন কেন্দ্রের নৈকট্য) উপর নির্ভর করে। এই সুবিধাগুলি যত বেশী হয়, খাজনাও তত বেশী হয়। শিল্প ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলি পরস্পরের নিকটে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হইতে পছন্দ করে। সুতরাং শিল্প ও ব্যবসায়-অঞ্চলে ব্যবসায়ী বেশী ভাড়া দিতে প্রস্তুত থাকে।

জনসংখ্যা-বৃদ্ধি ও কৃষির উন্নতির সহিত খাজনার সম্পর্ক—Rent in relation to Increase of population and Improvement in agriculture

জনসংখ্যা বাড়িলে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা অবশ্যই বাড়ে। খাদ্যদ্রব্যের এই

বর্ধিত চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রথম শ্রেণীর জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ বলিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করিতে হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করিলে এই জমির তুলনায় প্রথম শ্রেণীর জমিতে খরচাতিরিক্ত উদ্‌বৃত্ত থাকে। ফলে প্রথম শ্রেণীর জমিতে খাজনা হয়। এইরূপে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা যতই বৃদ্ধি পায়, খাদ্যদ্রব্যের বর্ধিত চাহিদা মিটাইবার জন্য ততই তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর নিকৃষ্ট জমি চাষ করিতে হয়। নিকৃষ্ট জমি চাষ করা হইলে উৎকৃষ্ট জমিগুলির উদ্‌বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া খাজনার পরিমাণ বাড়ে। অতএব দেখা যায়, জনসংখ্যা বাড়িলে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়ে। খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়িলে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়ে। মূল্য বাড়িলে উদ্‌বৃত্তের পরিমাণ বেশী হইয়া খাজনা বাড়ে।

যদি কৃষিকার্যের উন্নতি হয়, অর্থাৎ জমিতে যদি সেচ-ব্যবস্থা, উৎকৃষ্ট সার ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে বিঘা প্রতি জমিতে উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে ফসলের মূল্য হ্রাস পাইবে এবং ইহার ফলে খারাপ জমি (প্রান্তিক জমি) আর চাষ হইবে না, কারণ এই জমির উৎপাদন-ব্যয় পরিবর্তিত অবস্থায় বাজার মূল্য অপেক্ষা বেশী হইবে। সুতরাং প্রান্তিক জমির চাষ না হইলে খাজনার পরিমাণ কমিবে।

অনুপার্জিত মূল্যবৃদ্ধি—Unearned Increment

সামাজিক অগ্রগতির ফলে শহরাঞ্চলের উপকণ্ঠে জমির মূল্য বৃদ্ধি পায়। রাস্তাঘাট, পার্ক, বৈদ্যুতিক আলো, যানবাহন প্রভৃতি জীবনের নানা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে শহরের উপকণ্ঠে জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া মূল্য বৃদ্ধি পায়। কলিকাতার দক্ষিণে বালিগঞ্জ অঞ্চলে এইরূপ জমির মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। জমির মূল্যবৃদ্ধির জন্য জমির মালিককে কোনপ্রকার পরিশ্রম বা ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় নাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতির জন্যই জমির মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং এই বর্ধিত মূল্যের সমগ্র পরিমাণ জমির মালিক বিনা আয়াসে পান বলিয়া এই আয়কে অনুপার্জিত আয় বলা হয়। অনেকে বলেন যে, এই আয় জমির মালিকের ভোগ করিবার কোন অধিকার নাই। সামাজিক কারণেই যখন জমির মূল্য বৃদ্ধি পায়, তখন সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে সামাজিক হিতের জন্য রাষ্ট্রই হইল এই আয়ের প্রকৃত অধিকারী। সুতরাং রাষ্ট্র কর্তৃক জমির মালিকগণের নিকট হইতে কর ধার্য করিয়া অনুপার্জিত আয় আদায় করা উচিত।

এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্র কর্তৃক অনুপার্জিত আয় আদায় করা সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নয়। কারণ, প্রথম অসুবিধা হইল রাষ্ট্র কাহার নিকট হইতে এই কর আদায় করিবে। রাষ্ট্র যদি জমির বর্তমান মালিকের উপর কর স্থাপন করে তাহা হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্তমান মালিককে পরোক্ষভাবে দুইবার কর দিতে বাধ্য করা হয়। বর্তমান মালিক জমির পূর্বমালিকের নিকট হইতে একবার বেশী দামে জমি কিনিয়াছেন। তাঁহাকে যদি আবার কর দিতে হয়, তাহা হইলে একই জমির জন্য তাঁহাকে দুইবার বেশী দাম দিতে হয়। ইহা যুক্তিসঙ্গত নয়। দ্বিতীয়তঃ, জমির মালিক যে জমির উন্নতিতে কোনপ্রকার সাহায্য করেন নাই, একথা বলাও সত্য নয়। কারণ জমির মালিক জমিতে মূলধন বিনিয়োগ করিয়া কিছু ঝুঁকি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মালিক জমি না কিনিলে জমির চাহিদা বাড়িয়া দাম বাড়িতে পারিত না। সুতরাং জমির বর্ধিত মূল্যের একটা অংশ মালিকের ন্যায্য প্রাপ্য। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্র যদি সামাজিক অগ্রগতির যুক্তি-বলে শহরাঞ্চলে জমির বর্ধিত মূল্য জমির মালিকগণের নিকট হইতে আদায় করে, তাহা হইলে পল্লী-অঞ্চলে সামাজিক অধঃপতনের ফলে জমির মূল্য হ্রাস পাইয়া জমির মালিকগণ যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, রাষ্ট্রের পক্ষে সে ক্ষতিপূরণ করা অবশ্য-কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

ভারতে জমির খাজনা—Rent in India

রিকার্ডোর মত অনুসারে জমির খাজনা জমির চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রভাবে অর্থাৎ প্রজা ও জমির মালিকের মধ্যে প্রতিযোগিতার দ্বারা নির্ধারিত হয়। ভারতে খাজনা-নির্ধারণে এই নীতি প্রযোজ্য হইলেও ভারতে স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য এই নীতির কিছু পরিবর্তন করা আবশ্যক। রিকার্ডোর মতে জনসংখ্যা বাড়িলে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়ে। আর খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়িলে জমির চাহিদা বাড়ে। ফলে খাজনা বৃদ্ধি হয়। ভারতেও এই নীতি প্রযোজ্য। এদেশের জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু চাষের জমি সে তুলনায় বাড়ে নাই। কাজেই প্রজাগণের মধ্যে জমির জন্য তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে খাজনার পরিমাণও ক্রমশঃই বাড়িতেছে।

কিন্তু ভারতে প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হইতে পারে নাই। একমাত্র প্রতিযোগিতার দ্বারা ভারতে খাজনা নির্ধারিত হইবার প্রধান বাধা হইল

দেশের অতি প্রাচীন প্রথা ও সরকার কর্তৃক বিধিবদ্ধ আইন। প্রথমতঃ, ভারতে হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বকাল হইতেই জমির খাজনা প্রথাসম্মতভাবে ধার্য করা হইত। ফলে, পরবর্তী কালেও জমির মালিক এই অতি প্রাচীন প্রথা লঙ্ঘন করিয়া নূতন হারে খাজনা দাবী করিতে দ্বিধাবোধ করে। প্রজাও প্রথাসম্মত খাজনার বেশী দিতে আপত্তি জানায়। ইংরাজ শাসনকালে আইন প্রণয়ন করিয়া শুধু জমির খাজনা নহে, প্রজার স্বত্বও আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। এইজন্য বলা হয় যে, ভারতে জমির খাজনা-পরিমাণ প্রথা (Custom) প্রতিযোগিতা (Competition) ও আইন (Legislation) দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে ভারতে ফসলের মূল্য অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে খাজনার হার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়া জমির চাহিদা বর্তমানে ভারতে এরূপ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, সরকারকে আইন প্রণয়ন করিয়াও জমির খাজনা নিয়ন্ত্রণ করিতে বেগ পাইতে হইতেছে। জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদ হওয়ার ফলে পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়াছে।

মুনাফা—Profit

আধুনিককালে উৎপাদনের একটি প্রধান উপাদান হইল ব্যবস্থাপনা। ব্যবস্থাপনার অর্থ হইল জমি, শ্রম ও মূলধন যথাযথ পরিমাণে একত্রিত করিয়া ব্যবস্থাপক তাঁহার যোগ্যতা অনুসারে দ্রব্য উৎপাদন করেন। জমির খাজনা, মূলধনের সুদ ও শ্রমিকের মজুরি দিয়া উৎপাদনের যে উদ্বৃত্ত মূল্য ব্যবস্থাপকের থাকে, তাহাকে সাধারণতঃ মুনাফা বলা হয়। উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যে পরিমাণ অর্থ হয় তাহা হইতে সমগ্র উৎপাদন-ব্যয় বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই হইল মুনাফা। এই মুনাফাকে মোট মুনাফা (Gross Profit) বলা হয়।

মোট মুনাফা ও খাঁটি মুনাফা—Gross Profit and Net Profit

মোট আয় হইতে মোট ব্যয় বাদ দিয়া সাধারণতঃ মুনাফা হিসাব করা হয়। কিন্তু আয় ও ব্যয়ের এই পার্থক্য খাঁটি বা নীট মুনাফা বলিয়া গণ্য করা যায় না। কারণ, ব্যবস্থাপক যদি অন্যের জমি বা বাড়ী ভাড়া করিতেন এবং নিজস্ব মূলধনের

পরিবর্তে ধার-করা মূলধন ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে জমির খাজনা ও মূলধনের সুদ দিতে হইত এবং সমগ্র আয় হইতে খাজনা ও স্থদ উৎপাদন-ব্যয়ের অংশ হিসাবে বাদ দিতে হইত। ইহা ছাড়া, ব্যবস্থাপকের নিজ পরিচালনা-কার্যের যে পারিশ্রমিক তাহাও উৎপাদন-ব্যয়ের অংশ, কারণ ব্যবস্থাপক অন্য লোকের অধীনে পরিচালক হিসাবে কার্য করিলে যে বেতন পাইতেন তাহাও উৎপাদন-ব্যয়ের অংশ বলিয়া গণ্য হইত। সুতরাং সমগ্র আয় হইতে (ক) খাজনা, (খ) স্থদ ও (গ) ব্যবস্থাপকের সাধারণ পরিচালনা-কার্যের পারিশ্রমিক বাদ দিলে নীট বা খাঁটি মুনাফা পাওয়া যায়। যৌথ মূলধনী কারবারের পরিচালনা কার্যে নিযুক্ত ব্যবস্থাপকের বেতন বাদ দিয়াই যৌথ-মূলধনী কারবারের নীট্ মুনাফা হিসাব করা হয় এবং এই নীট মুনাফাই অংশীদারগণের মধ্যে লভ্যাংশ (Dividend) হিসাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়।

উৎপাদনের আয় হিসাবে মুনাফার সহিত অন্যান্য আয়ের পার্থক্য—Difference between Profit and other Factor-incomes

খাজনা, মজুরি, স্থদ ও মুনাফা হইল যথাক্রমে জমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি উৎপাদনের উপাদানগুলির আয়। উৎপাদনের একটি উপাদানের আয় হইলেও মুনাফার কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলির জন্যই মুনাফা ও অন্যান্য আয়গুলির মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য দেখা যায়।

(ক) প্রথমতঃ, মুনাফা হইল জাতীয় আয়ের অবশিষ্টাংশ (Residual income.)। জমি, শ্রম ও মূলধন প্রভৃতি উপাদানগুলির পারিশ্রমিক দিয়া যে অবশিষ্টাংশ থাকে, ব্যবস্থাপককে তাহাই লইতে হয়। অন্যান্য আয়গুলি, যথা, খাজনা, মজুরি ও সুদ পূর্বচুক্তি অনুযায়ী দিতে হয়—ইহাদের পরিমাণের পরিবর্তন হয় না।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, মুনাফার পরিমাণের কোন স্থিরতা নাই। সচরাচর ইহার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। কিন্তু অন্যান্য আয়ের এরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না।

(গ) সুদ বা মজুরির হার হ্রাস পাইতে পারে, কিন্তু এই আয়গুলি কখনও একেবারে অন্তর্হিত হয় না। কিন্তু মুনাফার পরিবর্তে অনেকক্ষেত্রে লোকসানও হইতে পারে।

(ঘ) ব্যবস্থাপকের কাজের সঙ্গে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত

এবং এই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করিবার ক্ষমতার উপরই ব্যবস্থাপকের মুনাফার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু শ্রমিকের মজুরির মধ্যে এতটা পার্থক্য দেখা যায় না।

নীট বা খাঁটি মুনাফার উপাদান—Elements of Net Profit

ব্যবস্থাপককে বহু রকমের কাজ করিতে হয়। উৎপাদনের প্রথম হইতে শেষ অবধি তিনিই সমস্ত কার্য পরিচালনা করেন। এজন্য তাঁহাকে কঠোর কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়। এই সাধারণ পরিচালনা-কার্যের জন্য তিনি (১) পারিশ্রমিক (Earnings of management) পাইয়া থাকেন। ব্যবস্থাপক উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করেন এবং এই ঝুঁকি বহন করিবার জন্য যে (২) পুরস্কার (Reward for risk-taking) পাইয়া থাকেন, তাহাও নীট মুনাফার একটি উপাদান। একচেটিয়া ব্যবসায়ের মালিক হওয়ার ফলে অথবা অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতার সুবিধা গ্রহণ করিয়া যে (৩) অতিরিক্ত লাভ (Monopoly gains) হয়, তাহাও ব্যবস্থাপকের নীট মুনাফার অন্তর্ভুক্ত হয়। অনেক সময় আবার কোন অদৃষ্টপূর্ব ঘটনার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ব্যবস্থাপক যে (৪) অতিরিক্ত লাভ (Profit due to unforeseen circumstances) করেন, তাহাও তাঁহার নীট মুনাফার-পরিমাণ-বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। যুদ্ধ প্রভৃতি আপৎকালে ব্যবসায়ীর এই জাতীয় লাভের পরিমাণ বেশী হয়। (৫) নূতন আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের ফলে যে অতিরিক্ত মুনাফা (Profit due to Innovation) হয়, তাহাও মুনাফার একটি উপাদান বলিয়া বিবেচিত হয়। পরিচালন-কার্যের ও ঝুঁকি-বহনের জন্য ব্যবস্থাপক যে মুনাফা অর্জন করেন, সাধারণতঃ তাহাকেই স্বাভাবিক লাভ (Normal Profit) বলা হয়। দীর্ঘ-মেয়াদে সকল ব্যবস্থাপকই এই স্বাভাবিক লাভ অর্জন করেন, নতুবা তাঁহারা ব্যবস্থাপনা করিতে পারেন না। সুতরাং স্বাভাবিক লাভকে উৎপাদন-ব্যয়ের একটি অপরিহার্য অংশ বলা যাইতে পারে।

ভারতের ব্যবস্থাপকের মুনাফা—Profit in India

ভারতে বড় বড় শিল্প ও ব্যবসায় নিতান্ত নগণ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র ও মাঝারি বহরে শিল্প ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। কাজেই লাভের পরিমাণ কম। ভারতের ব্যবস্থাপকগণ সাধারণতঃ বেশী ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তাপূর্ণ ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে দ্বিধাবোধ করেন। বিদেশী প্রতিযোগিতার জন্য নূতন আবিষ্কার ও

উদ্ভাবনের ক্ষেত্রও খুব কম। যুদ্ধ প্রভৃতি অদৃষ্টপূর্ব কারণেও প্রতিযোগিতার অভাবে অনেক সময় ভারতের ব্যবস্থাপকগণ অতিরিক্ত মুনাফা আয় করিবার সুযোগ পান। সাধারণভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে, ভারতের ব্যবস্থাপকগণের মুনাফা-পরিমাণ সাধারণতঃ পরিচালনা-কার্যের পারিশ্রমিক ও ব্যবসায়ের স্বাভাবিক ঝুঁকি-গ্রহণের পুরস্কার লইয়া গঠিত হয়। তবে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের লোক ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ কাজে লিপ্ত হইতেছে। তাহাদের ব্যবস্থাপনা-নৈপুণ্যও বৃদ্ধি পাইতেছে। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে ভারতেও প্রথম শ্রেণীর ব্যবস্থাপকের আবির্ভাব হইবে।

যৌথ প্রতিযোগিতা ও শ্রমিক সঙ্ঘ—Colloctive Bargaining and Trade Union

যৌথ প্রতিযোগিতা—Collective Bargaining

উৎপাদনের উপাদান হিসাবে শ্রমের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য শ্রমিক মালিকের সহিত সমান প্রতিযোগিতা করিতে অসমর্থ। শ্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা শ্রমিক হইতে অবিচ্ছেদ্য (inseparable from labour)। শ্রমিক নিজে ছাড়া অন্য কেহ ইহা দিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিককে নিজে উপস্থিত থাকিয়া তাহার শ্রম বিক্রয় করিতে হইবে (must personally deliver his goods)। সুতরাং অসুস্থ হইলে বা অন্য কাজে নিযুক্ত থাকিলে সে পরিশ্রম করিতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য দ্রব্য নিজে বিক্রয় করিতে না পারিলেও অন্যের সাহায্যে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ মূল্য পাওয়া যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ, শ্রম একটি অতি পচনশীল দ্রব্য (an extremely perishable commodity)। শ্রমিক যদি একদিন কোন কারণে কাজ করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার সেদিনকার শ্রম নষ্ট হইয়া যায়। অন্য কোন দিন কাজ করিয়া সে আর গতদিনের শ্রমের মজুরি পাইতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য দ্রব্য একদিন বিক্রয় না করিয়াও অন্যদিন বিক্রয় করিয়া দ্রব্যের মূল্য পাওয়া যাইতে পারে। চতুর্থতঃ, শ্রমিক কাজ করে কিন্তু কাজ করিলে তাহার কর্মশক্তি নষ্ট হয় না। পুনরায় কাজ করিবার ক্ষমতা তাহার আয়ত্তে থাকে (sells his labour but retains the property in himself)। অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় একবার বিক্রয় করিলেও তাহার শ্রম বিক্রয় করিবার ক্ষমতা একেবারে নিঃশেষিত হয় না।

পঞ্চমতঃ, শ্রমিকের কোন মজুত তহবিল নাই (has no reserve fund)। সুতরাং কাজ না করিলে সে খাইতে পায় না। মজুত তহবিলের অভাবে অনেক সময় বাধ্য হইয়া তাহাকে কম মজুরিতে কাজ করিতে হয়। মালিকের মজুত তহবিল আছে, কাজেই শ্রমিক নিয়োগ না করিয়া সে কিছুদিন উৎপাদন-কার্য বন্ধ রাখিয়া শ্রমিকের সহিত দর কষাকষি করিতে পারে। কিন্তু শ্রমিকের সে সুবিধা নাই। কাজ বন্ধ হইলে তাহার শ্রম নষ্ট হইবে। সে মজুরি পাইবে না এবং তাহার ব্যাঙ্কে গচ্ছিত কোন মজুত অর্থ নাই বলিয়া পরিবারসহ তাহাকে অনশনে দিন কাটাইতে হইবে। এই কারণে এককভাবে শ্রমিক মালিকের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না এবং শ্রমিকের এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ লইয়া মালিক তাহাকে তাহার প্রাপ্য ন্যায্য মজুরি অপেক্ষা কম মজুরি দিয়া থাকে।

শ্রমিকের এককভাবে এই প্রতিযোগিতা করিবার অসামর্থ্য দূর করিবার জন্য শ্রমিকগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে মালিকের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার উদ্দেশ্যে শ্রমিক সঙ্ঘ গঠন করে।

শ্রমিক সঙ্ঘ—Trade Union

কার্যের পূর্বস্থিত অবস্থা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে অথবা পূর্বস্থিত অবস্থার উন্নতি-সাধনের উদ্দেশ্যে গঠিত শ্রমিকগণের অবিচ্ছিন্ন সমিতিকে শ্রমিক সঙ্ঘ বলা হয়। "A trade union is a continuous colleetion of wage-earners for the purpose of maintaining or improving the conditions of employment." —(Henry and Beatrice Webb)

ব্যক্তিগতভাবে কোন শ্রমিকই মালিকের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। তাই তাহারা সমবেতভাবে মালিকের সহিত প্রতিযোগিতা করে। সুতরাং শ্রমিক সঙ্ঘের মূলনীতি হইল "একতাই বল"। শ্রমিক সঙ্ঘের একজন কর্মকর্তা থাকে। এই কর্মকর্তা শ্রমিকগণের প্রতিনিধি হিসাবে মালিকের সহিত শ্রমিক-সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা পরিচালনা করিয়া কাজের শর্তাদি স্থির করে।

শ্রমিক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য—Aims and Objects of Trade Unions

(ক) কোন নির্দিষ্ট শিল্প বা ব্যবসায় সবচেয়ে বেশী যে পরিমাণ মজুরি দিতে সমর্থ, শ্রমিকগণের জন্য সেই সবচেয়ে বেশী পরিমাণ মজুরি স্থির করা ;

(খ) শ্রমিকগণের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অবসর-যাপনের জন্য কার্যের সময়ের দীর্ঘতা হ্রাস করা।

(গ) কর্মস্থলের পরিবেশ স্বাস্থ্যকর, চিত্তাকর্ষক ও মনোরম করা;

(ঘ) মালিক যাহাতে ব্যক্তি-বিশেষ শ্রমিকের উপর অন্যায় না করিতে পারে অথবা তাহার খুশীমত শ্রমিককে বরখাস্ত করিতে না পারে, শ্রমিক সঙ্ঘের সে বিষয়ে অত্যধিক সচেতন থাকা;

(ঙ) কার্যের স্থায়িত্ব বলবৎ করা।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, শ্রমিক সঙ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্য হইল তাহাদের অর্থ নৈতিক অবস্থার উন্নতি করিয়া জীবনযাত্রার মান উন্নয়নপূর্বক যাহাতে তাহারা মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে পারে তজ্জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা।

শ্রমিক সঙ্ঘের কার্যক্রম—Trade Union activities

শ্রমিক সঙ্ঘ ইহার উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তিন প্রকারের কাজ করিয়া থাকে:

১। শ্রমিক-কল্যাণমূলক কার্য—Ministrant or Fraternal activities

প্রথমতঃ, শ্রমিক সঙ্ঘ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাহাদের সমস্যা সমাধানের জন্য সচেষ্ট হয়। বৃদ্ধ বয়সে, অসুস্থ বা বেকার অবস্থায় অথবা আকস্মিক বিপদকালে যাহাতে তাহাদের দুর্দশা না হয়, সেজন্য তাহারা সমবেতভাবে বিভিন্ন শ্রমিককে সাহায্য করে। এই উদ্দেশ্যে চাঁদা তুলিয়া তাহারা তহবিল সৃষ্টি করে। এই ব্যবস্থা তাহাদের আত্মনির্ভরশীলতা ও একাত্মবোধের পরিচায়ক। মালিকের সহিত তাহারা সম্ভবমত শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাহাদের কাজের শর্তাদি আলোচনা করে। ইহা ছাড়া, যাহাতে শ্রমিকগণ কর্তব্যপরায়ণ ও নিয়মানুবর্তী হইয়া দক্ষতা অর্জন করিতে পারে, সেজন্য শ্রমিক সঙ্ঘ সভাসমিতি ও পুস্তিকা-প্রকাশের মাধ্যমে শ্রমিকগণকে ঠিকপথে চালিত করে।

২। বিবাদমূলক কার্য—Militant activities

শান্তিপূর্ণ উপায়ে যদি তাহাদের উদ্দেশ্যসাধন না হয়, তাহা হইলে শ্রমিক সঙ্ঘ সংগ্রামের মনোভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। মালিককে তাহাদের শর্তে স্বীকৃত হইতে বাধ্য করিবার জন্য তাহারা কর্মে বিরতি বা ধর্মঘট (Strike) করে। শ্রমিকগণের ধর্মঘট করিবার অধিকার থাকিলেও পরিবহন, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ

প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানক্ষেত্রে এই অধিকার অবাধভাবে প্রয়োগ করা সমীচীন নহে।

৩। রাজনৈতিক কার্য—Political activities

শ্রমিক সঙ্ঘকে ইহার সমস্যাগুলি চূড়ান্তভাবে সমাধান করিবার উদ্দেশ্যে অনেক সময় রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইতে হয়। শ্রমিক সঙ্ঘ রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করে। উদ্দেশ্য হইল যে, যদি তাহারা নির্বাচনে জয়ী হইতে পারে, তাহা হইলে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা দখল করিয়া শ্রমিক-সম্পর্কিত সকল সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হইবে। ইংলণ্ডের শ্রমিকদলের, রুশিয়ার সাম্যবাদীদলের অভ্যুত্থানের গোড়াপত্তনের ইতিহাসে শ্রমিক সঙ্ঘের প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়।

মজুরির উপর শ্রমিক সঙ্ঘের প্রভাব—Influence of Trade Union on Wages

প্রশ্ন হইল শ্রমিক সঙ্ঘ কি মজুরি বৃদ্ধি করিতে পারে? সাধারণতঃ দেখা যায় যে, মালিকগণ শ্রমিকদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া সব সময়ে তাহাদের ন্যায্য মজুরি দেয় না। ১। শ্রমিকের মজুরি যদি প্রান্তিক উৎপাদন পরিমাণের কম হয়, তাহা হইলে শ্রমিক সঙ্ঘগুলি শ্রমিকের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া মালিককে শ্রমিকের প্রান্তিক দানের সমান মজুরি দিতে বাধ্য করিতে পারে। ২। কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করিয়াও জীবনযাত্রার মান উন্নত করিয়া শ্রমিক সঙ্ঘগুলি শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধিতে সাহায্য করিতে পারে। শ্রমিকের কর্মদক্ষতা যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে উৎপাদনে তাহার প্রান্তিক দান বৃদ্ধি পায় এবং ফলে তাহার মজুরি বৃদ্ধি পায়। ৩। যে শ্রেণীর শ্রমিকের কাজ উৎপাদনে অপরিহার্য, সে শ্রেণীর শ্রমিকের মজুরি বেশী দিতেই হইবে। ৪। শ্রমিকের মজুরি যদি কোন দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের সামান্য অংশ হয়, তাহা হইলে মজুরি বেশী হইতে পারে। কারণ, মজুরি একটু বাড়িলে উৎপাদন ব্যয়ের বিশেষ তারতম্য হয় না। সুতরাং মালিক শ্রমিকদের সহিত অসদ্ভাব এড়াইবার উদ্দেশ্যে কিছু মজুরি বেশী দিতে পারে।

ভারতে শ্রমিক আন্দোলন—Trade Union movement in India

ভারতে পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতে বিরাট বহরের শিল্পপ্রতিষ্ঠান অতি আধুনিক-কালেই গঠিত হইয়াছে। সুতরাং ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস প্রাচীন

নহে। ১৮৯০ সালে বোম্বাই প্রদেশে সর্বপ্রথম শিল্পশ্রমিক সঙ্ঘ গঠিত হইলেও প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৮ সাল হইতেই ভারতে প্রকৃত শ্রমিক আন্দোলন স্থরু হয় বলা যাইতে পারে। এই সময় দ্রব্যমূল্য অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শ্রমিকগণের চরম দুর্দশা হয় এবং তাহাদের এই অবস্থার উন্নতির উদ্দেশ্যে তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে থাকে। এই সময়ে কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে অসংবদ্ধভাবে কয়েকটি শ্রমিক সঙ্ঘ গঠিত হয়। কিন্তু এই সঙ্ঘগুলি ধর্মঘট করা ব্যতীত অন্য কোন শ্রমিক-কল্যাণমূলক কার্যে অগ্রণী হয় নাই। এই সময়ে অবশ্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মহাসভা শ্রমিক সঙ্ঘগুলিকে সুসংবদ্ধ হইতে সাহায্য করে এবং কংগ্রেসের অনুপ্রেরণায় শ্রমিক সঙ্ঘগুলি শক্তিশালী হইয়া উঠে। ১৯২৬ সালে তদানীন্তন ভারত সরকার একটি নূতন আইন পাস করিয়া শ্রমিক সঙ্ঘগুলিকে আইনানুমোদিত প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকৃতিদানের ব্যবস্থা করেন। ১৯৪৭ সালে পূর্বের আইনটি সংশোধন করিয়া শ্রমিক সঙ্ঘগুলিকে সরকারী অনুমোদন লাভ করিবার জন্য বাধ্য করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে ভারতে শ্রমিক সঙ্ঘগুলি শক্তিশালী হইয়া তাহাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হইয়াছে। ১৯৫৩ সালে ভারত সরকার যে শিল্প-বিরোধ সংশোধন আইন পাস করিয়াছেন, তাহাতে শ্রমিক-মালিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের ব্যবস্থা হইয়াছে। শিল্প-বিরোধ মিটাইবার উদ্দেশ্যে আপোষ-কর্মচারী (Conciliation officer) নিযুক্ত হইয়াছে। শ্রমিকগণের ধর্মঘট করিবার অধিকারও সঙ্কুচিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রমিকগণকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছাঁটাই করিয়া দিলে ক্ষতিপূরণ দিবারও ব্যবস্থা হইয়াছে।

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ত্রুটি—Defects of the Trade Union Movement in India

নানাকারণে ভারতের শ্রমিক আন্দোলন অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক অনগ্রসর রহিয়াছে। বাহিরের বাধা অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাই ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান অন্তরায়।

প্রথমতঃ, ভারতে শিল্পশ্রমিক বলিয়া কোন স্থায়ী শ্রমিকশ্রেণী নাই বলিলেও চলে। অধিকাংশ শিল্পশ্রমিকই কৃষিকার্যের অবসরে গ্রাম হইতে সাময়িক কালের জন্য শহরে আসে এবং কিছু আয় করিতে পারিলেই আবার গ্রামে ফিরিয়া যায়।

তাহাদের শ্রমজীবী-বৃত্তিতে প্রায়ই কোন আসক্তি দেখা যায় না। কাজেই স্থায়ী পেশাগত শ্রমিকের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। এই কারণে তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকগণ নিরক্ষর ও অদৃষ্টবাদী। এজন্য তাহাদের মধ্যে স্বাবলম্বী হইয়া নিজেদের চেষ্টায় অবস্থার উন্নতি করিবার অনুপ্রেরণার একান্ত অভাব। আত্ম-প্রত্যয়ের অভাবে তাহারা ভীরু ও অলস প্রকৃতির হয়।

তৃতীয়তঃ, জাতিগত, ধর্মগত ও ভাষাগত বিভেদের জন্য ভারতীয় শ্রমিকগণ একতাবদ্ধ হইতে পারে না। বোম্বাই রাজ্যের শ্রমিক ও পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকের মধ্যে ভাষার পার্থক্য একমাত্র ব্যবধান নহে, খাদ্য, বস্ত্র ও আচার-ব্যবহারেও তাহারা সম্পূর্ণ পৃথক। সুতরাং অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সহজ নয়।

চতুর্থতঃ, ভারতের শ্রমিকগণের মজুরি এত স্বল্প যে, তাহাদের পক্ষে সঙ্ঘে দেয় চাঁদা নিয়মিতভাবে দেওয়া কষ্টকর। তাহারা রোগ, শোক ও আর্থিক কষ্টে এত জর্জরিত থাকে যে, সঙ্ঘের কাজে যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহী হইতে পারে না।

পঞ্চমতঃ, ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের আর একটি প্রধান দুর্বলতা হইল যে, শ্রমিক সঙ্ঘের নেতৃত্ব সাধারণতঃ শ্রমিকশ্রেণী-বহির্ভূত পেশাদার রাজনৈতিক কর্মীর হাতে থাকে। শ্রমিকগণের অজ্ঞতা ও দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ লইয়া এই সমস্ত নেতা অনেক সময় শ্রমিকের স্বার্থ-সংরক্ষণে অবহেলা করেন।

প্রতিকার—Remedies

ভারতের শ্রমিক আন্দোলন সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে প্রথম ও প্রধান কাজ হইল শ্রমিকগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষার প্রসার। শিক্ষা পাইলে শ্রমিকগণ তাহাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে আত্মসচেতন হইয়া অধিকতর স্বাবলম্বী হইতে পারিবে। শ্রমিক সঙ্ঘ পরিচালনা করিবার জন্য বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন। শ্রমিক সঙ্ঘগুলির নেতৃগণ যাহাতে শ্রমিকগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হন তাহার ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন। এইজন্যই সাধারণ শিক্ষা ও শ্রমিক সঙ্ঘ-সংক্রান্ত শিক্ষা দ্রুত বিস্তার করা দরকার। শ্রমিকগণের যাহাতে তাহাদের কর্তব্যে আসক্তি জন্মে, সেজন্য মালিকেরও উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। শ্রমিকগণের জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক, অবসর-বিনোদনের জন্য স্বাস্থ্য

সহায়ক আমোদ-প্রমোদ ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ব্যবস্থা করিতে পারিলে শ্রমিক-মালিক বিরোধ ঘটিবার কারণ দূর হইবে। শ্রমিক ও মালিকের স্বার্থ যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে এই ধারণা যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে দেশের সরকার অনেক সাহায্য করিতে পারেন। শ্রমিক ও মালিকের উপর সরকারী বিধিনিষেধগুলি শিথিল করাও আবশ্যক।

জাতীয় আয়

National Income

আয়—Income

জাতীয় আয় আলোচনা করিবার পূর্বে 'আয়' কাহাকে বলে তাহা জানা দরকার। শিশু, বৃদ্ধ, অক্ষম বা অকর্মণ্য ব্যতীত আর সকলেই প্রায় কিছু-না-কিছু আয় করে। চাষী, দিন-মজুর, কুটিরশিল্পী, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, সরকারী বা বে-সরকারী চাকুরীয়া সকলেই নানাবিধ কাজে নিযুক্ত থাকে। কাজের প্রতিদানস্বরূপ প্রত্যেকে সাপ্তাহিক বা মাসিক যে পরিমাণ অর্থ পায়, তাহাই হইল প্রত্যেকের আয়। অর্থের দ্বারাই আয়ের পরিমাণ স্থির করা হয়। চাষী বা কুটিরশিল্পী যে দ্রব্যাদি উৎপাদন করে, তাহা বাজারে বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পায় তাহাই হইল তাহার আয়। এইরূপে প্রত্যেক ব্যক্তিই যাহা উপার্জন করে, তাহাই হইল তাহার আয়। একজন লোক এইরূপে মাসে বা বৎসরে যে পরিমাণ আয় করে, তাহাই হইল তাহার মাসিক বা বাৎসরিক আয়। একই পরিবারের যদি তিনজনে আয় করে, তাহা হইলে এই তিনজনের আয়সমষ্টিকে পারিবারিক আয় (Family income) বলা হয়।

এখন প্রশ্ন হইল যে, এই আয়ের প্রয়োজন বা গুরুত্ব কি ? আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি যে, প্রতিবেশীর মধ্যে অমুকের অবস্থা বেশ ভাল, সে সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে ; আর অমুকের অবস্থা খুব খারাপ, তার দিন চলা ভার। এই স্বচ্ছলতা ও দৈন্যের মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, যার আয় বেশী তার অবস্থা ভাল, আর যার আয় কম তার অবস্থা খারাপ। ভালভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মানুষের অনেক কিছুরই প্রয়োজন হয়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসগৃহ ছাড়াও মানুষের স্বাস্থ্য-রক্ষা, শিক্ষা-দীক্ষা, ভ্রমণ, আমোদ-প্রমোদ, দুর্দিনের জন্য

সঞ্চয় প্রভৃতি নানা বাবদ ব্যয়ের প্রয়োজন। যথেষ্ট পরিমাণে আয় করিতে না পারিলে ব্যয় সঙ্কুলান হয় না। কাজেই স্বল্পআয়ের লোকের সব অভাব মিটিতে পারে না। সুতরাং দেখা যায় যে, আয়ের উপরই লোকের জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে।

আর্থিক আয় ও প্রকৃত আয়—Money Income and Real Income

ব্যক্তি তাহার কাজের জন্য যে পরিমাণ অর্থ মজুরি পায় তাহাকে আর্থিক আয় বলা হয়। কিন্তু অর্থ ছাড়া সে কাজের জন্য অন্যান্য যে সমস্ত সুখ-সুবিধা পায় বা অর্থ দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্য বা কাজ ক্রয় করিতে পারে তাহার উপর তাহার প্রকৃত আয় নির্ভর করে। সুতরাং দ্রব্যমূল্য ও কাজের অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুখ-সুবিধার উপরই প্রকৃত আয় নির্ভর করে।

ব্যক্তিগত আয়ের উপর ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে, সুতরাং ব্যক্তিগত আয় সঠিকভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত আয় নির্ধারণ করিবার কালে ব্যক্তি তাহার কাজের বাবদ যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে শুধু তাহা গণনা করিলে চলিবে না, অন্য নানাভাবে সে যে আয় করে অথবা তাহার কাজের জন্য যে আনুষঙ্গিক সুবিধা পায় তাহার অর্থমূল্যও ধরিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একজন রেলকর্মী মাসিক ২০০৲ টাকা বেতন পায়, তিন কামরাযুক্ত বাড়ী বিনা-ভাড়ায় পায় ও বৎসরে দুবার বিনা মাশুলে পরিবারসহ রেলভ্রমণ করিতে পারে। এই রেলকর্মীর মাসিক বা বাৎসরিক আয় পরিমাণকালে শুধু মাত্র তাহার বেতন-পরিমাণ ধরিলে চলিবে না। বেতনের সহিত চল্‌তি হারে বাড়ীভাড়া যোগ দিলে তাহার আয়ের সঠিক পরিমাণ জানা সম্ভব। বিনা ভাড়ায় বাড়ী না পাইলে তাহাকে হয়ত ৯০৲ টাকা বাড়ীভাড়া বাবদ দিতে হইত। বর্তমানে বাড়ীভাড়া দিতে হয় না বলিয়া তাহার সমগ্র আয় হইল ২০০৲ (বেতন) + ৯০৲ (বিনা ভাড়ায় বাড়ী) = ২৯০৲ টাকা। অনেক সময় আবার আয় করিতে কিছু ব্যয় হয়। সমগ্র আয় হইতে এই আবশ্যকীয় ব্যয় বাদ দিলে ব্যক্তির নীট্ আয় পাওয়া যায়। সু-চিকিৎসকের রোগী দেখিবার জন্য মোটর গাড়ীর প্রয়োজন হয়। মোটর গাড়ী রাখিবার জন্য চালকের বেতন, পেট্রোল খরচ ও অন্য আনুষঙ্গিক ব্যয় আছে। চিকিৎসকের মোট মাসিক আয় হইতে এই ব্যয় বাদ দিলে তাঁহার নীট্ আয় পাওয়া যায়।

ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান ব্যক্তিগত আয়ের উপর নির্ভর করে ইহা সত্য। কিন্তু আয়পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই যে জীবনযাত্রার মান উচ্চ হইবে, ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। মানুষের জীবনযাত্রার মান অভাব মিটাইবার সামগ্রী অর্থাৎ ভোগ-ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির পরিমাণের উপর নির্ভর করে, অর্থ-পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। আর্থিক আয় দ্বিগুণ বাড়িতে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য যদি চতুর্গুণ হয় তাহা হইলে আয়-বৃদ্ধি সত্ত্বেও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায় না, অধিকন্তু লোকের কষ্ট হয়। বর্তমানে আমাদের ভারতেও এই অবস্থা ঘটিয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে লোকের যে আয় ছিল তাহা অপেক্ষা আয় দুই-তিন গুণ বৃদ্ধি পাইলেও বাড়ীভাড়া, চাউল, তৈল, চিনি, কাপড় প্রভৃতি নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির এরূপ অগ্নিমূল্য হইয়াছে যে, লোকের দুরবস্থা লাঘব হওয়া দূরের কথা, ইহা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং অর্থের ক্রয়ক্ষমতা অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে কি পরিমাণ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় তাহার উপরই লোকের জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে।

জাতীয় আয়—National Income

ব্যক্তির অর্থনৈতিক অবস্থা যেরূপ তাহার ব্যক্তিগত আয়ের উপর নির্ভর করে, একটি জাতির অর্থনৈতিক অবস্থাও তদ্রূপ জাতীয় আয়ের উপর নির্ভর করে। এখন দেখা যাউক জাতীয় আয় কাহাকে বলে। একটি দেশের লোক বৎসরব্যাপী পরিশ্রম করিয়া কৃষি, খনি, শিল্প, ব্যবসায়, পরিবহন ও যোগাযোগ প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে যে পরিমাণ দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদন করে এবং শিক্ষক, চিকিৎসক, আইন-জীবী, বিচারক, গায়ক প্রভৃতি শ্রেণীর লোক যে পরিমাণ সেবামূলক কার্য সৃষ্টি করে—এই উভয়ের সমষ্টিকে সেই বৎসরের মোট জাতীয় উৎপাদন-পরিমাণ (Gross National product বা G. N. P.) বলা হয়। অধ্যাপক মার্শালের মতে একটি দেশের শ্রম ও মূলধন প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রযুক্ত হইয়া নানাবিধ সেবামূলক কার্যসমেত বাৎসরিক যে দ্রব্যসমষ্টি উৎপাদন করে তাহাই হইল জাতীয় উৎপাদন-পরিমাণ। ভূমি, মূলধন, শ্রম ও ব্যবস্থাপনা হইল সর্বপ্রকার উৎপাদনের অপরিহার্য উপাদান এবং ইহাদের যুক্ত প্রচেষ্টায় দেশের যাবতীয় সম্পদ উৎপাদিত হয়। এই জাতীয় মোট উৎপাদন-পরিমাণের অর্থমূল্যকে মোট জাতীয় আয় বলা হয়।

নীট্‌ জাতীয় আয়—Net National Income

মোট জাতীয় আয় হইতে আবশ্যকীয় খরচ অর্থাৎ যন্ত্রপাতি প্রভৃতি স্থায়ী মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি-পূরণ, কাঁচামাল প্রভৃতি চলতি মূলধন-সংগ্রহের খরচ বাদ দিলে নীট্‌ জাতীয় আয় পাওয়া যায়। কৃষক বৎসরে যে পরিমাণ ধান উৎপাদন করে তাহা হইতে পর বৎসরের জন্য তাহাকে বীজধান রাখিতে হয়। সুতরাং সমগ্র উৎপন্ন ধান্য-পরিমাণের মূল্য হইতে যে পরিমাণ বীজধান রাখিতে হয় তাহার মূল্য বাদ দিলে কৃষকের কৃষিকার্য হইতে নীট্‌ আয় পাওয়া যায়। শিল্প-কারখানার ক্ষেত্রেও এইরূপে যন্ত্রপাতি-মেরামতের খরচ বা পুরাতনের পরিবর্তে নূতন যন্ত্রপাতি কিনিবার খরচ বাৎসরিক মোট আয় হইতে একটা নির্দিষ্ট হারে বাদ দিয়া নীট্‌ আয় গণনা করা হয়।

জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণের গুরুত্ব—Importance of National Income Analysis

আধুনিককালে সকল দেশেই জাতীয় আয়ের আলোচনা হইতেছে এবং দেশের জাতীয় আয় নির্ধারণ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। জাতীয় আয় হইতে দেশের লোকের সম্বৎসরের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার ফল সম্বন্ধে একটা ধারণা করা হয় এবং বর্তমান জাতীয় আয়-পরিমাণের ভিত্তিতেই ভবিষ্যতে উন্নতির পরিকল্পনা করা হয়। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন উৎস হইতে জাতীয় আয়ের কি পরিমাণ পাওয়া যাইতেছে এবং কোন উৎসটির অধিকতর সু-ব্যবহার হইলে জাতীয় আয় আরও বৃদ্ধি পাইতে পারে তাহা জাতীয় আয় বিশ্লেষণ করিলে জানিতে পারা যায়। দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে জাতীয় আয় কিভাবে বন্টিত হইতেছে এবং বন্টন-ব্যবস্থার ত্রুটিও এই বিশ্লেষণ হইতে জানা সম্ভব; জাতীয় আয়ের নিয়মিত হিসাব ব্যতীত পরিকল্পনার সাহায্যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব হয় না। এইজন্যই আধুনিক রাষ্ট্রে জাতীয় আয় সম্পর্কিত তথ্যগুলি আহরণ করিবার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতি—How to measure National Income

১। উৎপাদন সুমারী পদ্ধতি—Census of Production Method

জাতীয় আয় তিনটি পদ্ধতি অনুসারে পরিমাপ করা হয়। প্রথম পদ্ধতি

অনুসারে দেশের সমগ্র উৎপাদন-পরিমাণের সমষ্টির মূল্য যোগ দিলে, জাতীয় আয়ের পরিমাণ জানা যায়। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য-জাত দ্রব্যের মূল্য ও অন্য নানাজাতীয় সেবামূলক কার্যের মূল্য যোগ দিয়া জাতীয় আয় পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিকে দ্রব্যসমষ্টির পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতিতে দেশের সমগ্র উৎপাদন পরিমাণের অর্থমূল্য নির্ধারণ করিবার কালে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। প্রথমতঃ, মূল্যনির্ধারণ কালে একই দ্রব্যের মূল্য যাহাতে একাধিকবার জাতীয় আয়ে গণনা না-করা হয়, সে বিষয়ে সচেতন থাকা দরকার। একটি ব্যবহারযোগ্য গৃহের মূল্য নির্ধারিত হইলে, সেই গৃহ-নির্মাণের জন্য যে উপকরণাদি সংগ্রহ করিতে হয়, পৃথক্‌ভাবে আর সেই সকল উপকরণাদির মূল্য গণনা করিতে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় আয় পরিমাপকালে বিদেশ হইতে প্রাপ্ত আয় যোগ অথবা ঋণ-পরিশোধ বিয়োগ করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, স্থায়ী মূলধনের অপচয়-পূরণের খরচ বাদ দিতে হইবে।

২। আয় সুমারী পদ্ধতি—Census of Income Method

দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে দেশের বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত কর্মিসমূহের আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হয়। এইজন্য সরকারী, আধা-সরকারী ও বে-সরকারী কর্মপ্রতিষ্ঠানসমূহে যাহারা কাজ করে, তাহাদের সমগ্র আয়ের পরিমাণ সংগ্রহ করিতে হয়। জমির মালিক বা খনির মালিক যে খাজনা বা নূতন আবিষ্কারের লাভ পান, শ্রমিকের মজুরি ও ভাতা, পুঁজিপতির প্রাপ্য সুদ এবং ব্যবস্থাপকের মুনাফা এই সমস্ত যোগ দিলে জাতীয় আয় জানা যায়।

দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে জাতীয় আয় পরিমাপকালেও বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। শুধুমাত্র অর্থের বিনিময়ে হস্তান্তরিত হইলেই সেই আয় জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না। একটি বাড়ী বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যায় তাহা জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে না, কারণ বিক্রয় দ্বারা শুধু মালিকানাস্বত্ব হস্তান্তরিত হয়, কোন নূতন ধন উপাদিত হয় না। অনায়াসলভ্য আয়, যথা—ভিক্ষুকের আয়, বৃদ্ধবয়সের ভাতা প্রভৃতি যে আয় বিনা উৎপাদনে পাওয়া যায়, তাহাও জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে। সঠিকভাবে জাতীয় আয় নির্ধারণ করিতে হইলে দেশের জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ও মূল্যস্তরের পরিবর্তনের উপর লক্ষ্য রাখিয়া পরিমাপকার্য পরিচালিত করা আবশ্যক।

৩। ভোগ ও সঞ্চয় পদ্ধতি—Consumption and Savings Method

ভোগ ও সঞ্চয় পদ্ধতির সাহায্যে জাতীয় আয় পরিমাপ করা যায়। একটি বৎসরে দেশের বিভিন্ন উৎস হইতে যে আয় হয়, সেই আয় আংশিকভাবে ভোগ্য-দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হয় এবং আংশিকভাবে সঞ্চয় করা হয়। সুতরাং সমগ্র জাতীয় আয়ের একাংশ ভোগ করা হয়, অপরাংশে সঞ্চয় করা হয়। সুতরাং একটি দেশে একটি নির্দিষ্ট বৎসরে ভোগ্যদ্রব্য ও সেবামূলক কার্য ব্যবহারের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় এবং যে পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত হইয়া মূলধন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে—এই উভয়ের সমষ্টি হইল জাতীয় ব্যয় (National Outlay)।

জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার তিনটি পদ্ধতি—উৎপাদন, আয় ও ব্যয়—বিভিন্ন হইলেও তিনটি পদ্ধতির সাহায্যে একই ফল পাওয়া যায়। উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানগুলি অর্থাৎ জমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা যাহা উৎপাদন করে, এই উৎপাদন পরিমাণ পুনরায় খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা হিসাবে উৎপাদন-গুলির মধ্যে ভাগ হয়। সুতরাং জাতীয় উৎপাদন জাতীয় আয়ের সমান হইবেই। জাতীয় আয় আবার লোকে অংশতঃ ভোগের জন্য ব্যয় করে, অংশতঃ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করে। সঞ্চয় ও ভোগ মিলিয়া জাতীয় ব্যয় হয়। এদিক দিয়াও জাতীয় আয় জাতীয় ব্যয়ের সমান।

জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধা—Difficulties in the measurement of National Income

জাতীয় আয় সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব হইলেও জাতীয় আয় নিরূপণ করা দুরূহ।

প্রথমতঃ, যে সমস্ত তথ্য ও পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করিয়া জাতীয় আয় গণনা করা হয় সর্বত্র সময়ে সেই তথ্যাদি পাওয়া যায় না। অনুন্নত দেশগুলিতে এই অসুবিধা বেশী। দ্বিতীয়তঃ, অর্থের মূল্য পরিবর্তনের ফলে জাতীয় আয় নির্ধারণ করার অসুবিধা ঘটে। তৃতীয়তঃ, কোন দ্রব্য বা সেবামূলক কার্যের মূল্যবৃদ্ধি না পাইয়াও যদি উপযোগিতা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে উৎপাদনের দিক দিয়া জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলেও অর্থমূল্যে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় না। চতুর্থতঃ, জাতীয় আয় গণনার আর একটি অসুবিধা হইল, একই দ্রব্য একাধিকবার গণনা করিবার সম্ভাবনা।

ভারতের জাতীয় আয়—National Income of India

ভারতের জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদ অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিক হইলেও এ দেশের জাতীয় আয় অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক কম। জাতীয় আয়ের স্বল্পতার জন্য এদেশের জনসাধারণের মাথাপিছু আয় নগণ্য এবং অধিকাংশ লোকই দারিদ্র্য-পীড়িত। দারিদ্র্য দূর করিয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইলে, জাতীয় আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে বর্তমান ভারত সরকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে জাতীয় আয়-বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন।

ভারতে জাতীয় আয় নির্ণয় করিয়া জনপ্রতি আয় নির্ধারণ করিবার চেষ্টা পূর্বতন সরকার করেন নাই। তবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু নানা-কারণে এই ব্যক্তিগত চেষ্টার ফল নির্ভরযোগ্য নহে। বর্তমানে ভারত সরকার এ বিষয়ে অবহিত হইয়া জাতীয় আয় নির্ধারণের ব্যবস্থা করিয়াছেন—কারণ, জাতীয় আয় নিরূপণ না করিয়া কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় না। জাতীয় আয় নির্ধারণ করিবার জন্য ভারত সরকার ১৯৪৯ সালে অর্থদপ্তরে একটি জাতীয় আয়কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন এবং ইহা পরিচালনা করিবার জন্য একটি জাতীয় আয় কমিটি (National Income Committee) নিযুক্ত হইয়াছে। ১৮৭০ সালে দাদাভাই নওরোজী সর্বপ্রথম ভারতীয়দের মাথাপিছু আয় নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। সেই সময় হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মাথাপিছু আয় নির্ণয়ের যে প্রচেষ্টা করিয়াছেন তাহার বিবরণ দেওয়া হইল। এই বিবরণ হইতে ভারতের জনসাধারণের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মানের একটি মোটামুটি ধারণা করা যাইতে পারে।

হিসাবকারকের নাম	আয়-পরিমাপের বৎসর	জনপ্রতি বাৎসরিক আয়
১। দাদাভাই নওরোজী	১৮৭০	২০ টাকা
২। লর্ড কার্জন	১৯০১	৩০ „
৩। অধ্যাপক ওয়াদিয়া এবং যোশী	১৯১৩-১৪	৪৪ „
৪। মিঃ সিরাস	১৯২২	১১৬ „

হিসাবকারকের নাম	আয়-পরিমাপের বৎসর	জনপ্রতি বাৎসরিক আয়
৫। ডাঃ রাও	১৯৩১-৩২	৬৫ ,,
৬। বাণিজ্য দপ্তর	১৯৪৭-৪৮	২৭২ ,,
৭। জাতীয় আয় কমিটি	১৯৫২	২৬৫ ,,
৮। ,,	১৯৫৫-৫৬	২৮০ ,,

উপরে জাতীয় আয়ের যে হিসাব দেওয়া হইল, একমাত্র জাতীয় আয় সমিতির হিসাব ব্যতীত অন্য হিসাবগুলিকে নির্ভরযোগ্য বলা চলে না। ভারতে জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে সরকারেরও অনেক অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ, ভারতের জনসাধারণ নিরক্ষর এবং তাহাদের অজ্ঞতার জন্য তাহারা সরকারকে জাতীয় আয় নির্ধারণ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি-সংগ্রহ ব্যাপারে সাহায্য করে না। এতদ্ব্যতীত এ দেশের উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের বেশীর ভাগ উৎপাদকগণ নিজেরাই ব্যবহার করে কিংবা প্রত্যক্ষভাবে দ্রব্য-বিনিময় করে। এই ব্যবস্থার ফলে উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের মূল্য অর্থে রূপান্তরতি হয় না বলিয়া আয়ের হিসাব নির্ভুল হয় না।

জাতীয় আয় সমিতির বিবরণ বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের জাতীয় আয় অন্যান্য দেশের আয় অপেক্ষা কত কম এবং ইহার ফলে আমাদের মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতার জন্য আমাদের দেশের লোক কত গরীব এবং তাহাদের জীবনযাত্রার মান কত নীচু। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইবার ফলে জাতীয় আয় পরিমাণ ও মাথাপিছু আয় পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিম্ন প্রদত্ত বিবরণী হইতে এই বৃদ্ধির পরিমাণ সম্পর্কে একটা ধারণা করা যাইতে পারে।

পরিকল্পনার পূর্বে

জাতীয় আয় পরিমাণ (চলতি মূল্যের হিসাবে)	মাথাপিছু আয় পরিমাণ (চলতি মূল্যের হিসাবে)
১৯৪৮-৪৯—৮,৬৫০ কোটি টাকা	২৪৬.৯ টাকা
১৯৪৯-৫০—৯,০১০ ,, ,,	২৫৩.৯ ,,
১৯৫০-৫১—৯,৫৩০ ,, ,,	২৬৫.২ ,,

পরিকল্পনার পরে

জাতীয় আয় পরিমাণ (চলতি মূল্যের হিসাবে)	মাথাপিছু আয় পরিমাণ (চলতি মূল্যের হিসাবে)
১৯৫১-৫২—৯,৯৭০ কোটি টাকা	— ২৭৪ টাকা
১৯৫২-৫৩—৯,৮২০ " "	— ২৬৬·৪ "
১৯৫৩-৫৪—১০,৪৯০ " "	— ২৮১ "
১৯৫৪-৫৫—৯,৬১০ " "	— ২৫৪·২ "
১৯৫৫-৫৬—৯,৯৮০ " "	— ২৫৫·০ "
১৯৫৬-৫৭—১১,৩১০ " "	— ২৮৩·৪ "
১৯৫৭-৫৮—১১,৩৯০ " "	— ২৭৯·৬ "
১৯৫৮-৫৯—১২,৬০০ " "	— ৩০৩·০ "
১৯৫৯-৬০—১২,৯৪০ " "	— ৩০৪·৭ "
১৯৬০-৬১—১৪,২০০ " "	— ৩২৭·৩ "
১৯৬১-৬২—১৪,৮০০ " "	— ৩৫৩·৬ "
১৯৬২-৬৩—১৫,৪০০ " "	— ৩৩৯·৪ "

(প্রাথমিক হিসাব)

উপরি-প্রদত্ত বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মূল্য হ্রাস হওয়া সত্ত্বেও পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইবার পূর্বে ১৯৫০-৫১ সাল হইতে জাতীয় আয় ৯,৫৩০ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া পরিকল্পনার চতুর্থ বৎসরে অর্থাৎ ১৯৫৪-৫৫ সালে ৯,৬১০ কোটি দাঁড়ায়। ১৯৫০-৫১ সাল হইতে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ২৬৫·২ টাকা হইতে কমিয়া ১৯৫৪-৫৫ সালে ২৫৪·২ টাকা হইলেও বলা যায় যে, এই সময়ে মূল্য হ্রাস পায়, সেজন্য মাথাপিছু আয় কম দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে মাথাপিছু প্রকৃত আয় ২৪৬·৩ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৬৯৲ টাকায় দাঁড়ায় অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

জাতীয় আয়ের উৎস—Sources of National Income

একটি দেশের জাতীয় আয় নানা উৎস হইতে উপার্জিত হয়। বিভিন্ন দেশে এই উৎসগুলির গুরুত্ব সমান নহে। পশুপালন, খনি, কৃষি, মৎস্যের চাষ, ফলের উৎপাদন, ছোট-বড় ও কুটিরশিল্প, পরিবহন, যোগাযোগ, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও

নানাবিধ সেবামূলক কার্য হইতে জাতীয় আয় উপার্জন করা হয়। অনুন্নত দেশগুলিতে পশুপালন, কৃষিকার্য, কুটিরশিল্প প্রভৃতি হইতে জাতীয় আয়ের বেশীর ভাগ পাওয়া যায়, আর উন্নত দেশগুলির জাতীয় আয়ের বেশীর ভাগ বড় বড় শিল্প-কারখানা, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও পরিবহন হইতে পাওয়া যায়।

ভারতে জাতীয় আয়ের উৎসগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যে, কৃষি হইতে জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক পাওয়া যায়।

ভারতের জাতীয় আয়ের উৎস

	১৯৬১-৬২ শতকরা	১৯৬২-৬৩ (প্রাথমিক হিসাব) শতকরা
১। কৃষি	৪৭·০	৪৫·৩
২। খনি, বড় ও ছোট শিল্প	১৯·৫	২০·১
৩। ব্যবসায়-বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ	১৬·৮	১৭·০
৪। নানাবিধ সেবামূলক কার্য	১৭·২	১৮·১
৫। বিদেশ হইতে উপার্জিত নীট্ আয়	—০·৫	—০·৫

জাতীয় আয়ের বিভিন্ন উৎস বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান এবং জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক কৃষি হইতে পাওয়া যায়। বৃহৎ শিল্প-কারখানা হইতে জাতীয় আয়ের শতকরা মাত্র সাতভাগ পাওয়া যায় আর ক্ষুদ্র শিল্প হইতে দশভাগ পাওয়া যায়। ইহার দ্বারা বুঝা যায় আমাদের দেশ শিল্পসম্পদে অতি দরিদ্র। আবার, এই স্বল্প পরিমাণ জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় ৫৩ ভাগ খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিতে ব্যয় হয়।

ভারতের জনসাধারণ যে কত দরিদ্র ও তাহাদের জীবনযাত্রার মান যে কত নীচু তাহা উপরি-প্রদত্ত বিবরণী হইতে জানিতে পারা যায়। ইংলণ্ডের লোকের মাথাপিছু মাসিক আয় হইল ৩৬৩৲ টাকা, আমেরিকানদের আয় হইল ৭৮৪৲ টাকা, জাপানীদের আয় হইল প্রায় ৮২৲ টাকা—আর ভারতবাসীর মাসিক আয় হইল (৩৩৯ ÷ ১২) = ২৮৲। এই নগণ্য আয়ও আবার সকলের মধ্যে

সমানভাগে ভাগ হয় না—কেহ বেশী পায়, কেহ বা এত কম পায় যে, তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান হয় না। একটি হিসাবে ভারতে মাথাছি আয়ের তারতম্য দেখান হইয়াছে। এই হিসাব অনুসারে সমগ্র জাতীয় আয়ের এক-তৃতীয়াংশ শতকরা পাঁচজন লোক ভোগ করে, অপর এক-তৃতীয়াংশ পঁয়ত্রিশজনের মধ্যে বন্টিত হয় এবং অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ শতকরা ষাটজনে ভোগ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভারতের দারিদ্র্যের জন্য শুধুমাত্র উৎপাদন-ব্যবস্থা দায়ী নহে, বন্টন-ব্যবস্থার ত্রুটিও সমভাবে দায়ী।

বর্তমানে যদিও জনসাধারণের মাথাপিছু আর্থিক আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত আয় সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯৩১-৩২ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ৬৫৲ টাকা, কিন্তু বর্তমানে এই আয় চারগুণ বৃদ্ধি পাইলেও লোকের জীবনযাত্রার মানের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। কারণ, আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অনেকক্ষেত্রে আয়বৃদ্ধির তুলনায় দ্রব্যমূল্য অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩১-৩২ সালে এক মণ চাউলের দাম ছিল ৪৲ টাকা, ১৯৬৪ সালে সেই চাউলের মূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়া ৫০৲ টাকা হইয়াছে। সুতরাং আয়বৃদ্ধি হইলেও অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয় নাই।

সংক্ষিপ্তসার

উপাদানের আয়

ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা এই চারিটি হইল উৎপাদনের উপাদান এবং খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা হইল যথাক্রমে ইহাদের আয়। প্রত্যেকটি উপাদানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রত্যেকটি আয় অপরাপর আয় হইতে পৃথক।

মজুরি

মজুরি জাতীয় আয়ের একটি অংশ। শ্রমিকের কাজের জন্য যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, তাহাকে মজুরি বলা হয়। মজুরি কাজের পরিমাপে দেওয়া যাইতে পারে, আবার সময়ের পরিমাপেও দেওয়া যাইতে পারে।

আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরি

কাজের প্রতিদান হিসাবে শ্রমিক যে পরিমাণ অর্থ পায়, তাহাকে আর্থিক মজুরি

বলা হয়। আর্থিক মজুরি ছাড়াও শ্রমিক মালিকের নিকট হইতে যে সুখ-সুবিধাগুলি পায়, তাহাকে প্রকৃত মজুরি বলা হয়। প্রকৃত মজুরি অর্থপরিমাণ ছাড়া আরও অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যথা, দ্রব্যমূল্য, কাজের সুবিধা-অসুবিধা, বাড়তি আয়ের সম্ভাবনা, কাজের স্থায়িত্ব প্রভৃতি। প্রকৃত মজুরির পরিমাণ দ্বারাই শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থার পরিমাপ করা যায়।

প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা নীতি

মজুরি-নির্ধারণ নীতি সম্পর্কে নানা মত আছে। আধুনিক ধনবিজ্ঞানিগণ দ্রব্যমূল্য-নির্ধারণ নীতির চাহিদা ও যোগানের সূত্রটি প্রয়োগ করিয়া মজুরি-নির্ধারণ নীতির ব্যাখ্যা করেন। চাহিদার দিক দিয়া উৎপাদনে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা ও যোগানের দিক দিয়া শ্রমিকের জীবনযাত্রার ব্যয়ের দ্বারা মজুরি নির্ধারিত হয়।

মজুরির হারের পার্থক্যের কারণ

কর্মদক্ষতার পার্থক্য ও প্রতিযোগিতার অভাবই হইল মজুরির পার্থক্যের প্রধান কারণ। সকলে সমান কর্মদক্ষ হইলে পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য মজুরির পার্থক্য দেখা যায়ঃ ১। বৃত্তিগুলি সমান রুচিকর নহে, ২। বৃত্তিগুলির ঝুঁকি ও দায়িত্বের পার্থক্য, ৩। কাজের স্থায়িত্ব, ৪। বৃত্তিশিক্ষার ব্যয়, ৫। ভবিষ্যৎ উন্নতি ও অতিরিক্ত আয়ের সম্ভাবনা ইত্যাদি।

ভারতে মজুরির হার

ভারতে শ্রমিক অন্যান্য দেশের শ্রমিক অপেক্ষা কম মজুরি পায়। শিল্প শ্রমিকগণ বর্তমানে শ্রমিক সঙ্ঘের সাহায্যে তাহাদের মজুরির হার কিছু পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। দেশের সরকারও এ বিষয়ে অবহিত হইয়া অনেক ক্ষেত্রে ন্যায্য-মজুরি স্থির করিয়া দিয়াছেন।

সুদ

উৎপাদনের মূলধনের কার্যকারিতার জন্য যে মূল্য দিতে হয়, তাহাকে সুদ বলে। দেনাদার পাওনাদারকে মূলধনের ব্যবহার-মূল্য হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ দেয়, তাহা হইল মোট সুদ। মূলধন ধার দিয়া পাওনাদারকে পাওনা টাকা আদায় করিবার জন্য যে ঝুঁকি ও হাঙ্গামা সহ্য করিতে হয়, মোট সুদ হইতে ঐ ঝুঁকি ও হাঙ্গামার খরচ বাদ দিলে নীট বা খাঁটি সুদ পাওয়া যায়।

সুদের হারের তারতম্য

ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা ও ধার-দেওয়া অর্থের নিরাপত্তার পার্থক্যের জন্যই সুদের হারের পার্থক্য হয়। যেখানে ঝুঁকি বেশী, সেখানে সুদের হারও বেশী। ভারত সরকার অল্প সুদে টাকা ধার পায়। তাহার কারণ হইল ভারত সরকারের আর্থিক সামর্থ্য ও সুনাম। কৃষকের বেশী সুদ দিতে হয়। তাহার কারণ তাহার আর্থিক সঙ্গতি বা সুনাম নাই।

সুদের হার কি ভাবে স্থির হয়

দ্রব্যমূল্যের ন্যায় চাহিদা ও যোগানের সূত্র দ্বারা সুদ-নির্ধারণ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হয়। চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় যে হারে সুদ হইলে মূলধনের মোট সরবরাহ মোট চাহিদার সমান হয়, সেই হারেই একটা নির্দিষ্ট অবস্থায় সুদের হার নির্ধারিত হয়।

ভারতে সুদের হার

ভারতে সুদের হার বেশী। ইহার কারণ হইল সঞ্চয়ের অভাবে মূলধনের সরবরাহ-পরিমাণ খুব কম। পল্লী অঞ্চলে সুদের হার অত্যন্ত অধিক, কারণ, এক মহাজন ব্যতীত ধার পাইবার আর অন্য কোন উপায় নাই। পল্লীবাসীর ধার শোধ করিবার সামর্থ্যের অভাবও বেশী সুদের আর একটি কারণ।

খাজনা

ভূমি ও অন্যান্য প্রকৃতি-দত্ত উপাদানগুলি ব্যবহারের জন্য যে মূল্য দেওয়া হয়, তাহাকে খাজনা বলে। মোট প্রদত্ত খাজনা-পরিমাণ হইতে জমির মালিকের জমিতে নিযুক্ত নিজস্ব মূলধনের সুদ, নিজস্ব পরিশ্রমের মজুরি বাদ নিলে নীট খাজনা পাওয়া যায়।

রিকার্ডোর খাজনা-তত্ত্ব

রিকার্ডোর মতে জমির উৎপন্ন পরিমাণের যে অংশ জমির আদিম ও অবিনশ্বর ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে দেওয়া হয়, তাহাই হইল খাজনা। নূতন দেশে লোকে প্রথমতঃ ভাল জমি চাষ করে। জনসংখ্যা-বৃদ্ধির ফলে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে ভাল জমির অভাবে লোকে খারাপ জমি চাষ করিতে আরম্ভ করে। সমান পরিমাণ খরচ করিয়া খারাপ জমি অপেক্ষা ভাল জমিতে যে পরিমাণ

খরচাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত থাকে, তাহাই উৎপাদকের উদ্বৃত্ত বা খাজনা নামে অভিহিত হয়। খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা যতই বৃদ্ধি পায়, অপেক্ষাকৃত খারাপ জমি ততই বেশী চাষ করা হয় এবং এইরূপে তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণীর জমি চাষের ফলে উৎকৃষ্ট জমির উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া খাজনা বৃদ্ধি হয়।

খাজনার কারণ

(১) চাহিদার তুলনায় জমির সরবরাহ সীমাবদ্ধ বলিয়া জমির ব্যবহারের জন্য খাজনা দিতে হয়। (২) খাজনার আর একটি কারণ হইল ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন-বিধির কার্যকারিতা। এই কারণে ভাল জমি হইতে বেশী শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিয়াও অধিক পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব হয় না। সুতরাং খারাপ জমি চাষ করিতে হয় এবং খারাপ জমি চাষ করিলেই তাহার তুলনায় ভাল জমিতে উদ্বৃত্ত হয় এবং এই উদ্বৃত্তই হইল খাজনা। রিকার্ডো আরও বলেন যে, ভাল জমির এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ জমির উর্বরতা ও অবস্থানের সুবিধা—এই উভয়ের উপর নির্ভর করে।

অর্থনৈতিক খাজনা ও চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত খাজনা

জমির মালিক নিজে জমি চাষ করিয়া খরচ বাদ দিয়া যে উদ্বৃত্ত আয় পায় তাহাই হইল অর্থনৈতিক খাজনা। জমির মালিক ও প্রজার মধ্যে দর-কষাকষি হইয়া প্রজা জমির মালিককে জমি ব্যবহার করিবার জন্য যে পরিমাণ মূল্য দিতে স্বীকার করে, তাহাই হইল চুক্তিগত খাজনা। ইহা সাধারণতঃ অর্থনৈতিক খাজনার বেশী হইতে পারে না।

খাজনার সহিত মূল্যের সম্পর্ক

ফসলের মূল্য নিকৃষ্ট (প্রান্তিক) জমির উৎপাদন-ব্যয়ের সমান হয়। নিকৃষ্ট জমি চাষ করিলে মূল্য দ্বারা উৎপাদন-ব্যয় পোষায়, কিন্তু কোন উদ্বৃত্ত থাকে না। কাজেই এ জমির কোন খাজনা হয় না। যেহেতু খাজনা নিকৃষ্ট জমির উৎপাদন-ব্যয়ের অংশ নহে, সেইহেতু খাজনা মূল্যেরও অংশ হইতে পারে না। কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বাড়িলে উদ্বৃত্ত বেশী হইয়া খাজনা বেশী হয়, কিন্তু খাজনা বেশী বলিয়া মূল্য বেশী হইতে পারে না।

শহরাঞ্চলে গৃহনির্মাণের জমির খাজনা

গৃহনির্মাণের জন্য শহরাঞ্চলের জমির খাজনা-নির্ধারণে জমির উর্বরতার কোন

কার্যকারিতা নাই। জমির অবস্থানের সুবিধা-অসুবিধার ভিত্তিতেই উহার খাজনা নির্ধারিত হয়।

জনসংখ্যা-বৃদ্ধি ও কৃষির উন্নতির সহিত খাজনার সম্পর্ক—

(১) জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে নিকৃষ্ট জমি চাষ করিতে হয়। নিকৃষ্ট জমি চাষ করিবার ফলে উৎকৃষ্ট জমির উদ্বৃত্ত-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া খাজনা বৃদ্ধি পায়।

(২) কৃষিকার্যের উন্নতি হইলে যদি এই উন্নত ধরণের কৃষিপদ্ধতি সকল জমিতেই প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে নিম্নস্তরের জমির চাষ বন্ধ হয় ও খাজনা কমে।

অনুপার্জিত মূল্যবৃদ্ধি

শহরের উপকণ্ঠে সরকারী বা বে-সরকারী প্রচেষ্টায় যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি হয়, তাহা হইলে জমির দাম বাড়িয়া যায়। সামাজিক অগ্রগতির ফলে জমির এই মূল্যবৃদ্ধিকে অনুপার্জিত মূল্যবৃদ্ধি বলা হয়, কারণ ভূ-স্বামীকে জমির উন্নতির জন্য কিছুই করিতে হয় না, অথচ তিনি এই বর্ধিত আয় ভোগ করেন।

ভারতে জমির খাজনা

ভারতে জমির খাজনা প্রধানতঃ প্রথার দ্বারা নির্ধারিত হইত। ইংরাজ শাসন-কালে আইন দ্বারা খাজনার পরিমাণ নির্ধারিত হয়। বর্তমানে জনসংখ্যা-বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে খাজনা অনেক পরিমাণে প্রতিযোগিতার দ্বারা স্থির হইতেছে। জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদের ফলে ভারতে বর্তমানে চিরাচরিত পদ্ধতিতে খাজনা প্রদ প্রায় রহিত হইয়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তৃত হইতেছে।

মুনাফা

বিক্রয়লব্ধ মোট আয় হইতে মোট ব্যয় বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহাকে ব্যবস্থাপকের মোট মুনাফা বলা হয়। মোট মুনাফা হইতে ব্যবস্থাপকের নিজের জমির খাজনা, মূলধনের সুদ ও নিজের পারিশ্রমিক বাদ দিলে নীট মুনাফা পাওয়া যায়।

মুনাফার বৈশিষ্ট্য

(১) মুনাফা হইল অবশিষ্ট আয় অর্থাৎ খাজনা, সুদ ও মজুরি দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই হইল মুনাফা। (২) খাজনা, মজুরি, সুদ প্রভৃতি অন্যান্য

আয়ের পরিমাণের মত মুনাফা-পরিমাণের কোন স্থিরতা নাই। (৩) মুনাফা একেবারেই নাও হইতে পারে। (৪) মুনাফার প্রধান কারণ হইল ঝুঁকি-বহন, এবং ঝুঁকি-বহন-ক্ষমতার পার্থক্যের জন্য ব্যবস্থাপকগণের মুনাফা-পরিমাণের পার্থক্য হয়।

নীট মুনাফার উপাদান

(১) পরিচালনা কার্যের পারিশ্রমিক, (২) ঝুঁকি-বহনের পুরস্কার, (৩) একচেটিয়া লাভ, (৪) অদৃষ্টপূর্ব অবস্থা-জনিত অতিরিক্ত লাভ, (৫) নূতন উদ্ভাবন-জনিত অতিরিক্ত লাভ। প্রথম দুইটি উপাদান লইয়া গঠিত মুনাফাকে স্বাভাবিক মুনাফা বলা হয় এবং দীর্ঘ মেয়াদে সকল ব্যবস্থাপকই এই মুনাফা অর্জন করেন।

ভারতে ব্যবস্থাপকের মুনাফা

অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের ব্যবস্থাপকগণ কম ঝুঁকি গ্রহণ করেন। তাঁহাদের উদ্ভাবন-শক্তিও কম। সুতরাং মুনাফা-পরিমাণও কম। তবে বর্তমানে ভারতেও প্রথম শ্রেণীর ব্যবস্থাপকের আবির্ভাবের সম্ভাবনা হইয়াছে।

যৌথ প্রতিযোগিতা

শ্রমিকগণ প্রায় সবদিক দিয়াই মালিকগণের সহিত এককভাবে প্রতিযোগিতা করিতে অসমর্থ। তাই তাহারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে মালিকের সহিত প্রতিযোগিতা করে।

শ্রমিক সঙ্ঘ

শ্রমিকগণ মালিকগণের নিকট হইতে তাহাদের কাজের মজুরি-বৃদ্ধি ও অন্য নানা সুখ-সুবিধা পাইবার জন্য সমবেতভাবে চেষ্টা করে। এইজন্য তাহারা শ্রমিক সঙ্ঘ গঠন করিয়া যুক্তভাবে মালিকের সহিত দর-কষাকষি করে।

শ্রমিক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য

(১) মজুরি বৃদ্ধি করা, (২) কাজের সময় হ্রাস করা, (৩) মালিকের অন্যায়-অত্যাচার প্রতিরোধ করা, (৪) শ্রমিক-ছাঁটাই প্রতিরোধ করা, (৫) কাজের স্থায়িত্ব বলবৎ করা।

শ্রমিক সঙ্ঘের কার্য

(১) শ্রমিক-কল্যাণমূলক কার্য—যাহাতে তাহারা স্বাবলম্বী হইয়া নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের উন্নতি করিতে পারে।

(২) বিবাদমূলক কার্য—ধর্মঘট করিয়া ও নানাভাবে মালিকের সহিত অসহযোগিতার দ্বারা মালিককে তাহাদের শর্ত গ্রহণে বাধ্য করিতে চেষ্টা করা।

(৩) রাজনৈতিক কার্য—রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। নির্বাচনে জয়ী হইলে সরকার গঠন করিয়া শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ করা।

ভারতে শ্রমিক আন্দোলন

ভারতে শ্রমিক আন্দোলন অতি আধুনিক কালের ঘটনা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কার্যতঃ, প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কাল হইতে ভারতে শ্রমিক-আন্দোলন শুরু হয় এবং ১৯২৬ সালে শ্রমিক সঙ্ঘগুলি সরকার কর্তৃক প্রথম স্বীকৃত হয়। তাহার পর ১৯৪৭ ও ১৯৫৩ সালে ভারতের জাতীয় সরকার শ্রমিক-সম্পর্কিত আইন পাস করিয়া এই সঙ্ঘগুলির কার্যক্রমের উপর কতকগুলি বিধি-নিষেধ আরোপ করিয়াছেন। বর্তমানে ভারতে শ্রমিক সঙ্ঘগুলি অনেক পরিমাণে সুসংবদ্ধ হইয়াছে।

ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ত্রুটি

(১) শ্রমিকগণের মধ্যে পেশাগত স্থায়ী শ্রমিকের অভাব, (২) জাতিগত ভাষাগত ও ধর্মগত বিভেদ, (৩) শ্রমিকগণের অজ্ঞতা ও কু-সংস্কার, (৪) স্বল্প হারে মজুরি, (৫) পেশাদার রাজনৈতিক কর্মীর নেতৃত্ব।

প্রতিকার

(১) শিক্ষার প্রসার, (২) শ্রমিক সঙ্ঘ পরিচালনা-সম্পর্কিত শিক্ষা, (৩) মালিকের সহানুভূতি, (৪) শ্রমিকের সততা ও দক্ষতা, (৫) সরকারী সাহায্য।

জাতীয় আয় ও ইহার বণ্টন

একটি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করিয়া সেই দেশের শ্রম ও মূলধন প্রতি বৎসর গড়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সেবামূলক কার্যসমেত কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য-জাত ও অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদন করে। একবৎসরের উৎপাদন-পরিমাণকে সেই

সময়ের আয় বলা হয়। এই আয়ের সেই সময়কার অর্থমূল্যকে জাতীয় আয় বলা হয়। একটি দেশের মোট জাতীয় আয় হইতে মূলধন ও কাঁচামাল প্রভৃতি পুনঃস্থাপনের জন্য যে ব্যয় হয় তাহা বাদ দিলে নীট্ জাতীয় আয় পাওয়া যায়।

জাতীয় আয় পরিমাপ করা কঠিন কাজ। ইহা পরিমাপ করিতে প্রধানতঃ দুইটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। প্রথম পদ্ধতি অনুসারে দেশের সমগ্র উৎপাদন-পরিমাণের সমষ্টির মূল্য যোগ দিয়া জাতীয় আয় নির্ধারণ করা হয়। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যজাত দ্রব্যের মূল্য ও অন্য নানাজাতীয় সেবামূলক কার্যের মূল্য যোগ দিয়া জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে দেশের বিভিন্ন উৎপাদন-কার্যে নিযুক্ত কর্মিসমূহের আয়,—যথা, খাজনা, মজুরি, সুদ, মুনাফা প্রভৃতি আয় যোগ দিয়া জাতীয় আয় স্থির করা হয়। এইরূপে জাতীয় আয় নির্ধারণকালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক, যাহাতে একই আয় একাধিকবার গণনা না হয় বা শুধুমাত্র হস্তান্তরিত আয়, যথা, ভিক্ষুকের আয় বা দান গণনা না হয়।

জাতীয় আয় বণ্টন

ভূমি, মূলধন, শ্রম ও ব্যবস্থাপনা এই চারিটি উৎপাদনের উপাদানের সাহায্যে জাতীয় আয়ের সৃষ্টি হয়। উপাদানগুলির প্রত্যেকটি উৎপাদনে সাহায্য করে এবং সেইজন্য প্রত্যেকটির একটি চাহিদা আছে। আর এই চাহিদা মিটাইবার জন্য উপাদানগুলির সরবরাহ থাকা চাই। নতুবা চাহিদা ও সরবরাহের সামঞ্জস্য হইতে পারে না। ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনা জাতীয় আয়ের কি অংশ তাহাদের কার্যের মূল্য হিসাবে পাইবে, তাহা প্রত্যেকটি উপাদানের চাহিদা ও সরবরাহের দ্বারা নির্ধারিত হয়। শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতির ফলে শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে মজুরি বৃদ্ধি পায়। আবার মূলধনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, সঞ্চয় বেশী বৃদ্ধি পাইলে সুদ হ্রাস পায়।

ভারতের জাতীয় আয়

জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় ভারতের জাতীয় আয় অতি স্বল্প। ব্যক্তিগতভাবে ভারতের জাতীয় আয় নির্ধারণ করিবার চেষ্টা অনেকে করিয়াছেন। বর্তমানে দেশের জাতীয় সরকার এই বিষয়ে অবহিত হইয়া এই কার্যের জন্য জাতীয় আয়-কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। ১৮৭০ সালে দাদাভাই নওরোজী প্রথম

জাতীয় আয় নিরূপণ করেন। তাঁহার হিসাবমত ভারতে জনপ্রতি বার্ষিক আয় ছিল ২০৲ টাকা। তারপর ১৯০১ সালে লর্ড কার্জনের সময় যে হিসাব হয়, তাহাতে জনপ্রতি বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ হয় ৩০৲ টাকা। ১৯২২ সালে মিঃ সিরাস ও ১৯৩১-৩২ সালে ডাঃ রাও-এর হিসাবমত ভারতের জনপ্রতি বাৎসরিক আয় হয় যথাক্রমে ১১৬৲ ও ৬৫৲ টাকা। ১৯৫৫-৫৬ সালে জাতীয় আয়-কমিটির হিসাব অনুসারে এই আয় ২৮০৲ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতের জনসাধারণ যে কত দরিদ্র ও তাহাদের জীবনযাত্রার মান যে কত নীচু তাহা জাতীয় আয়-কমিটির হিসাব হইতে জানা যায়। আমাদের দেশে জনপ্রতি মাসিক আয় হইল বর্তমানে মাত্র ২৮৲ টাকা। ইংলণ্ড, আমেরিকা এমন কি জাপানের অধিবাসীদের আয়ের তুলনায় এই আয় অতি নগণ্য। এই আয়ও আবার সমান ভাগে ভাগ হয় না। অল্পসংখ্যক শিল্পপতি ও ধনীসম্প্রদায় জাতীয় আয়ের একটা বিরাট অংশ ভোগ করেন। বর্তমানে জনপ্রতি আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও লোকের জীবনযাত্রার মানের বিশেষ উন্নতি হয় নাই—কারণ আর্থিক আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যমূল্য অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. Explain why wage rates vary in different occupations within a Country.

[H. S. (Hu.), 1961]

একটি দেশের মধ্যে মজুরির হার কেন বিভিন্ন হয় আলোচনা কর।

উঃ—সকল কাজের একই হারে মজুরি হয় না। ভিন্ন ভিন্ন পেশার মজুরির হারের পার্থক্য দেখা যায়। এখন প্রশ্ন হইল সব কাজে কেন মজুরি সমান হয় না। মজুরি পার্থক্যের প্রধান কারণ হইল কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার অভাব। সকলেই নিজের খুশীমত কাজ বাছিয়া লইতে পারে না—তাহা হইলে সকলেই হাইকোর্টের জজ হইতে পারিত। কাজেই দেখা যায় যে, কোন কোন বৃত্তিতে বেশী সংখ্যক লোক আবার কোন কোন বৃত্তিতে লোকাভাব। যে বৃত্তিতে বেশী লোক যায়, সেখানে মজুরির হার কম, আর যেখানে কম লোক সেখানে মজুরির হার বেশী। কিন্তু যদি ধরা যায় যে, সব লোকই সব কাজ করিতে পারে এবং খুশীমত যে-কোন কাজে যোগ দিতে পারে তাহা হইলেও নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য মজুরির পার্থক্য থাকিবে—

১। কাজটি প্রীতিকর কি অপ্রীতিকর—প্রীতিকর কাজে বেশী লোক আকৃষ্ট হয়, সেইজন্য শ্রমিকের সংখ্যা বেশী হয় ও মজুরি কম হয়। কাজটি অপ্রীতিকর হইলে কম লোক যায় ও মজুরির হার বাড়ে।

২। কাজের স্থায়িত্ব ও অস্থায়িত্ব—স্থায়ী কাজে বেশী লোক যোগদান করিতে ইচ্ছুক হয় আর অস্থায়ী কাজে কম লোক যায়। কাজেই মজুরির পার্থক্য হয়।

৩। বৃত্তি শিক্ষার ব্যয়—চাকুরি পাইতে হইলে যদি অনেক ব্যয় করিয়া বৃত্তি শিক্ষা করিতে হয়, তবে সেই সব বৃত্তিতে উচ্চহারে মজুরি না হইলে লোকে সে বৃত্তির জন্য অযথা খরচ করিবে না। এইজন্য বিশেষজ্ঞদের, চিকিৎসক ও আইনজীবীদের দর্শনী বেশী হয়।

৪। ভবিষ্যতে উন্নতির আশা বা নির্দিষ্ট বেতন ছাড়া অতিরিক্ত আয়ের সম্ভাবনা থাকিলেও লোকে সেই সব বৃত্তিতে আকৃষ্ট হয়।

৫। কাজের আনুষঙ্গিক সুবিধা—বিনাভাড়ায় বাসগৃহ, অল্পমূল্যে খাদ্যদ্রব্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রভৃতি থাকিলেও লোক অল্প বেতনে কাজ করিতে ইচ্ছুক হয়।

2. What determines wages ? Is it the standard of living or the marginal productivity of labour ?

or

What are the different factors that determine wages.

H. S. (Com.), 1965

মজুরি কিভাবে স্থির হয় ? প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা অথবা জীবনযাত্রার মান—কোন্‌টির দ্বারা মজুরি নির্ধারিত হয় ?

উঃ—মজুরি হইল শ্রমিকের কাজের মূল্য এবং মূল্য হিসাবে ইহা অনেকটা অন্যান্য দ্রব্যমূল্যের ন্যায় চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রভাবে নির্ধারিত হয়।

দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় কালে ক্রেতার যেরূপ একটি সর্বোচ্চ মূল্য থাকে ও বিক্রেতার একটি সর্বনিম্ন মূল্য থাকে এবং এই সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্যের মাঝামাঝি বাজার মূল্য হয়; তদ্রূপ শ্রমের ক্রেতা (মালিক) ও শ্রমের বিক্রেতার (শ্রমিক নিজে) একটি সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মূল্য থাকে যাহার উপরে মালিক মজুরি দিতে পারে না ও শ্রমিক মজুরি গ্রহণ করিতে পারে না। শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার (Marginal Productivity) উপর ভিত্তি করিয়া মালিক উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার মূল্যের অনুপাতে মজুরির নির্ধারণ করে। অপর পক্ষে বর্তমানে শ্রমিকগণ শ্রমিকসঙ্ঘের সাহায্যে মালিকের সহিত দর-কষাকষি করিয়া যে হারে মজুরি লইতে স্বীকৃত হয়, যোগানের দিক দিয়া তাহাই হইল মজুরির সর্বনিম্ন হার এবং এই হার শ্রমিকগণের জীবনযাত্রার মান (standard of living), কাজটি আরামদায়ক কি কষ্টকর প্রভৃতি শ্রমের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। এই সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সীমার মধ্যে মজুরির হার পরিবর্তিত হইবে। শ্রমিকের চাহিদা বাড়িলে মজুরির হার সর্বোচ্চ সীমার কাছাকাছি যাইবে, আবার চাহিদার অনুপাতে শ্রমিকের যোগান বাড়িলে সর্বনিম্ন সীমার সমান হইবে। সুতরাং শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ও জীবনযাত্রার মান—এই উভয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে মজুরি নির্ধারিত হয়। তবে মালিকের সহিত শ্রমিকের পূর্ণ প্রতিযোগিতার অক্ষমতাহেতু মজুরি নির্ধারণে শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানের প্রভাব সব সময় সমান কার্যকরী হয় না।

3. Explain how interest is determined. [H. S. (Hu.), 1961]

Why does the lender charge different rates of interest for different types of loans ?

সুদ কিভাবে স্থির হয় ? পাওনাদার বিভিন্ন ধারের জন্য বিভিন্ন হারে সুদ আদায় করে কেন ?

উঃ—ঋণদাতা ঋণ-গ্রহীতার নিকট কেন সুদ দাবী করে ইহাই আলোচ্য বিষয়। মার্শাল প্রভৃতি কয়েকজন ধনবিজ্ঞানী বলেন যে, ঋণদাতার ধার দিবার ক্ষমতা নির্ভর করে তাহার মূলধন পরিমাণের উপর—আবার মূলধন পরিমাণ নির্ভর করে সঞ্চয়ের উপর। সঞ্চয় করিতে গেলে লোকের বর্তমান খরচ কমাইতে হয় অর্থাৎ বর্তমান প্রয়োজন না মিটাইয়া তাহাকে জমাইতে হয়। লোকে যাহা আয় করে বর্তমানে সেই আয়ের সমস্তটাই নিজের ভোগের জন্য ব্যয় না করিয়া ভবিষ্যতের জন্য রাখিতে হয়। সঞ্চয় করিতে গেলেই বর্তমানের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ অন্ততঃ কিছুটা কমাইয়া ভোগ নিবৃত্তি করিতে হয়। সুতরাং লোককে ভোগ হইতে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে সঞ্চিত মূলধনের জন্য একটা মূল্য দিতে হয়। এই মূল্যই হইল সুদ।

মার্শাল প্রমুখ ধনবিজ্ঞানিগণ সুদকে সঞ্চয়ের পুরস্কার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু কেইনস্ প্রভৃতি ধনবিজ্ঞানিগণ বলেন যে, সুদ সঞ্চয় পরিমাণ বা মূলধনের উৎপাদন-ক্ষমতার উপর নির্ভর করে না। তাঁহাদের মতে সুদ পরিমাণ নির্ভর করে লোকে কত টাকা ধার দিতে ও নিতে চায় তাহার উপর। লোকের নগদ টাকার প্রতি একটা আসক্তি থাকে। কারণ, নগদ টাকা হাতে থাকিলে নগদ টাকার মালিক নানাদিক দিয়া অনেক সুবিধা পায়—এবং এই সুবিধাগুলির জন্য সে নগদ টাকা হাতছাড়া করিতে চায় না। টাকা ধার দিলে টাকা হাতছাড়া হয় ও ঐ ধার দেওয়া টাকা নিজের হাতে থাকিলে যে সুবিধাগুলি পাওয়া যাইত তাহা আর পাওয়া যায় না। সুতরাং যাহার হাতে টাকা আছে তাহাকে ধার দিবার উদ্দেশ্যে প্রলুব্ধ করিবার জন্য দেনাদারকে অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়। এই অতিরিক্ত টাকাই হইল সুদ।

[দ্বিতীয় ভাগের উত্তরের জন্য চতুর্থ উত্তর দ্রষ্টব্য।]

4. Explain why rates of interest vary.

সুদের হার কেন বিভিন্ন হয় আলোচনা কর।

উঃ—মজুরির হারের ন্যায় সুদের হারেরও পার্থক্য দেখা যায়। ব্যাঙ্ক হইতে শতকরা ৪।৫ টাকা হারে ধার পাওয়া যায়, অথচ মহাজন শতকরা ২০।২৫ টাকা সুদ আদায় করে। সুদের হারের এই পার্থক্যের কারণ কি ? ধার দেওয়া টাকা ফেরৎ পাইবার অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি যত বেশী হয়, ঋণদাতা তত বেশী হারে সুদ দাবী করে। দেনাদারের ধার শোধ দিবার ক্ষমতা যদি কম হয় তাহা হইলেও পাওনাদার বেশী সুদ দাবী করে। এইজন্যই আমাদের দেশে কৃষকদের অধিক হারে সুদ দিতে হয়, অথচ ভারত সরকার ধার করিতে চাহিলেই অল্প সুদে বহু টাকা পায়, কারণ সরকারকে ধার দিলে সে ধারের অর্থ মারা যাইবার ভয় নাই।

5. Discuss the origin and significance of rent.

খাজনার উৎপত্তি ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

উঃ—জমির দুষ্প্রাপ্যতাই হইল খাজনার কারণ। চাহিদার তুলনায় যদি কোন দ্রব্যের যোগান সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে সে দ্রব্যের জন্য একটা মূল্য দিতে হয়। জমির ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, জমির যোগান প্রকৃতির দ্বারা সীমাবদ্ধ। চাহিদার তুলনায় জমির যোগান সীমাবদ্ধ, সেইজন্য জমি ব্যবহার করিতে হইলে জমির মালিককে একটা মূল্য দিতে হয় এবং এই মূল্যই হইল খাজনা। জমির দুষ্প্রাপ্যতা ছাড়াও খাজনা উৎপত্তির আরও দুই-একটি গৌণ কারণ আছে; যথা, জমির উর্বরতা, বাজারের নৈকট্য ইত্যাদি। যে জমিতে বেশী ফসল হয়, যোগানের তুলনায় সে জমির চাহিদা অনেক বেশী, সুতরাং ভাল জমির খাজনা বেশী হয়।

খাদ্যশস্য ও পণ্যশস্যের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে নিকৃষ্ট জমির চাষ হয়, এবং যতই নিকৃষ্ট জমির চাষ হয়, উৎকৃষ্ট জমির খাজনা ততই বৃদ্ধি পায়। উৎকৃষ্ট জমির মালিকগণ বিনা পরিশ্রমে এই বর্ধিত আয় ভোগ করেন। এইজন্য খাজনাকে অনুপার্জিত আয় বলা হয়। যেহেতু খাজনা অনুপার্জিত আয়, সেইহেতু সরকার কর্তৃক কর ধার্যের ইহা একটি উপযুক্ত উৎস। খাজনা জমির মালিকের অনায়াসলভ্য আয়। ইহার উপর কর স্থাপন করিলে জমির যোগান বা উৎপাদন-ক্ষমতা কোনরূপ ব্যাহত হয় না, অধিকন্তু সমাজে খাজনা ভোগকারী শ্রমবিমুখ যে এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার বিলুপ্তি ঘটিবে এবং বর্তমানে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা দূর হইবে।

6. Explain Ricardo's theory of rent.

রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।

উঃ—রিকার্ডোর মতে খাজনা হইল জমি হইতে প্রাপ্ত খরচাতিরিক্ত আয় এবং এই আয়ের মূল কারণ হইল জমির দুষ্প্রাপ্যতা। লোকে আগে ভাল জমি চাষ করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্যশস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, ফলে ভাল জমির অভাবে লোকে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমি চাষ করে। নিকৃষ্ট জমি একই খরচায় চাষ করিলে উৎকৃষ্ট জমির ফসল পরিমাণ অপেক্ষা কম পরিমাণ ফসল পাওয়া যায়। একই খরচা করিয়া উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট জমিতে ফসল পরিমাণের যে পার্থক্য হয় তাহাই হইল উৎকৃষ্ট জমির খরচাতিরিক্ত আয় বা খাজনা। এই অতিরিক্ত আয়ের কারণ হইল একখণ্ড জমি অন্য খণ্ড হইতে বেশী উর্বর কিংবা বেশী সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত। এইরূপে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে যতই নিম্নস্তরের জমি চাষ হইবে, উচ্চস্তরের জমির খাজনা ততই বৃদ্ধি পাইবে।

7. Examine the connection between rent and price.

[H.S. (Hu.), Comp. 1961]

খাজনার সহিত মূল্যের সম্পর্ক বিচার কর।

উঃ—ফসল উৎপাদনের খরচ বাদ দিয়া জমি হইতে যে উদ্বৃত্ত আয় পাওয়া যায়, তাহা হইল খাজনা। ফসলের বাজার দাম নিকৃষ্ট (প্রান্তিক) জমির উৎপাদন খরচার দ্বারা স্থির হয়। প্রান্তিক জমি চাষ করিয়া কোন উদ্বৃত্ত থাকে না—শুধু খরচ পোষায়। সুতরাং প্রান্তিক জমির জন্য কোন খাজনা দিতে হয় না। কাজেই জমির খাজনা চাষবাসের খরচের বা ফসলের মূল্যের অংশ বলিয়া

ধরা যায় না। খাজনা বেশী বলিয়া ফসলের মূল্য বেশী হইতে পারে না—ফসলের মূল্য বেশী হইলে উদ্বৃত্ত বেশী হয় ও অধিক খাজনা ধার্য হয়। খাজনা মূল্যের ফল, মূল্য খাজনার ফল নহে। (Rent is the result of price and not its cause)

8. Define profit and enumerate the different elements in profit.

উঃ—ব্যবস্থাপক পরিচালনা কার্যের জন্য যে পুরস্কার পান তাহাকে মুনাফা বলা হয়। মোট আয় হইতে মোট ব্যয় বাদ দিয়া সাধারণতঃ মুনাফা হিসাব করা হয়। কিন্তু আয় ও ব্যয়ের এই পার্থক্য হইল মোট মুনাফা (Gross profit)। মোট আয় হইতে জমির খাজনা, মূলধনের সুদ ও ব্যবস্থাপকের সাধারণ পরিচালনা কার্যের পারিশ্রমিক বাদ দিলে নীট বা খাঁটি মুনাফা পাওয়া যায়।

নীট মুনাফার অংশ হইল :

১। পরিচালনা কার্যের পারিশ্রমিক, ২। ঝুঁকি বহনের পুরস্কার, ৩। একচেটিয়া লাভ, ৪। নূতন আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের পুরস্কার। সুতরাং ব্যবস্থাপকের মুনাফা পরিমাণ তাহার কর্মদক্ষতার উপর নির্ভর করে এবং এই কর্মদক্ষতার পার্থক্যের জন্য সকল ব্যবস্থাপকের মুনাফা সমান হয় না।

9. Distinguish between gross and net interest. Account for the difference in the rate of interest in a country. [H. S. (Com.), 1962

মোট সুদ ও নীট সুদের পার্থক্য কর। সুদের হারের পার্থক্যের কারণ আলোচনা কর।

উঃ—টাকা ধার লইয়া ঋণ-গ্রহীতা ঋণ-দাতাকে যে পরিমাণ সুদ প্রদান করে তাহাকে মোট সুদ বলা হয়। ধর, একজন গ্রামচাষী মহাজনের নিকট হইতে এক বৎসর পর শোধ করিবার প্রতিশ্রুতিতে বার্ষিক শতকরা ২০৲ টাকা সুদ হিসাবে ২০০৲ টাকা ধার করিল। বৎসর শেষ হইলে সে মহাজনকে ৪০৲ টাকা সুদ দিল। এই সুদ হইল মোট সুদ। নিছক মূলধন ব্যবহারের জন্য ঋণ-গ্রহীতা ঋণ-দাতাকে যে পরিমাণ অর্থ দেয় তাহা নীট সুদ। মোট সুদের পরিমাণ খাঁটি সুদ ব্যতীতও অন্যান্য উপাদান লইয়া গঠিত এবং এই কারণে মোট সুদের পরিমাণ নীট সুদের পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হয়। ধার দেওয়ার অনেক অসুবিধা, ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা আছে। অনেক সময় ঋণ আদায়ের জন্য হাঙ্গামা করিতে হয় এবং লেন-দেনের হিসাবপত্র রাখিতে হয়। ঋণ দান সম্পর্কে যেখানে অতিরিক্ত কাজ করিতে হয় বা অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকির পরিমাণ বেশী সেখানে ঋণ-দাতা মূলধন ব্যবহারের মূল্য ছাড়াও একটি অতিরিক্ত মূল্য ধার্য করে। যেমন, গ্রাম্য মহাজন ও কাবুলিওয়ালা যে সুদ আদায় করে তাহা ব্যাঙ্কের সুদ অপেক্ষা বেশী—কারণ ব্যাঙ্ক নীট সুদ আদায় করে, মহাজন আদায় করে মোট সুদ।

দ্বিতীয় ভাগের জন্য ৪নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

10. What is meant by National Income ? How is it measured ? Give a brief account of the principal sources of National Income.

জাতীয় আয় বলিতে কি বুঝ ? জাতীয় আয় কি পদ্ধতিতে পরিমাপ করা হয় ? জাতীয় আয়ের প্রধান প্রধান উৎসগুলি বর্ণনা কর।

উঃ—একটি দেশে পশুপালন, কৃষি, খনি, শিল্প, ব্যবসায়, পরিবহন প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী এবং শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী, বিচারক, গায়ক প্রভৃতি শ্রেণীর লোক যে পরিমাণ সেবামূলক কার্য একটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ এক বৎসরে উৎপাদন করে—এই উভয়ের সমষ্টিকে, সেই বৎসরের মোট জাতীয় উৎপাদন পরিমাণ (Gross National Product বা G. N. P.) বলা হয়। ভূমি, শ্রম, মূলধন ও ব্যবস্থাপনার যুক্ত প্রচেষ্টায় একটি দেশের যাবতীয় সম্পদ উৎপাদিত হয় আর এই জাতীয় মোট উৎপাদন পরিমাণের অর্থমূল্যকে মোট জাতীয় আয় (Gross National Income) বলা হয়। মোট জাতীয় আয় হইতে আবশ্যকীয় খরচ অর্থাৎ স্থায়ী মূলধনের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ, কাঁচামাল প্রভৃতি চলতি মূলধন সংগ্রহের খরচ বাদ দিলে নীট্ জাতীয় আয় (Net National Income) পাওয়া যায়।

জাতীয় আয় প্রধানতঃ দুইটি পদ্ধতির সাহায্যে নির্ণয় করা হয়ঃ (১) দ্রব্যসমষ্টি পদ্ধতি—এই পদ্ধতি অনুসারে দেশের সমগ্র উৎপাদন পরিমাণের সমষ্টির মূল্য অর্থাৎ কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়জাত দ্রব্যগুলির ও নানা জাতীয় সেবামূলক কার্যগুলির মূল্য যোগ দিয়া জাতীয় আয় স্থির করা হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে, দেশের বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত কর্মিসমূহের আয়ের পরিমাণ অর্থাৎ খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা এই সমস্ত যোগ দিলে জাতীয় আয় জানা যায়। এই উভয় পদ্ধতির সাহায্যে জাতীয় আয় নির্ধারণকালে বিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

পশুপালন, খনি, কৃষি, মৎস্যের চাষ, ফলের উৎপাদন, ছোট-বড় কুটিরশিল্প, পরিবহন ও যোগাযোগ, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও নানাবিধ সেবামূলক কার্য হইতে জাতীয় আয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন দেশে এই উৎসগুলির গুরুত্ব সমান নহে।

11. What is meant by National Income? Give a brief account of the principal sources of India's National Income.
জাতীয় আয় কাহাকে বলে? ভারতের জাতীয় আয়ের উৎসগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উঃ—প্রথম প্রশ্নের প্রথম পংক্তি দ্রষ্টব্য।

ভারতে জাতীয় আয়ের উৎস হইল কৃষি, খনি, শিল্প, (বড়, ছোট ও কুটির) ব্যবসায়-বাণিজ্য, পরিবহন ও নানাবিধ সেবামূলক কার্য। ভারতে জাতীয় আয়ের উৎসগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, কৃষি হইতে জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক পাওয়া যায়। শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি উৎসগুলি হইতে জাতীয় আয়ের পরিমাণ অন্যান্য উন্নত দেশগুলি অপেক্ষা অনেক কম।

12. Write notes on: (1) Per Capita Income, (2) Standard of living.
(ক) মাথাপিছু আয় ও (খ) জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উঃ—(১) মাথাপিছু আয় বা গড়পড়তা জাতীয় আয় বলিলে একটি নির্দিষ্ট বৎসরে একটি দেশের জনপ্রতি গড় আয় কত তাহা বুঝায়। এক বৎসরের জাতীয় আয় পরিমাণকে সেই বৎসরের লোকসংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে সেই বৎসরের মাথাপিছু আয় জানিতে পায় যায়। ১৯৫১-৫২ সালে ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ৯,৯৭০ কোটি টাকা। এই আয় পরিমাণকে সেই বৎসরের

জনসংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে দেখা যায় যে, সেই সময়ে ভারতে চল্‌তি মূল্যের হিসাবে মাথাপিছু আয় ছিল ২৭৪৲ টাকা। মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ হইতে একটি দেশের লোকের আর্থিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে ধারণা করা হয়।

(২) দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত দ্রব্যগুলিকে ভোগ করা লোকে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে সামগ্রিকভাবে সে দ্রব্যগুলিকে জীবনযাত্রার মান বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। সকলের জীবনযাত্রার মান সমান নহে। ধনী ও দরিদ্রের জীবনযাত্রার মানের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। শহরে ও পল্লীগ্রামে জীবনযাত্রার মানের পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। জীবনযাত্রার মান মাথাপিছু আয়, পারিবারিক আয় তথা জাতীয় আয় পরিমাণের উপর করে। জীবনযাত্রার মান স্থায়ী নহে—দেশ-কাল-পাত্র ভেদে এই মান পরিবর্তিত হয়।

13. Explain the nature of 'economic rent'. Does rent inter into the price of a commodity? [H. S. (Com.), 1961]

অর্থনৈতিক খাজনার প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। খাজনা কি মূল্যের অঙ্গীভূত ?

উঃ—প্রজা জমির মালিককে খাজনাবাবদ যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করে, তাহা হইল মোট খাজনা। নিছক জমি ব্যবহারের মূল্য ছাড়াও আরও কয়েকটি উপাদান লইয়া মোট খাজনা গঠিত। এই উপাদানগুলি হইল : (১) জমিতে মালিক কর্তৃক নির্মিত গৃহাদির ব্যবহার-মূল্য, মালিক কর্তৃক জমির উন্নতিকল্পে প্রযুক্ত মূলধনের সুদ, মালিকের জমি-সম্পর্কিত নিজস্ব পরিশ্রমের মজুরি ও ঝুঁকি গ্রহণের মূল্য। মোট খাজনা হইতে এই উপাদানগুলি বাদ দিয়া অর্থনৈতিক খাজনা স্থির হয়। সুতরাং শুধু জমি বা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের জন্য যে আয় হয়, তাহাকে অর্থনৈতিক খাজনা বলা হয়। ধনবিজ্ঞানে অর্থনৈতিক খাজনারই আলোচনা হয়। এই আয়ের কারণ হইল জমির যোগানের সীমাবদ্ধতা।

দ্বিতীয় ভাগের উত্তরের জন্য ৭নং উত্তর দ্রষ্টব্য।
